আইনস্টাইন

বি. কুজনেত্‌সভ্‌

মনীষা

অনুবাদ
দিলীপ বসু
সুনীল মিত্র

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক
মণি সান্যাল
৫৪এ, হরি ঘোষ ষ্ট্রিট
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
কালান্তর প্রেস
৩০/৬ ঝাউতলা রোড
কলিকাতা-১৭

দাম
সুলভ সংস্করণ—ছাব্বিশ টাকা
শোভন ,, —বত্রিশ টাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা

যে ভাবেই তাকে দেখ না কেন,
সে ছিল একজন মানুষ।
শেকস্‌পীয়ার, 'হ্যামলেট'

হ্যামলেট মানুষ বলতে বুঝত রেনেসাঁস (১) ও নতুন কালের মানুষ। তার পিতা, প্রয়াত রাজা তার কাছে কর্মের মাধ্যমে মূর্ত সুষম চিন্তারূপে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। হ্যামলেট নিজেই এই ধরনের চিন্তাকে ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে মূর্ত করার জন্যে প্রচেষ্টা করত। সপ্তদশ শতাব্দী এই নতুন আদর্শকে গ্রহণ করে বাস্তবে প্রকাশ করেছিল। যখন মানুষ তার নিজের যুক্তিশাস্ত্রসম্মত গঠনের সুষমা ও সূক্ষ্মতার দ্বারা আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, যেটা ছিল মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য—পরন্তু সে বাস্তব জগতের সুষমা এবং জীবন সম্পর্কে বলিষ্ঠ প্রত্যয় খুঁজে বেড়াতে ব্যস্ত,—তখন তাকে নতুন মানুষ বলা যায়। হ্যামলেটের উক্তি—ডেনমার্কের যুবরাজের পুরো ট্রাজিডিটাই (বা বিয়োগান্ত নাটকটাই), শেকস্‌পীয়ারের অন্যান্য লেখার মতোই, নব যুগের কর্মসূচি। স্বয়ংসম্পূর্ণ চক্রবৎ যুক্তির বলয় ছেড়ে সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ পুঁথিসর্বস্ব পাণ্ডিত্য বিসর্জন দিয়ে প্রকৃতির দিকে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে এবং প্রয়োগসঞ্জাত অভিজ্ঞতার দিকে ঝুঁকছে। বাস্তবতাকে মানসিক গঠন-কার্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সম্ভব—এর পরে ভিত্তি করে সে তার স্বাধীনতার দাবি তুলছে।

---

১ ইউরোপীয় রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ-এর যুগ শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে, যখন শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন ও পুঁথিগত বন্ধন থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে প্রথম ব্যক্তিমানুষের জয়গান ঘোষিত হয়েছে—অনুবাদক।

জনজীবনে যুক্তিসম্মত চিন্তার সরাসরি বৈপ্লবিকভাবে হস্তক্ষেপ করাটা হল অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ।

মহাবিশ্বের জটিলতা যে অপরিসীম, এ সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হওয়ার পরে অনেক বেশি মানবিক হয়ে উঠল। তাকে আর পুঁথিগত উদ্ধৃতির দ্বারা বাঁধা হল না এবং পণ্ডিতরা তার সীমানাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আরও তাকে যাচাই করে দেখতে লাগলেন।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান আরও জনগণের কাছাকাছি হল। যেসব চিরায়ত (ধ্রুপদী, ক্ল্যাসিক্যাল) নিয়মগুলিকে নড়ানো যায় না বলে আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া ধারণার বশবর্তী হওয়া যেত, সেগুলি দেখা গেল মিলছে না এবং নতুন ও আরও সঠিক নিয়মগুলি তার স্থান নিল। নতুন ধারণার জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও লোকেরা বুঝল যে, তারা পূর্বতন নজিরের মাধ্যমে জ্ঞানোপলব্ধির (১) উচ্চ শিখর থেকে বিজ্ঞানকে মাটিতে নামিয়ে আনছে; একদিক থেকে দেখতে গেলে যেন তারা প্রমিথিয়ুসের মহান কাজের পুনরাবৃত্তি করছে। পৃথিবীতে দারুণ সব ব্যাপার ঘটতে লাগল এবং সত্য ও সুষমার সন্ধানে যাকে কোনো কিছুই রোধ করতে পারবে না, সেইরকম বিজ্ঞান লোকের মনে সাড়া জাগাল। বিপ্লবের যুগের সন্তান বলে চিহ্নিত এই কালের মানুষরা নতুন বিপরীত সংঘাতমূলক দুনিয়ার চিত্রটা গ্রহণ করল।

বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ যেন আমাদের সামনে মেলে ধরছে আপাত একটা দ্বন্দ্বমূলক চেহারা: বিজ্ঞান যতই নরত্বারোপের (২) অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে, ততই সেটা মানবিক হয়ে উঠছে। এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই, কারণ নরত্বারোপ, যেটা কিনা যে-সকল বস্তু মানবিক নয় তাতে মানুষী চরিত্র আরোপ করা, সত্য জ্ঞানের উৎসরূপে দৈব-লব্ধ জ্ঞানের ধারণার দিকে নিয়ে যায়। নতুন বিজ্ঞান এই ধারণা থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে গেল। বিজ্ঞান যতই প্রত্যক্ষ বিষয়ীমুখী (subjective) অনুসন্ধানকে কম করতে লাগল ততই

১ অর্থাৎ 'বেদে আছে অতএব সত্য'—এই ধরনের নজির দিয়ে কাজ চলবে না। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একেবারে গোড়া থেকে কাজ করতে হবে—অনুবাদক।

২ anthropomorphic—অর্থাৎ ঈশ্বর বা দেবতাকে নরমূর্তিধারী ও নরসুলভ গুণসম্পন্ন ধরে নিয়ে কল্পনা করা—অনুবাদক।

প্রকৃতির বিষয়মুখী (objective) নিয়মগুলির মধ্যে সে গভীরতরভাবে অনুপ্রবেশ করতে লাগল, ততই সে মানুষের কাছে এসে পড়ল এবং ততই সে মানবিক হয়ে পড়ল। অদ্ভুত মনে হতে পারে কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে প্রত্যক্ষভাবে চোখে-দেখার ভিত্তিতে পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্ব-জগতের ধারণা—সূর্য পৃথিবীর চারধারে আবর্তন করছে—এতে সম্পূর্ণ চক্রের চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে, অথচ গ্যালিলিওর সূর্য-কেন্দ্রিক বিপরীত সংঘাতমূলক বিশ্ব-জগতের ধারণা, যেটা আপাতদৃষ্টিতে প্রতিভাত দৃশ্যের বিপরীত, সেটা ইতালীর শহরগুলির পথে পথে উত্তেজনা ও সহানুভূতির সঙ্গে বিতর্কিত হয়েছে।

বিংশশতাব্দীতে একজন বৈজ্ঞানিকের সর্বোচ্চ অর্জিত খ্যাতি হতে পারে ("যে ভাবেই তাকে দেখ না কেন সে ছিল একজন মানুষ") যদি তিনি গোঁড়ামী ও গোঁড়া "স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের" পথ থেকে নিজেকে একেবারে মূলগতভাবে আলাদা করে নিয়ে কোনো তত্ত্ব প্রচার করেন। পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি করে আজকের দিনে বিজ্ঞানের গোঁড়ামী-বিরোধী দ্বন্দ্বমূলক বিচারের আবেদন মানুষের কাছে বেশি। বিংশ শতাব্দীর মেজাজ এবং এই কালের জনগণ, উভয়ে মিলে বিজ্ঞানকে "স্বতঃসিদ্ধ" প্রস্তাবিত সত্য থেকে আজ সরিয়ে নিয়ে আসছে। এই যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণীকৃত ধারণাগুলিতে চলে যাওয়া। সেদিন চলে গেছে যখন ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্যে বিজ্ঞানের অবদান কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হত। বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলি, দেশ ও কাল, মহাবিশ্ব ও তার বিবর্তন, ক্ষুদ্রতম বস্তুর পরমাণু—এক কথায় বিশ্বজগতের পুরো চেহারাটা শিল্পগত ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের তথা মানুষের চিন্তার পদ্ধতি ও ধ্যানধারণা সম্পর্কে বুঝতে অন্যতম একটা প্রধান সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একজন বিজ্ঞানী বিশেষ প্রশ্নগুলি থেকে যতই মহাবিশ্বের সাধারণ ধারণার দিকে অগ্রসর হতে চান ততই তাঁর কাজ সমগ্র মানবসমাজের জরুরী সমস্যাগুলি নিয়ে বিচার করার দিকে পৌঁছয়। আরও দেখতে হলে পুরানো চিন্তাধারার পদ্ধতি থেকে যতই মৌলিকভাবে ভেঙ্গে বেরিয়ে দুনিয়া সম্পর্কে সাধারণ ধারণার জটিলতা বাড়তে থাকে, ততই এই সকল সমস্যাতে পৌঁছবার সোজা পথ পাওয়া যায়। মানবজীবন সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের তাত্ত্বিক ভিত্তি পাওয়া যেতে পারে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে, সেই সকল ধারণার মধ্যে যেখানে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতিবেগ,

লক্ষ-কোটি আলোকবর্ষ দূরের মহাকাশের দূরত্ব এবং এক সেন্‌টিমিটারের একশ' কোটি ভাগের এক ভাগ(১) নিয়ে কাজ করতে হয় এবং তাতে প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সম্পর্ক উদ্‌ঘাটিত হয়।

এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের থেকেও আজ আরও জোর করে "স্বতঃপ্রতিভাত" সত্যকে বরবাদ করতে হবে। হাইসেনবার্গের মৌলিক পদার্থ কণিকার ঐকিক ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্পর্কে নিয়েল বোর একবার টিপ্পনী কেটেছিলেন: "এটা নিশ্চয়ই একটা পাগলামির তত্ত্ব; তবে একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, এটা সত্য হবার মতো পাগলামি কি, না।" এই উক্তিতে বিজ্ঞানের আজকের অবস্থা সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা করা যায়।

শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যা নয়, আধুনিক বিজ্ঞানও পরম্পরাগত ধারণাগুলি থেকে পুরোপুরি ভেঙ্গে বেরিয়ে "পাগলামির" ধারণাগুলি হাজির করতে পারে, আর সেই কারণেই সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের চিরায়ত মূল ভিত্তিগুলি বরবাদ করে দেওয়াই আজকের দিনের প্রচলিত রীতি; দেশ, কাল (space, time) এবং বস্তুর গঠন ও গতি সম্পর্কে তখনকার দিনের মতামতগুলি, যেটা এই শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে দেখা গিয়েছিল, তার চেয়েও অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী করে আজকের দিনে মতামতকে ব্যক্ত করা হচ্ছে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক স্ববিরোধী "পাগলামি"-র মধ্যে মৌলিক পরিবর্তনের চেহারা পাওয়া যায়। সাধারণত তারা অল্পদিনের মধ্যেই ভাসা ভাসা সত্যের "পাগলামি"র পরিচয় হিসেবে আর থাকে না, তাদের মেনে নিতে হয় স্বাভাবিক "একমাত্র সম্ভাব্য" সত্য হিসেবে, যেভাবেই হোক "স্বতঃপ্রতিভাত" বা জ্ঞানের আপনাআপনি গুণাগুণ হিসেবে নয়। একবার যখন শীর্ষে পৌঁছবার পথটা খুঁজে বার করা যায়, তখন প্রাথমিকভাবে যাকে সত্য বলে মনে করা

---

১ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি দৌড়তে পারলে সময় সংকোচন হয়, যেখানে আলোর গতিবেগ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩,০০,০০০ কিলোমিটার।

তেমনি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বা কেন্দ্রীনে প্রোটনের চারধারে ঘূর্ণমান ইলেকট্রনগুলির দূরত্ব এক সেন্‌টিমিটারের একশ' কোটি ভাগের থেকেও কম।

এই অবস্থায় পুরানো (ক্ল্যাসিক্যাল) পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলি খাটে না অনুবাদক।

হয়েছিল, সেটা যে কত "আপাতভাবে স্ববিরোধী" ছিল এবং চিরাচরিত পথ যেটা একমাত্র সম্ভাব্য ছিল, তাকে ছেড়ে দিতে যে কী 'উন্মত্ত' সাহসের প্রয়োজন হয়েছিল, তা যথার্থ স্বাভাবিক এবং আপাতদৃষ্টিতে একমাত্র সম্ভাব্য বলে মনে হয়েছিল।

একবার একটা তত্ত্ব যখন তাঁর "আপাত স্ববিরোধী" দিকটা ছেড়ে দিয়ে "স্বতঃপ্রতিভাত" বলে মনে হয় তখন "পাগলামি"-র বিশেষণটা বর্তায় সেই মানুষের পরে যিনি সেটা প্রথম রূপায়িত করেছিলেন। একজন পণ্ডিতের জীবনীতে তাঁর বৈজ্ঞানিক সাফল্যের দিকটা রেকর্ড করা হয় না, পরন্তু করা হয় সেই সাফল্যের পথে পৌঁছবার জন্যে তাঁকে কত খাড়া পথ বেয়ে সাফল্যের শিখরে উঠতে হয়েছে, মানুষের জ্ঞানের বৃদ্ধির হার কিভাবে বেড়েছে, কালের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান কিভাবে পাওয়া গেছে, এবং জ্ঞানের বাঁকা পথের চেহারা কী রকমের। বিজ্ঞান ও তার ইতিহাসের মধ্যে প্রভেদ এইখানে যে ইতিহাস জ্ঞান কতখানি হল বা কোন্ স্তরে উঠল তা নিয়ে আলোচনা করে না, যতটা করে কালের পটভূমিতে কী নতুন বস্তু পাওয়া যাচ্ছে, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের দিকে, মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে কতটা রূপান্তর ঘটছে। যে কালপর্বে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য জমা হয় অতি দ্রুত হারে, সেটা বিজ্ঞানের ইতিহাসে পথের বাঁক হিসেবে সূচিত হয়। ইতিহাসের পরি-প্রেক্ষিতে আগের কালপর্বের স্তরের সঙ্গে মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলাফলকে দেখতে হবে; নতুন ধারণা পরে সাধারণ জ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে. এটা দিয়ে কতখানি উত্তরণ হল [তার বিচার হয় না। পরে আলোচিত হবে এইরকম ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে কোনোরকম তুলনা হাজির করে আমরা বলতে পারি যে, বিজ্ঞানে কোনো অবদানের কী মূল্যায়ন হবে, পরপর দু'টি স্তরের মধ্যে কী প্রভেদ রয়েছে, সেটাকে কোন্ পরিপ্রেক্ষিত যা থেকে নেওয়া হয়েছে, তা' থেকে স্বতন্ত্র, ঠিক যেমন যে কো-অর্ডিনেটের উৎপত্তির পয়েন্ট কোথায় যাতে অনুসন্ধান করা হচ্ছে, সেটা ঠিক করার জন্যে কারটিজিয়ান(১) কো-অর্ডিনেটকে ঠিক করার দরকার হয় না।

জ্ঞান যখন লাভ হয় তখন তাতে আরও যা যোগ করা হয় তার তাৎপর্য কখনই চলে যায় না, যত দূরই আমরা সেই জ্ঞান থেকে এগোই না কেন।

১ ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্তে, যিনি জ্যামিতিতে তিন মাত্রার কো-অর্ডিনেটকে প্রথম ঢুকিয়েছিলেন—অনুবাদক।

যেমন, গোল থালার মতো পৃথিবীর ধারণা থেকে গোলাকার বলের মতো পৃথিবীর চেহারা যে আমরা বুঝতে পারলাম, তার তাৎপর্য প্রাচীন গ্রীসে প্রথম যখন আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখনও যা ছিল আজও তাই আছে। দুনিয়ার বিজ্ঞানসম্মত ছবির কোনো পরিবর্তনে, বিজ্ঞানের ইতিহাসের কোনো সন্ধিক্ষণের সংকটে বিজ্ঞানের সম্ভাবনা নষ্ট হয় না এবং বিজ্ঞানের দুটি পরপর স্তরের মধ্যে প্রভেদও সংকীর্ণ হয়ে যায় না; তেমনি হঠাৎ উচ্চতর স্তরে উল্লম্ফনের "পাগলামি" বা "আপাত" স্ববিরোধিতা বরাবরের মতোই আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

একজন বিজ্ঞানীর জীবনে এই ধরনের সন্ধিক্ষণ জীবনের নানা রঙা কাঁচের মাধ্যমে এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও তাঁর অন্তর্জগতের সঙ্গে তাঁর বহির্জগতের সম্পর্কের মধ্যে দেখা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের প্রগতির পথ কতখানি বাঁকা এবং কালের পটভূমিতে তা থেকে কী পাওয়া যায়, এবং বৈজ্ঞানিক প্রগতির হার কত বেশি তা দিয়ে প্রতিভাকে মেপে দেখা যায়।

মগজভরা তথ্য ও সংখ্যা থাকলেই প্রতিভার সৃষ্টি হয় না। একজন প্রতিভাবান আগেকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান রাখেন এবং এই অবদানের মধ্যেই তাঁর মানসিক ও ভাবাবেগের জগৎ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

কবি হাইনে যেমন বলেছেন, একজন অতিকায় মানুষের কাঁধে চড়ে একজন বামন অনেক দূর অবধি দেখতে পাবে, কিন্তু "তার বুকের মধ্যে কোনো বড় অতিকায় হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে না।"

একজন প্রতিভার পেছনে পেছনে যে অনুগামীরা চলে তাদের কাছে অনেক বেশি তথ্যমূলক জ্ঞান তাদের ঐ প্রতিভার চেয়ে বেশি জমা থাকে: কিন্তু মানুষের পূর্বতন জ্ঞান সম্পর্কে তাদের অবদান নেই বা প্রায় কিছুই নেই বলা যেতে পারে, কারণ তাদের চিন্তা, ভাবাবেগ ও মেজাজে "ডাঃ ফাউস্টাস-এর মনের" তাড়না নেই।

আইনস্টাইনের জীবন-কাহিনীতে স্পষ্টই বিরাট হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর বৈজ্ঞানিক সাফল্য তখনই ধরতে পারা যাবে যখন বোঝা যাবে যে, এর পূর্বে নিউটনীয় ধারণা থেকে আইনস্টাইনীয় ধারণাতে উত্তরণের ফলে দুনিয়ার চেহারা সম্পর্কে যে আপাত স্ববিরোধী ও মৌলিক রূপান্তরণের চেহারা দেখা গেল, সেটা এর আগে আর হয় নি। নিউটন যে-কাজ শুরু করেছিলেন, তাকে সাধারণীকরণ ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে কিন্তু তার ফলে বিজ্ঞানে ঘটে

গিয়েছে এক বিপ্লব। দুই শতাব্দী ধরে নিউটনের পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের মৌল সমস্যাগুলির চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে, বিশ্বের চরম ও পূর্ব-নির্ধারিত চিত্র হিসেবে গণ্য করা হত। আলেকজাণ্ডার পোপের কবিতাতে এই রকম বিচারের প্রতিফলন পাওয়া যায়:

প্রকৃতি ও প্রকৃতির নিয়ম
ছিল রাতের আঁধারে
ভগবান এলেন, বললেন
আসুক নিউটন,
আর সব কিছু হল
আলোকিত।

এর পরে যখন আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে এলেন, তখন জনৈক রসিক ব্যক্তি তাতে যোগ করলেন:

কিন্তু বেশি দিন নয়।
আসুক আইনস্টাইন!
বলল শয়তান,
আর চেয়ে দেখ,
হয়ে গেল আঁধার;
আলো তখন পালিয়েছে।

শেষের এই দুই লাইনের তাৎপর্য হচ্ছে, ব্যাপক আকারে এই ধারণা যে, নিউটনীয় বলবিদ্যার মৌলিক নীতিগুলিকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ বাহ্য জগতের (objective world) ধারণাকে ত্যাগ করা। বিজ্ঞানের অগ্রগতির কোনো একটা স্তরকে গোঁড়া চিন্তাধারা সমগ্র বিজ্ঞানের সঙ্গে এক করে দেখে; নতুন স্তরে উত্তরণকে গোঁড়া চিন্তাধারা সারা বিজ্ঞানের অধঃপতন ছাড়া আর কিছুই মনে করে না, বিজ্ঞানকে পুরানো অবস্থানে টেনে নামিয়ে আনতে চায় অথবা বিজ্ঞানে নতুন যা পাওয়া যাচ্ছে সেটা যে বিষয়মুখী দিক থেকেই বিশ্বাসযোগ্য(১) সেটাই অস্বীকার করে; কিন্তু এই চিন্তাধারা কখনোই বুঝে উঠতে পারে না যে, বাস্তব জগতের ক্রমশই অধিকতর বিশ্বস্ত বর্ণনার মধ্যেই বিজ্ঞানের সারসত্তার ক্রমাগত বিবর্তন হতে পারে।

১ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি-মানুষের ইচ্ছা ব্যতিরেকেই তার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে—অনুবাদক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বিজ্ঞানে প্রতিটি বিপ্লবই প্রগতির মহিমান্বিত রূপ।

নিউটনীয় বলবিদ্যার মতো, আপেক্ষিক তত্ত্ব শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে পথের অগ্রগমনের আর একটি নিশানা মাত্র নয়। আপেক্ষিক তত্ত্ব মানুষের চিন্তা করার পদ্ধতিকে বদলে দিয়েছে, মানুষের আত্মিক বিকাশের পথে এ আর একটি পথের অগ্রগমনের নিশানা (মাইলস্টোন বা প্রস্তরফলক)। আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রয়োগ মানুষের সমাজের বাস্তব অবস্থাগুলিকে বদলে দিতে কাজ করেছে।

আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বকে এমন একটা যুগে রূপায়ণ করেছেন, যাকে চিরকালের মতো সেই যুগ বলে গণ্য করা হবে যখন মানুষ নিয়মশৃঙ্খলার জগৎ (necessity) থেকে মুক্তির জগতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে যাত্রা শুরু করেছে, যখন সে তার ইতিহাসে উদ্বোধন করেছে নতুন একটি অধ্যায়ের। আপেক্ষিকতার তত্ত্বের উদ্ভব হওয়ার অর্থ বিজ্ঞান পরিণত যৌবনে পা দিয়েছে। অবশেষে সে তার অসার মনুষ্যকেন্দ্রিকতা (anthropocentrism), মানুষই যে মহাবিশ্বের কেন্দ্র এই ধারণা, পৃথিবীবাসীর চোখে মহাবিশ্বের যা চূড়ান্ত রূপ—এই সব পরিত্যাগ করেছে।

প্রাচীন কালে মনুষ্যকেন্দ্রিকতার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, উঁচু ও নিচুর চরম ধারণার মধ্যে, যার সঙ্গে গোলবলের(১) মতো পৃথিবীর ধারণাকে মেলানো মুস্কিল ছিল। এই ধরনের বিশ্বের ধারণা অনুসারে (অর্থাৎ উঁচু-নিচু, পৃথিবীর গায়ে নয়—অনুবাদক) "পায়ের নিচে' বললে "পৃথিবী থেকে পড়ে যাবার কথা বলতে হয়।"

প্রাচীন গ্রীসে যখন গোলাকার পৃথিবীর মূর্তি আমাদের সামনে খুলে গেল তখন "উঁচু" ও "নিচু"-র ব্যাপারটা যে আসলে আপেক্ষিক মাত্র, এই ধারণা যে মহাকাশে যেকোন দিকই অন্য যে-কোনো দিকেরই মতো স্বীকৃতি পায় (অর্থাৎ, ত্রিমাত্রিক—অনুবাদক); তাহলে মহাকাশ হল এক কথায় সব দিকেই সমমাত্রিক (Isotropic)। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভূগোলকটাই রয়ে গেল মহাবিশ্বের

১ উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন বলি, আমাদের মাথার উপরে রয়েছে, নিচে পায়ের তলায় জমি তখন কিন্তু গোলাকার বলের মতো, পৃথিবীর গায়ের উল্টো দিকের মানুষও ঠিক ঐ একই ভাবে ভাবছে। আসলে কিন্তু পৃথিবীর গায়ে আমরা বাস করি। অনুবাদক

কেন্দ্র এবং সেই দিক থেকে পৃথিবীর তুলনায় যে-কোনো গতি দাঁড়াল পরম গতি (absolute motion)। অতএব এই ধরনের উক্তি যে, "পৃথিবীর পটভূমিতে (বা তুলনায়) এই বস্তু-দেহের (body) গতি রয়েছে" এবং "এই বস্তু-দেহের তুলনায় পৃথিবীর গতি রয়েছে" এই দুটো বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যাতে পূর্বেরটা হল চরমভাবে সত্য এবং শেষোক্তটা হল চরমভাবে ভুল।

কোপারনিকাস ভূ-কেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেন। কিন্তু মহাবিশ্বের কেন্দ্র যে সূর্য তাকেও এই উচ্চাসনে বেশি দিন রাখা সম্ভব হল না: জিওরদানো ব্রুনো এবং গ্যালিলিও-এর মহাবিশ্বের কোনো কেন্দ্র ছিল না, এমন কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছিল না যার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যকে দেখা সম্ভব হয়।

অন্য বস্তুদেহের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন পরম গতির ধারণা কিন্তু রয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি ধরে নেওয়া হল যে, গতিশীল বস্তুদেহগুলিকে চোখে দেখবার প্রক্রিয়া যে-বস্তুদেহগুলি স্থাণু রয়েছে তা থেকে ভিন্নতর হবে; এই প্রভেদ থেকে 'গতি'-র অর্থ করা হল অন্য বস্তুদেহের সঙ্গে আপেক্ষিক সম্পর্ক না দেখে, যার তুলনায় ঐ বস্তুদেহটিকে বলা যেতে পারে গতিশীল। মনে করা হল সমস্ত মহাকাশকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে চরমভাবে আবদ্ধ স্থাণু ইথার; একটা গতিশীল বস্তুদেহকে মনে করা হল যেন সে ইথার-তরঙ্গ সৃষ্টি করে, ঠিক যেমন একজন দৌড়ে যাওয়া মানুষের চারপাশে বায়ুর তরঙ্গ বয়ে যায়।

১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, জার্মানির বৈজ্ঞানিক পত্রিকা Annalen der Physik-এ "গতিশীল বস্তুদেহের ইলেক্ট্রোডাইনামিকস্" নামে একটি প্রবন্ধে এই ধারণাকে (স্থিতিশীল পরিব্যাপ্ত ইথারের ধারণাকে—অনুবাদক) আইনস্টাইন বরবাদ করে দিলেন। তাঁর প্রবন্ধে আইনস্টাইন দেখালেন যে, সকল বস্তুদেহেরই একের তুলনায় অন্যের ত্বরণবেগ না থাকলেও আলোর গতিবেগ একই থাকে।(১)

মাইকেলসন্-মরলির পরীক্ষার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আইনস্টাইন দেখালেন যে, একটা বস্তুদেহ যেদিকেই ছুটে যাক তা থেকে বিচ্ছুরিত আলোর গতিবেগের তারতম্য হয় না। স্থাণু পরিব্যাপ্ত ইথার থাকলে যেমন নদীর স্রোতের অনুকূলে বা বিপরীতে গেলে নৌকার গতির তারতম্য হওয়া উচিত, সে রকমের নয়—অনুবাদক।

এর ঠিক কিছু পরেই আপেক্ষিক তত্ত্বকে চতুর্মাত্রিক জ্যামিতির গাণিতিক নিয়মের সাজ পরানো হল। চালু ত্রিমাত্রিক আয়তনে কোনো বিন্দুর (point) অবস্থান নির্ধারণ করতে হলে তিনটি সংখ্যার প্রয়োজন হয়। একটি চতুর্থ সংখ্যার সংযোজন, কাল, একটি **ঘটনাকে** একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি বস্তু-কণিকার স্থান নির্ধারণ করে দেয়। চতুর্মাত্রিক জ্যামিতি এবং দেশ ও কাল সম্পর্কে চতুর্মাত্রিক ধারণা ঐ ধরনের **ঘটনাবলীর** বিকাশের যে নিয়মগুলি নিয়ন্ত্রণ করে তাতে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ, বস্তু-কণিকাদের বিভিন্ন বিন্দুতে এবং কালে অবস্থান নির্ধারণ করতে (অন্যভাবে বলতে হলে. কণিকাদের এবং যে বস্তুদেহ দিয়ে তারা গঠিত হয়েছে তাদের গতির নিয়ম ঠিক করতে)।

আইনস্টাইন যে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের রূপরেখা দিয়েছিলেন, তাতে বস্তুদেহগুলির অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াতে যা ঘটছে সেটা তাদের সরলরেখাতে সমমাত্রা-নির্ভর গতি-নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। গতির অভ্যন্তরীণ প্রভাব **জাড্যের** অথবা **গড়িয়ে যাচ্ছে যে গতি,** তাতে নেই। পরে, ১৯১৬ সালে আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্রকে ত্বরণবেগ-সঞ্চালিত গতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাঁর বাকি জীবনটা তিনি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের তত্ত্বকে বিস্তারিত করার কাজে নিয়োগ করেন, যার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী ও তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রকে বিশেষ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

একটা ব্যাপক মহলে এই রকমের অত্যন্ত বিমূর্ত সমস্যাগুলির সম্পর্কে এত ঔৎসুক্য জাগল কী করে? আর এই ঔৎসুক্যটা এমনকি সেই মানুষটির সম্পর্কেও দেখা গেল যিনি আর যে-কোনো লোকের চাইতে সর্বাপেক্ষা বেশি এই তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, যেটা অন্য তত্ত্ব সম্পর্কে অন্য লোকেরা যা করেছেন সে রকমের নয়। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যত কিছু অভূতপূর্ব সুযোগ ও বিপদ আছে, আইনস্টাইনকে কেন তার প্রতিভূ বলে মনে করা হয়?

এই প্রশ্নের জবাব পেলে আমাদের শতাব্দীর মৌল বৈশিষ্ট্যগুলির সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞানকে প্রকৃতিস্থভাবে প্রয়োগ করতে এবং তা থেকে যে-ধ্বংসের বিপদ আসতে পারে তাকে দূর করতে মানুষ আজ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। তার এই অনুসন্ধানে শুধু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির মর্মবস্তু নিয়ে তাকে বিচার করলেই চলবে না, বিজ্ঞানের প্রকৃতিস্থতা ও নৈতিকতা সম্পর্কেও তাকে বিচার করে দেখতে হবে। আইনস্টাইনের মধ্যে শেষোক্ত দুটি গুণ ছিল। বিজ্ঞান-জগতের বাইরের মানুষদের কাছে এই

মানুষটির এই দিকটার আবেদন ছিল সবচেয়ে বেশি। বিষয়মুখী 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' জগৎ সম্পর্কে ধারণা, তাকে জানা সম্ভব এবং তার আপাত স্ববিরোধী চেহারা, তার চেহারা সম্পর্কে আরও সঠিক ও আরও সাধারণ ধারণা অর্জনের জন্যে অন্তহীন অনুসন্ধিৎসা আইনস্টাইনের জীবনে ক্রমশ রূপ পরিগ্রহ করেছে। রহস্যময়, মননশীলতা-বিরোধী সবরকম চেহারার বিরুদ্ধে যুক্তির চিরন্তন সংগ্রামের এটা একটা রেকর্ড। ঐ থেকে বিজ্ঞানের লোকহিতকর (জনগণের) দায়িত্ব সম্পর্কে একটা ক্রমবর্ধমান উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

আইনস্টাইনের জীবনের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য তাঁর বৈজ্ঞানিক লেখাপত্রে, তাঁর জনসমক্ষে বিবৃতির এবং তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর দুটো আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ, একটা ১৯৫৫তে তাঁর মৃত্যুর এক মাস পূর্বে লেখা(১) এবং দ্বিতীয়টি আত্মজীবনীমূলক নোটস্-এর(২) মধ্যে পাওয়া যায়। মামুলি অর্থে শেষোক্তকে আত্মজীবনী বলা প্রায় চলেই না, যদিও তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

"এখানে আমি বসে আছি," আইনস্টাইন শুরু করছেন, "৬৮ বছর বয়সে যেন আমার মৃত্যুর পরে নিজের শোকবার্তা লেখার জন্যে।" তিনি বর্ণনা করে চলেছেন কিভাবে মহাবিশ্বের যুক্তিসম্মত নিয়মগুলি আবিষ্কার করার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে জেগে উঠল। তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্বগত আত্মবিশ্বাস লিখে ফেললেন এবং তারপরে ফিরে চলে গেলেন তাঁর মৃত্যুর পরে শোকবার্তা এবং গাণিতিক ঔৎসুক্যের উৎপত্তি রচনায়। প্রবন্ধের বেশিরভাগ অংশটা সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান পদার্থবিদ্যাগত ধারণা—নিউটনীয় গতিবিজ্ঞান, তাপগতিবিজ্ঞান (থার্মোডাইনামিকস্), বিদ্যুৎগতিবিজ্ঞান (ইলেকট্রো-ডাইনামিকস্) এবং শেষ অবধি আমাদের শতাব্দীতে যে-পদার্থ-সংক্রান্ত

১ Helle Zeit—Dunkle Zeit. In Memoriam Albert Einstein, edited by Carl Seelig, Europa Verlag, Zurich, 1956, S. 9-17. (পরে Helle Zeit বলে উল্লিখিত)।

২ Albert Einstein: Philosopher-Scientist, edited by Paul A. Schilpp, Tudor, New York, 1951, pp. 3-95 (পরে Philosopher-Scientist বলে উল্লিখিত)।

ধারণাগুলি উদয় হয়েছে—সেগুলির ব্যাখ্যা করতে লেগে গেলেন। নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের পর্যালোচনা করে আইনস্টাইন লিখেছেন :

"একে কি শোকবার্তা বলে ধরা যায়?—বিস্মিত পাঠক একথা জিগ্যেস করতে পারেন। উত্তরে আমি বলতে চাই : প্রধানত, হ্যাঁ, তাই-ই। কারণ আমার মতো ছাঁচের মানুষের কাছে তার সত্তার মূল যেটা সেটা হল সে ঠিক কী চিন্তা করছে এবং কিভাবে করছে, সে কী করে বা কী নিয়ে তার যন্ত্রণা, তা নয়। অতএব, বিভিন্ন চিন্তাধারাকে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সেটার কথা আমার প্রচেষ্টার কাহিনীর মধ্যে বড় ভূমিকা পালন করবে এবং মৃত্যুর পরে শোকবার্তাকে তার মধ্যেই সীমিত করতে হবে।"

তাঁর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর বড় বড় আবিষ্কারের সূত্রগুলি আলোচনা করতে হলে আমাদের আইনস্টাইনের আত্মজীবনীকে অনেকবার উল্লেখ করতে হবে।

তাঁর আত্মজীবনীকে আইনস্টাইন 'শোকবার্তা' বলে অভিহিত করেছেন কারণ তাতে তাঁর কাজের ও মতামতের সাধারণীকরণ রয়েছে। এটাকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করা হয়েছে। জীবনের নানারঙা ছবি-গুলির মধ্যে তিনি যেগুলিকে বেছে নিয়েছেন, সেগুলি মানুষের বৌদ্ধিক ইতিহাসের অংশবিশেষ। এর পূর্বে আর কখনও বিজ্ঞানের ইতিহাস এত পুরোপুরি বিজ্ঞানীর জীবনের সঙ্গে মিলে যায় নি। এতে প্রতিভার নিশ্চিত স্বাক্ষর রয়েছে। কারণ একমাত্র প্রতিভাধরের জীবনই এত সম্পূর্ণভাবে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের সঙ্গে মিলে যায়। ক্রমবিকাশমান বিজ্ঞানের সঙ্গে এই রকমের মানুষটির স্বার্থ সম্পূর্ণ একাকার হয়ে যায় ; বিজ্ঞানের পথেই তাঁর অনুসন্ধিৎসার যাত্রা শুরু, নতুন ও উচ্চতর স্তরে বিজ্ঞানকে উন্নীত করে তাঁর সাফল্য। তাঁর পূর্বের যে-কোনো পদার্থবিদের অপেক্ষা বিজ্ঞানের সঙ্গে আইনস্টাইনের জীবন অনেক বেশি জড়িত।

আইনস্টাইনের কাছে যে ব্যক্তিগত মহত্ত্বের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাঁর স্বভাব-বিরোধী ছিল এটা কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। তিনি সব সময়েই স্পষ্টাস্পষ্টি দিলখোলা হাস্যকৌতুকের সাহায্যে তাঁর নামের সঙ্গে কোনো প্রতিভাধরের বিশেষণ প্রয়োগ করা হলে তাকে ঝেড়ে ফেলতেন। নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা আসলে "কেবলমাত্র ব্যক্তিগত"ভাবে কোনো কিছুকে দেখারই একটা অংশ, যা থেকে একজন প্রতিভাবান পুরুষ যখন "ব্যক্তিক সীমা-

বহির্ভূত জগতের সম্পর্কে মনের দিক থেকে ধারণা করতে পারে" তখন নিজেকে আলাদা করে নেয়।

"কেবলমাত্র ব্যক্তিগত" এবং "ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত" যেটা, তাদের মধ্যে প্রভেদ করে আইনস্টাইন তাঁর "আত্মজীবনীমূলক নোটস্" যেভাবে শুরু করেছেন, তাতে "মৃত্যুর পরে শোকবার্তা" লেখার রচনার চেহারাটা নির্ধারিত হয়ে গেছে। আইনস্টাইনের জীবনের পর্যালোচনা করার উপরে ঝোঁক পড়েছে, যাতে প্রধান প্রধান যথার্থ ঐতিহাসিক দিকচিহ্নস্বরূপ ঘটনাবলীর দিকে নজর টানা হয়েছে। পরে আমরা এই আত্মজীবনীর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি আরও ভালো করে আলোচনা করব। এখানে উপস্থিত শুধু আমরা এইটুকু লক্ষ্য করব যে, আইনস্টাইনের জীবনবৃত্তান্ত অন্তত কিছু পরিমাণে তাঁর আত্মজীবনীর মূল কাঠামোকে অনুসরণ করেই চলবে। অতএব আমাদের আইনস্টাইনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তনের নকসা ধরে চলতে চলতে প্রায়শই ঘটনাপঞ্জীর পরম্পরা থেকে সরে গিয়ে এমনভাবে সাধারণীকরণ করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে এটা দেখানো যে, কী করে তাঁর জীবন বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে মিলে গেছে। এটা ঠিকমতো করতে পারলে আমরা একজন প্রতিভার জীবনী পাব। কারণ আইনস্টাইনের জীবনী নিশ্চয়ই আপেক্ষিক তত্ত্বের সৃষ্টিকর্তার সারা জীবনের কাজের মধ্যে যেভাবে মূর্ত হয়ে রয়েছে, সেইভাবেই ইতিহাসের অগ্রগতির ধাপে ধাপে সাধারণীকরণ করে দেখতে হবে। অথচ এই সাধারণীকরণ কেবলমাত্র ইতিহাসের দিক থেকে করলেই আইনস্টাইনের জীবনী দাঁড়াবে না। আইনস্টাইনের কালের তিন পুরুষ তাঁর জীবনের ছোটখাটো খুঁটিনাটি বিষয়-গুলি অবধি বিচার করে দেখতে চান, দেখতে চান তাঁর চাহনী ও চেহারা, তাঁর অভ্যাস, তাঁর বলবার ধরন। লোকেরা কেবলমাত্র তাঁর বিরাট চিন্তাশক্তির জন্যেই শুধু নয়, পরন্তু তাঁর মানবতা, দয়ালু মনোভাব ও চারিত্রিক মাধুর্যের জন্যেও তাঁকে মনে রাখে।

তাঁর ধারণাগুলির চরিত্র বিমূর্ত থাকা সত্ত্বেও, "নিতান্ত ব্যক্তিগত" থেকে ক্রমাগত উর্ধ্বলোকে বিচরণ সত্ত্বেও, যেটা তাঁর জীবনের অর্থকে বহন করত, আইনস্টাইনকে সাধারণ লোক কখনও বৈশিষ্ট্যহীন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বলে দেখে নি, তিনি যেন চিন্তার শীর্ষদেশ থেকে "নিয়মকানুনের বিধিলিপিগুলি"(১)

---

১ bearer of the "tablets of law"—এখানে বাইবেলে বর্ণিত মোজেজের উপমা দেওয়া হচ্ছে। মোজেজ সিনাই পর্বতের শীর্ষদেশে পৌঁছে ঈশ্বরের

বহন করে এনেছেন। এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণে এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের তাৎপর্যের মধ্যে। আইনস্টাইন জানতেন যে—বস্তুত তিনি সেই বিচার থেকেই শুরু করেছিলেন—অনুমানমূলক যুক্তি যদি তর্কাতীতও হয়, তাহলেও সেটা নিজে নিজে প্রকৃতির নিয়মকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে না। আমরা বলতে পারি যে, আইনস্টাইন নতুন "নিয়মকানুনের বিধিলিপিগুলি", বিশ্বব্যবস্থার নতুন সমীকরণগুলি, যেগুলি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে, আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেগুলি পুরোনো বিধিলিপিকে অকেজো করে দিয়েছে কিন্তু সেগুলি সিনাই পর্বতশিখর থেকে নিয়ে আসার(১) কোনো ব্যাপার ছিল না। উল্টে, তিনি এখানে পৃথিবীতে আবিষ্কৃত নীতিগুলিকে বিশ্ব-সমীকরণের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন।

গোঁড়া মতবাদগুলির প্রবক্তাদের শিষ্যদের মধ্যে তাদের গুরুদের প্রায় ঐশ্বরিক পর্যায়ে নিয়ে যাবার ঝোঁক থাকে। আইনস্টাইনের কপালে এরকম কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটবার ভয় নেই। আপেক্ষিক মতবাদের অ-গোঁড়ামীসুলভ চরিত্রের, যাতে **পূর্ব-নির্ধারিত** সিদ্ধান্ত কিছু ধরে নিয়ে কাজ করা হয় না, তার প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ মিল রয়েছে। বালক বয়েস থেকেই আইনস্টাইন যুক্তিসম্মত বিশ্ব-ব্যবস্থার অনুসন্ধান শুরু করেছেন। তা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বাস্তবতার নিরবচ্ছিন্ন স্রোতকে কোনো সাধারণ আনুপাতিক ব্যবস্থাগত কাঠামো তৈরি করে তা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা তিনি পরিহার করে চলতেন। তিনি যেভাবে দেখতেন, তাতে অনুপাত, শৃঙ্খলা, সুষমা হল "ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত" জগতের বৈশিষ্ট্য, যেটা বিবেকবুদ্ধি নিরপেক্ষ।

সারা মহাবিশ্বকে জড়িয়ে নিয়ে বড় বড় ধারণাগুলি উদ্ভূত হয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বাহ্যিক উৎস থেকে। তাতেই তাদের স্বীকৃতি আছে, তারা বদলায়, তারা আরও বড় সাধারণীকরণের এবং তাকে বাস্তব, যেন রক্তমাংসসম্পন্ন দেহের রূপ দেবার চেষ্টা করে। এই দিক থেকে দেখলে

আদেশস্বরূপ দশটি "বাধ্যতামূলক পালনীয় নির্দেশ" (**ten commandments**) পান—অনুবাদক।

১ অর্থাৎ, ঐশ্বরিক কোনো নির্দেশ যা প্রেরণার মতো আসে তা ছিল না, ছিল কঠোর যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নতুন সত্যে উপনীত হবার চেষ্টা।

অনুবাদক।

বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানের মতো দেখাবে না, এবং তাদের প্রবক্তাদের তাদের নিজেদের চোখে অথবা মানুষের কাছে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো মনে হবে না।

তাঁর আত্মজীবনীমূলক নোটস-এ আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করছেন এই বলে: "এই ব্যাখ্যাটার উদ্দেশ্য সফল হবে যদি এর পাঠকদের দেখানো যায় কী করে একটা জীবনের সারা প্রচেষ্টাতে সঙ্গতি আছে এবং কিভাবে তারা একটা বিশিষ্ট রূপের আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে।"(১)

তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজে তিনি প্রধান প্রধান ঝোঁককে দেখিয়েছেন এবং এ থেকে যে সিদ্ধান্তগুলি উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি থেকে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার একটা চেহারা যেন দেখতে পাওয়া যায়। আইনস্টাইনের সারা জীবনের কাজে শৃঙ্খলাবদ্ধ, যৌক্তিক ও একীভূত বিশ্বজগতের মতো আশ্চর্য যুক্তিসম্মত সুষমার সাক্ষাৎ মেলে—যেটা তিনি ইচ্ছামতো এটা-ওটা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার গোলক-ধাঁধার মধ্যে খুঁজেছেন। এটা কেবলমাত্র একটা উপমা নয়। প্রতিটি বড় পণ্ডিত ব্যক্তির জীবনই শেষ বিচারে দেখা যাবে একটি কোনো চিন্তার পেছনে ধাবিত। কিন্তু প্রকৃতিকে যাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করেছেন, তাঁদের বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য ও চিন্তার পদ্ধতির মধ্যে সুষমা খুঁজে বার করার ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের বিশেষ স্থান রয়েছে। তাঁর কাজকে বলা যায় সঙ্গীতের মতন, কারণ কালপ্রবাহে আইনস্টাইনের মতামত বা ধারণাগুলি এমন একটা স্বাভাবিক পর্যায়ক্রমিক সারণীর সৃষ্টি করে যাতে তাঁর জীবনীকারকে তাঁর কাজের ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত যুক্তিপরম্পরা খুঁজে বার করার জন্যে কোনো সময় নষ্ট করতে হয় না। কারণ সেটা অত্যন্ত সহজে চোখে পড়ে। তাছাড়া তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব জড়িয়ে রয়েছে। আত্মজীবনীতে 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত (extra-personal) চিন্তাধারার বিবর্তন দেখিয়েছেন এমনভাবে, যাতে যেটা আকস্মিক ও ব্যক্তিগত সেটা যেন দৃষ্টিকে আড়াল না করে। আর সেটা তাঁর নিজের সত্তা সম্পর্কেও সত্য। আইনস্টাইনের জীবনী পড়া যেন একটা রাগসঙ্গীত শোনা যাতে প্রতিটি পর্দা অনুপমভাবে মূল সাঙ্গীতিক বিষয়বস্তুকে ঠিক করে দিচ্ছে।

১ Philosopher-Scientist, ৯৫ পৃঃ।

তাঁর আত্মজীবনীতে এমন সব সূত্র আছে যেগুলি আইনস্টাইনের নিজের বৈজ্ঞানিক জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সামগ্রিক উন্নতির যোগসূত্র। আমি ভেবেছিলাম, এই সকল সূত্র বা ফরমুলাগুলিকে প্রয়োগ করে এই বইয়ের নাম দেব 'বিস্ময় থেকে উড্ডয়ন' ঠিক যেভাবে আইনস্টাইন 'বিস্ময়'কে কী করে অতিক্রম করেছেন, একটা আপাতবিরোধী তথ্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে যেটা ঘটে এবং যাকে বিশ্বজগতের যুক্তিসম্মত ব্যবস্থাপনার মধ্যে তথ্য হিসেবে ঢোকাতে হয়, সেগুলি ব্যাখ্যা করেছেন।

আমি এটাও ভেবেছিলাম যে, 'স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ থেকে উড্ডয়ন' বলে এ বইয়ের নাম দেব। যেটা প্রথাগত এবং প্রায়শই ঘটে থাকে, সেটাই 'স্বতঃসিদ্ধ' বলে মনে হয় এবং আইনস্টাইন যেভাবে দেখেছিলেন, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে নতুন ধারণাগুলিকে বিকশিত করা যা 'আপাত' যুক্তিনিষ্ঠ ছক ও পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলে গেলেও, আরও ঠিক ঠিক পরীক্ষার এবং আরও সঠিক, নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ নকসার সঙ্গে মিলে যায়।

শেষ অবধি আমি ভেবেছিলাম যে, আইনস্টাইন সম্পর্কে আমার বইয়ের নাম দেব "একান্ত ব্যক্তিগত থেকে উড্ডয়ন"। আইনস্টাইন তাঁর 'আত্মজীবনী'তে লিখছেন: "আমার মতো ছাঁচের মানুষের পক্ষে বিকাশের সন্ধিক্ষণ হচ্ছে, ক্রমশ প্রধান ঔৎসুক্য (বা জানবার ইচ্ছা) অধিকতর মাত্রায় ক্ষণস্থায়ী ও একান্ত ব্যক্তিগত দিক থেকে সরে যায় এবং বাস্তবতাকে মনের দিক থেকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে।"(১)

এই সূত্রগুলি থেকে আইনস্টাইনের চরিত্রের আশ্চর্য সামগ্রিকতা ধরতে পারা যায় যাতে তাঁর চরিত্র, মন ও আবেগের দিকটা সুসমন্বিত হয়ে রয়েছে।

মহাবিশ্ব সসীম কি অসীম সেটা হিসেব করতে আইনস্টাইন একদিকে যেমন সম্পূর্ণ মগ্ন আবার অন্যদিকে তিনি জনসাধারণের স্বার্থে টাকা তোলার জন্যে স্বহস্তে তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কে মূল লেখার পাঠকে কপি করে দিচ্ছেন (আইনস্টাইনের স্বহস্তে পুনর্লিখিত এই পাণ্ডুলিপি কয়েক দশ-লক্ষ বা মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়ে কংগ্রেসের লাইব্রেরীতে স্থান পেয়েছিল): একই ভাবমূর্তির এটা দুটো দিক এবং এতে মনে হয়, আইনস্টাইন এ ছাড়া আর অন্য কিছু করতে পারতেন না। শুধুমাত্র একজন মানুষ, যে কখনও নিজের

১ Philosopher-Scientist, ৭ পৃঃ।

সম্পর্কে ভাবে নি, সেই-ই অতোটা পুরোপুরি নিজেকে "একান্ত ব্যক্তিগত" থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা তত্ত্বকে এত জোরের সঙ্গে অনুধাবন করতে পারে—যার পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ সাক্ষ্য ও সহস্র বর্ষব্যাপী ঐতিহ্যের একটা সংঘাত বাধে। মনে হয় ও খুব ভালো কথায় বলতে হলেও এ যেন একটা "পাগলের তত্ত্ব"। এই দিক থেকে আইনস্টাইনের পুরো নৈতিক নিষ্ঠা তাঁর মনের বিরাটত্বের থেকে আলাদা করা যায় না।

তাঁর 'প্রথম স্মৃতিকথা'-তে লেভ তলস্তয় একটা গল্প বলেছেন, যাতে একটা সবুজ ছড়িতে মানুষের সুখের রহস্য ও অন্যান্য রহস্য কী সে সম্পর্কে খোদাই করা আছে, যেটা বার করতে হলে ছড়ির মালিককে মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে কয়েকটি তুচ্ছ ছুটকো জিনিস থেকে মনকে সরিয়ে রাখতে হবে। বিজ্ঞানে সেই ধরনের সবুজ ছড়ি পাওয়া সম্ভব যদি মনকে একেবারে উচ্চতম পর্যায়ে নিবিষ্ট করা সম্ভব হয়, যার সামনে কোনো বাধা-বিপত্তি থাকলেও যে বিচলিত হবে না, এমন ধরনের একাগ্রতা যাতে অন্য কোনো সাময়িক বা ব্যক্তিগত চিন্তার স্থান নেই—যেটা মূল চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে নেয়।

একেবারে সঠিক বিশ্বের নিয়ম, যেটা ক্রমশই অধিকতরভাবে সারা মহা-বিশ্বের প্রতি প্রযোজ্য, তাকে খুঁজে বার করার কাহিনীরূপে উপস্থিত করলে আইনস্টাইনের জীবনকাহিনীকে তিন পর্বে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্বে কৈশোরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' জীবনের অর্থ কী তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানে ঔৎসুক্য জেগে উঠল এবং তার জন্যে বিষয়মুখী জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে-নিয়মাবলী তার খোঁজ করার ইচ্ছা সৃষ্টি হল। আইনস্টাইনের ছাত্রজীবনেই তাঁর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি পরিণত হওয়ার সূচনা দেখা যায় এবং গাণিতিক ও পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করছেন, পরবর্তীকালে যার সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয় পর্বে ত্বরণমুক্ত গতিবেগের আপেক্ষিক তত্ত্বের সাধারণীকরণ করাটাই সমগ্র সময় ব্যেপে রয়েছে। এই পর্বের সর্বাপেক্ষা বড় সাফল্য হল সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের রূপায়ণ এবং এর ভিত্তিতে মহাবিশ্বের কার্যকারণ ও উৎপত্তি সম্পর্কে নতুন জ্ঞানের উদ্ভব। সূর্যগ্রহণের সময় প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ার পরে এই পর্বের সমাপ্তি এবং এই তত্ত্ব সর্বজনস্বীকৃত হল।

পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলে তৃতীয় পর্ব আসন্ন পারমাণবিক যুগের সংকেত বহন করে আনছে। বিশের দশকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাতে ক্ষুদ্রতম জগতের (microcosmic) তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে। আইনস্টাইন তার গুটিকতক প্রতিপাদ্যের সমালোচক ছিলেন। তিনি নিজে একটি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যার (অথবা তার জন্যে প্রচেষ্টাতে) কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

বিশের দশকের শেষ থেকে পরিসমাপ্তি অবধি তাঁর জীবনের এই পর্বের মূল্যায়ন সম্পর্কে আইনস্টাইন ও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে মতভেদ আছে। আইনস্টাইনের কাছে যে ধারণাগুলির অনুসন্ধানে তিনি জীবনের শেষ ত্রিশ বছর কাটিয়েছেন, সেটা 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত', যা তিনি করতে চেয়েছেন, তারই শেষ পরিণতির পরিচায়ক। এই বছরগুলিতে তিনি নতুন এক তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্যে নিজেকে বহুলাংশে নিয়োগ করেছিলেন, যে তত্ত্ব একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিপাদ্যের ভিত্তিতে সব কিছু ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করবে, যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে মাধ্যাকর্ষণ, তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র ও অন্যান্য শক্তির ক্ষেত্র।

আইনস্টাইনের কাজের পুরো মূল্যায়ন, যার মধ্যে তাঁর জীবনকাহিনী সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তাও ধরতে হবে, শুরু করতে হয় আপাতদৃষ্টিতে তাঁর অনুসন্ধানের নিষ্ফলতা দেখে। অথচ আজ, ১৯৬০-এর দশকে, এমন ঝোঁক-গুলি দেখা যাচ্ছে যাতে পুরোনো মূল্যায়নগুলিকে আবার নতুন করে বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে। আইনস্টাইনের অর্ধেক জীবন যাতে অতিবাহিত হয়েছিল, তাতে যে দারুণ মানসিক প্রচেষ্টা ছিল তার সম্পর্কে নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যাবে। এই ঝোঁকগুলির এবং মৌলকণাদের (elementary particles) তত্ত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যতে কী দাঁড়াবে সেটা না জানতে পারলে তাদের সম্পর্কে শেষ বিচার কিছুতেই করা সম্ভব নয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৈশোর

তাঁর সততা ও ন্যায়বিচারের বোধ থাকার জন্যে তাঁর ডাকনাম ছিল 'বিদারমাইয়ার' (সাধু জন), এটা অনেক সময়ে তাঁকে মন-মরা হওয়ার মতন অবস্থায় নিয়ে যেতো। তখন যেটা মন-মরা বলে মনে হোত আজ সেটা অন্তর্নিহিত ও একেবারেই বিলুপ্ত করা যায় না এই রকমের সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ। যারা মানুষ ও বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে জানে, তারা এটা জানে যে তাঁর ছেলেমানুষী বিষাদ-গ্রস্ততা আসলে তাঁর দৃঢ় নৈতিকভাবে সামগ্রিক সাধুতার পরিচায়ক ছিল।

মসৎস্কভ্স্কি

যে পরিবেশে আইনস্টাইন জন্মেছিলেন, তা তাঁকে অতি অল্প বয়সেই দুটি বিপরীত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সম্পর্কে এনে ফেলে। বস্তুত, সারা জীবনে অনেকবার তাঁকে এর সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার একটি হল যুক্তিবাদী ঐতিহ্য। তাঁর জন্মস্থান সোয়াবিয়াতে এটা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল, তার শেকড় বিস্তৃত ছিল এমন কি আলসাস্ ও ফ্রান্সেও। অন্যটা ছিল অভ্রান্ত পুলিসী রাষ্ট্রের উপর অন্ধ বিশ্বাসের ঐতিহ্য—যেটার চেহারা হাইনরিখ মান্ তাঁর 'উন্টারটান' বইয়েতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। এর সরব ঘোষক ছিলেন প্রুশিয়ার সরকারী কর্মচারী ও আমলাতন্ত্রের রাজপুরুষেরা—যারা সদ্য-গঠিত সাম্রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে দক্ষিণ জার্মানিতে পিলপিল করে ঢুকতে শুরু করেছিল। আইনস্টাইন যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের প্রতিভূ ছিলেন। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের মহান সুষমাকে জানা। আপাতবিরোধী জগতের যে-চিত্র তাঁর কাছে ছিল, সেটা নিশ্চয়ই

অষ্টাদশ শতাব্দীর যে-ছকে গাঁথা দুনিয়ার চিত্র সাবেকি যুক্তিবাদীদের অনুগামীমহলের কাছে ছিল, তা থেকে অনেক তফাৎ। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে যে যুক্তিবাদী মনোভাব চলে আসছিল তার মধ্যে ছিল যুক্তির স্বাধীনতা, ভলতেয়ারের তির্যক শ্লেষ ও সহিষ্ণুতা, মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্খার পক্ষে এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুসোর ঘোষণা,—এ সবই আইনস্টাইনের পরিবেশের মধ্যে অল্প-বিস্তর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও ধারণার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাঁর মনের উপর প্রথম দিককার ছাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছিল। একটা বিপরীত ঐতিহ্য ঐ পরিবেশের মধ্যে বজায় ছিল, সেটা আইনস্টাইনের জীবদ্দশায় নতুন ব্যাপকতা ও চেহারা নিয়ে সভ্যতার অস্তিত্বকেই সংকটাপন্ন করে তুলেছিল।

১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ দানিয়ুব নদীর বাঁ পারে উলম নামে এক পুরানো জার্মান শহরে আইনস্টাইনের জন্ম; উলম শহরটি সোয়াবিয়ার আলপস পর্বত-মালার সানুদেশে অবস্থিত। নবম শতাব্দী থেকে এই শহরের ইতিহাস পাওয়া যায়। সোয়াবিয়ার শহরগুলির জোটের মধ্যে অন্যতম প্রধান এই শহরটি ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক গীর্জা ও সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রোটেস্টাণ্ট রাজন্যদের সংগ্রামে একটা প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময়ে এখানেই ম্যাকের অধিনায়কত্বে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী প্রচণ্ডভাবে হেরে গিয়েছিল বলে ইতিহাসে লেখা আছে।

১৮০৯ সালে ভিয়েনা শান্তি চুক্তিতে অষ্ট্রিয়ার পরাজয় পাকা হয়ে গেল, উলম শহর ভুরটেমবার্গের(১) অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ১৮৪২ সালে শহরের পুরানো দুর্গ-প্রাকারকে আবার গড়ে তোলা হল; প্রুশিয়ার ইনজিনিয়াররা তাকে তৈরি করলেন এবং ১২টি দুর্গ ও কামান ছোঁড়ার স্তম্ভ দানিয়ুব নদীর ওপরে যেন হুমড়ী খেয়ে পড়ল। এবারে তাদের ফ্রান্সের মুখোমুখি খাড়া করা হল।

১৮৭০-এর দশকে সোয়াবিয়ার জন-সম্প্রদায়ের একটি বাহ্যিক মধ্যযুগীয় চেহারা দেখা গেল; অাঁকাবাঁকা রাস্তার দু'ধারে তিন-কোণা ছাদযুক্ত বাড়ি-

১ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সারা জার্মানি ৩৪টি সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, যার মধ্যে প্রুশিয়া (যার রাজধানী ছিল বার্লিন) ছিল সর্বাপেক্ষা বড়। ১৮৭১ সালের পরে সারা জার্মানিতে একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ১৯০৯ সালে ভুরটেমবার্গ ঐ রকমের একটি সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল।

অনুবাদক

গুলি যেন ঝুলে রয়েছে এবং তাদের ছাড়িয়ে যেন আধিপত্য করছে বিরাট আকারের পঞ্চদশ শতাব্দীর গথিক গীর্জার (বা ক্যাথিড্রালের) ৫০০ ফুট উঁচু মিনার। কেউ কষ্ট করে এই মিনারে চড়তে পারলে চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাবে : তিরল ও সুইজারল্যাণ্ডের, সোয়াবিয়ার আলপস্ পর্বতমালার ঢেউ-খেলানো গ্রামগুলি, বাভেরিয়ার মাঠগুলি এবং দূরে রয়েছে ভুরটেমবার্গ, আর পায়ের কাছে ভিলহেলমসবার্গ দুর্গের খাড়া খাড়া রূপরেখা, এবং চতুর্দিকের দুর্গ প্রাচীরগুলি, টাউন হল, বাজার, লোহা-ঢালাইয়ের ছোট কারখানা, এবং কয়েকটি সুতোকল। সর্বসাকুল্যে ত্রিশ হাজার বাসিন্দা : কাপড়ের ও চামড়ার কারবারি, মজুর, হস্তশিল্পী, ঢালাইয়ের কারখানার মজুর, তাঁতি, বাড়ি তৈরির মিস্ত্রি, ছুতোর, বিখ্যাত উলম পাইপের নির্মাতারা, ঘরের আসবাবপত্র তৈরি করার মিস্ত্রিরা, মদ চোলাই করে যারা—সোয়াবিয়ার বাসিন্দাদের সবাইকে নিয়ে তিন ভাগের দু'ভাগ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী এবং বাকি এক ভাগ মার্টিন লুথার সম্প্রদায়ভুক্ত, যার মধ্যে মাত্র কয়েক শত ইহুদী রয়েছে, যাদের জীবনযাত্রা জনসাধারণের অন্যান্য অংশের থেকে বিশেষ কিছু পৃথক নয়।

কথ্য ভাষাটা মিষ্টি সোয়াবিয়ার প্রকাশ ভঙ্গিতে বলা জার্মানি, যার টান আইনস্টাইনের কথার মধ্যে বহুদিন পাওয়া যেত এবং সারা জীবন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এলসার ভাষার মধ্যে ছিল। তাঁর কাছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ডাক নাম ছিল 'অ্যালবার্টল', ল্যাণ্ডকে বলতেন 'লেণ্ডল', শহরকে (জার্মান ভাষায় স্টাডট্) বলতেন 'ষ্টড্‌টল'।(১) এই নরম ভাবাবেগপূর্ণ কথ্য ভাষার সঙ্গে সংঘাত লাগত নবাগত প্রুশিয়ানদের রুক্ষ কাটাকাটা কথা বলার ভঙ্গির। দুই মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে যে তফাৎ দেখা দিত, তার ফলে বেসুর হোত তাদের প্রকাশভঙ্গি এবং সেটা থেকেই সেটা বোঝা যেত যার কথা আমরা এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই বলেছি। ভুরটেমবার্গের মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ একটা বেশ বড় মাপের মনের উদারতা এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সহিষ্ণুতা দেখাতে পারত, যার বিরুদ্ধে "প্রুশিয়ানতন্ত্রের" চরম জাতীয়তাবাদ, গোঁড়ামী ও উদ্ধত অসহিষ্ণুতা ছিল।

আইনস্টাইন যে পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে ছিলেন তাতে হাইনে,

---

১ **Philip Frank, Einstein. His Life and Times, Jonathan Cape. London, 1950, ৪ পৃঃ।**

লেসিং ও শিলার ইহুদী ও ক্রিশ্চিয়ানদের কাছে সমানভাবে আদরণীয় ছিলেন এবং এঁদের লেখা বইগুলি বাইবেল অথবা গস্‌পেল-এর (খৃষ্টের উপদেশাবলী) পাশাপাশি বইয়ের তাকে অবস্থানুসারে সজ্জিত থাকত। শিলার ছিলেন বিশেষ করে তাদের কাছে প্রিয়, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই তাদের আদরের সোয়াবিয়ান প্রকাশভঙ্গি, যা তাঁর বইয়েতে পাওয়া যেতো।

অ্যালবার্টের পিতা হেরমান আইনস্টাইন গণিতে ভাল ছিলেন, তিনি একবার ভেবেছিলেন স্টুটগার্ট জিমনাসিয়ামে তাঁর পড়াশুনা শেষ করার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবেন। কিন্তু তার বদলে তাঁকে নামতে হল ব্যবসায়। ১৮৭৮ সালে তিনি স্টুটগার্টের এক ধনী ব্যবসায়ীর কন্যা পাউলিনে ককে বিবাহ করে উল্‌মে বসবাস শুরু করেন, সেখানে হেরমান আইনস্টাইনের বাবা মা বাস করতেন ১৮৬৮ সাল থেকে এবং সেখানে তাঁদের অনেক আত্মীয় ছিল। উল্‌ম শহরে হেরমান আইনস্টাইন একটা ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপত্রের দোকান খুলেছিলেন। উল্‌ম থেকে ১৫ মাইল দূরে হেচিনগেন শহরে হেরমানের খুড়তুতো ভাই রুডলফ তাঁর মেয়ে এলসাকে নিয়ে বাস করতেন; আইনস্টাইনের সমবয়স্ক এই মহিলাটি পরে আইনস্টাইনের দ্বিতীয় স্ত্রী হন। মায়ের সম্পর্কে তাঁদের আত্মীয়তা আরও নিকটতর ছিল কারণ এলসার মা ছিলেন পাউলিনে ককের বোন।

১৮৮০ সালে আইনস্টাইনের জন্মের এক বছর পরে তাঁদের পরিবারটি মিউনিকে চলে যায়, সেখানে হেরমানের সঙ্গে তাঁর ভাই জেকব একটা ইলেকট্রিকের কারখানা খোলেন। অ্যালবার্টের বয়েস যখন পাঁচ তখন তাঁরা মিউনিকের উপকণ্ঠে সেণ্ডলিং-এ একটা বাড়ি তোলেন এবং ডাইনামো, আর্ক ল্যাম্পও মাপজোক করার যন্ত্রপাতি তৈরির জন্যে একটা ছোট ফ্যাক্টরি খোলেন। পাউলিনের যৌতুকের সব বাকি টাকাটাই তাতে খাটানো হয়।

১৮৮১ সালে মাজা নামে একটি কন্যার জন্ম হয় এই পরিবারে। সমবয়সী এই দুই ছেলে-মেয়ে মাজা ও অ্যালবার্ট দারুণ বন্ধু হয়ে ওঠে এবং সেণ্ডলিং-এর সংলগ্ন বাগান তাদের খেলার জায়গা ছিল।

হেরমান আইনস্টাইন তাঁর ছেলে-মেয়েদের প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন।

মিউনিকের চতুর্দিকে ছবির মতো গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাওয়া এই

পরিবারের একটা অভ্যাস ছিল, আর তাতে বহু আত্মীয়-স্বজনরাও যোগ দিতেন। এলসাকে নিয়ে রুডলফ আইনস্টাইন হোচিনগেন থেকে আসতেন।

পাউলিনে আইনস্টাইন সঙ্গীত বড় ভালোবাসতেন। পিয়ানো বাজাতেন এবং গানও করতেন তিনি। তাঁর প্রিয় সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন বীটোফেন এবং বিশেষ করে তাঁর সোনাটা(১) তিনি ভালোবাসতেন। সারা পরিবারটা সঙ্গীত এবং চিরায়ত জার্মান সাহিত্য ভালোবাসত।

হেরমান আইনস্টাইনের ভ্রাতা জেকব এই পরিবারের সঙ্গে বাস করতেন। তিনি ছিলেন ভালো ইনজিনিয়ার এবং তিনিই অ্যালবার্টকে গণিতে আগ্রহান্বিত করে তোলেন। ভায়েরা দুজনে মিলে ইলেকট্রিক ফ্যাক্টরির কাজ দেখতেন, হেরমান দেখতেন ব্যবসার দিকটা আর জেকব দেখতেন ইনজিনিয়ারিংয়ের ব্যাপারটা। তাঁরা কিন্তু ব্যবসাতে সাফল্য লাভ করেন নি এবং পরিবারের অবস্থাটা কোনো সময়েই বেশ স্বচ্ছল ছিল না।

অ্যালবার্ট শান্ত প্রকৃতির একটু চাপা ছেলে ছিল। বন্ধুদের সে এড়িয়ে চলত এবং অন্য ছেলেমেয়েদের ছোটাছুটিতে একেবারেই যোগ দিত না। সৈন্য সৈন্য খেলা তার বিশেষ অপছন্দ ছিল। সারা গ্রামাঞ্চলে মিলিটারি ব্যাণ্ডের বাজনা শোনা যেত, শহরগুলিতে সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করত আর উৎসাহী ছেলেরা ভিড় করে গর্বের সঙ্গে তাদের তালে পা ঠুকত, আর নগরবাসী ব্যবসায়ীরা ফুটপাতগুলিতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে মার্চ-করা নতুন সাম্রাজ্যকে যেন গর্বের সঙ্গে দেখত আর তাদের ছেলেদের ভবিষ্যতের সুরাহা হবে বলে উৎফুল্ল হত। ছোট্ট অ্যালবার্ট কিন্তু তার বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকত এবং কেঁদে-কেটে পীড়াপীড়ি করত তাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। ব্যাণ্ডের আওয়াজ আর কুচকাওয়াজের পদধ্বনি তাকে ভয় পাইয়ে দিত এবং তার স্নায়ুর পরে চাপ পড়ত।

যথাসময়ে স্কুলে যাওয়ার দিন এল। জার্মানিতে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত সম্প্রদায়গতভাবে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গোষ্ঠীগুলি তাকে নিয়ন্ত্রণ করত। ইহুদীদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্কুলটি বাড়ি থেকে বহুদূরে, তা-ছাড়া তার মাইনে আইনস্টাইন পরিবারের সাধ্যের বাইরে ছিল। অ্যালবার্টকে কাছের এক ক্যাথলিক স্কুলে ভর্তি করা হল। সেখানেই প্রথম তাঁর স্কুলের

১ যন্ত্রের সাহায্যে গীতিমালা বলা যেতে পারে—অনুবাদক।

সহপাঠীরা তার ন্যায়ের জন্যে 'বিষাদমূলক মনোভাব'-কে লক্ষ্য করল, যার কথা আইনস্টাইনের অন্যতম প্রথম জীবনীকার আলেকজাণ্ডার মস্‌ৎস্‌কভ্‌স্কি ১৯২০ সালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে বলেছেন। খুব সম্ভব এই প্রাথমিক স্কুলেই আইনস্টাইন প্রথম ইহুদী বিদ্বেষের পরিচয় পান। "ঐ স্কুলে ইহুদী ছেলেমেয়ে বেশি ছিল না এবং এখানেই ইহুদী বিদ্বেষের ধাক্কা, যেটা স্কুলকে বাইরে থেকে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, তার কিছুটা স্পর্শ ছোট্ট আইনস্টাইনের গায়েও লাগে। এই প্রথম একটা বিরোধী, বেসুরো আবহাওয়া তাঁর মনের মধ্যে যে সব সুষমাময় জগতের চিত্র ছিল তাকে ব্যাহত করে।"

তাঁর জীবনে এটাই হয়ত প্রথম বেসুরো ব্যাপার ছিল না, কারণ ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের তুলনায় প্রুশিয়ার বাঁশী ও ড্রামের বেসুরো আওয়াজ এবং ভাবাবেগের রঙে রঞ্জিত দক্ষিণ জার্মানির মধুর বাচনভঙ্গির তুলনায় হেঁড়ে গলার আদেশ-করা ভঙ্গিতে প্রুশিয়ানদের চিৎকারও একটা উপাদান ছিল। অবশ্য বহু বছর পার হবার পরই তাঁর মন সব সময়ে যে যুক্তি ও সুষমার জন্যে আকুল ছিল তার সঙ্গে এই দুষ্ট যুক্তিহীন শক্তির বিরোধ তিনি ধরতে পেরেছিলেন। এই সময়ে ইহুদী-বিরোধী কাদা ছিটানো যে ছোট ছেলেটিকে আঘাত করেছিল, তার কারণ এই নয় যে সে তার শিকার ছিল ; পরন্তু তার মনের মধ্যে যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শের যে শেকড় গেঁথেছিল এটা তার বিরোধী।

যাই হোক, তখন বা তার পরেও কখনোই আইনস্টাইনের মনে এটা (ইহুদী বিদ্বেষ) জাতীয় বিচ্ছিন্নতার মনোভাব জাগিয়ে তোলে নি বরঞ্চ তাঁর মনের গভীরে সমভাবে চিন্তা করে এই রকম মানুষদের আন্তর্জাতিক সংহতি-বোধের বীজ বপন করেছিল।

মিউনিকের লুইটপোল্ড জিমনাসিয়ামে দশ বছর বয়সে তিনি যোগ দেন। ছেলেটির মনের ঝোঁক বা প্রবণতার কোনো কিছুই সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খেত না। 'ক্ল্যাসিক্যাল শিক্ষা' বলতে লাতিন ও গ্রীক ব্যাকরণ মুখস্ত করাই যেন একমাত্র কাজ ছিল, আর ইতিহাস পড়ার অর্থ ছিল ঘটনাবলীর এক ঘেঁয়ে পরম্পরাকে মনে রাখা। মাস্টার মশাইদের ধরন-ধারন ছিল সেনাবাহিনীর অফিসারদের মতন, আর ছাত্ররা ছিল যেন সাধারণ 'সৈন্য'। এই সময়ের কথা স্মরণ করে আইনস্টাইন টিপ্পনী কেটেছিলেন, "প্রাথমিক শিক্ষকরা আমার কাছে সার্জেন্টের মতন মনে হত আর

জিমনাসিয়ামে তাদের মনে হত লেফটেন্যান্ট-এর মতন।" ঐ ধূসর পটভূমির অবশ্য কিছু কিছু উজ্জ্বল দিকও ছিল। জিমনাসিয়ামে রুয়েস নামে একজন শিক্ষক ছিলেন, যিনি তাঁর ছাত্রদের কাছে সত্যসত্যই প্রাচীন সভ্যতার মনোভাবকে তুলে ধরে ক্ল্যাসিক্যাল ও সমকালীন-জার্মান সংস্কৃতিতে তার প্রভাব এবং বিভিন্ন যুগে ও পুরুষের সাংস্কৃতিক জীবনে তার প্রভাব কিভাবে বর্তমান রয়েছে, সেটা দেখাবার চেষ্টা করতেন। 'হেরমান ও ডরোথি' নামে রোমান্টিক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী পড়তে গিয়ে আইনস্টাইন যে আনন্দ পেতেন তা আইনস্টাইনের স্মৃতিপটে বরাবরের জন্যে গাঁথা ছিল। রুয়েসের সঙ্গে বাক্যালাপ করার সুযোগ তিনি খুঁজে বেড়াতেন এবং মধ্যাহ্নভোজন বাদ দিয়েও স্কুলে ঘণ্টার পরে থাকার শাস্তি তিনি আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতেন যদি রুয়েস সেই বাড়তি ক্লাস নিতেন। বহু বছর পরে, যখন আইনস্টাইন জুরিখের প্রফেসার, তিনি মিউনিক দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং রুয়েসের সঙ্গে দেখা করা ঠিক করলেন। কিন্তু জীর্ণ পোষাক পরিহিত সেই তরুণটির নামের কোনো অর্থই সেই বৃদ্ধ মাস্টার মশাইয়ের কাছে ছিল না। রুয়েস মনে করলেন যে, তরুণটি বোধ হয় তাঁর কাছে অর্থ সাহায্য চায় এবং নিরুত্তাপভাবে তার সঙ্গে কথা বললেন। তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া ছাড়া আইনস্টাইনের আর কিছু করার ছিল না।

বছরগুলি কাটতে লাগলো এবং অ্যালবার্ট নিয়মমতো এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে উঠতে লাগল। চুপচাপ স্বল্পভাষী বালকটি তার পড়াশুনাতে বিশেষ কোনো সাফল্য দেখাতে পারেনি। আসলে তার উত্তরগুলির গভীরতা ও ঠিক ঠিক জবাব মাষ্টার মশাইদের সংকীর্ণ মনে ধরা পড়ে নি, তাঁরা ওর আস্তে আস্তে বলার ভঙ্গিতে কিছুটা রেগেই যেতেন।

ইতিমধ্যে ছেলেটির মনে নানারকমের ভাবনা চিন্তার ঢেউ সৃষ্টি হচ্ছিল। বৃহত্তর জগতে এবং সামাজিক পরিবেশে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সেই সুষমা যা তার অন্তর্জগতের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে। অ্যালবার্টের গোড়ার দিককার ধর্মীয় মনোভাব প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ধাক্কায় শীগগিরই দুর হয়ে গেল। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক তার অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে বিশ্বের সুষমা মেলে ধরতে পারল না। আইনস্টাইন-পরিবারে পোলাণ্ডের মেডিকেল ছাত্র ম্যাক্স তালমি এসেছিল; তার কাছে বালক অনেকগুলি সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক বইয়ের সন্ধান পেল। আইনস্টাইনের বাড়িতে প্রতি শুক্রবার বিদেশ থেকে

আগত একজন গরীব ছাত্রকে খেতে বলার রেওয়াজ ছিল। এরন বার্নস্টাইনের লেখা প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে কয়েকটি বইয়ের প্রতি তালমি অ্যালবার্টের নজর টানে। এই বইগুলিতে প্রাণী বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোলবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, এইসব বইয়ে আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলিকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সাধারণ বিশ্বপ্রকৃতির কার্যকারণ সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা বুঝিয়ে বলা হয়েছে। এর পরে অ্যালবার্ট বুকনার-এর 'বল ও বস্তু' (Force and Matter) নামে বইয়ের একজন উৎসাহী পাঠক ছিল ; এ বইটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তরুণ জার্মানদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বড় বড় আবিষ্কারের ফলে যে অগাধ জটিল জগতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, সে সম্পর্কে লেখকের একেবারে কোনো বোধ না থাকলেও বুকনারের বই বহু তরুণকে ধর্ম থেকে সরিয়ে আনতে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। এই বই থেকে আইনস্টাইন দারুণভাবে প্রভাবান্বিত হন। প্রাথমিক স্কুল ও জিমনাসিয়ামে বিশ্ব ও প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে শিক্ষা বাইবেলের ব্যাখ্যা মেনে চলত, যেখানে আধুনিক জ্ঞান সম্পর্কে বুকনারের ব্যাখ্যা ধর্মীয় নীতিগুলিকে বরবাদ করে বিশ্বের বাস্তব চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছিল।

প্রাথমিক স্কুলে আইনস্টাইন ক্যাথলিক ধর্মীয় শিক্ষালাভ করতেন। জিমনাসিয়ামে তিনি ইহুদী ধর্মের শিক্ষা পেতেন, যেটা ইহুদী ছাত্রদের দেওয়া হত। ওল্ড টেসটামেন্টের ঐতিহাসিক ও শৈল্পিক মূল্যবোধ আইনস্টাইনকে নাড়া দিত কিন্তু তার মনে পরে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের যে-ধাক্কা পড়েছিল তার বিরোধিতা করতে পারে নি। শীঘ্রই যে কোনো ধর্মের প্রতি তাঁর বিরূপতা জেগে ওঠে ; তিনি ইহুদী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে এবং কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের সভ্য না হতে মনস্থ করেন।

বেশ ছেলে বয়েস থেকেই আইনস্টাইন গণিতে যথেষ্ট ঔৎসুক্য প্রকাশ করতেন। এটা হয়তো তাঁর কাকা জেকবের জন্যে, যিনি বীজগণিত সম্পর্কে বলতে ভালোবাসতেন : "বীজগণিত একটা চমৎকার বিজ্ঞান। একটা ছোট্ট জন্তুর পেছনে আমরা ধাওয়া করি যার নাম আমরা জানি না, কাজেই আমরা তাকে X বলে ডাকি। যখন আমরা তাকে ধরে ফেলি তখন তাকে পেড়ে ফেলে তার ঠিক নাম দিয়ে থাকি।" এই বিষয়টা বালকের মনকে অবাক

করে দিয়েছিল এবং সেও শীঘ্রই এই শিকারে যোগ দিল, যা করতে গিয়ে সে অনেক সময়েই চিরাচরিত পদ্ধতির পথ ছেড়ে দিয়ে নতুনভাবে সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করত।

অ্যালবার্টের যখন বারো বছর বয়েস তখন স্কুলের পাঠে বীজগণিত ও জ্যামিতি পড়া শুরু করার কথা। কিন্তু সে ইতিমধ্যেই বীজগণিত জানলেও জ্যামিতি সম্পর্কে তখনও কিছুই জানত না। এই বিষয় সম্পর্কে একটা পাঠ্যপুস্তক জোগাড় করে যে কোনো স্কুলের ছাত্রের মতোই পাতার পর পাতা উল্টে পড়তে আরম্ভ করল। বইটা এতো আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়াল যে, সে তা থেকে নিজেকে কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পারল না।

ইতিমধ্যে ছয় বছর বয়েস থেকেই অ্যালবার্ট বেহালা বাজানোর শিক্ষা নিতে শুরু করেছিল। ভালো শিক্ষক তার ভাগ্যে জোটে নি, যারা তার স্কুলের শিক্ষকদের মতোই তাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে নি। সাত বছর ধরে সে নিয়মমতো রেওয়াজ করে গেছে কিন্তু মোৎসার্টের সোনাটাই তাকে প্রথম সঙ্গীতের মাধুর্যে প্রবেশ করাতে সক্ষম হল। মোৎসার্টের সোনাটাগুলির মাধুর্য ও ভাবাবেগে সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলল এবং তার নিজের বেহালার সুরে তাকে রূপ দিতে চাইল। কিন্তু নৈপুণ্য তখনও তার আয়ত্ত হয় নি, কাজেই বেহালার কলাকৌশল সে আয়ত্ত করতে শুরু করলো এবং শেষ অবধি মোৎসার্টের সঙ্গীতের ধ্বনি বেরিয়ে এল। সঙ্গীত তার অন্যতম চিত্তবিনোদনের প্রিয় বিষয় হয়ে দাঁড়াল। চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই সব রকমের বাড়ির জলসাতে সে যোগ দিত। মোৎসার্ট ও তাঁর সঙ্গীত আইনস্টাইনের জীবনে ঠিক সেই প্রভাবই বিস্তার করেছিল, যেটা ইউক্লিডের জ্যামিতি তাঁর বৈজ্ঞানিক বিকাশেও করেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছাত্র-জীবন

"প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা সুন্দর দান দেখতে ও বুঝতে কত আনন্দ।"

আইনস্টাইন

হেরমান আইনস্টাইন ব্যবসায়ী হিসেবে সফল হতে পারেন নি। ইলেক-ট্রিকের ফ্যাক্টরিতে কোনো লাভ হোত না এবং শেষ অবধি প্রায় দেউলে হওয়ার মতো অবস্থায় পড়ে তিনি অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে যাওয়ার ঠিক কারন। ইতালিতে যাওয়াই সবদিক থেকে উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল কারণ সেখানে একদিকে ব্যবসার সম্ভাবনাও ছিল ভালো, অন্যদিকে ইতালির জীবন ছিল রঙীন, যেটার অত বেশি আবেদন ছিল তাঁর কাছে। তাছাড়া পাউলিনের কয়েকজন ধনী আত্মীয়স্বজন (তারা জেনোয়াতে শস্যের ব্যাপারী ছিল) তাঁকে সাহায্য করতে রাজি ছিল। কাজেই ১৮৯৪ সালে, কাকা জেকবকে নিয়ে পুরো পরিবারটা মিলানে চলে গেল, অ্যালবার্ট রয়ে গেল মিউনিকে, জিম্‌নাসিয়ামে তার লেখাপড়া শেষ করতে। আইনস্টাইন ভ্রাতৃদ্বয় (অ্যালবার্টের বাবা ও কাকা) প্রথম মিলানে ব্যবসা চালু করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যবসা দাঁড়াল না এবং তাঁরা পাভিয়াতে চলে গেলেন; সেখানেও অবস্থার হেরফের হল না। কাজেই তাঁরা আবার মিলানে ফিরলেন এবং ইলেকট্রিক মোটর ডাইনামো তৈরি করার কারখানা খুললেন। প্রধানত কক পরিবারের ইতালীয় ও জার্মান শাখাগুলোর সাহায্য পেয়েই তাঁরা ব্যবসাটা চালাতে পারলেন।

মিউনিকে একা ১৫ বছরের অ্যালবার্টের অবস্থা বেশ কাহিল হয়ে ওঠে। গণিত ও পদার্থবিদ্যাতে তার ক্লাসের ছেলেদের থেকে সে অনেক এগিয়ে
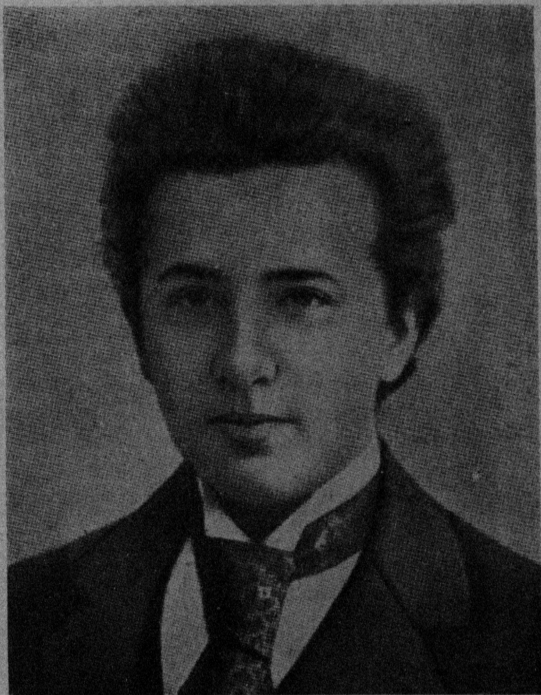
আইনস্টাইন

কিন্তু লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়াটা তার পক্ষে ক্রমশই বেশি রকম মুস্কিল হয়ে দাঁড়াতে লাগল। যে সব বই সে পড়ত, তাতে জিমনাসিয়ামের পুঁথিগত বিদ্যার 'পরে বেশি রকম গুরুত্ব আরোপ করাকে সে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখত। ক্রমাগত লাতিন ও গ্রীক মুখস্ত করা, অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অর্থহীন অনেক খবরাখবর বেশি করে জড়ো করে হাজির করা, সামরিক কায়দার আবহাওয়া এবং মাষ্টার মশাই ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের আত্মসন্তুষ্ট অজ্ঞতা তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। তার সহপাঠীদের দুষ্টুমি আন্তরিক মনোভাবাপন্ন ছেলেটির মনে কোনো উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারত না। তার স্কুলে কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না এবং এখন তার পরিবারও বহুদূরে বাস করছে। জিমনাসিয়াম ছেড়ে দিয়ে ইতালিতে তার পরিবার-বর্গের কাছে চলে যাওয়ার মনস্থ করল অ্যালবার্ট। স্নায়বিক দুর্বলতার জন্যে তার ছয় মাসের ছুটির দরকার বলে সে ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করল। স্কুলের কর্তৃপক্ষ অবশ্য তার উদ্দেশ্যটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাঁরা বহুদিন ধরেই আইনস্টাইনের সংশয়বাদিতা ও মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করাকে ভালো চোখে দেখছিলেন না। এক বছর পূর্বেই জিমনাসিয়াম ছাড়বার প্রস্তাব তাকে দেওয়া হল। কারণ তার উপস্থিতি অন্য ছাত্রদের স্কুলের প্রতি মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ করছে। পাশ করে বেরোবার এক বছর আগের ব্যাপার এটা।

মিলানে তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েই আইনস্টাইন প্রথম যে কাজটি করলেন, সেটি হল জার্মান নাগরিকত্ব ও ইহুদী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করা।

ইতালি আইনস্টাইনকে মুগ্ধ করল। তার পুরানো মন্দিরগুলি (বা পীঠস্থানগুলি), মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারিগুলি, তার প্রাসাদ ও ছবির মতো কুঁড়েঘরগুলি, তার মনোরম, অতিথিপরায়ণ ও সহজ-জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত মানুষেরা, যারা কাজ করে অথবা আলস্যে দিন কাটায়, একই ভাবে প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে প্রকাশ্য ভঙ্গিতে তারা মজা ও আনন্দ করে অথবা ঝগড়া করে। সঙ্গীত ও গান এবং আবেগপূর্ণ নমনীয় কথা বলার ভঙ্গির তুলনায় জার্মানিতে শীতল, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আচারব্যবহারের নিয়মগুলি ছিল, যা তাঁকে পীড়িত করত। জেনোয়া ও অন্য স্থানে বেড়িয়ে, আগে যে ধরনের অন্তরের মুক্তি সে অনুভব করে নি, সেটা এবারে করল।

তবে বরাবরের মতো এটা থাকা সম্ভব ছিল না এবং এমন একটা সময় এল যখন অ্যালবার্টকে তাঁর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হল। তাঁর বাবার ব্যবসাপত্র তো ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। মিলান ও পাভিয়াতে ইলেকট্রিকের ফ্যাক্টরিগুলি স্থাপন করতে গিয়ে পরিবারের যা কিছু সঞ্চয় ছিল, সব শেষ হয়ে গিয়েছিল অথচ তা থেকে বিশেষ কিছু টাকা ঘরে এলো না। শেষ অবধি হেরমান আইনস্টাইনকে তাঁর ছেলেকে বলতে হল যে, তাকে অর্থ সাহায্য করতে তাঁর খুব মুস্কিল হচ্ছে এবং যত শীঘ্র তাকে জীবিকা অর্জনের জন্যে কিছু করতে হবে। ইতিমধ্যে অবশ্য অ্যালবার্টের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর প্রধান ঝোঁক রয়েছে গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যাতে। তবে মুস্কিল ছিল, তার এই প্রধান দুটো পড়াশুনা করার বিষয় ও ইচ্ছাকে কী করে একটা পেশার সঙ্গে মেলানো যায়, যাতে রোজগারও হবে। তার বাবা ও কাকা চাইছিল সে ইনজিনিয়ারের পেশা গ্রহণ করুক। তাঁদের প্রস্তাবকে মানার প্রয়োজন আরও বেশি ছিল এইজন্যে যে, জিমনাসিয়ামের ডিপ্লোমা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা প্রায় অসম্ভব। একটা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে ঢোকার ঠিকঠাক হয়ে গেল, কেবলমাত্র বাকি যেটা রইল সেটা হল জার্মান ভাষাতে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান। জার্মানিতে পড়াশুনা করাটা একেবারেই সম্ভব ছিল না। জার্মানির বাইরে সবচেয়ে বিখ্যাত ইনস্টিটিউট ছিল জুরিখের ফেডারাল পলিটেকনিক, সেখানে ঢোকার জন্যে অ্যালবার্ট দরখাস্ত করলেন। ভর্তি হবার জন্যে পরীক্ষায় গণিতে দারুণ ভালো রেজাল্ট হল, কিন্তু বিদেশী ভাষা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যাতে নম্বর হল কম। জিমনাসিয়ামের ডিপ্লোমাটা না-থাকাও ধরা হল এবং তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল না। পলিটেকনিকের ডিরেক্টার কিন্তু আইনস্টাইনের অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান দেখে চমৎকৃত হয়ে তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডের মাধ্যমিক স্কুল শেষ করতে উপদেশ দিলেন এবং পরের বছর আবার দরখাস্ত করতে বললেন। তিনি এরাই নামে ছোট্ট শহরের করপোরেশনের (ক্যান্টনের) স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে সুপারিশ করলেন, যেখানে মাষ্টারমশাইরা এবং পড়াবার পদ্ধতি, দুই-ই বেশ প্রগতিশীল।

মিউনিকের ঘটনাবলী মনে বেশ দগদগে হয়ে থাকায় মাধ্যমিক স্কুলে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা আইনস্টাইনের একেবারেই অপছন্দ ছিল কিন্তু তাহলেও আর কিছু করার ছিল না। এরাই-য়ের স্কুল কিন্তু বেশ ভাল

ব্যাপারই হয়ে দাঁড়াল। মাষ্টারমশাইরা ছাত্রদের বন্ধুর মতো ছিল, পড়ানো হোত খুব আকর্ষণীয় করে এবং পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের ল্যাবোরেটারিতে ছাত্ররা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রসমেত প্রাণীবিদ্যার একটা মিউজিয়াম ছিল এবং হাতে-নাতে উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাস করার জন্যে একটা উদ্যান ছিল। উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা প্রায়ই সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করত। অনেক দেশ-ছাড়া তরুণ বিপ্লবী সুইজারল্যাণ্ডে আস্তানা নিয়েছিল এবং এই ধরনের নানা প্রশ্ন নিয়ে ক্রমাগতই তর্কবিতর্ক চলত।

আইনস্টাইন থাকতেন প্রফেসার ভিনটেলার নামে স্কুলের এক শিক্ষকের বাড়ি। ভিনটেলারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অনেক সময় তিনি কাটাতেন। এরা তাঁর সমবয়সী ছিল এবং সকলে মিলে আশপাশের পাহাড়পর্বতে হাঁটতে যেত। ক্লাসের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গেও তাঁর ভাব হল।

এরাই-তে যে বছরটা কাটল তাতে আইনস্টাইন বুঝলেন যে, পণ্ডিতীপনার রুটিনে বাঁধা না থাকলে এবং প্রগতিশীল তরুণ লোকেরা পড়ালে শিক্ষকতা করাটা বেশ একটা আনন্দজনক পেশা হতে পারে, আর তার সঙ্গে রিসার্চের কাজটা ভাল করেই চলতে পারে।

১৮৯৬ সালে এরাই-য়ের স্কুল শেষ করে আইনস্টাইন জুরিখের পলি-টেকনিকে পরীক্ষা না দিয়েই ভর্তি হতে পারলেন। অক্টোবর ১৮৯৬ থেকে আগস্ট ১৯০০ সাল অবধি তিনি সেখানে পড়াশুনা করলেন এমন একটা বিভাগে, যেখানে পদার্থবিদ্যা ও গণিতে শিক্ষক হওয়ার জন্যে ট্রেনিং দেওয়া হোত।

শিক্ষক তৈরি করার জন্যে এই ট্রেনিং ডিপার্টমেণ্ট কার্যত পদার্থ-গণিত বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্যে একটা বিশেষ বিভাগের (বা ফ্যাকাল্টি) মতন ছিল। গণিত ও পদার্থবিদ্যাতে পাঠক্রম পড়া ছাড়া আইনস্টাইন দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি ও সাহিত্যের(১) বিশেষ কোর্স (পাঠক্রম) পড়তে লাগলেন। তবে

---

১ যে যে বিষয়ে আইনস্টাইন পড়াশুনা শুরু করলেন সেগুলি হল: differential and integral calculus, descriptive geometry, analytical geometry, theory of invariants, theory of determinants, theory of definite integrals, theory of linear equations, geometric theory of numbers, function theory, elliptical functions, differential equations in partial derivatives, variation calculus, analytical mechanics, general

পদার্থবিদ্যা ও গণিতের প্রধান ক্লাস প্রায় তিনি করতেনই না। হাইন্‌রিখ্ ভেবের, যিনি পদার্থবিদ্যার বিষয়ে পাঠক্রম ক্লাস চালাতেন, তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিংয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিক দিকে আইনস্টাইন ইতিমধ্যেই যা জেনেছেন, তার চেয়ে বেশি কিছু যোগ করতে পারেন নি। ম্যাক্‌সওয়েল, কিরচোফ, বোলট্‌স্ম্যান ও হারজে-র বইগুলি নিয়ে আইনস্টাইন সরাসরি উল্লেখ করতেন। এই সময়েই তাঁর প্রাথমিক ঔৎসুক্য, যেটা এতাবৎ পদার্থবিদ্যা ও বিশুদ্ধ গণিতের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, সেটা এবারে পদার্থবিদ্যার কয়েকটি মৌলিক বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করল। তাঁর গণিতের মাস্টার মশাইদের মধ্যে এডলফ হুরভিৎস এবং হেরমান মিনকোস্‌স্কি-র মতন বিশেষ লোক ছিলেন কিন্তু তাঁদের লেকচারও আইনস্টাইনের বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে নি। মিনকোস্‌স্কি পরে আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রমাণের জন্যে গণিতের দিক থেকে যন্ত্রপাতি তৈরি করেন, তিনি কিন্তু তাঁর লেকচারগুলিতে এই তত্ত্বের ভাবী প্রবক্তার টিকিও কখনও দেখেন নি। তত্ত্বটি যখন রূপায়িত হয়েছিল তখন মিনকোস্‌স্কি মন্তব্য করেছিলেন যে, জুরিখ পলিটেকনিকের তাঁর সেই ছাত্রের কাছ থেকে তিনি সেটা মোটেই আশা করেন নি।

মিনকোস্‌স্কি ও অন্যান্য প্রফেসারদের উচ্চ গণিতের বিভিন্ন বিভাগে লেকচারে মারসেল গ্রসমান নিয়মিত হাজির থাকতেন; আর সব কিছুর বেশ যত্ন করে নোট নিতেন। গ্রসমান আইনস্টাইনের ভাল বন্ধু হয়ে পড়লেন এবং বহু বছর পরে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের গাণিতিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে যোগ দেন। গ্রসমানের নোটগুলি নিয়ে আইনস্টাইন পরীক্ষায় পাশ করেন। এই নোট পাওয়ায় ইচ্ছামতো লেকচারগুলিতে তিনি যোগ দিতেন, যেটা আইনস্টাইনের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কারণ ছিল। একমাত্র পরীক্ষা পাশ করার উদ্দেশ্যেই পড়াশুনা করার ব্যাপারটা তাঁকে সবসময়েই পীড়িত করত।

---

mechanics, applications of analytical mechanics, physics, electrical engineering, practical physics, astrophysics, astronomy, theory of scientific thinking, Kantian philosophy, and in the optional subjects: designing, external ballistics, ancient history, geology, Swiss history, economics, statistics, insurance, the works and views of Goethe.

"এই জবরদস্তি", তাঁর আত্মজীবনীমূলক নোটস-এ তিনি লিখেছেন, "(আমার 'পরে) এমন একটা ভীতিজনক প্রভাব বিস্তার করত যে, শেষ পরীক্ষা পাশ করার পরে পুরো এক বছর কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে আমার পক্ষে আলোচনা করা প্রীতিকর ছিল না। ন্যায্যভাবে বলতে হলে আমাকে এটাও যোগ করতে হয় যে, অন্য অনেক জায়গার চাইতে সুইজারল্যাণ্ডে আমাদের ঐ ধরনের জবরদস্তি অনেক কম সহ্য করতে হয়েছে। মোটামুটিভাবে কেবলমাত্র দু' ধরনের পরীক্ষা ছিল, এটা ছাড়া আর যা খুশি তা করার পক্ষে আরও সুবিধা ছিল, যেমন আমার ক্ষেত্রে, কারণ আমার এমন একজন বন্ধু ছিল যে লেকচারগুলিতে নিয়মিত যোগ দিত এবং তার পুরো বিষয়টা নিয়ে বিবেকী বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করত। এতে পরীক্ষার কয়েক মাস আগে পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামতো পড়াশুনা করার সুবিধা ছিল, যে সুবিধাটা আমি বহুলাংশে উপভোগ করতাম এবং তার বিনিময়ে বিবেকের দংশনকে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ জিনিস বলে মেনে নিতাম। শিক্ষা দেবার আধুনিক পদ্ধতি যে এখনও অনুসন্ধিৎসু মনের পবিত্র মনোভাবকে একেবারে পিষে ফেলে নি, সেটা প্রায় একটা আশ্চর্য ঘটনা: কারণ এই ছোট্ট নমনীয় চারাগাছটিকে মাঝে মাঝে ধাক্কা দেওয়া ছাড়া তার মুক্তির দরকার আছে; এটা ছাড়া এ ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে যাবে।"(১)

সুইজারল্যাণ্ডের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় শহরের মতোই বহু দেশের ছাত্রদের কাছে জুরিখ ছিল একটা নিরাপদ আশ্রয়ের মতো; বিপ্লবী দেশত্যাগী ও অন্যান্য তরুণ যুবকরা, যারা জাতীয় অথবা সামাজিক পীড়ন থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, জুরিখে এসে আশ্রয় নিত। সব ছাত্রই অবশ্য বিপ্লবী ছিল না, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই ছিল গণতন্ত্রকামী। বেশ বড় সামাজিক পটভূমিতে রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সংযোগ হোত। এমন কি যাদের একমাত্র বিজ্ঞানের উপরেই ঝোঁক ছিল, তারাও এর দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারত না।

দেশছাড়া অনেক ছাত্রদের সঙ্গে আইনস্টাইনের বন্ধুত্ব হয়। তার মধ্যে ছিল মিলেভা মারিশ্, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি থেকে সারবিয়া-ভাষী মেয়ে। গভীরভাবে মনোযোগী, স্বল্পভাষী এই মেয়েটি খুব যে চালাক-চতুর বা দেখতে দারুণ ভালো ছিল তা নয়, কিন্তু বড় বড় পদার্থবিদদের বইগুলি পড়ার

১ **Philosopher-Scientist**, ১৭ পৃঃ।

ব্যাপারে তার ও আইনস্টাইনের ঝোঁক ছিল একই রকম। আইনস্টাইনের সবসময়েই এমন একজন বন্ধু ও সহযোগীর দরকার ছিল যার কাছে তাঁর ধারণাগুলি বলা যায়। মিলেভা শুনত বটে কিন্তু খুব সাড়া দিত না, তবে তাতেই কাজ চলে যেত। জুরিখে এমন কেউ ছিল না যে, বুদ্ধির দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ, (বস্তুত সব দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ এরকম বন্ধু তাঁর কখনও ছিল না) এবং এমন কোনো মেয়ের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয় নি যে তাঁকে তার নিজের পড়াশুনার ক্ষমতার সাহায্য ছাড়া একমাত্র সৌন্দর্য দিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করতে পেরেছে।

আইনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিল মার্সেল গ্রসমান, লুই কোলোরস এবং জেকব এহ্‌রাট, সকলেই মিলেভা-র মতো পলিটেকনিকে ১৮৯৬সালের শিক্ষা-বর্ষের ছাত্র ছিল। গ্রসমান তার বাবা-মার সঙ্গে থালভিল গ্রামে জুরিখ লেকের ধারে বাস করত। জেকব এহ্‌রাট-এর সঙ্গে আইনস্টাইন সাধারণত লেকচার-গুলিতে বসতেন, সে থাকত তার মায়ের সঙ্গে, তার মা এলবার্টকে খুব ভালো-বাসতেন। তাঁর প্রায়ই মনে পড়ত সেই দিনগুলির কথা যখন আইনস্টাইনের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগাতে তাঁদের বাড়ি এসে হাজির হয়েছিলেন। তাঁর গলার চার-ধারে যে স্কার্ফটা জড়িয়েছিলেন, সেটা যে-ঘরে তিনি ভাড়া থাকতেন তারই টেবিল ঢাকা। প্রসঙ্গত আইনস্টাইনের গৃহকর্ত্রী জামাকাপড় ইস্ত্রি করে দিন গুজরান করত এবং কাজ করার সময় গান বা বাজনা শুনতে ভালবাসত। তাকে সন্তুষ্ট করতে আইনস্টাইন অনেক সময় বেহালা বাজাতেন, যার জন্যে তাঁর লেকচারে যাওয়া হোত না (এবং তার চেয়েও বড়ো কথা) মেট্রোপোল কাফেতে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা হোত না।

তাঁর বাবার উলম শহর থেকে আসা বন্ধু গুস্তাফ মাইয়ারের পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করতে যেতেন। তাঁদের বিবাহের স্বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আইন-স্টাইন মাইয়ারকে লিখেছিলেন:

"উলম শহরে আপনারা আমার বাবা-মার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এমন একটা সময়ে যখন সারস তার অফুরন্ত ভাণ্ডারের আড়ষ্টতা থেকে সবে আমার মুক্তি দিচ্ছিল। ১৮৯৫ সালে আমি যখন জুরিখে আসি খানিকটা পরীক্ষা বাতিল করে, আপনি তখন উদার হস্তে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। আমার সারা ছাত্রজীবনে আপনাদের বাড়ির দ্বার আমার জন্যে উন্মুক্ত ছিল, যদিও আমি উয়েটলিবার্গ থেকে ময়লা জুতো পরেই আপনার কাছে আসতাম।"

কখনও কখনও অ্যালবার্ট তার এক দূরের আত্মীয় অ্যালবার্ট কার-এর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন ; সে জুরিখে জেনায়ার কোকস-এর প্রতিনিধি ছিল। তারা পারিবারিক জলসার ব্যবস্থা করত যাতে আইনস্টাইন শ্রীমতী কারের সঙ্গে বাজাতো, তাঁর গলা ছিল ভাল।

পাভিয়া বা মিলানে বাবা-মার সঙ্গে আইনস্টাইন ছুটি কাটাতেন। বেশি টাকা তিনি পেতেন না। হেরমান আইনস্টাইনের ব্যবসার অবস্থা আগেরই মতো খারাপ চলছিল এবং অ্যালবার্টের একমাত্র আয় ছিল মাসিক ১০০ ফ্র্যাংক, যেটা তাঁর জেনোয়ার বড়লোক আত্মীয়রা দিতেন। এর মধ্যে কুড়ি ফ্র্যাংক তিনি তুলে রেখে দিতেন সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে প্রয়োজনীয় ফি-এর জন্যে।

১৯০০ সালের শরৎকালে রাষ্ট্রের পরীক্ষা পাশ করে আইনস্টাইন তাঁর ডিপ্লোমা পান। মিলেভা ছাড়া তাঁর বন্ধুরাও স্নাতক হলেন ; মিলেভা আরও এক বছর পড়াশুনা চালিয়ে যান যদিও ডিপ্লোমা পাবার আশা তাঁর ছিল না। মেয়েদের একমাত্র স্নাতক হবার সার্টিফিকেট দেওয়া হত।

আগেকার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও, একজন মেধাবী তরুণের ভাল নম্বর পাওয়ার খ্যাতি সত্ত্বেও (৬ পয়েন্ট স্কেলে তাঁর নম্বর ছিল : তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে ৫ ; প্রায়োগিক পদার্থবিজ্ঞানে ৫ ; ফাংশনের তত্ত্বে ৫.৫ ; জ্যোতির্বিদ্যায় ৫ ; স্নাতক হবার থিসিসে ৪.৫ ; মোট নম্বর ৪.৯১) আইন-স্টাইনকে পলিটেকনিকে নিযুক্ত করা হল না। তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান বন্ধুরা পদ পেয়ে গেল, গ্রসমান রইল ফিডলার-এর অধীনে, এহ্রাট রুদিও-র অধীনে এবং কোলোরস হুরভিৎস-এর অধীনে। তাত্ত্বিক বা পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার কাজ করার পথ পলিটেকনিকে আইনস্টাইনের কাছে বন্ধ হয়ে গেল। তিনি কখনও ভেবারের লেকচারে উপস্থিত ছিলেন না, কারণ প্রফেসারের যা কিছু বলার ছিল তা তিনি ইতিমধ্যেই জানতেন। আর পারনেটে-র ল্যাবেরোটারিতে যে-পরীক্ষা তাঁকে করতে বলা হয়েছিল, সেটা তিনি সরিয়ে রেখেছিলেন এবং যেভাবে তিনি ভালো বুঝতেন সেইভাবেই করেছিলেন। তাছাড়া একবার তিনি ভেবারকে 'হের প্রফেসার' বলে সম্বোধন না করে 'হের ভেবার' বলেছিলেন ; ভদ্রতার প্রচণ্ড ত্রুটি হয়েছিল এতে।

আইনস্টাইনকে বাধ্য হয়ে পলিটেকনিক-এর বাইরে চাকরী খুঁজতে

হয়। জুরিখ ফেডারাল মানমন্দিরের জন্যে হিসাবপত্র করে তিনি কিছু রোজগার করেছিলেন। বাকী সময়টা জুরিখের পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন স্থায়ী কোনো চাকরীর সন্ধানে। সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব পেলেই এটা পাওয়ার সুরাহা হবে বলে তাঁর ভরসা ছিল। ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর সব কিছু সঞ্চয় দিয়ে এবং তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর পিতামহের চরিত্র কিরকমের এবং আরও অনেক কিছু যার মধ্যে তাঁর মদ্যপানের ঝোঁক আছে কি না—এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার পরে তাঁকে নাগরিকত্ব প্রদান করে কাগজপত্র দেওয়া হল। সদ্য নাগরিকত্ব-পাওয়া সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিককে সমরবিভাগে বাধ্যতামূলকভাবে যে খানিকটা সময় কাজ করার কথা তা থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হল যখন দেখা গেল যে, তাঁর চেটাল পা ও স্ফীত ধমনী রয়েছে।

কাজের খোঁজ চলতেই থাকল। মে মাসে ভিন্টারথুর শহরে একটা টেকনিক্যাল স্কুলে অস্থায়ী শিক্ষকের চাকরী পেলেন। মিলানে তিনি গিয়েছিলেন চাকরীর সন্ধানে, সেখান থেকে জুরিখের এক প্রফেসারকে লিখেছিলেন: "১৫-ই মে থেকে ১৫-ই জুলাই অবধি ভিন্টারথুরের টেকনিক্যাল স্কুলে আমাকে অঙ্ক শেখাবার জন্যে একটা পদ দেওয়া হয়েছে কারণ সেখানকার নিয়মিত প্রফেসারকে একটা সামরিক কাজের জন্যে চলে যেতে হয়েছে। এইমাত্র খবর পেলাম যে, এটা ঠিকঠাক হয়ে গেছে এবং আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে। কোন্ দয়ালু ব্যক্তি যে আমার সুপারিশ করেছেন সে সম্পর্কে আমার কোনোই ধারণা নেই: আমার প্রাক্তন প্রফেসারদের সুনজরে আমি কোনো সময়েই ছিলাম না, অথচ এই পদটা না চাইতেই আমি পেয়ে গেলাম। সুইস্ পেটেন্ট অফিসে পাকা চাকরী পাবার আশা আছে…এর সঙ্গে বলা উচিত যে, আমি একটা সদা-প্রফুল্ল ছোট্ট পাখীর মতন যার মনের স্ফূর্তি একমাত্র পেটের ব্যথাতে বা ঐ রকমের কিছুতে নষ্ট হয়ে যায়…কয়েকদিনের মধ্যেই স্প্লুজেন আমি পায়ে হেঁটে পার হব এবং এইভাবে কর্তব্যের সঙ্গে কিছুটা আনন্দ মিশে যাবে।"(১)

সহজেই আন্দাজ করা যায় যে, 'সদা-প্রফুল্ল ছোট্ট পাখীটির'-র জীবিকার সংস্থান নেই এবং পাকা চাকরী নেই অথচ্ মাত্র দু'মাসের চাকরীর পদ পাওয়াতেই একেবারে খুশিতে ডগমগ হয়ে বলছে যে, সপ্লুজেন পাহাড়

১ C. Seelig. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৮০ পৃঃ।

পেরিয়ে তার কর্মক্ষেত্রে যাবে। আইনস্টাইন সেই ধরনের লোক যারা সহজে কোনো কিছুতে ঘাবড়ে যায় না এবং সফলতার কিছুটা আভাস পেলেই যারা আনন্দ করে। নিশ্চয়ই তিনি এতটা ঢিলে-ঢালা ও হাল্কা চরিত্রের মানুষ ছিলেন না যে, তাঁর অন্তরে কোনো নাটকীয় সংঘর্ষ ছিল না। বরংচ, রোজকার জীবনের ঝঞ্ঝাট ও উৎকণ্ঠা না থাকাতে তাঁর অনেকের চেয়ে বেশি 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' ঝড়-ঝাপটার অবস্থার উদ্ভব হোত।

১৯০১ সালের শরৎকালে আইনস্টাইন আবার কাজ ছাড়া হয়ে গেলেন। রাইন নদীর ধারে সাফ্‌হাউসেন, যেখানে প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত আছে এবং টুরিষ্টরা প্রায়ই গিয়ে থাকে, সেখানে অল্পদিনের জন্যে কাজ পেলেন। সেখানে কন্‌রাড হ্যাবিচ্ বলে পলিটেকনিকের তাঁর এক সহপাঠী ছিল। হ্যাবিচের সুপারিশে আইনস্টাইনের ছাত্রদের বোর্ডিং স্কুলে একটা চাকরী জুটল। স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়ে দেবার জন্যে ছাত্রদের তৈরি করার দায়িত্ব ছিল তাঁর। কাজটা আইনস্টাইনের ভালোই লাগত এবং তিনিও বেশ আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে পড়াতেন; পাঠক্রমের রুটিন মাফিক যে একঘেয়ে পড়ানো, যেটা তাঁর স্কুলজীবনকে পীড়িত করেছিল, সেটা করতেন না। কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর ধারণার সঙ্গে তাঁর নিয়োগকর্তা জেকব নয়েসের খটমটি লাগত। আইনস্টাইন দারুণ স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং নয়েস তাঁকে শীঘ্রই বরখাস্ত করল।

সাফ্‌হাউসেন শহরে আইনস্টাইন ও হ্যাবিচ্ একসঙ্গে থাকতেন বহুক্ষণ, বহু কথাবার্তা তাঁদের মধ্যে হোত এবং তাঁরা দুজনেই বেহালা বাজাতেন। তাঁদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যেটা পরেও চলেছিল এবং বার্ন শহরে আরও জোরালো হয়েছিল।

আবার আইনস্টাইনের কাজ চলে গেল। শিক্ষকতার কাজ করা তাঁর পক্ষে যেন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কেন যে এটা হচ্ছে সেটা তিনি বুঝতে পারলেন না; এটা কি দেশে সাধারণভাবে বেকারী থাকার জন্যে অথবা এর কারণ কি তিনি বিদেশী হয়ে সুইস্ নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন বলে অথবা তিনি ইহুদী অথবা তিনি ভাল পড়াতেন না বলেই।

১৯০২ সালের বসন্তকালে আবার তাঁকে মিলানে দেখা গেল। সেখান থেকে যেখানে যেখানে পদ খালি হয়েছে, সেখানে তিনি চিঠি লিখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মার্সেল গ্রসমানের চেষ্টায় বার্নের পেটেণ্ট অফিসে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বার্ন

পেটেন্টের বিবৃতিগুলিকে রূপায়ণ করার কাজটা আশীর্বাদের মতন দাঁড়াল। তাতে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ আমি পেলাম। তাছাড়া, আমার মতো মানুষের পক্ষে কোনো প্রায়োগিক কাজকর্মের পেশা একটা মুক্তিরই ব্যাপার; লেখাপড়া-ভিত্তিক কর্মজীবন একজন যুবককে বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের কাজে বাধ্য করে এবং একমাত্র শক্তিশালী চরিত্রের মানুষরাই হাল্কা উপরি-উপরি বিশ্লেষণের লোভ সামলাতে পারে।

আইনস্টাইন

পেটেন্ট অফিসে আইনস্টাইনের কাজটা রিসার্চের জন্যে কি এক ধরনের আশীর্বাদ হিসেবে উপস্থিত হল? মৃত্যুর এক মাস আগে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনাতে তিনি শেষ যে-উক্তি করেছেন তা পড়লে অবশ্য এই রকমই মনে হবার কথা। ফেলে-আসা দিনগুলির পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাঁর ধারণাগুলির যুক্তিসম্মত, মানসিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমির পরে সেগুলি যে ভাবে বিকশিত হয়েছে, সেটার বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তখনকার অবস্থাতে কেবলমাত্র জীবনে শেষ অবধি প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ এবং তাতে নিশ্চিন্ত হওয়াটাই শেষ কথা ছিল না। তাঁর সারা জীবনের সংক্ষিপ্তসার রচনা করতে গিয়ে আইনস্টাইন তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের ভিত্তিভূমির উপর জোর দিয়েছেন।

বার্নে আইনস্টাইনের জীবনকে উলসথর্প-এ আইজ্যাক নিউটনের ১৬৬৫

থেকে ১৬৬৭ পর্যন্ত দু'বছর প্লেগের সময়কালের সঙ্গে তুলনা করা যায়; এই সময়ে তাঁকে কেমব্রিজ ছেড়ে যেতে হয়।

এই উপসংহারেই নিউটন তাঁর ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস, বিশ্বব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ এবং আলোককে বর্ণালী বিন্যাসের রশ্মির মধ্যে বিভাজন করেন। বার্নেই আইনস্টাইন ব্রাউনীয় আন্দোলনের আপেক্ষিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটান। বার্নে বৈজ্ঞানিক রিসার্চের জন্যে যে সুবিধাজনক অবস্থা ছিল তার প্রমাণ এর চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে?

তবে এটা বলতে হয় যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল্যের এই ধরনের পরিমাপ সাধারণত বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় না। বস্তুত আজকের দিনে বেশির ভাগ পদার্থগত আবিষ্কার করে পেশাদার গবেষকরা বৈজ্ঞানিক পেশাকে সাধারণভাবে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান, প্রথমে কলেজে, তারপর বিজ্ঞানের স্কুলগুলিতে এবং স্কুলের কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করেন।

তাহলে বোধ হয় বার্নে কাজ করার সুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্যে আপেক্ষিক তত্ত্বের বিকাশ সম্ভব হয়েছে বলে আইনস্টাইন যে-তারিফ করেছেন, সেটা একমাত্র তাঁর পক্ষেই প্রযোজ্য এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খায় না। এটা সম্ভব ছিল যদি আইনস্টাইনের জীবনটা অত বেশি করে বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত না হোত, যদিও এটা একটা বিশেষ উদাহরণের বিষয় এবং খুব সহজে এর তুলনা মেলে না।

কার্যত, সারা জীবন ধরে আইনস্টাইন বার্নের ঐতিহ্য বহন করে গিয়েছেন। কী ফলাফল হবে সেটার সম্ভাব্য মূল্যায়ন না করেই তিনি সমস্যাগুলি হাতে নিয়েছেন। এই রকম একজন পেশাদার গবেষণা-কর্মীর পক্ষে এটা করা সম্ভব ছিল, যিনি প্রাগে, জুরিখে বার্লিনে ও প্রিন্সটনে এবং বিশেষ করে পরে আপেক্ষিক তত্ত্বের রূপায়ণ করেছেন। পথের শুরুতে বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত নয় এরকম একটা প্রায়োগিক কাজ করতে গিয়ে হাতের সামনে যে সমস্যা ছিল তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করার সুবিধা হল।

আপেক্ষিক তত্ত্বকে পরিষ্কারভাবে খুঁটিয়ে প্রাথমিকভাবে সূত্রায়ন করা এবং তার সমস্যাগুলির আরও সাধারণীকরণ করার জন্যে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে এর প্রভাব ফেলার জন্যে প্রয়োজন ছিল মানবিক

দুর্বলতাকে অতিক্রম করা—যার মধ্যে 'উপরি উপরি বিশ্লেষণের প্রলোভন'-কেও ত্যাগ করতে হোত।

দেশ ও কাল সম্পর্কে মৌলিক ধারণাগুলির উদ্ভব হয়েছে আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যেকার সম্পর্কের পুনর্বিচার করে, যে পুনর্বিচারের জন্যে এগুলির বাইরের কোনো কিছুর প্রয়োজন ছিল না। আইনস্টাইন হয়তো আপেক্ষিক তত্ত্বে অন্য অবস্থাতে পৌঁছতেন কিন্তু এই আবিষ্কারের জন্যে সর্বাপেক্ষা অনুকূল ছিল গতানুগতিক পুঁথিগত পাঠক্রমের বাঁধাবাঁধি থেকে মুক্তি। বার্ন শহরের মুক্ত জীবনের ছবি, শিক্ষায়তনের কর্তৃত্বপরায়ণতার শেকল থেকে ছাড়া-পাওয়া জীবন—এই সবের জন্যে আইনস্টাইন পেটেন্ট অফিসে কাজ এত পছন্দ করতেন।

সেখানে তাঁর কাজ পদার্থবিদ্যাতে তাঁর উৎসাহকে আরও উদ্দীপিত করতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছিল। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার মর্মবস্তু ও তার পদ্ধতিকে একেবারে বদলে দিতে পারে এই রকমের নতুন পদার্থগত ধারণায় পৌঁছনো সহজ হোত না যদি না মোটামুটি একই রকমের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলি থেকে তুলনীয়ভাবে অনুরূপ সূত্রগুলি পাওয়া যেত। দুঃখের বিষয়, আইনস্টাইনের একেবারে গোড়ার দিকের নোটগুলি, যা থেকে তাঁর চিন্তাধারা কি ভাবে বিবর্তিত এবং ধারণাগুলি কি ভাবে রূপায়িত হয়ে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের রূপ নিয়েছে তার হদিশ পাওয়া যেত, পাওয়া যায় না। যেটুকু আমরা জানি, তাঁর নিজের কথাতে (নিজের সম্পর্কে শেষ বক্তব্যে ও অন্যত্র যা উদ্ধৃত হয়েছে), তাতে পেটেন্ট অফিসের কাজ করতে গিয়ে তিনি ইনজিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যে সকল যুক্তিতর্কের সম্মুখীন হয়েছিলেন—প্রায়শই নতুন ধরনের উদ্ভাবনী নীতিগুলি ও প্রযুক্তিগতভাবে তাদের সমাধান কি করে হবে, পুরানো ধারণাগুলির রূপান্তরণ, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার প্যাটার্ন ও নকসার স্থান বিনিময়করণ, নতুন সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যে পুরানো পদ্ধতিগুলির সাহসিক প্রয়োগ—এ সবগুলি তাঁর খুবই কাজে লেগেছিল।

ইনজিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে আইনস্টাইনের ঔৎসুক্য যে কত বেশি ছিল তা বোঝা যায় বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাঁর কাজ দেখে। কন্‌রাড হ্যাবিচের এক ছোট ভাই ছিল, তার নাম পল, সে ঐ সময়ে বার্নে একটা জিমনাসিয়ামে পড়াশুনা করত। ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিংয়ে তার ঝোঁক ছিল এবং স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে সে সাফ্‌হাউসেনে গিয়ে ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতি মাপবার

ফ্যাক্টরি তৈরি করে। ১৯০৮ সালে পল হ্যাবিচের সঙ্গে সহযোগিতায় আইনস্টাইন 0·0005 ভোল্ট পরিমাণের অতি অল্প বিদ্যুৎ-পরিবাহী শক্তি মাপবার যন্ত্র তৈরি করেন। ১৯১০ সালে তাঁরা 'আইনস্টাইন-হ্যাবিচ'-এর নাম দিয়ে এমন যন্ত্র তৈরি করেন যাতে সুপ্ত শক্তিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায় (potential multiplier)। পরের বছরগুলিতেও আইনস্টাইন অনেক ধরনের যন্ত্রপাতির নকসা তৈরি করেন।

বার্নে থাকার প্রথম দিকে মাস কয়েক আইনস্টাইন প্রাইভেট টিউশনি করতে মনস্থ করেন। স্থানীয় সংবাদপত্রে তিনি বিজ্ঞাপন দেন যে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, জুরিখ পলিটেকনিকের পি-এইচ-ডি প্রতি ঘণ্টায় তিন ফ্রাংক হারে পদার্থবিজ্ঞানের জন্যে ছাত্র পড়াবেন। এই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে যে কয়জন ছাত্র এসেছিল তার মধ্যে ছিল রুমানিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মরিস সোলোভিন, তার ঝোঁক ছিল পদার্থ বিজ্ঞানে। দুই যুবকের মধ্যে শীগগিরই বেশ ভালো সম্পর্কে গড়ে ওঠে এবং বেশ একটা নিবিড় ও বরাবরের মতো বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে তাঁর কাছে লেখা আইনস্টাইনের চিঠিপত্র ও স্মৃতিচারণ নিয়ে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন।(১)

বিশ্ববিদ্যালয়ে সোলোভিন পড়তেন দর্শন, সাহিত্য, গ্রীক, গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান ও ভূবিদ্যা এবং তিনি মেডিকেল বিভাগেও লেকচারে যোগ দিতেন। প্রকৃতির সামগ্রিক চিত্র গড়ে তোলার জন্যে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যাতে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল।

আধো-অন্ধকারে ঢাকা বারান্দা পার হয়ে আইনস্টাইনের ঘরে যেতে গিয়ে প্রথমেই যেটা সোলোভিন-এর চোখে লাগে, সেটা হল যে মানুষটি তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল তাঁর বড়ো বড়ো জ্বলজ্বলে চোখ দু'টি। প্রথম সাক্ষাৎ-কারেই তাদের মতামতের ঐক্য ও ঔৎসুক্য প্রকাশিত হল। শীগগিরই মাস্টার-মশাই ও ছাত্রের পড়ার কাজটা দাঁড়িয়ে গেল তাদের উভয়ের পারস্পরিক আগ্রহের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনাতে। কিছু পরে কনরাড হ্যাবিচ তাদের সঙ্গে যোগ দেন, যিনি বার্ন শহরে গণিত সম্পর্কে পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলেন।

১ **A. Einstein, Lettres a Maurice Solovine, Paris. 1956** (পরে সোলোভিন বলে উল্লিখিত)।

এই ত্রয়ী কাজের ও পড়াশুনার সময়ের পরে একত্র হয়ে দীর্ঘ পথ হাঁটতে বেরোতেন অথবা তিনজনের একজনের ফ্ল্যাটে গিয়ে আলাপ আলোচনা ও বই পড়তেন। তাঁরা স্পিনোজা ও হিউমের দর্শনের বইগুলি, মাখ, এভেনারিয়াস ও পিয়ারসনের নতুন বইগুলি, এমপিয়ার-এর বিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে পুরানো প্রবন্ধগুলি, হেলমহোলৎস-এর পেপারগুলি, রিম্যানের জ্যামিতির ভিত্তি সম্পর্কে বিখ্যাত লেকচার, দেদেকিণ্ড ও ক্লিপোর্ডের গণিত সংক্রান্ত লেখাগুলি, পোঁয়েকার-এর বিজ্ঞান সম্পর্কে থিসিস এবং অন্যান্য বই ও লেখাগুলি পড়তেন। তাছাড়া তাঁরা একজোটে পড়তেন সোফোক্লিস এর নাটক আন্তি-গোনে, রেসিনের 'এন্‌ড্রোমাক', ডিকেনসের 'খ্রীস্টমাস ক্যারলস', সারভান্‌-তিস-এর ডন কুইকসট্' এবং অন্যান্য বিশ্বসাহিত্য।

যদিও আইনস্টাইন ও তাঁর বন্ধুরা এইসব বইয়ের অনেকগুলিই আগে পড়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করে আবার আনন্দ পেলেন। কখনও কখনও একটি ছত্র নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে যেত, যেটা গভীর রাত্রি অবধি অথবা কয়েকদিন ধরে চলত। বার্নে মিলেভা পৌঁছবার আগে এই তিনজন বন্ধু একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। রাত্রের সাধারণ খাবার ছিল সসেজ, চীজ, ফল এবং মধু দিয়ে চা। সামান্য দু' একটি ছেলেকে আইনস্টাইন পড়াতেন, তারা অল্পই টাকা দিত এবং তিনি ঠাট্টা করে বলতেন যে, পথে পথে বেহালা বাজিয়ে (ভিক্ষা করে) এর চেয়ে তিনি বেশি রোজগার করতে পারেন। এসব সত্ত্বেও তাঁরা সকলে বেশ আনন্দেই ছিলেন। ঐ বছরগুলির কথা স্মরণ করে এপিকিউরাস-কে উল্লেখ করে সোলোভিন বলেছেন: "হাসিখুশি ভরা দারিদ্রের চেয়ে আর কী ভালো হতে পারে।"

এই ত্রয়ী নিজেদের একবাড়ির তিন ছেলের মতো ভায়ে ভায়ে মিলে মিশে থাকাকে নাম দিয়েছিলেন "অলিম্পিয়ান আকাদেমি"। তরুণ বয়সের এই দিনগুলি আইনস্টাইনের মনে চিরকালের মতো একটা ছাপ রেখেছিল। ১৯৫৩ সালে তিনি সোলোভিনকে লিখেছেন:

"অমর অলিম্পিয়ান আকাদেমি,

তোমার স্বল্পস্থায়ী জীবনে যুক্তি ও কোনো কিছুকে পরিষ্কার করে বুঝতে তুমি বালকোচিত আনন্দ পেতে। তোমার সভ্যরা তোমার বড়াটে জাঁকালো প্রাচীন ভগ্নীদের নিয়ে মজা করার জন্যেই তোমার প্রতিষ্ঠা করেছিল।

আমরা যে কতো ঠিক কাজ করেছি সেটা বহু বছরের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

"তোমার তিনজন সভ্যই আগেরই মতো পিঠোপিঠি করে রয়েছে। তারা কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে কিন্তু তোমার খাঁটি প্রাণবন্ত আলো তাদের নির্জনতাকে আলোকিত করে, কারণ বেশি বেড়ে-ওঠা লেটুস্ পাতা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি তোমার নাম তাদের সঙ্গে মরচে পড়ে পুরানো হয়ে যায় নি।

"তোমাকেই আমাদের একমাত্র আনুগত্য ও ভক্তি জানাই আমাদের শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত!

"উপস্থিত তোমার একমাত্র সভ্য, এ. ই.(১), প্রিন্সটন, ৩রা এপ্রিল, ১৯৫৩।"(২)

এই 'অলিম্পিয়ান আকাদেমি'-র সঙ্গে তার 'ঝঞ্ঝাটে জঁাকালো প্রাচীন ভগ্নীদের' তুলনাতে একটা বিষাদপূর্ণ সারাংশীকরণ আছে। পণ্ডিতদের সঙ্গে বহুবছ'রর মেলামেশার পরে আইনস্টাইনের চিন্তাগুলি বার্নের সময়ের নিশ্চিত ভাবনাহীন, তখনকার চক্রগুলির জঁাকালো মর্যাদার প্রতি যুবজনোচিত অজ্ঞতার এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা, "যুক্তি ও কোনো কিছুকে পরিষ্কার করে বোঝার পেছনে বালকোচিত আনন্দ" পাওয়ার, দিনগুলির কথা মনে পড়েছে।

পরে যেমন আমরা দেখব, বার্নের আবহমণ্ডলের আশাপূর্ণ যুক্তিবাদিতার সোজা প্রভাব পড়েছিল বৈজ্ঞানিক আদর্শের প্রতি—যা থেকে আইনস্টাইনকে সোজা তাঁর আবিষ্কারের দিকে নিয়ে গেছে।

তিনজন 'অলিম্পিয়ান'(৩)-এর সঙ্গে পরে যোগ দিয়েছিলেন মাইকেল অ্যানজেলো বেসো নামে একজন ইতালিয়ান ইন্‌জিনিয়ার, যাঁর স্ত্রী আন্না এরাই স্কুলের প্রফেসার ভিনটেলারের মেয়ে; আন্নার ভাই আইনস্টাইনের বোন মাজা-কে পরে বিবাহ করেন। বেসো যখন বার্নের পেটেন্ট অফিসে

১ অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নামের আদ্যক্ষর দুটি—অনুবাদক।

২ Solovine, ১২০ পৃঃ।

৩ অলিমপাস্ পর্বতের শিখরবাসী বলতে গ্রীকরা বোঝাত বিরাট মানুষদের। এখানে বিরাট মানুষকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনুবাদক

১৯০৪ সালে কাজ করতে আসেন, তখন আইনস্টাইনই তাঁকে চাকরি পেতে সাহায্য করেন। কাজের শেষে তঁারা সাধারণত হেঁটে বাড়ি ফিরতেন।

দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, গণিত ও পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে বেসোর জ্ঞান ছিল বিরাট পরিধি নিয়ে, তঁাকে সঙ্গী হিসেবে আইনস্টাইনের বড় ভাল লাগত এবং তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ের ধারণাগুলি নিয়ে আইনস্টাইন আলোচনা করতেন। বহু বছর পরে আইনস্টাইন বলেছেন, "সারা ইউরোপে এঁর (বেসোর) চেয়ে ভালো শ্রোতা তিনি পেতে পারতেন না।" নতুন ধারণা-গুলি গ্রহণ করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল বেসোর এবং তাদের তিনি গুছিয়ে তুলতেন বেশ ভালোভাবে। তাঁর নিজের ভাষায়, "ঈগলপাখির মতো আইনস্টাইন আমার মতো চড়ুই পাখিকে বহু উঁচুতে নিয়ে গেছেন। অত উঁচুতে ওঠার পরে চড়ুই পাখিটা আরও একটু উঁচুতে ওঠার জন্যে ডানা ঝাপ্‌টাতে পারত।"(১)

বেসোর মন্তব্যের মধ্যে প্রথম আপেক্ষিক তত্ত্বের ধারণার মৌখিক ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি তক্ষুনি বুঝতে পারলেন যে, বিজ্ঞানের নতুন যুগের প্রবর্তন ছাড়া এটা আর কিছু নয়। এই সঙ্গে তিনি কয়েকটি নতুন বিষয়ের দিকে আইনস্টাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে তাঁরা বহু সময় ধরে আলোচনা করলেন। "গতিশীল বস্তু-দেহের বৈদ্যুতিক গতিময়তা" (On the electrodynamics of moving bodies) সম্পর্কে আইনস্টাইনের শেষ পেপারে (প্রবন্ধ) এই আলোচনার মূল্য যে কতখানি তার স্বীকৃতি আছে:

"শেষকালে আমি বলতে চাই যে আমার বন্ধু ও সহকর্মী বেসো এই সমস্ত প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনাতে আমার অনুগত সহকারী ছিল এবং কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শের জন্যে আমি তার কাছে ঋণী।"

আইনস্টাইনের এক বন্ধু ছিলেন লুসিয়েন সাভঁা, যিনি সোলোভিনের মতোই পড়ানোর বিজ্ঞাপন দেখে তাঁর ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। সুইজারল্যাণ্ডের ফরাসি-ভাষী অঞ্চলের বাসিন্দা (অর্থাৎ, জেনিভা অঞ্চলের—অনুবাদক), বার্নের ডাক ও তার বিভাগে তিনি কাজ করতেন, তাঁর অফিস ছিল পেটেন্ট অফিসেরই একতলাতে (সাভঁা আইনস্টাইনকে পোস্ট অফিসে চাকরী দেবার চেষ্টা করেছিলেন)। সাভঁার পদার্থবিদ্যাতে ঝোঁক ছিল, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে

৩ C. Seelig, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১২০ পৃঃ।

লেকচারে যোগ দিতেন এবং আইনস্টাইনের কাছে পড়তেন। তিনি পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে সকল নোট নিয়েছিলেন এবং আইনস্টাইনের একটা পুরানো ছবি রয়েছে যার পেছনে লেখা আছে: "১'৭৬ মিটার লম্বা, চওড়া-কাঁধ, একটু ঝুঁকে পড়া হচ্ছে আইনস্টাইন। তাঁর ছোট মাথার খুলিটা আশ্চর্য রকমের চওড়া। তাঁর গায়ের চামড়া কৃষ্ণবর্ণ। বড়ো মুখের উপরে ছিল একটি সরু গোঁফ, খাড়া নাক। তাঁর ব্রাউন চোখে গভীর সহানুভূতিশীল দীপ্তি ছিল। চেলো (বেহালার মতো বাজনা—অনুবাদক) যন্ত্রের মতো তাঁর গলার আওয়াজ ছিল মধুর ও কম্পনশীল। একটু বিদেশী উচ্চারণে তিনি চমৎকার ফরাসি বলতেন।(১)

বার্নে মিলেভা পৌঁছবার পরে আইনস্টাইন পারিবারিক জীবনযাত্রা শুরু করলেন। বন্ধুরা অবশ্য একসঙ্গে মিলিত হয়ে মতামত প্রকাশ করত। মিলেভা চুপচাপ থাকলেও মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

সোলোভিন বর্ণনা করেছেন কিভাবে যত ইচ্ছে তর্ক ও ধূমপান করে বন্ধুরা আইনস্টাইনের বেহালা শুনত অথবা হেঁটে বেড়াতে যেত, সেখানেও চলত তাঁদের আলোচনা। এক মধ্যরাত্রে তাঁরা বার্ন শহরের দক্ষিণপ্রান্তে মাউণ্ট গারটেনে উঠেছিলেন। নক্ষত্র-খচিত আকাশ তাঁদের চিন্তাকে চালিত করেছিল জ্যোতির্বিদ্যার দিকে এবং কথাবার্তা আরও জোরের সঙ্গে চলেছিল। ভোর অবধি তাঁরা সেখানে থেকে সূর্যোদয় দেখলেন। দিকচক্রবালের প্রান্ত থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে আলপস্ পর্বতমালার রূপরেখাকে হাল্কা সোনালী রংয়ে রাঙিয়ে দিল। একটা বিরাট পর্বতমালা তাঁদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সকাল হল। তরুণ কয়েকজন একটা ছোট রেস্টুরেন্টে কফি পান করল এবং সকাল ৯-টা নাগাদ উপত্যকাতে নেমে এল, তাঁরা তখন ক্লান্ত কিন্তু খুশি। কখনও তাঁরা ১৮ মাইল হেঁটে টুন শহরে যেতেন, ভোর ছ'টায় বেরিয়ে পৌঁছতেন বেলা ১২-টাতে। আলপস্ পর্বতমালার মাঝে বসে তারা পৃথিবীর ইতিহাস, পর্বতমালা কী করে তৈরি হল এবং ভূতত্ত্ব আলোচনা করতেন। টুন শহরে তাঁরা মধ্যাহ্ন ভোজন সারতেন, তারপর সারাদিনের মতো তাঁরা লেকের ধারে কাটাতেন এবং সন্ধ্যার ট্রেনে বার্নে ফিরতেন।(২)

---

১ C. Seelig, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৪-১৫ পৃঃ।
২ Solovine, xii-xiii.

তাঁদের আলোচনার বর্ণনা দিতে গিয়ে সোলোভিন বলেছেন, আইনস্টাইন আস্তে আস্তে কথা বলতেন, গলার স্বর ওঠা-নামা করত না, এবং মাঝে মাঝে ভাবতে গিয়ে চুপ করে যেতেন। নিজের চিন্তাতে এমনভাবে তিনি ডুবে যেতেন যাতে বাইরের সবকিছু তাঁর কাছে বিলুপ্ত হয়ে যেত। সোলোভিন এমন কিছু ঘরোয়া ব্যাপার বর্ণনা করেছেন যা আইনস্টাইনের বার্নের জীবন-যাত্রাকে চিত্রিত করে।

একবার আইনস্টাইনের জন্মদিনে সোলোভিন ও হ্যাবিচ কিছু ক্যাভিয়ার(১) এনেছিলেন, আইনস্টাইন আগে কখনও সেটা খাননি। তাঁরা জাড্যের নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন এবং টেবিলে খেতে বসার সময়ও আইনস্টাইন আলোচনাতে এত মগ্ন ছিলেন যে, ক্যাভিয়ার তিনি খেলেন বটে কিন্তু ধরতেই পারলেন না যে, নতুন কিছু খাচ্ছেন। বন্ধুরা যখন হেসে উঠলেন, তিনি তখন বড় বড় চোখ করে কিছু না বুঝে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন: "আমার মতো গেঁয়ো লোককে এই রকমের বিশেষ সুখাদ্য খাইয়ে কিছু লাভ নেই। যাই হোক, আমি সেটাকে তারিফ করতাম না।"(২)

সোলোভিন আরও একটা ঘটনা বিবৃত করেছেন। বার্নে অনেক বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী বাজাতেন এবং বন্ধুরা সাধারণত এই ধরনের কনসার্টগুলিতে যেতেন। একবার যখন শহরে চেক দেশ থেকে সিম্ফনি এল, সোলোভিন প্রস্তাব করলেন যে, সবাই যাবেন। তাঁরা তখন হিউমকে নিয়ে গভীর আলোচনায় নিমগ্ন; আইনস্টাইন প্রস্তাব করলেন যে, তাঁরা তাহলে সোলোভিনের বাড়িতে জড়ো হবেন। পরের দিন সোলোভিনকে একটা টিকেট দেওয়া হল এবং তিনিও শেষ অবধি কনসার্টে যাওয়া ঠিক করলেন। তিনি একটা রাত্রের খাবারের বন্দোবস্ত করলেন, যাতে ছিল পুরো সেদ্ধ করা ডিম, যেটা তাঁদের বন্ধুদের পছন্দসই এবং তার বন্ধুদের জন্যে লাতিন ভাষায় একটা নোট লেখা ছিল: "Amicis carissimis ova dura et salutem (প্রিয় বন্ধুদের জন্যে বেশি সেদ্ধ ডিম ও সম্ভাষণ)। আইনস্টাইন ও হ্যাবিচ ভালো করেই খাবার খেলেন, ধূমপান করলেন যাতে ধোঁয়াতে ঘরটা ভরে গেল এবং চলে যাবার সময় লিখে গেলেন, Amica carissimo fumum

১ মাছের ডিমের এক রকমের খাদ্য—অনুবাদক।

২ ঐ গ্রন্থ, ix-x.

Spissum et Salutem (একজন প্রিয় বন্ধুর জন্যে প্রচুর ধোঁয়া ও সম্ভাষণ)। পরের দিন সকালে আইনস্টাইন সোলোভিনকে সম্ভাষণ করলেন ভ্রূকুঞ্চনের সঙ্গে এই কথাগুলি বলে, "হতভাগা তুমি কোন্ সাহসে আমাদের পড়া-শুনো করার স্বাধীনতাকে বাজনার জন্যে ত্যাগ কর? অসভ্য ও মাথামোটা! এই ধরনের আর একবার স্খলন হোক তোমার, তাহলে তোমাকে আমাদের আকাদেমি থেকে বার করে দেব!" তারপর তাঁরা হিউম সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে মধ্যরাত্রের অনেক পরে সঙ্গত্যাগ করলেন।(১)

১৯০৫ সালে প্রথমে হাবিচ, পরে সোলোভিন বার্ন ছেড়ে চলে যান। পরের বছর মে মাসে আইনস্টাইন সোলোভিনকে লেখেন: "তুমি চলে যাবার পরে কারুর সঙ্গেই আমার সম্পর্ক হয় নি। এমন-কি বাড়ি ফেরার সময় বেসোর সঙ্গে যেসব সাধারণ কথাবার্তা হোত সেগুলিও আর হয় না।"(২)

১৯০৫ সালে প্রকাশিত আপেক্ষিক তত্ত্বের পেপার প্রকাশিত হওয়ার পরে যে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে লিখে ২৬ বছরের পণ্ডিত বলেছেন: "এমন একটা বয়েস আমার হোতে চলেছে যখন যুবকদের বিপ্লবী মনোভাব সম্পর্কে দুঃখপ্রকাশ করা উচিত।"

১৯০৬ সালে হাবিচ ও সোলোভিনকে লেখা চিঠিগুলিতে আইনস্টাইন ব্রাউনীয় আন্দোলন বা গতি, ফোটন এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গবেষণাপত্রগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। মে মাসে তিনি হাবিচ-কে বার্নে আসতে বলে চিঠি লিখেছিলেন: "আমাদের গৌরবময় আকাদেমির কয়েকটি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার জন্যে আপনাকে আহ্বান করছি, তার দ্বারা তার সভ্য সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে যাবে।"(৩) এর অব্যবহিত পরেই আনালেন ডের ফিজিক্-এর (Annalen der Physik) সংখ্যার(৪) জন্যে প্রতীক্ষারত অবস্থায় হাবিচকে নিম্নলিখিত চিঠি লিখছেন:

১ Solovine, xi-xii.

২ Ibid., p. 5-7.

৩ C. Seelig, op. cit., p. 124.

৪ জার্মান ভাষায় পৃথিবী-বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানের এই পত্রিকাতে আইন-স্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রবন্ধটি তখন প্রকাশিত হবার কথা, যা তাঁকে বিখ্যাত করে তুলবে।—অনুবাদক।

"প্রিয় হ্যাবিচ,

"তোমাতে আমাতে একটা সম্ভ্রমপূর্ণ মৌনাবস্থা চলছে ; আর আমি মাঝে মাঝে যে হাল্কা বকবকানিতে এটা ভঙ্গ করি সেটা নিশ্চয়ই বেশ নোংরা ব্যাপার। কিন্তু আমাদের দুনিয়াতে মহৎ ব্যক্তিদের কপালে কি এটাই ঘটে না? কী নিয়ে তুমি ব্যস্ত আছ, হে জড়পদার্থবৎ তিমি মাছ, হে মহান ব্যক্তি, যিনি একটা ভালো আচারের যেন আলুনো অংশবৎ, হে···জানি না। শতকরা সত্তর ভাগ ক্রোধ ও তিরিশ ভাগ করুণা ছাড়া আর কী দিয়ে তোমার মস্তকে ঘা দিতে পারি? শেষোক্ত এই তিরিশ ভাগকে ধন্যবাদ দিতে পারো যে, তোমাকে ইষ্টারের ছুটিতে না-আসার অপরাধের জন্যে তোমাকে এক টিন কাটা পেঁয়াজ ও রসুন পাঠাই নি। তোমার পেপারগুলিকে আমার কাছে কেন এখনও পাঠাও নি? তুমি কি জানো না, হে বিমর্ষ মানুষটি, যে দেড়জন তরুণের মধ্যে আমি সেই রকমের একজন, যে তোমার পেপারগুলিকে আনন্দ ও ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়বে? তার পরিবর্তে আমি তোমাকে চারটি রচনা পাঠাবার অঙ্গীকার করছি; এর মধ্যে প্রথমটি শীঘ্রই লেখকের কপি হিসেবে পাওয়া যাবে। সেটি হচ্ছে আলোকের বিকীরণ ও শক্তি সম্পর্কে এবং তুমি নিজেই দেখবে এটি দারুণ বিপ্লবী; অবশ্য যদি তুমি তোমার লেখা আগে আমাকে পাঠাও। দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে, পরমাণুর আসল মাত্রাকে নির্ধারণ করবার (বা মাপবার) পদ্ধতি ঠিক করা হয়েছে তরল দ্রবণের (বা দ্রবীভূত অবস্থার) বিচ্ছুরণ ও অন্তর্নিহিত ঘর্ষণ হিসেব করে। তৃতীয়টিতে প্রমাণ করা হয়েছে, তাপের আণবিক তত্ত্ব অনুসারে ১/১০০০ মিলিমিটার মাত্রাযুক্ত দ্রব্যকে যদি তরল পদার্থে ডুবিয়ে রাখা যায়, তাহলে অণুদের তাপ-জনিত গতির জন্যে এলোমেলো গতিবেগের সৃষ্টি হওয়ার মতো অবস্থা হয়। জীববিজ্ঞানীরা সাময়িকভাবে স্থগিত বস্তু-দেহগুলিতে এই ধরনের আন্দোলন লক্ষ্য করেছেন, যাকে ব্রাউনীয় আণবিক আন্দোলন বলা যায়। চতুর্থ কাজটি গতিশীল বস্তু-দেহের বিদ্যুৎ-পরিবাহী গতিশীলতার (ইলেক্ট্রো-ডাইন্যামিকস্) ধারণাগুলির' পরে প্রতিষ্ঠিত এবং তাতে দেশ ও কালের তত্ত্বের কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; এই কাজের স্থিতিবিদ্যার(১) নিছক অংশটুকুতে তোমার আগ্রহ থাকবে···তোমার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তোমাকে

১ kinematics, অর্থাৎ বল বা ফোর্সের পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে গতিবিদ্যার বিজ্ঞান।—অনুবাদক।

অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমার স্ত্রী ও এক বৎসরাধিক চিৎকাররত শিশুর অভিনন্দন।"(১)

কয়েক মাস পরে আইনস্টাইন হ্যাবিচকে লিখে উপদেশ দিলেন যাতে তিনি যেন পেটেন্ট অফিসে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেন। এর সঙ্গে ছিল আপেক্ষিক তত্ত্বের আনুষঙ্গিক কিছু অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং অন্যান্য আরও কিছু সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য।

"তুমি অত্যন্ত সিরিয়াস (গুরুগম্ভীর) মনোভাব নিচ্ছ" তিনি লিখছেন। "তোমার যে বিশ্রী খোঁয়াড়ে তুমি নির্জন-বাস শুরু করেছ তার ফল এই-ই হয়। কী হয় যদি হ্যালার-এর কাছে তোমাকে চাকরি দেবার জন্যে আমি দরখাস্ত করি এবং খিড়কীর দরজা দিয়ে তোমাকে পেটেন্ট অফিসে ঢোকাই? তাহলে কি তুমি এখানে আসবে? ভেবে দেখো, কারণ আট ঘন্টার কাজ ছাড়া প্রত্যহ বাকি আট ঘণ্টা রয়ে-বসে কাটানো যায়, আর তাছাড়া পুরো রবিবারটা তো আছেই। তুমি এখানে এলে আমি দারুণ খুশি হব। বন্ধুদের সাহচর্যে তোমার পুরানো স্মৃতি সহজেই শীঘ্র ফিরে পাবে।"

পদার্থবিজ্ঞানে বিপ্লবের আগমনী জানিয়ে পেপারগুলি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্ল্যাংক ও ভিয়েন-এর মতো পদার্থবিদরা সাধুবাদ জানিয়েছিলেন, তবুও নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আইনষ্টাইনের কোনো চিন্তা দেখা দেয় নি। হ্যাবিচ-কে নিয়েই তাঁর যা কিছু ভাবনা-চিন্তা। খ্যাতির দোর গোড়ায় এসে আইনস্টাইন নিজের পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন: পেটেন্ট অফিসে আট ঘণ্টা কাজ আর বাকি আট ঘণ্টা 'কুঁড়েমি' করে কাটানো, যার অর্থ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পড়াশুনাতে সময় কাটিয়ে দেওয়া।

তাঁর পত্রে আইনস্টাইন সেই সমস্যাগুলির উল্লেখ করেছেন যা হ্যাবিচ-এর আগ্রহ জাগাতে পারবে, যার মধ্যে ছিল বর্ণালীর ব্যাপারটা। "তবে আমি মনে করি" তিনি লিখছেন, "যে এই ঘটনাবলীর সঙ্গে অন্যান্য যে ঘটনাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তাদের কোনো সহজ সম্পর্ক নেই; কাজেই বর্ণালীর সমস্যাটি অত সহজে সুরাহা হওয়ার নয়।(২) দশ বছর পরে দেখা গেল যে বর্ণালীর সমস্যা, অর্থাৎ বস্তুর পরমাণুদের দ্বারা নিঃসৃত তড়িৎ-চুম্বকীয়

১ C. Seelig, op., cit. S. 125-26.
২ C. Seelig, op cit., S. 126.

বিকিরণের বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আসলে অত সহজে এবং সোজাসুজি জানা নিয়মগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায় না।

শেষ অবধি আইনস্টাইন লিখলেন, তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত যেটা বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে আসছে—একটা বস্তুর ভর তার শক্তির অনুপাতে হবে। হ্যাবিচ-কে লেখা তাঁর চিঠিতে তারিখ নেই, তবে খুব সম্ভব এটা ১৯০৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে পোস্ট করা হয়েছিল, যখন কোনো বস্তু-দেহের শক্তি ও ভর-এর মধ্যে অনুপাতের সম্পর্কে তাঁর গবেষণা-পত্র তিনি 'এনালেন ডের ফিজিক' পত্রিকাতে পাঠাচ্ছেন, যেটা হল আপেক্ষিক তত্ত্বের আনুষঙ্গিক একটা দিক পরিবর্তন, যেটা মানুষের জীবন ও কাজকর্মে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রভাব বিস্তার করেছে।

সোলোভিন ও হ্যাবিচ-এর বার্ন থেকে চলে যাওয়ার দুবছর পরে আইন-স্টাইন শেষ অবধি এমন একজন সঙ্গী পেলেন যাঁর সঙ্গে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করতে পারেন। তাঁর জীবনে নতুন যুগ শুরু হচ্ছে এখান থেকে, কারণ জেকব জোহান লাউব বার্নে এসেছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ভিলহেলম্ ভিয়েন-এর আমন্ত্রণে, এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আপেক্ষিক তত্ত্বের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে দেখা ও আলোচনা করা। (লাউব নিজে ভিয়েনের পরিচালনায় একটি সেমিনারে আপেক্ষিক তত্ত্বের পর্যালোচনা করেছিলেন)। লাউব ও আইনস্টাইনের মধ্যে আলোচনার ফলশ্রুতিতে কয়েকটি পেপার যৌথভাবে উপস্থিত করা সম্ভব হল। আইনস্টাইনের সহজ সহৃদয় আচার ব্যবহারের কিছুই পরিবর্তন হয় নি; লাউব দেখলেন একটা ঠাণ্ডা ফ্ল্যাটে ঘর গরম করার জন্যে আগুনের স্টোভ জ্বালাতে তিনি ব্যস্ত। কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ লাউব আইনস্টাইনকে দিনের কাজের শেষে পেটেন্ট অফিসে দেখা করে তাঁর সঙ্গে বাড়িতে আসতে আসতে পথে তাঁদের আগ্রহের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁরা দুজনে বার্ন অপেরা-তে ভাগনারের গটার-ডামেরুং (Gotterdammerung) শুনতে যান এবং আইনস্টাইন উৎসাহের সঙ্গে ফিসফিস করে বলেন "ভগবান রক্ষে করুন, ভাগনার আমার পছন্দসই নয় কিন্তু সিগফ্রিড-এর মৃত্যুর সময়ে তার নায়কের অদম্য মনোভাবের পূর্বাপর স্মৃতিচারণ নিশ্চয়ই মহিমান্বিত।"(১)

---

১ Ibid., S. 121.

১৯০৭-০৯ সালের শীতকালের বহু সন্ধ্যা পাঁচজনে মিলে একত্রে বেহালা বাজিয়েছেন—যাতে তিনি ছাড়া আর বাকি চার জনের মধ্যে ছিল উকিল, গণিতজ্ঞ, বুকবাইণ্ডার, একজন জেল রক্ষী। তারা হ্যাডেন, মোৎসার্ট ও বীঠোফেন বাজাত কিন্তু অন্য বাজিয়েরা কেউই জানত না যে, তাদের পঞ্চম সঙ্গীটি কে।

এই পরিচ্ছেদটি শেষ করার জন্যে বার্নে আইনস্টাইনের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ১৯০৪ সালে মিলেভার একটি ছেলে হয়, নাম হানস অ্যালবার্ট। (ছোট বা জুনিয়র অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পরে জুরিখে পড়াশুনা করেন এবং শেষ অবধি ১৯৩৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সেখানে ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইড্রলিকস বা জলের গতি বিজ্ঞানের প্রফেসার হন)। পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খরচের মাত্রা বাড়ে কিন্তু আইনস্টাইনের তাতে কোনো উদ্বেগ ছিল না। যখন তাঁর মাইনে বাড়িয়ে ৪৫০০ ফ্রাংক করা হল তখন তিনি মন্তব্য করলেন "এই টাকা নিয়ে আমরা করবো কী?" মিলেভা কিন্তু কোনো রকমে সংসার চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁরও খুব মাথাব্যথা ছিল না। আসল ব্যাপার হল তাঁদের মেজাজ ছিল ভিন্ন রকমের। সোলোভিন ও হ্যাবিচের তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা তিনি মেনে নিতেন কিন্তু তাঁরা একসঙ্গে (আইনস্টাইনকে নিয়ে) হেঁটে বেড়াতে যাবে, বাড়ির বাইরে খাবে, বাড়িতে জলসার আয়োজন করবে এবং অনেক লোককে ডাকবে এগুলি তাঁর পছন্দ ছিল না। আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ক্রমশই তাঁর কাছে দূরের ব্যাপার হয়ে যেতে লাগল। হাড়ের সংযোগ স্থলে ক্ষয় রোগ এবং যে স্নায়ুজনিত অসুখে তিনি ভুগছিলেন তাতে তাঁর মনের কোনো পরিবর্তন হল না। আর এর সঙ্গে যোগ হতে লাগল বিকারগ্রস্ত দ্বেষ ও সন্দেহ। এক সময়ে আইনস্টাইনের সহজ সরল ব্যবহার ও অন্যমনস্ক দয়ালু মনোভাব তাঁর বিরক্তির কারণ হতে থাকল। তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়তেই লাগল, যদিও প্রকাশ্যে সেটা বেরিয়ে এল অনেক পরে, তাঁদের বার্ন ত্যাগ করার বেশ কিছু পরে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত'

"এই তুনিয়াতে কেউ যদি ঠিক পথে চলতে চায় তাহলে তাকে শেষ অবধি নিজের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। মানুষের ভাগ্য কেবলমাত্র তার নিজের সুখের মধ্যেই আবদ্ধ নয়···সমগ্র মানুষের জন্যে তাকে মহান কিছু আবিষ্কার করতে হবে।"

"নিজের থেকে রেনা কতোখানি সে মুক্তি পেয়েছে এই অর্থেই একজন মানুষকে যথার্থ মেনে নেওয়া সম্ভব।"

আইনস্টাইন

'একান্ত ব্যক্তিগত' দৈনন্দিন ব্যাপার থেকে আইনস্টাইনের উচ্চমার্গে বিচরণ শুরু হয়েছিল যখন তিনি একান্ত বালক, কিন্তু 'একান্ত ব্যক্তিগত' স্বার্থকে ছাড়িয়ে বিশিষ্ট ধারণাতে নিবদ্ধ হতে, যেটা বৌদ্ধিক দিক থেকে অভীষ্ট লাভের চেষ্টা, তাঁর সময় লেগেছিল। অল্প সময়ের জন্যে তিনি ধর্মের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এর পরে 'মুক্ত চিন্তার মাতামাতি' এবং তার পরে এল 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত'-র প্রতি আনুগত্য, কিন্তু এটা ছিল বাস্তব ও যুক্তিসম্মত ধারণা। আমরা দেখেছি যে, জনবোধ্য বিজ্ঞানের বইগুলি পড়া থেকেই এর প্রত্যক্ষ প্রেরণা এসেছিল। ফলে শুধুমাত্র যে ধর্মীয় গোঁড়ামী বর্জিত হল তাই নয়, এই সব ধারণা তুনিয়ার বৈজ্ঞানিক চিত্রের সঙ্গেও মিলল না: সুদূরপ্রসারী ফল দাঁড়াল সামাজিক দিক থেকে প্রতিবাদ এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পুরো সম্পর্ক ছেদ। তাঁর 'আত্মজীবনীমূলক নোটস'-এ আইনস্টাইন যে রকম লিখেছেন, বিজ্ঞানের আঘাতে বাইবেলীয় কিংবদন্তীর

প্রভাব ও তার প্রতি বিশ্বাস চলে গিয়ে মনে এই ধারণা হল যে, ধর্মের আড়ালে রাষ্ট্র ইচ্ছে করেই যুবকদের মিথ্যার সাহায্যে প্রতারণা করছে। তিনি লিখছেন, "এই ধারণা প্রবল চাপের সৃষ্টি করল। এই অভিজ্ঞতা থেকে যে-কোনো কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সন্দেহ গড়ে উঠতে লাগল, যে-কোনো বিশিষ্ট সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যে বিশ্বাসটা (কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সন্দেহ—অনুবাদক) জীবন্ত ছিল, যে মনোভাব কখনও আমাকে ছেড়ে যায় নি··· ।" (১)

আইনস্টাইন ধর্মের বা সামাজিক ব্যাপারে কখনও উদাসীনতার আশ্রয় নেন নি, যদিও পরিবেশের সঙ্গে প্রথম যৌবনেই তিনি বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন তাতে এই উদাসীনতা তাঁর ঐতিহ্যের অন্যতম অঙ্গ ছিল। ধর্মকে পরিত্যাগ করে আইনস্টাইন যে-ধারণাকে গ্রহণ করলেন সেটা তাঁর জীবন ও কর্মের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল। তাঁর জীবনের মূল ও সবকিছু ছাপিয়ে যে-উদ্দেশ্য প্রধান ছিল, সেটা হল 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' বস্তুগত (objective) জগৎকে জানা।

"বাইরে ঐ বিরাট জগৎ রয়েছে, যেটা আমাদের মানুষী সত্তার থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এবং যা আমাদের সামনে একটা বিরাট চিরন্তনী প্রহেলিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে যেটা অংশত অন্তত আমাদের অনুসন্ধানের ও চিন্তার বিষয়। এই জগতের ধ্যান আমাকে মুক্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং আমি শীগগিরই লক্ষ্য করলাম যে, যেসব লোককে আমি শ্রদ্ধা ও তারিফ করতে শিখেছি, তারা এর প্রতি আনুগত্য স্থাপন করে নিজেদের মনের গভীরে মুক্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পেরেছেন। এই ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত জগৎ, যাকে মনের দিক থেকে ধরবার সম্ভাব্য পরিস্থিতি রয়েছে, সেটা আমার মনের মুকুরে আধা-সচেতন এবং অচেতনভাবে ভেসে উঠেছে। তেমনি বর্তমান ও অতীতের যে সকল অনুপ্রাণিত মানুষকে এবং যে সকল অন্তর্দৃষ্টি তারা লাভ করেছে, তারা সকলেই এমন বন্ধু যাদের হারিয়ে ফেলা যায় না। এই স্বর্গের দিকে সড়কটা ধর্মের পথ বেয়ে চলার মতো আরামদায়ক ও প্রলুব্ধকর নয়; কিন্তু এটা সমানভাবেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে এবং একে বেছে নেবার জন্যে আমি কখনও আক্ষেপ করি নি।" (২)

জগতের বিষয়মুখী চরিত্রের যে ধারণাটা আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান

---

১ Philosopher-Scientist, p. 5.

২ Ibid., p. 5.

স্তম্ভস্বরূপ ছিল, যেটা কৈশোর থেকেই ‘ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত’ অনুসন্ধিৎসা থেকে এসেছিল, তার আর একটা বাড়তি আবেগাত্মক নৈতিক দিক ছিল। জগৎটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অনুভূতি-সাপেক্ষ (অর্থাৎ, তার কোনো বিষয়মুখী বা objective অস্তিত্ব নেই—অনুবাদক), সেটা আত্মমুখী (subjective) অভিজ্ঞতা লব্ধ—এই ধারণার সম্মুখীন হওয়া-মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তার বিরোধিতা করলেন। এটা নিশ্চয়ই দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে একজন বিজ্ঞানীর স্বতঃস্ফূর্ত যে বিশ্বাস আছে তা থেকে অতিরিক্ত কিছুর জন্যে; যেটা আমরা ইতিহাস থেকে জানি, সচেতন যুক্তিসম্মতভাবে কোনো দার্শনিক অবস্থান বেছে নেওয়াটা যথেষ্ট নয়। আইনস্টাইন তখনও বালকের চেয়ে বেশি কিছু নয় যখন “এই বিরাট দুনিয়া, যার অস্তিত্ব আমাদের মানুষী সত্তা থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন” সেটা তাঁর কাছে খুঁটিয়ে বিচার করার বিষয় হয়ে দাঁড়াল এমনভাবে, যাতে একজন মানুষকে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনার ও বিশ্বাসের দ্বারা নির্ধারিত সীমানার বাইরে বহুদূর নিয়ে যায়। দুনিয়াটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছাপ বা অনুভূতির নিয়মশৃঙ্খলের দ্বারা বাঁধা—এই ধারণা আইনস্টাইনের কাছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বা বিজাতীয় বলে মনে না হয়ে পারে না। ঠিক তেমনি, এই জগতের ধারণা করতে হলে পূর্ব-নির্ধারিত ন্যায়শাস্ত্রসম্মত জ্ঞানের সাহায্যে বুঝতে হবে—এ ধারণাও তাঁর কাছে গ্রহণীয় ছিল না। এই অবস্থান থেকে শেষ পর্যন্ত যেটা বেরিয়ে এল সেটা হল—পদার্থগত ইতিবাচক এই ধারণা যে, এমন পরিমেয় বস্তুগুলিকে (quantities) বার করার প্রয়োজন আছে, যেটা প্রকৃতির নিয়মকানুনগুলিকে খোঁজবার জন্যে প্রয়োগ করলে তার জন্যে বিশেষ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক-যুক্ত ব্যবস্থাতে (system of reference) কোনো পরিবর্তন আনবে না।

আইনস্টাইনের ‘আত্মজীবনী’ থেকে যেটা এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটা আর একটা মূল ধারণার সূত্রের দিকে ইঙ্গিত করে। জগৎপ্রপঞ্চের ‘বিরাট চিরন্তন রহস্য’ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছাপ বা প্রভাব অথবা আমাদের ন্যায়শাস্ত্রসম্মত বিচারপদ্ধতির সঙ্গে মিলে যায় না; তাদের উভয়ের বিরোধী হয়ে একটা স্বতন্ত্র বাস্তবতা হিসেবে দাঁড়ায়। কাজেই জগৎপ্রপঞ্চকে জানার ব্যাপারটা সত্যের কতটা কাছাকাছি পৌঁছনো যায় তারই একটা প্রক্রিয়া মাত্র, বিজ্ঞানের গোঁড়ামী-বিরোধী ঝোঁক অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে সেই স্বীকৃতির সঙ্গে যুক্ত।

যদিও আইনস্টাইন তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কীয় মতামতকে তাঁর মৌলিক পদার্থ জগতের আবিষ্কারের পরে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, তবুও তারা তাদের অতীত ক্রিয়া থেকে সিদ্ধান্ত হিসেবে আসে না। জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে ঐক্য রয়েছে এবং সেটা জানা সম্ভব—শুধুমাত্র নিছক স্বতঃস্ফূর্ত এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই পদার্থ-বিজ্ঞানে এটা হাসিল করা সম্ভব ছিল না—আপেক্ষিক তত্ত্ব তা থেকে বহুদুর ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে। এই বিশ্বাস কৈশোর থেকেই তাঁর চেতনাতে বরাবরই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছে। মিউনিক, জুরিখ ও বার্নে আইনস্টাইন যে সকল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বইপত্র পড়তেন, তা থেকেই যে তাঁর প্রাথমিক গোড়াকার ধারণাগুলি এসেছে, সেই রকম 'প্রভাব' মোটেই দেখা যায় না। তাঁর বয়সেও তিনি কারুর ছাত্র ছিলেন না এবং তাঁর মতামত কোনো বাঁধাধরা দর্শনপন্থী ছিল না।

স্পিনোজা-ই বোধ হয় একমাত্র দার্শনিক যাঁর মধ্যে তিনি মনের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। মোটের উপর, বই থেকে নেওয়া ধারণা ও সূত্রগুলি তাঁর মতামতের তূণীরে প্রবেশলাভ করেছিল বটে, যেটা আপেক্ষিক তত্ত্বের বিকাশে সক্রিয়ভাবে অবদান রেখেছে কিন্তু পরিবর্তিত রূপে। পদার্থবিদ্যার সমস্যাবলীর প্রয়োগগত প্রক্রিয়ার মধ্যে, নতুন পদার্থ-বিজ্ঞানের তত্ত্বের প্রয়োগে তাঁদের আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয়েছে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারের প্রাথমিক স্তরে যে-দ্বন্দ্বগুলি দেখা দেয় সেই প্রক্রিয়াতে সাময়িক দ্বন্দ্বগুলি দূরীভূত হয়।

আইনস্টাইন তাঁর ১৯৪৯ সালে লিখিত 'আত্মজীবনীমূলক নোট্‌স্'-এ লিখছেন যে, এত যে ছক-বাঁধা ছবি উপস্থিত করা হল তার মধ্যে আসল মানসিক বিবর্তনের জটিলতা ও বিশৃঙ্খলাগুলি প্রকাশ পায় না। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলে একজন ব্যক্তিবিশেষ দেখবে সমভাবে পদ্ধতিমাফিক বিবর্তন হয়েছে; আসল অভিজ্ঞতাতে কিন্তু বিশেষ ধরনের পরিবর্তনশীল বিচিত্র বর্ণের ছবির সমাবেশ দেখতে পাওয়া যাবে। সমগ্র পদার্থ-জগতের বাস্তবতার নিয়মগুলিকে জড়িয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ নকসার ধারণাই আইনস্টাইনকে পেয়ে বসেছিল। বেশ স্বাভাবিকভাবেই পরে রূপান্বিত হয়েছে যে-অগ্রসর পরিপক্ক ধারণাগুলি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যৌবনের দিনগুলির কথা পেশ করেছেন। অবশ্যম্ভাবী এই বিচ্যুতির ব্যাপারটা মনে রেখেই তাঁর আত্মজীবনীতে ভাবাদর্শগত বিকাশের ছবিটা যে-ভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে, যেটা মানুষের সচেতন কার্যকলাপের একেবারে টুকরো 'পরমাণুর

মতো কাঠামো'কে অগ্রাহ্য করে, সেটাই আইনস্টাইনের তরুণ বয়সের ভাবনা-চিন্তার দিকনির্দেশ কোনদিকে ছিল তা দেখিয়ে দেয়।

"আমার মতো ধাঁচের মানুষের কাছে আমার বিবর্তনের পথে একটা বাঁক বা নিশানা হচ্ছে ক্রমশ প্রধান আগ্রহটা সুদূরপ্রসারী মাত্রাতে সাময়িক ও একান্ত ব্যক্তিগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় এবং মনোগতভাবে বিষয়বস্তুকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। এই দিক থেকে দেখলে উপরে যে ছাঁচে-ঢালা মন্তব্যগুলি করা হল তাতে ততোটাই সত্য আছে যেটা অল্প কথায় বলা যায়।"(১)

একজন পণ্ডিত মানুষের জীবনী লিখতে হলে পরবর্তীকালে তাঁর যা মনোভাব গড়ে উঠেছে সেইদিকে দৃষ্টি রেখে প্রথম দিকের মানসিক বিকাশের পশ্চাতে তাকিয়ে মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ করেই সত্য, যেটা বিশেষ করে উপরে উদ্ধৃত অংশ থেকে পাওয়া যায়: সাময়িক আগ্রহ থেকে প্রধান আগ্রহকে ছাড়িয়ে নিতে হবে এবং একটা জটিল ও দ্বন্দ্বমূলক আন্তরজীবনের বাস্তবতার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সামগ্রিক ছাঁচ (বা প্যাটার্ন) খুঁজতে হবে। এটা কেবলমাত্র সরাসরি মনের 'পরে যে বিচিত্র বর্ণের ছাপ পড়ছে তার জন্যেই সত্য নয়, পরন্তু আইনস্টাইনের তরুণ বয়সে যে-বইগুলি তাঁর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণার 'পরে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেগুলিকেও ধরতে হবে। তাঁর জীবনের শেষদিকে আইনস্টাইন যখন হিউম, কান্ট ও অন্যান্য দার্শনিকদের সম্পর্কে তাঁর মতামত ও অবস্থান প্রকাশ করেন তখনও তিনি তাঁর অতীতকে সংশোধন করছিলেন না; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সেই ধারণাগুলিকে আলাদা করে বেছে নেওয়া, যেগুলি তাঁর 'পরে বরাবরের মতো ছাপ ফেলেছে, যে-দার্শনিক প্রভাবগুলি তাঁর ব্যক্তি-জীবনে ঘটনা মাত্র নয়, পরন্তু যেগুলি তাঁর বৈজ্ঞানিক লক্ষ্যকে হাসিল করার জন্যে অবদান রেখেছে এবং সেইভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে দিকচিহ্নকারী একটা ঘটনাস্বরূপ হয়ে রয়েছে।

তাঁর নিজের ভাবাদর্শগত বিবর্তন সম্পর্কে আইনস্টাইনের মনোভাব ঠিক অন্যান্য ক্ষেত্রেও যা, এখানেও তাই; তিনি 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' বিষয়ের জন্যে প্রচেষ্টা করছেন। এই ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' বিষয় হচ্ছে তাঁর দার্শনিক ধারণা ও ভাবধারাগুলি, যেটা তাঁর মনে মগ্ন হয়ে রয়েছে

১ Philosopher-Scientist, p. 7.

এবং যা তাঁর নতুন বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির অল্পবিস্তর ভিত্তিভূমি-স্বরূপ।'
'বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'ব্যক্তিগত' জীবনী ও 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূ'ত''
বিজ্ঞানের ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে আইস্টাইনের জীবনস্মৃতির বৈশিষ্ট্য। তথ্যগুলি ও চিন্তাগুলি তিনি পর্যালোচনা করেন; তার মধ্যে থেকে একান্ত ব্যক্তিগত ও নিছক জীবনকাহিনীকে সরিয়ে রেখে তাঁর সৃজনশীল প্রচেষ্টার দিকেই অবদান রাখেন তিনি। এই তফাৎ টানলে আইনস্টাইনের চিন্তা ও অতীতের আরও ভালো করে মূল্যায়ন করা যাবে। কাজেই মাখ্-এর দার্শনিক মতামতের আবেদন তাঁর জীবনকাহিনীর মধ্যে নিছক একটা ঘটনা-স্বরূপই হয়ে রয়েছে, আর তাঁর গোড়াতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং পরে সচেতনভাবে মাখ্-এর দর্শন সম্পর্কে সন্দেহ ও তাকে গ্রহণ না-করা তাঁর 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূ'ত' বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম একটা উপাদানে পরিণত হয়েছে, যা থেকে ধ্রুপদী পদার্থবিজ্ঞানকে সংশোধন করার দৃষ্টিভঙ্গি এসে পড়ে।

আইনস্টাইনের ১৯৪৯ সালের আত্মজীবনীতে জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে যে সকল বিচ্যুতি বা বিষয়বস্তু আছে সেগুলি এখন দেখা যাক। আইনস্টাইন এই মূলগত ধারণা থেকে শুরু করছেন যে, বাস্তব জগৎ আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ (অর্থাৎ, জ্ঞানের 'পরে নির্ভরশীল নয়—অনুবাদক)। বস্তুত এটাই তাঁর আত্ম-জীবনীতে ভিন্ন পথের সূচনা। এটাই খুব স্পষ্টভাবে 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূ'ত' হওয়ার যৌবনের প্রচেষ্টা থেকে আপেক্ষিক তত্ত্বে পৌঁছনোকে চিহ্নিত করে—আর এই তত্ত্বই পরিষ্কারভাবে ও সর্বজনীনরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে বিশ্ব-কাঠামোর সঙ্গে পদার্থগত সম্পর্ক।

আইনস্টাইন একদিকে তাঁর মনের 'পরে ছাপগুলি, অন্যদিকে ধারণাগুলি পরীক্ষা করে দেখছেন, যা ন্যায়শাস্ত্রের একেবারে সঠিক নিয়মগুলি অনুসারে অনুমান-আশ্রিত যুক্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়। তবে একেবারে গোড়াকার ধারণাগুলি আগে-থেকে ঠিক করে নেওয়া হতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রের গৃহীত নিয়মানুসারে যুক্তিসম্মত চিন্তাতে বিভিন্ন ধারণাগুলির মধ্যে যে-সম্পর্কগুলি রয়েছে সেগুলিকেই একমাত্র নিশ্চিত করে বলা যায়। এই অর্থে যুক্তিসম্মত-ভাবে কোনো প্রতিপাদ্যে পৌঁছলে সেটা সত্য।

কিন্তু নিছক যুক্তি প্রতিপাদ্যের সত্যাসত্য পরখ করতে পারে না, যে অর্থে তাদের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে। যুক্তিসম্মতভাবে প্রতিপাদ্যে পৌঁছনো এবং আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়দের দ্বারা মনের 'পরে পুরো ছাপাগুলি যা পড়ে—এই

দুইয়ের মধ্যে যা সম্পর্ক, তা-ই হল এর নিশ্চিত গ্যারান্টি। আপনা-থেকে মনের 'পরে যে ছাপাগুলি পড়ে তাতে কোনো বস্তু বা বিষয়ের আসল চরিত্র সম্পর্কে কিছু বোঝা যায় না: বিজ্ঞান ধারণাগুলির যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার দিকে যায়, যেটার 'অর্থ' তথা 'মর্মবস্তু' তখনই এসে পড়ে যখন তারা মনের 'পরে ছাপাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রকৃতিতে কেবলমাত্র ন্যায়শাস্ত্রসুলভ যুক্তিতর্কের (অর্থাৎ যুক্তির শুকনো কচ্‌কচানির—অনুবাদক) মাধ্যমে যথার্থ সম্পর্ক নির্ধারণ করা অসম্ভব। আইনস্টাইন এই বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে গিয়ে যখন "একটা অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের জগৎপ্রপঞ্চের যে-ধারণা পূর্ব থেকে আমাদের মনে গাঁথা হয়ে আছে তার সঙ্গে সংঘাত লাগলে", যে 'বিস্ময়কর অনুভূতি' আমাদের মধ্যে জাগে, তার কথা লিখেছিলেন। চার-পাঁচ বছর বয়সে যখন তিনি একেবারে বালক-মাত্র তখন একটা কম্পাস দেখে তাঁর মনে কী বিস্ময়কর অনুভূতি হয়েছিল। কম্পাসের চুম্বকের কাঁটাটি আন্দোলিত হওয়ার যে-ছাপ ছোট্ট ছেলেটির মনে পড়েছিল, সেটাকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যায় বালকের দুনিয়াকে দেখবার ও উপলব্ধি করার বাধাবন্ধহীন প্রবণতা। সে প্রচলিত ধারণা ও পূর্বের কোনো ভাবানুষঙ্গ বাদ দিয়ে এটা অনুভব করছে এবং যেটা যথার্থ বিজ্ঞানীরা, যথার্থ শিল্পীদের মতোই সারা জীবন ধরে বহন করে চলে এবং যেটা প্রতিভার সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে জগৎপ্রপঞ্চের নতুন ব্যাখ্যা অথবা নতুন ছবি উপস্থিত করে।

কম্পাসের চেহারা দেখে যে গভীর ও চিরস্থায়ী ছাপ তাঁর মনে পড়েছিল তার কথা তিনি লিখেছেন। বস্তুত, এটা একটা মনের 'পরে সেই ধরনের ছাপ, যেটা 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' স্তরে গিয়ে পৌঁছয়। কম্পাস দেখে এই ধরনের 'বিস্ময়কর মনোভাবের' অর্থ কী? একটা বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, ধাক্কার ফলে গতির সৃষ্টি হয়। এই বক্তব্য থেকে যুক্তিসম্মত চিন্তার ভিত্তিতে কয়েকটি প্রতিপাদ্য ও ধারণা করা যেতে পারে। এই ভাবে সিদ্ধান্ত করাটা যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে কিন্তু তা থেকে তার সর্বজনীন সত্য নিশ্চিত হল বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। অথবা তা থেকে প্রাথমিক ভাবে যেগুলি সূত্ররূপে প্রমাণার্থ উপস্থিত করা হয়, সেগুলি যে সত্যই তা মনে করারও কোনো কারণ নেই ; তারা ততোটুকুই যথার্থ যতোটুকু ধাক্কার ফলেই যে গতির সৃষ্টি হচ্ছে এটা অনেকগুলি তথ্যের দ্বারা যাচাই হচ্ছে। কম্পাসের গতিবিধি থেকে এমন কয়েক ধরনের যুক্তির 'পরে যুক্তি দিয়ে ইমারত তৈরি

করা যায় যেটা পূর্বে যে-প্রণালীতে যুক্তি চালানো হয়েছে তার সঙ্গে সংঘাতে আসে।

"যখনই এই ধরনের দ্বন্দ্ব কঠিন ও গভীরভাবে অনুভূত হয়, তখনই সেটা আমাদের চিন্তার 'পরে একটা নিয়ামক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। চিন্তার জগতের এই বিকাশ এক অর্থে 'বিস্ময়' থেকে নিরন্তর পলায়নের চেষ্টা।"(১)

এই ধরনের বৈজ্ঞানিক বিকাশ সব রকমের আগে-থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিরোধী। আমাদের আগ্রহ রয়েছে এই ধারণাটির ইতিবাচক দিকের প্রতি। বিজ্ঞানের বিকাশে আইনস্টাইন দেখেছিলেন 'বিস্ময় থেকে পলায়ন,' অর্থাৎ নতুন ধরনের ধারণা ও যুক্তিসম্মত নির্মাণের দিকে রূপান্তরণ, যেটা 'বিস্ময়ের' বিরোধী নয় এবং তা থেকেই, নতুন পরীক্ষামূলক তথ্য থেকেই এটা অগ্রসর হয়। এটা থেকে মনে করার কোনো কারণ নেই যে, যুক্তিসিদ্ধ কোনো কিছুকে নির্মাণ করতে সত্যের মাপকাঠিকে বরবাদ করে দিতে হবে। মোটেই তা নয়। একমাত্র যেটা হয়, সেটা হল যুক্তিসিদ্ধ নির্মাণ-কৌশল নিজে নিজেই তার সত্তাবিদ্যাগত(২) মর্মবস্তুকে গ্যারাণ্টি করতে এবং এককভাবে নির্ধারণ করতে পারে না। সত্তাবিদ্যার দিক থেকে তখনই সেটা আমাদের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন সেটা পর্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয়গত ছাপের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই ভাবে সত্তাবিদ্যার দিক থেকে সত্যকে ক্রমাগত যাচাই করা হয়ে থাকে। সঙ্গতিপূর্ণ হলেই যে তার সত্যাসত্য নির্ধারিত হয়ে গেল এ রকমের কোনো গ্যারাণ্টি নেই।

"একটা প্রতিপাদ্য তখনই সত্য হয়ে দাঁড়াবে," আইনস্টাইন লিখছেন, "যখন একটি বিশেষ যুক্তিসম্মত ব্যবস্থার মধ্যে, স্বীকৃত ন্যায়শাস্ত্রসম্মত নিয়মানুযায়ী তাকে প্রতিপন্ন করা হয়। একটা (যুক্তিসম্মত) ব্যবস্থার মধ্যে সত্য তখনই মর্মবস্তু হয়ে দেখা দেবে যখন পারস্পরিক সমন্বয়ের সম্ভাবনার কতোটুকু

১ Philosopher-Scientist, p. 9.

২ Ontology আসলে পুরো দার্শনিক অর্থে এটা দাঁড়াবে—অধিবিদ্যার সেই শাখা যেটা কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রকৃতি ও মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা করে। অবশ্যই এরিস্টটলের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এর নানারকম ব্যাখ্যা হয়েছে।—অনুবাদক।

সম্পূর্ণ ও নিশ্চিত থাকবে তার 'পরে অভিজ্ঞতার পুরো সামগ্রিকতা পাওয়া যাবে।"(১)

আমরা যদি মহাবিশ্বের সীমাহীন জটিলতার কথা হিসেবের মধ্যে ধরি, তাহলে তা থেকে যেটা দাঁড়ায় সেটা হল : যেকোনো যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ব, যা ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়, 'বিস্ময়' ও নতুন তত্ত্বের দিকে পরবর্তী বিবর্তন থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না।

১ Ibid., p. 13.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যুক্তিবাদ

কারণ অথবা যুক্তি, যুক্তি অথবা কারণ।

স্পিনোজা

কোনো বস্তু-দেহ যখন গতিশীল অথবা স্থির থাকে, তখন তাকে সেই গতিবেগের অথবা স্থির অবস্থায় আনতে অন্য বস্তু-দেহের তার 'পরে ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যেটা আবার তার গতিবেগের অথবা স্থির অবস্থায় আনবার জন্যে অপর একটি বস্তু-দেহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং এইভাবে চলে অনন্তকাল অবধি।

স্পিনোজা

অবশ্যই যে-দর্শন যুক্তির সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে সেটা সম্পর্কে আইনস্টাইন বালক বয়সে অজ্ঞ ছিলেন। তবে গীর্জার কর্তৃত্ব থেকে যুক্তির মুক্তির জন্যে যে সাংস্কৃতিক ঝোঁক বিদ্যমান ছিল, তার সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর ছাত্র-জীবনে এবং 'অলিম্পিয়ান আকাদেমি'-তে তিনি যুক্তিবাদী দর্শনের ধ্রুপদী সাহিত্য, তাদের পূর্বসূরী, ছাত্র, অনুগামী ও সহকর্মীদের চিন্তাধারা জেনে ফেলেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পদার্থবিজ্ঞানের ধারণাসমূহের পশ্চাৎপট এবং ভবিষ্যতে যুক্তিসম্মত ভবিষ্যদ্বাণীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আইনস্টাইনের কাজকে মনে হবে একটা বিরাট যুগের পরিণতি হিসেবে—যে যুগে দর্শন ও বিজ্ঞানে যুক্তিবাদের অভ্যুদয় হয়ে মানবেতিহাসে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি

সূচিত হয়েছে ; এরই প্রকাশ ছিল নিউটনের বলবিদ্যাতে। আইনস্টাইনের লেখা পড়তে হলে গ্যালিলিও, দেকার্ত, স্পিনোজা, হবস্ ও নিউটনের কথা না ভেবে থাকা যায় না। এর কারণ তাঁদের ধারণার মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল আছে, সেটা আরও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এটা মোটেই ইচ্ছাকৃত নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী চিন্তার মধ্যে যে ধোঁয়াটে, আন্দাজী কথাবার্তা ও অনুসন্ধিৎসা ছিল, সেটা আইনস্টাইনে ইতিবাচক নিয়মমাফিক চেহারা নিয়েছে, যেটা তখনকার দিনে ছিল অসম্ভব। পারস্পরিক যুক্তিনির্ভর সম্পর্কটা তর্কাতীত। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যে সকল সমস্যার ও ধারণার মধ্যে পথ করে আইনস্টাইনকে চলতে হয়েছে সেটা ততো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান নয়। গোড়ার দিকে তাঁর প্রাথমিক পর্যায় থেকে খুঁটিয়ে জ্ঞান অর্জন করার (বা জানবার) সুবিধা ছিল না: স্পিনোজাই বোধ হয় একমাত্র সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিক যাঁর রচনাবলী তিনি পড়েছিলেন! অন্যান্য বড়ো যুক্তিবাদীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে পরবর্তী কালের ব্যাখ্যাতে, যা সপ্তদশ শতাব্দীর চিন্তাবিদদের মতামতগুলিকে বেনামী করে দিয়েছে, যে মতামতগুলি আবার দর্শন ও বিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহ্য সম্পর্কে আইনস্টাইনের ধারণাগুলির অন্যান্য পরোক্ষ সূত্রও রয়েছে।

দেকার্ত ও স্পিনোজার যুক্তিবাদ মানুষের চিন্তা করার পদ্ধতির, তার সংস্কৃতি ও শিল্পকলার 'পরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে: অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে যুক্তিবাদের প্রভাব বর্তমান ছিল। বরংচ কয়েকটি দিকে সেটা আরও গভীরতর হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে যখন নতুন বিংশ শতাব্দী শুরু হল, তখন জুরিখ পলিটেকনিক এবং 'অলিম্পিয়ান আকাদেমি'র সদস্যরা এই যুক্তিবাদেরই উত্তরসাধক ছিল, যদিও তারা হয়ত তাদের ধারণার ঐতিহাসিক সূত্রগুলি, যা তাদের তখনকার লেকচার, প্রবন্ধ ও বইগুলির মধ্যে রয়েছে, সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। কিন্তু ঐ পুরুষের মহত্তম পদার্থবিদের বিচারপ্রবণ মন এত তীক্ষ্ণ ও গভীর ছিল যে, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বন্দ্বগুলিকে ভালো করে বেছে নিতে পারলেন এমন একটা সময়ে যখন যুক্তিবাদী ছকগুলি চূড়ান্ত চেহারা নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত সূত্ররূপে সারবান হয়ে ওঠে নি। সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ভবিষ্যতের জন্যে একই সঙ্গে ইতিবাচক জবাব ও

জীবন্ত দ্বন্দ্বগুলি রেখে গেছে। (আমরা বইয়ের শেষ দিকে দেখব যে, আমাদের শতাব্দীর 'দ্বিতীয়ার্ধে প্রকৃতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের- ধারণাতেও সেই রকমের দ্বন্দ্বগুলি রয়ে গেছে) এই দ্বন্দ্বগুলি যেন অদৃশ্য কালিতে লিপিবদ্ধ করা এবং কেবলমাত্র একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞানের ইতিবাচক ফলাফলকে অসাধারণ গভীর বিশ্লেষণে সমর্থ, একমাত্র তিনিই এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেন। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের মূলে যে প্রাথমিক সাধারণ ধারণাগুলি রয়েছে, আইনস্টাইনের চিন্তা সেই দিকে ধাবিত হয়েছিল। যুক্তিবাদের ভাবগত রূপ জগৎপ্রপঞ্চের এমন একটা চেহারা—যাতে রয়েছে বস্তুর পারস্পরিক গতিবেগ ও মিথস্ক্রিয়া—তাকে পরে এই আদর্শের থেকে একেবারে ভিন্ন (বা বিরোধী) এবং স্বতন্ত্র ধারণার দ্বারা পরিপূরক হিসেবে হাজির করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শূন্যময় একটা অবস্থায় পরম গতিবেগের ধারণা। আইনস্টাইন প্রাথমিক ধ্রুপদী যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের দিকে ফিরে আসেন আগেকার দিনের ধারণাগুলি থেকে। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছিল সেই সকল তথ্যের ভিত্তিতে যেগুলি সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জানা ছিল না।

আধুনিক বিজ্ঞান যেখান থেকে নতুন পথরেখা ধরে চলতে শুরু করল সেটা হল জাড্যের ধারণা ও জাড্যজনিত গতির আপেক্ষিকতা, যেটা গ্যালিলিও বলে গিয়েছিলেন। আইনস্টাইনের চিন্তা-জগতে এর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তাৎপর্য নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। এখানে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের ক্ষেত্রে গ্যালিলিওর সাধারণ ধারণাগুলির তাৎপর্য লক্ষ্য করছি।

আগেকার যুগের যুক্তিবাদী ধারণার মতো না হলেও ১৭দশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ একটা নির্দিষ্ট জ্ঞানতত্ত্ব ও সত্তাতত্ত্বের (ontology) উপর দাঁড়িয়ে ছিল। যুক্তির সার্বভৌমত্ব ছিমছাম সঙ্গতিপূর্ণ ইমারত গড়ার জন্যে কাজের বিকাশ কিভাবে হবে তাতেই নিবদ্ধ থাকে না, পরন্তু প্রকৃতির যথার্থ ছবি কিভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে সেই ক্ষমতার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। অন্য কথায় বলতে হলে, বিষয়মুখী প্রবৃত্তির ও বিষয়মুখী বাস্তবতার সঙ্গে তার কী ধরনের মিল আছে, এতে মানসিকভাবে ইমারত তৈরি করার সুষমা ও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিশ্বজগৎ সশৃঙ্খল ও সুসংহত সত্তা—সত্তাতত্ত্বের দিক থেকে এইভাবে উপস্থিত করার 'পরে এই মতবাদ

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্যালিলিওতে এই ধারণা পরে যে গোঁড়ামীর চেহারা নিয়েছিল তা তখনও দেখা দেয় নি (যে-কোনো একটা মানসিক ইমারত গড়লে তার সত্যের সঙ্গে পূর্ণ ও চূড়ান্ত মিল থাকতেই হবে, সেটাই হচ্ছে পরম সত্য)। গ্যালিলিও বলেছেন জ্ঞান হচ্ছে অপার, অনন্ত। তাঁর এক আধুনিক ছাত্র লিওনার্দো ওলচিস্কি লিখছেন :

"যারা কোনো বিষয়ের একেবারে মূলে যেতে অভ্যস্ত গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছেন তাদের জন্যে সমাধান করা সম্ভব নয় এই রকমের এক বিশ্ব-সমস্যা এবং অনন্ত অবধি দেশ-কাল ব্যাপী এমন এক বিজ্ঞান, যার সীমাহীনতা কেবলমাত্র তিক্ততার মনোভাব ও মানুষ যে কত একলা সেই বোধ জাগিয়ে তোলে।"

কিন্তু এ হল অতীতের দিকে প্রক্ষেপণ করা, যে মনোভাব পরের দিকে গড়ে উঠেছে। গ্যালিলিও জ্ঞানের অসীমতার চিন্তাতে প্রাণবন্ত আশাবাদ পেয়েছেন। তিনি লিখেছিলেন, কত বেশি খবর সংগ্রহ করা হয়েছে সেই ব্যাপকতার দিক থেকে যা জানতে হবে, সে তুলনায় আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত নগণ্য ; 'খুঁটিয়ে' জানার দিক থেকে প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান একেবারে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য।

'খুঁটিয়ে' কোনো কিছুকে নির্ভরযোগ্য করে জানাটা যদি আমরা অবহেলা করি তাহলে তা থেকে বিজ্ঞানের সম্ভাবনা সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদ আসতে পারে ও আসবে এবং তার ফলে বিজ্ঞানের মূল্যবোধকে বরবাদ করা হবে। যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এর ফলে নানারকমের আক্রমণ করার দরজা খুলে যেতে পরে ; এটা আমরা পারে আলোচনা করব।

যেমন আইনস্টাইনে, তেমনি গ্যালিলিও-তে জ্ঞানের অসীমতা আশাবাদী মনোভাবের উদ্রেক করে। গোটাকয়েক বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্যের 'পরেই প্রতিষ্ঠিত ধারণার দ্বারা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয় না। গ্যালিলিও এবং আইনস্টাইন, দুজনেই বিশ্বাস করতেন যে, সমগ্র প্রকৃতির নির্ভরযোগ্য নীতি-সূত্রগুলি বিজ্ঞান পেয়ে গেছে। গ্যালিলিও লিখেছিলেন যে, গণিত ঘটনাবলীর নিয়মশৃঙ্খলা আমাদের কাছে মেলে ধরে এবং "চূড়ান্তভাবে কোনো কিছুতে আস্থা স্থাপন করা যায় না।" আইনস্টাইন যেভাবে দেখেছিলেন, তাতে কার্যকারণ সম্পর্কের নীতি আগে থেকে কোনো মর্মার্থ ঠিক করে দেয় না ; অথবা কেবলমাত্র ঘটনাবলীর মধ্যেই একে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাঁর কাছে

কার্যের সঙ্গে কারণের সম্পর্ক বুঝতে হবে বিষয়মুখী দিক থেকে সেটা কত আনুপাতিক।(১) এই অনুপাতের দ্বারা জ্ঞেয় কতখানি সেটা হাল্কা অবগতি নয় যাতে দার্শনিক গোঁড়ামী চলতে পারে এবং যেটা বিষয়মুখী বাস্তবতার ও একটা বিশিষ্ট গোঁড়া মতের দ্বারা চরমভাবে নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক ধারণার মধ্যেকার একেবারে সঠিক সম্পর্ক নয়।(২) আইনস্টাইনের কাছে পদার্থগত বাস্তবতাকে নির্ধারণ করছে যে নিয়ম যেটা জগৎপ্রপঞ্চের অসীমতা সত্ত্বেও, গবেষক ও তার সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী ও ধাঁধার মতো মনে হলেও, জ্ঞানের অগ্রগতির কোনো একটা স্তরে সীমাবদ্ধ ও ত্রুটিজনক হলেও, তার জ্ঞেয়তা (cognisability) নিজেই এমন একটা বাস্তবতা, যার অস্তিত্ব রয়েছে। আইনস্টাইন এমন-কি জগৎপ্রপঞ্চের জ্ঞেয়তা সম্পর্কেও একটা আপাতবিরোধী অবস্থা দেখতে পান: এটা (অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ—অনুবাদক) অসীম, যে কোনো বিশেষ মুহূর্তে এর সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের সীমাবদ্ধ, তা সত্ত্বেও এটা জ্ঞেয় বা বোধগম্য (cognisable)। এটাই আইনস্টাইনের পর্যবেক্ষণের আসল অর্থ। "জগৎপ্রপঞ্চের সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা যেটা আমাদের দুর্বোধ্য সেটা হল যে, এটা বোধগম্য।" পদার্থগত বাস্তবতার বোধগম্যতা অনেক সময়ে আমাদের কাছে 'আশ্চর্য' বলে মনে হয় কারণ তার প্রকাশ দেখা যায় ন্যায়শাস্ত্রের বাক্যবিন্যাসের মধ্যে নয় পরন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে, যা আমাদের কাছে মেলে ধরে এই জগৎটা তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে কিভাবে মানুষের কাছে বোধগম্য হতে পারে এবং মানুষ কিভাবে তাকে বুঝতে পারে।

দেকার্তের যুক্তিবাদ ছিল (যদি আমরা তার পদার্থবিদ্যার দিকটা দেখি) মূলত সত্তাতত্ত্বগত (ontological); ঠিক এই কারণেই বিজ্ঞানে, সংস্কৃতিতে এবং চিন্তার পদ্ধতিতে তাঁর দ্বারা নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। ঈশ্বরকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে দিয়ে এবং গতির নিয়মাবলী ও বিভিন্ন বস্তু-দেহের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সব কিছু সম্যকভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরে

---

১ অর্থাৎ কার্য (effect) যেটা হচ্ছে, সেটা কারণের (cause) তুলনায় কতটা আনুপাতিক (ratio) ভাবে ধরা পড়ছে—অনুবাদক।

২ অর্থাৎ একটা গোঁড়া বৈজ্ঞানিক মতবাদের সাহায্যে প্রায় গায়ের জোরে বলে দেওয়া হল যে বাস্তব ঘটনার মাত্র একটাই ব্যাখ্যা থাকতে পারে, অন্য কিছু নয়—অনুবাদক।

যুক্তিবাদ ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল।(১) তার ফলে দেকার্তের মতানুসারে কয়েকটিমাত্র প্রাথমিক প্রতিপাদ্যের ভিত্তিতে বিশ্ব-সংসারের যে ছবিটা যুক্তিসঙ্গতভাবে ফুটে ওঠে, সেটা একেবারে অনন্য, সঠিক এবং এই অর্থে বাস্তব জগতের শেষ প্রতিচ্ছবি।

দেকার্তের পদার্থবিদ্যাতে প্রাথমিক বাস্তবতা হল, গতিশীল বস্তুপুঞ্জসম্পন্ন প্রকৃতি, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। দেকার্তের পদার্থবিদ্যা (Cartesian physics) অনুসারে যৌক্তিক কার্যকারিতা ও তার সার্বভৌমত্বের দাবির ভিত্তি এটাই যে, পদার্থজগতের বাস্তবতা অনুসারে একটা চিত্র এর সাহায্যে খাড়া করা সম্ভব।(২)

স্পিনোজা-র দর্শনে, দেকার্তীয় পদার্থবিদ্যা দেকার্তীয় আধিবিদ্যার 'পরে প্রাধান্য স্থাপন করল। এটা একটা অদ্বৈতবাদী দর্শন হয়ে দাঁড়াল যার 'পরে বিজাতীয় বা তার স্বভাববিরুদ্ধ কোনো কিছু নির্মাণ করার প্রয়োজন নেই। অনন্ত গুণযুক্ত সত্তা নিয়েই আসল সারবস্তু গঠিত হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই চিরন্তন ও অসীম মর্মবস্তুর পরিচায়ক। স্পিনোজা তাকে বলেছেন প্রকৃতি এবং ঈশ্বরও বটে : Deus sive natura।(৩) সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ধরনের বাক্য ব্যবহারের দ্বারা নির্ভেজাল নিরীশ্বরবাদী মনোভাবকে যেন পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা হত। তার পরের শতাব্দীতে সামাজিক ও দার্শনিক চিন্তাকে এই ধরনের পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থাকে সহ্য করা হত না এবং মানুষ কোনো কিছুকে তার যথার্থ স্ব-নামেই ডাকত। বস্তুত, সপ্তদশ শতাব্দী-তেই মানুষ বুঝেছিল যে, স্পিনোজার দর্শনে চিরাচরিত ধর্ম ও ঈশ্বরবাদের দফা সারা হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্য যে-কোন যুক্তিবাদীর অপেক্ষা স্পিনোজা-তেই সত্তাতত্ত্বগত ঝোঁকের চেহারা সর্বাপেক্ষা ভালো করে চোখে পড়ে : প্রকৃতিতে কার্য-কারণ সম্পর্কের অন্তর্লীন সুষমাকে বুদ্ধি দিয়ে ভালো করে বোঝবার চেষ্টা হয়েছে। এই সুষমাকে তখনই দেখতে পাওয়া যাবে, যখন কেবলমাত্র

---

১ অর্থাৎ, সব কিছুই যুক্তির সাহায্যে বোঝা সম্ভব ; কোনো আপ্তবাক্য বা পুঁথি আওড়ে বা আধিবিদ্যক ঐশ্বরিক শক্তির দোহাই পেড়ে সত্যে উপনীত হওয়া যাবে না—অনুবাদক।

২ অর্থাৎ, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সব কিছু সমাধান করা এবং বাস্তব জগতের যথার্থ ছবি বুদ্ধিবাদী যুক্তির সাহায্যেই নির্মাণ করা সম্ভব—অনুবাদক।

৩ ঈশ্বর অথবা প্রকৃতি—আক্ষরিক অনুবাদ।

মনের 'পরে ছাপ পড়ে যা প্রতিভাত হয় বুদ্ধি তার 'পরেই নির্ভর করে না (যেমন, পৃথিবীর চারধারে সূর্যের আপাতপরিক্রমা; সূর্যকেন্দ্রিকতা হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের পথে চলার শুরু) এবং একটা নতুন ছবি গড়তে চায় যেটা, শেষ পর্যন্ত খুব স্বাভাবিকভাবে **অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতাকে** ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়। গ্যালিলিও-র সমাধির প্রস্তরফলকে এই লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে: **Proprios impendit oculos, cum iam nil amplius habe-ret nature, quod ipse videret** (তিনি চোখের দৃষ্টি হারিয়েছিলেন কারণ প্রকৃতিতে দেখার মতো অবশিষ্ট আর কিছু তাঁর কাছে ছিল না)। গ্যালিলিওর গতিশীল সূর্যকে দেখার কোনো প্রয়োজন ছিল না কারণ তাঁর মন ছিল মুক্ত এবং মনের 'পরে যে ছাপ পড়ছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু তাঁকে প্রমাণ করতে হয়েছিল, পৃথিবীটা যে স্থির নয় এই ভিত্তিতে যে-ছবিটা দাঁড়াবে তার সঙ্গে মনের 'পরে ছাপ যা পড়ছে তার সঙ্গতি রয়েছে এবং সেটা দৃশ্য ঘটনাবলীকে অবিসংবাদীভাবে নির্ধারণ করে। তাঁকে দেখাতে হয়েছিল, নতুন সৃষ্টি রহস্য-সংক্রান্ত মতবাদে যে নিয়ম (system) দাঁড়াচ্ছে, সেটা পুরানো নিয়মগুলির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। যদিও দৃষ্টিশক্তি তিনি হারিয়েছিলেন তবু মনের দৃষ্টিতে ভেনিস শহরে জোয়ার-ভাঁটা তিনি যেন দেখতে পেতেন, যেটা পৃথিবী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝানো সম্ভব নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ মনের 'পরে যা ছাপ পড়ছে তার সামগ্রিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে নি, পরন্তু মনের 'পরে ছাপগুলির একটা সীমিত অংশকে এবং চোখে দেখার (empeiria) বিরুদ্ধে নয় কিন্তু প্রত্যক্ষবাদিতার(১) বিপক্ষে অবস্থান করেছিল।

এটা লক্ষ্য করার বিশেষ প্রয়োজন যে, স্পিনোজা ও অন্যান্য সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের মতে কোনো পর্যবেক্ষক যে ধারণাগুলিতে উপনীত হন, সেগুলি যেন পর্যবেক্ষকের অবস্থান থেকে স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ হয়; যাকে পাস্কাল বলেছেন, 'ঘৃণার্হ অহং।' একমাত্র তাহলেই তারা সত্য হয়ে উঠবে। স্পিনোজা তাঁর 'এথিক্স' বইয়েতে বলেছেন, বস্তুগুলির থেকে যে ধারণাগুলি জন্মেছে, সেগুলি যদি সত্য ধারণা হয় তাহলে তাদের মধ্যে মিল থাকবে।

---

১ **Empiricism**—অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে যা অভিজ্ঞতা আছে সেটাকে একমাত্র জ্ঞানের উৎস বলে ধরে নেওয়া। যা প্রত্যক্ষ প্রতিভাত, সেটা আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হলেও বাস্তবক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম—অনুবাদক।

স্পিনোজা ও সপ্তদশ শতাব্দীর পুরো যুক্তিবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক এই যে চিন্তা সেটা আইনস্টাইনে ঠিক একইভাবে সরল, সাধারণ ও সমবৈশিষ্ট্যযুক্ত বর্গ বা শ্রেণী (category) হিসেবে পাওয়া যাবে। তবে আইনস্টাইন কেবলমাত্র এমন একটি সঠিক তত্ত্ব খোঁজবার চেষ্টা করেন নি, যা কোনো একক পর্যবেক্ষকের অবস্থানের থেকে স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ। (এবং তাহলে সেটা সরাসরি মনের 'পরে ছাপের আপাতবিরোধী হয়ে দাঁড়াবে)। তিনি পদার্থবিদ্যাতে অপরিবর্তনীয় উপাদানের প্রয়োগকে খুব বড়ো করে উপস্থিত করেছেন, যেগুলি (অপরিবর্তনীয়গুলি) কোনো একজন দর্শকের মনের 'পরে যে ছাপ পড়ে তা থেকে অন্য দর্শকের ক্ষেত্রে বদলে যায় না। প্রকৃতির বিজ্ঞানে অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলির নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাওয়াটা হল প্রধানত বৈজ্ঞানিক বিকাশের প্রধান লাইন বা পথরেখা, এটা অযৌক্তিকভাবে নরকেন্দ্রিক মনোভাব(১) থেকে বিজ্ঞানের মুক্তির লক্ষণ। সূর্যকেন্দ্রিকতা, ব্রুনো ও গ্যালিলিও-র অনন্ত ও সুসংবদ্ধ মহাবিশ্ব, জাড্য সম্পর্কে ধারণা এবং ধ্রুপদী আপেক্ষিকতা—এই সবের অর্থ হল, যেটা এতাবৎ পৃথিবী-নির্ভর দর্শকের পক্ষেই সত্য বলে গৃহীত হত, (কাজেই সরাসরি প্রত্যক্ষ করার পরেই যাকে গ্রহণ করা হত), তার পরিবর্তে এখন যে-কোনো দর্শকের পক্ষেই প্রযোজ্য হবে; অতএব এতে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রাথমিক সপ্তদশ শতাব্দীর ধারণার উপর পরে যেসব বাধা আরোপ করা হয়েছিল আইনস্টাইন তা থেকে একে মুক্ত করেছিলেন।

স্পিনোজার মতে প্রকৃতির কোন্ ধারণাটা প্রকৃত সত্য এবং যাতে কোনো বিষয়ীমুখী বৈশিষ্ট্য নেই? উত্তর হচ্ছে, গ্যালিলিও এবং দেকার্তের সমরূপ বস্তুর ধারণা, যার অন্য কোনো গুণ নেই। "গতি অথবা স্থির অবস্থার জন্যে, তাদের দ্রুতি অথবা মন্থরতার জন্যে নিজেদের মধ্যে বস্তু-দেহগুলির প্রকারভেদ ঘটে, তাদের অন্তর্নিহিত মর্মবস্তুর জন্যে নয়।" সেজন্যে জ্যামিতি (পাটীগণিত নয়!) হল বিজ্ঞানের ভিত্তি। এতে প্রকৃতির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রকাশিত হয়ে পড়া সম্ভব হতে পারে ; এই সম্পর্কগুলি বিভিন্ন বস্তু-দেহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পর্যবসিত হয়। স্পিনোজার 'এথিক্স'-এর এই পরিচ্ছেদে লিখিত শেষ কথার যে উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি তাতে এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার

১ **anthropocentric fetish**—অযৌক্তিক নরকেন্দ্রিক মনোভাব অর্থাৎ, বিজ্ঞানের দ্বারা যে-কোনো ঘটনাকে বোঝাতে হলে মানুষ-নির্ভর হতে হবে, তথা বস্তু-নির্ভর কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা চালিত হবে না—অনুবাদক।

কথা লেখা আছে। 'এথিক্‌স' বইটি সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের ভাবাদর্শগত শীর্ষদেশ বলা যেতে পারে, তাতে বলা হচ্ছে যে-সকল কারণকে বিভিন্ন বস্তু-দেহের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হিসেবে শেষ অবধি দাঁড় করানো যায় না, তাদের সর্বজনীন কার্যকারণ সম্পর্ক থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। বহু বছর ধরে আইনস্টাইনের গবেষণায় এই ধারণা (বা মত) বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। স্পিনোজাতে এটা একটা একক বিশ্ব-সারপদার্থের ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল ।। সকল বাস্তবতা হল অসীম সারপদার্থের বাস্তবতা, যার গুণগুলি (বস্তু-দেহের) তাদের অন্তর্নিহিত সারপদার্থের 'পরেই একমাত্র নির্ভর করে।

বিভিন্ন অবস্থাতে (কোনো কিছুকে) অক্ষয় রাখার মধ্যেই যে কোনো ধরনের রূপান্তরণের ফলাফল ঘটলে তাতে থাকে প্রকৃতির মুক্তি। আমরা দেখব যে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বজায় থাকার ধারণাটাই স্পিনোজাকে এমন এক ব্যাপক ও সাধারণ ধারণার মধ্যে নিয়ে গেছে, যেটা গ্যালিলিও এবং দেকার্তের জাড্যের ধারণার খুব কাছাকাছি।

প্রতিটি বস্তু-দেহের চলাফেরাই (বা ধরনধারণ, behaviour) মহাবিশ্বের অন্যান্য সকল বস্তুর 'পরে নির্ভরশীল হওয়াতে শেষোক্তকে একটা যান্ত্রিক অবস্থায় নিয়ে গেছে। একটা যান্ত্রিক অবস্থাতে একই নিয়ম আগাগোড়া কার্যকর থাকে। অতএব বিশ্বে সুষমা একটা সরল ছক (বা প্যাটার্ন) মাত্র। গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিকরা সবাই মহাবিশ্ব যে সরল সেটা বলেছেন। স্পিনোজা ও অন্যান্য যুক্তিবাদীরা এই সরল জগতের কথা বলেছেন, যেখানে বিভিন্ন বস্তু-দেহ পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াতে বাস করে—যেন তারা নৈতিক ও নান্দনিক সুষমার আদিরূপ ও ভিত্তি। সপ্তদশ শতাব্দী এই সরল বিষয়মুখী জগতের কথা আঁচ করেছে, যে জগতের নিয়ম গড়ে উঠেছে এমন কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা যেটা মন দিয়ে ধরা যায়। "আমরা এখানে রয়েছি মনের দিক থেকে বোধগম্য একটি সুন্দর জগতে"—এইভাবেই মালেব্রাংস লিখেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ এই সরল সুষমাময় জগতের ছবির মধ্যে যেখানে ছোট ছোট ফাঁক থেকে গিয়েছিল তাকে পূরণ করার জন্যে অগ্রসর হয়েছে এবং যুক্তির সার্বভৌমত্বকে অনুমানমূলক যুক্তিতর্কের চৌহদ্দির বাইরে নিয়ে যাবার এবং তাকে জনসাধারণের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছে। যুক্তির যুগ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী—যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ও

দার্শনিক চিন্তার নয়, তবে যে যুক্তিকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব। রুসো, ভলতেয়ার ও এনসাইক্লোপিডিয়াকারীদের(১) মতামত আইনস্টাইনের কাছে মুক্ত চিন্তার 'পরে নির্ভর করে পৌঁছে গেল, যেটা তখন ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিশেষ করে দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় দক্ষিণ জার্মানিতে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তার তুলনায় লাংগরাঞ্জের মেকানিক এনালিটিক(২) বইয়ের নিয়মমাফিক যুক্তিবদ্ধতা ও মাধুর্য আইনস্টাইনের মনে সামাজিক-দার্শনিক চিন্তায় শ্রেষ্ঠ লেখাগুলির থেকেও বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যুক্তির ধারণাকে এমনভাবে ধরে রেখেছিল যেটা প্রকৃতি থেকে যে সমস্যাগুলি উঠছিল তার একেবারে শেষ অবধি সঠিক ও চূড়ান্ত সমাধান খুঁজে বার করেছিল।

আবার উল্টো দিকে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আইনস্টাইনের মনে পাদার্থিক বাস্তবতার অসীম জটিলতা সম্পর্কে বিশ্বাস ধরিয়ে দিয়েছিল। কাজেই দুই রকমের যুক্তিবাদিতা, যুক্তিবাদকে যেখানে সব কিছুর ঊর্ধ্বে তোলা হয় যেমন (১) যুক্তি প্রকৃতির সম্পর্কে একেবারে সঠিক ও চূড়ান্ত জ্ঞান আয়ত্ত করেছে এবং (২) যুক্তি প্রকৃতির আসল চেহারা কী সেটাতে পৌঁছবার জন্যে অসীম অবধি ধাওয়া করবে—তাঁর সামনে এসে হাজির হয়েছিল। আইনস্টাইন শেষোক্ত ফরমুলার দিকে ঝুঁকেছিলেন যেজন্যে তাঁর দার্শনিক আনুগত্য অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে স্পিনোজাতে গিয়ে দাঁড়াল—যে স্পিনোজার যুক্তিবাদ তখনও বাস্তবতার ধাঁধাগুলির চূড়ান্ত সমাধানের ধারণাতে পৌঁছায় নি। আইনস্টাইনের যুক্তিবাদ বাস্তবতার দ্বন্দ্বাত্মক জটিল ও আপাতবিরোধী ধারণাকে তখনও ঠিক ধরে উঠতে পারে নি; তিনি বুঝতেন দুনিয়াকে জানতে হলে ক্রমশই অধিকতর ধাঁধাগুলিকে পরপর সমাধান করতে হবে। তাদের সমাধান করতে পারলে মহাবিশ্বের মূলে যে সরল সুষমা রয়েছে, সেটা উদ্‌ঘাটিত হবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। পাদার্থিক বাস্তবতার জটিলতা সত্ত্বেও সেটা এলোমেলো নয় এবং তাতে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ

১ Encyclopaedists—ফরাসী বিপ্লবের সময়ে যে সকল বুদ্ধিজীবী বিশ্বকোষ লিখে আমাদের জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করার চেষ্টা করেন—অনুবাদক

২ Mechanique analytique গতিবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ—অনুবাদক।

পদ্ধতি রয়েছে যা থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে নিয়মগুলি তার সামগ্রিক ও সাধারণ চেহারাটা ধরা যায়।

বিশ্বের বস্তুগত এই সুষমার কী নাম দেওয়া যায়? আইনস্টাইন তার যুক্তিসম্মত নাম জানতেন। মহাবিশ্বকে ব্যাপ্ত করে যে একই রকম কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে, তার কথা তিনি বলেছেন। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর জঙ্গী ধর্মীয় অনুশাসন-বিরোধী ঐতিহ্য থেকে তিনি এত বেশি দূরে সরে ছিলেন যে 'ঈশ্বর' এবং 'ধর্ম' নামের শব্দগুলি তাঁর কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয় নি এবং তাঁর লেখা ও চিঠিগুলিতে আমরা তাদের উল্লেখ পেয়ে থাকি। কিন্তু এই শব্দগুলি ব্যবহারের দ্বারা নিরীশ্বরবাদিতা থেকে চলে যাওয়া সূচিত হয় না।

আইনস্টাইন যখন 'ঈশ্বর' বলেছেন তখন তাতে সাধারণত একটু ঘরোয়া বা মামুলী এমন-কি বিদ্রূপের ছোঁয়াচ আছে। প্রাগে থাকাকালীন আইনস্টাইনকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর ছেলেমেয়েদের এমন স্কুলে পাঠাতে হয়েছিল, যেখানে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে। "শেষ অবধি," হাল্কা সুরে ঠাট্টা করে তিনি টিপ্পনী কেটেছেন, "ছেলে-মেয়েরা মনে করল ঈশ্বর বোধ হয় একটা গ্যাসীয় শিরদাঁড়াযুক্ত কিছু।"(১) একবার প্রিন্সটনে তাঁকে যে পথ্য খেতে বাধ্য করা হয়েছিল সে সম্পর্কে নালিশ জানিয়ে তিনি মন্তব্য করছেন: "শয়তান আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে যাতে যেটুকু আনন্দ আমরা পেতে পারি তা থেকে যেন বঞ্চিত হই।" যখন তাঁর সহকর্মী তাঁকে জিগ্যেস করল কেন তিনি এর জন্যে ঈশ্বরকে দোষারোপ করছেন না, আইনস্টাইনের উত্তর, "তাদের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে কেবল চিহ্নের, একজন ইতিবাচক, অন্যজন নেতিবাচক।"(২) লিওপোল্ড এনফিল্ড একবার স্মরণ করেছেন রবিবারে কাজ করা হবে কি না জিজ্ঞেস করতে আইনস্টাইন উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরও রবিবারে বিশ্রাম নেন না।"(৩)

প্রিন্সটন, এন জে-র অ্যাডভান্স স্টাডির ইনস্টিটিউটে যেখানে আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছর কাজ করেছিলেন সেখানে ছোট হল ঘর গরম করার চুল্লীর উপরে খোদাই করা আছে আইনস্টাইনের এই কথাগুলি: "ঈশ্বরের

১ Philipp Frank, Einstein, His life and Times, P. 336
২ C. Seelig, Albert Einstein, Leben und werk eines Genies unserer Zeit ,Zurich. S. 426
৩ L, Infeld, Quest, Doubleday, New York, 1941, P 271

রুচি খুব পরিচ্ছন্ন, নোংরামি নেই তাঁর মধ্যে।" মহাবিশ্বের বাস্তব সুষমাটি প্রকাশ পেতে পারে আপাত-বিরোধী নানা সম্পর্কের মধ্যে ('ঈশ্বরের রুচি খুব পরিচ্ছন্ন') কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে।

আইনস্টাইনের 'ঈশ্বর' পাদার্থিক বাস্তবতা'র বিষয়মুখী, বস্তুনিষ্ঠ নিয়ম-কানুনগুলিরই যেন ভিন্ন নাম, মহাবিশ্ব-ব্যাপী যে বিষয়মুখী যুক্তিবাদী সম্পর্ক রয়েছে যেন তারই অন্য নাম। "বহির্বিশ্বের বাস্তবতার এই ধারণা" এনফিল্ড লিখছেন, "আইনস্টাইনের মধ্যে এত প্রবল যে, প্রায়শই এটা তার বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। আইনস্টাইন যখন ঈশ্বরের কথা বলেন তখন তিনি প্রকৃতির নিয়মগুলির যুক্তিসম্মত সরলতা ও আন্তঃসম্পর্কটাই বোঝাতে চান। আমি সেটাকে বলব ঈশ্বরকে বস্তুবাদীভাবে বোঝার চেষ্টা।"(১)

আইনস্টাইনের কাছে ধর্মীয় মনোভাব ছিল সত্তার স্বরূপকে বোঝা, যেটা আসছে মহাবিশ্বের সুসংগতির উপলব্ধি থেকে। 'জীবনের অর্থ' কী, বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন :

"এই প্রশ্নের ('জীবনের অর্থ কী') জবাব জানার জন্যে ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন হতে হবে। তুমি জিজ্ঞেস করছ : তাহলে এই প্রশ্নটাকে তোলার কি কোনো অর্থ আছে? আমার জবাব : যে-মানুষ তার নিজের এবং তার সহকর্মীদের জীবনকে অর্থহীন মনে করে, সে যে শুধু অসুখী তাই নয়, তার বেঁচে থাকার যোগ্যতা প্রায় নেই বললেই চলে।"(২)

'ধর্মীয় মনোভাব' বলতে আইনস্টাইন যা বোঝাতে চাইছেন, তাতে একদিকে জীবনটা অর্থহীন এবং পাদার্থিক বাস্তবতার মধ্যে যে সুষমা রয়েছে—তাদের মধ্যের সম্পর্ক এবং অন্যদিকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে ধর্মীয় মনোভাব বলতে যা বোঝায় তা নয়। আইনস্টাইন এগোচ্ছেন একেবারে খাঁটি মানসিক সম্পর্কের দিক থেকে। যে বৈজ্ঞানিক তার মধ্যে বিশ্বের সুষমার অনুভূতির দ্বারা আচ্ছন্ন, সে তার নিজের সত্তা সম্পর্কে উদাসীন। মহাবিশ্বের যৌক্তিকতার চরিত্র বিচার করলে বিজ্ঞানীর অবস্থান গোঁড়া বিশ্বাসীর একেবারে উল্টো। শেষোক্ত ব্যক্তি মহাবিশ্বে এমন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পুরুষকে খুঁজে বার

১ **Ibid., P. 271**

২ **A. Einstein, Ideas and Opinions, Alvin Redman, London, 1956. P. 11**

করার চেষ্টা করছেন যিনি তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বিজ্ঞানী এই ধারণাকে বরবাদ করেন এবং বিশ্বটা বাস্তব কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত, এইভাবে দেখার চেষ্টা করেন।

"বিজ্ঞানী কিন্তু মহাবিশ্বের কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণার দ্বারা চালিত। ভবিষ্যৎ তার কাছে ঠিক অতীতের মতোই ততোধিক প্রয়োজনীয় ও নির্ধারিত। নৈতিকতা সম্পর্কে ঐশ্বরিক কিছু নেই; এটা একান্তই মানবিক ব্যাপার। প্রকৃতির নিয়মের সুসংগতি দেখে তার ধর্মীয় মনোভাব একেবারে অবাক বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাবার অবস্থায় পড়ে...এই অনুভূতিই তার জীবন ও কাজের নির্দেশক নীতি হয়ে ওঠে, ঠিক যতটা সে নিজের স্বার্থের ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত রাখতে পারে।"(১)

'ধর্ম ও বিজ্ঞান'(২) প্রবন্ধে তিনি জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণার বিপক্ষে মানুষী ঈশ্বরকে রেখেছেন। মহাবিশ্ব যে যুক্তির নিয়মে চালিত এই গভীর বিশ্বাস ও তাকে বোঝবার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আইনস্টাইন বলেছেন। যাকে কেপলার ও নিউটন বহু বছরের নির্জন সাধনার পরে খগোল বলবিদ্যার নীতি-গুলিকে আলাদা করতে পেরেছেন।(৩) এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানীকে তাঁর যুগের ধারণার সামনাসামনি দাঁড়িয়েও তাঁকে বিষয়মুখী সত্যের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

মহাবিশ্বের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিশ্বাসের সঙ্গে মানুষী ঈশ্বর অথবা আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে ধারণার কোনো মিল নেই। আইনস্টাইন এই ধারণাকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রত্যাখান করেছেন। তিনি লিখছেন, "আমি এমন ঈশ্বরের ধারণা করতে পারি না, যিনি তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের কখনও পুরস্কৃত আবার কখনও বা শাসন করেন। তেমনি আবার এমন ব্যক্তিমানুষের ধারণা করতে পারি না বা চাই না, যে নাকি তার দেহান্তের পরেও বেঁচে থাকে; দুর্বলচিত্ত মানুষেরা হয় ভয় অথবা হাস্যকর অহংবোধ থেকে ঐ ধরনের চিন্তা পোষণ করুক।"(৪)

১ Ibid., P. 40
২ Ibid , P. 36-40
৩ Ibid., P. 39
৪ Ibid., P. 11

যে প্রকৃতিকে আইনস্টাইন শ্রদ্ধা করতেন তাতে ঈশ্বরের কোনো স্থান ছিল না, কারণ তাতে বিষয়মুখী যুক্তি ও কার্যকারণ সম্পর্ক সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করত। যে চিরন্তন প্রকৃতি ব্যক্তি-মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং ভয় ও অহংসর্বস্বতা থেকে যে জ্ঞান মুক্তি দেয়, তিনি তাকেই শ্রদ্ধা জানাতেন। তিনি আরও বলেছেন, "অনন্ত প্রাণের রহস্য এবং যে জগতের অস্তিত্ব রয়েছে তার অপূর্ব চেহারা সম্পর্কে অবহিত হয়ে এবং সামান্য আঁচ পেয়ে এবং তার কিছুটা অংশ, সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তার সম্পর্কে একাগ্রভাবে বোঝবার চেষ্টা করে, এবং যে যুক্তি প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত—এই সব কিছুতে আমি সন্তুষ্ট।" আইনস্টাইনের কাছে একটা চিঠিতে সোলোভিন এই অনুভূতিকে 'ধর্মে'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাতে আইনস্টাইন জবাব দিচ্ছেন:

"স্পিনোজা-তে যে ভাবাবেগ ও মানসিকতা এত পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত, তাতে তাকে 'ধর্ম' বলে অভিহিত করাতে আপনার যে পছন্দ হবে না তা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু বাস্তবতা যে যুক্তিসম্মত এবং সেটা যে মানব-মনের নাগালের মধ্যে এই বিশ্বাস বোঝাতে আমার কাছে এর চেয়ে (অর্থাৎ, তাকে ধর্ম নামে অভিহিত করাতে—অনুবাদক) আর ভালো কোনো প্রকাশভঙ্গি নেই। এই বিশ্বাস ছাড়া বিজ্ঞান নেহাৎ শুকনো প্রত্যক্ষবাদিতাতে পর্যবসিত হয়। একে ধর্মীয় যাজকরা যদি নিজেদের সুবিধার জন্যে ব্যবহার করতে চান, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এইরকমভাবে একে কাজে লাগিয়ে কেউ যদি কদর্থ করতে চান তো কোনোভাবেই তার কোনো সুরাহা নেই।"(১)

এ একটা বৈশিষ্ট্যসূচক সিদ্ধান্ত। সামাজিক ন্যায়ের জন্যে সংগ্রাম করতে হবে জঙ্গী মুক্ত মনের পতাকাতলে—আইনস্টাইন এই প্রকাশ্য জন-আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন এবং ধর্মকে অতিক্রম করে যাবার আসল কোনো পথ তিনি দেখতে পাননি। এই থেকে কাকে কিভাবে নামাঙ্কিত করা হবে, যেটা মতাদর্শগত অবস্থান ঠিক করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি, সে সম্পর্কে তাঁর অনীহার উদ্ভব। আইনস্টাইনের মন নিবদ্ধ রয়েছে অন্য আর এক দিকে: পাদার্থিক বাস্তবতা যে যুক্তিসম্মত এবং তাকে যে জানা যায় এই তথ্যকে স্বীকার করে নেওয়া, স্বীকার করে নেওয়া যে তার (অর্থাৎ, পাদার্থিক বাস্তবতার—

১ Solovine, A. Einstein, Lettres a Maurice Solovine, Paris, p. 103

অনুবাদক) নিয়মগুলি আপাতবিরোধী এবং এর মধ্যে অনেক অপ্রত্যাশিত নিয়মের অস্তিত্ব রয়েছে। পরে সোলোভিনকে লেখা একটা চিঠিতে তিনি আবার প্রকৃতির 'বিস্ময়' ও 'অনন্ত রহস্যে'র কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, তাঁকে এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিতে হচ্ছে "যাতে তোমার মনে না হয় যে, বয়সের ভারে আমি এখন টোটকা ওষুধে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।"

বিশৃঙ্খলাময় মহাবিশ্ব ও তার নিয়মগুলির বিষয়ীমুখী চরিত্রের ধারণার বিরুদ্ধে আইনস্টাইন যুক্তিসম্মত ও জ্ঞেয় বিষয়মুখী ধারণার কথা বলেছেন। আইনস্টাইন বলছেন এটা আশা করা যায় যে, একটা অভিধানে শব্দগুলিকে যেমন বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো থাকে, তেমনি বিশ্বে পরম্পরার নিয়ম চালু করতে হবে। কিন্তু নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের ধারণা এর বিরোধী—যা প্রকৃতির বিষয়মুখী যুক্তিসম্মত শৃঙ্খলার সঙ্গে মিলে যায়। এই নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে জ্ঞানের সাহায্যে গভীরে প্রবেশ করা যায় এবং জ্ঞান যত বাড়ে তত সেই নিয়মশৃঙ্খলা সম্পর্কে 'বিস্ময়'ও বাড়ে। এই বিস্ময়, আইনস্টাইন বলছেন, প্রত্যক্ষবাদকে ও বিস্ময়হীন জগতের গোঁড়া ধারণাকে দুর্বল করে দেয়।

ধর্মের সঙ্গে অনুভূতিকে মিলিয়ে দেওয়াটা যে ভুল সেটা নিছক মানসিকতার দিক থেকেও সুস্পষ্ট। আইনস্টাইনের ধারণাগুলির যথার্থ অর্থ কী, সেটাকে এইভাবে মিলিয়ে দেখলে যুক্তির দিক থেকে তার অমিলটা ধরা পড়বে। প্রকৃতির নিয়মগুলিকে জেনে নিয়ে বিজ্ঞান তা থেকে অনুপ্রেরণা, আবেগ ও রোমান্স পেতে পারে। প্রকৃতি কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা চালিত নয় যেটা প্রতিটি ধর্মীয় মনোভাবের, এমন-কি যখন সেটা মানুষী ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে যুক্ত নয়, তার পেছনেও রয়েছে—এই জ্ঞান সেই অনুভূতির কিছুই অবশিষ্ট রাখে না।

আইনস্টাইনের কাছে পাদার্থিক বাস্তবতার যুক্তিসম্মত সুসঙ্গতির এবং মহাবিশ্বের 'জ্ঞান' সম্পর্কে যুক্তিবিহীন ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে যে ভাবাদর্শগত বিভেদ রয়েছে, সেটা একমাত্র শব্দের নামকরণের অসঙ্গতির দিক থেকে। আসলে দেখতে গেলে আইনস্টাইনের জগৎ যুক্তিসম্মত সম্পর্কের উপর নির্ভর করেই দ্ব্যর্থহীনভাবে গড়ে উঠেছে। এটা কেবলমাত্র অনেকগুলি তাঁর মুখের কথার দ্বারাই যে প্রমাণিত হয় তা নয়, পরন্তু তাঁর আধুনিক পদার্থগত তত্ত্বগুলি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব দেখলেও বোঝা যায়।

আইনস্টাইনের নিজের কথায় তিনি 'স্পিনোজার ঈশ্বরে' বিশ্বাস করতেন। অতএব ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অবস্থান নির্ধারণ করতে হলে স্পিনোজা 'ঈশ্বর' বলতে কী ধারণা করেছেন, তার বিশ্লেষণ করে অর্থ বার করতে হবে।

সপ্তদশ শতাব্দীতেই অনেকের কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে, নামটি ছাড়া স্পিনোজার ঈশ্বরে ভগবৎ (বা স্বর্গীয়) কিছু নেই। তাঁকে বলা হত 'নিরীশ্বর-বাদীদের পাণ্ডা' যাঁকে গোঁড়া ধর্মের রক্ষাকারী ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট ও ইহুদীরা সমানভাবেই এবং ঈশ্বরবাদের প্রবক্তারা সকলেই নিন্দাবাদ করত। জ্যাকবির মতানুসারে স্পিনোজা 'সর্বভূতে ঈশ্বর' অথবা মহাবিশ্বে ঈশ্বরের শক্তি কাজ করে যাচ্ছে—এর কোনোটাতেই বিশ্বাসী ছিলেন না (প্রসঙ্গত আইনস্টাইন 'মহাজাগতিক ধর্ম' কথাটি ব্যবহার করেছেন), পরন্তু তিনি ছিলেন পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদী।

ভলতেয়ার স্পিনোজার অবস্থানকে এইভাবে ছড়া কেটে বলে দিয়েছেন :

'ক্ষমা করো,' ঈশ্বরের কানে কানে
বললেন তিনি
'কথাটা আমাদের মধ্যেই থাক,
কিন্তু মনে করি, নেই
তোমার অস্তিত্ব'।

হাইনে লিখেছেন, "এটা উল্লেখযোগ্য যে, অনেক রকমের লোক স্পিনোজাকে আক্রমণ করেছে। তারা যেন একটা বড় বাহিনী কিন্তু এত বিচিত্র লোকের সমাবেশ সেখানে ম্রাত্বে বেশ মজা পাওয়া যায়। একদিকে কালো ও সাদা আলখাল্লা পরে যাজকরা ক্রুশ কাঁধে নিয়ে চলেছে আর তাদের পাশাপাশি চলেছে আর এক বাহিনী, এনসাইক্লোপিডিয়া রচনাকারীরা ধুনুচি জেলে ধূম উদগীরণ করছে, কারণ তারা এই মিনমিনে চিন্তাবিদের প্রতি চটে গেছে। আমস্টারডামের ইহুদীদের গির্জা থেকে যাজক (বা রাবাই),—তার বিশ্বাসের 'পরে হাত পড়াতে রুষ্ট হয়ে সরবে হর্ন বাজিয়ে সেটা জানিয়ে দিতে চায় ; আর তার পাশেই রয়েছে ভগবৎ-বিশ্বাসের পক্ষে উপহাসের বাঁশি বাজিয়ে আরুয়ে ছ্য ভলতেয়ার, এবং মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে পুরোনো ডাইনী জেকবির ঐ ধর্মধ্বজীদের পক্ষে হুক্কা-হুয়ার ডাক, যিনি আবার ঐ বাহিনীর মদের যোগানদারও বটে।"

'সকল অবিশ্বাসীর তুলনায় সর্বাপেক্ষা ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন', 'মহাজাগতিক

ধর্মীয় মনোভাব' এবং 'স্পিনোজার ঈশ্বরে'র কথা বলতে গিয়ে ধর্ম সম্পর্কে 'নামকরণের' দিক থেকে কিছুটা ছেড়ে দিলেও আইনস্টাইন আসল মর্মবস্তুর দিক থেকে কিছুই ছাড়েন নি এবং তাঁর 'ঈশ্বর' স্পিনোজার থেকে অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক ও নামমাত্র। আসলে আইনস্টাইন স্পিনোজা থেকে ফয়েরবাখে অগ্রসর হয়েছেন, যে-ফয়েরবাখ স্পিনোজা যেভাবে 'ঈশ্বর অথবা প্রকৃতি'-কে অভিন্ন রূপে গণ্য করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন 'হয় ঈশ্বর নয় প্রকৃতি, হয় প্রকৃতি নয় ঈশ্বর' (১)—এইভাবে রেখেছেন।

স্পিনোজার নিরীশ্বরবাদী যুক্তিবাদিতার আসল উত্তরাধিকারী হচ্ছেন ফয়েরবাখ এবং তিনি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদিতার মূল, বিশিষ্ট ও সম্ভাবনাপূর্ণ ঝোঁককে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি বিষয়মুখী যুক্তিকে, পাদার্থিক বাস্তবতার 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' যুক্তিকে সর্বজনীন কার্যকারণ সম্পর্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের পেছনে উদ্দেশ্য-মূলক ইচ্ছাশক্তির কল্পনা থেকে বিজ্ঞানকে মুক্তি দিয়েছেন। "মানুষ যাকে প্রকৃতির উদ্দেশ্যমুখিতা বলে কল্পনা করে," ফয়েরবাখ লিখছেন, "সেটা আসলে জগতের ঐক্য ছাড়া, কার্যকারণ সম্পর্কের সুসঙ্গতি ছাড়া, প্রকৃতিতে সব কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেটা কাজ করে যাচ্ছে বলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়।"

সারা বিশ্বের এই সুষমা বা সুসঙ্গতি থেকে একজন সর্বপ্রধান 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' সত্তার উদয় হয়। ফয়েরবাখ প্রকৃতির সুষমা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের সেই আবেগপূর্ণ রঙ বজায় রেখেছেন, যেটা স্পিনোজার বৈশিষ্ট্য: "যারা ধর্ম ও পুঁথিগত বিদ্যার দিক থেকে নিরীশ্বরবাদিতা সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে, তাদের অন্যতম প্রকাশের ভঙ্গি হল যে, নিরীশ্বরবাদ প্রায় অপরিহার্য একটি উপাদানকে নষ্ট করে দেয় অথবা ধর্তব্যের মধ্যে আনে না, যেটি হল কর্তৃত্বকে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা জানানো এবং তাতেই একজন মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা ও হামবড়াই ভাব এনে দেয়। নিরীশ্বরবাদিতা যদিও মানুষের অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করে না, তথাপি মানুষের অপেক্ষা কোনো নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব নেই, এরকম কথা নিশ্চয়ই বরবাদ করে না। নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এমন একটা আদর্শ যেটা প্রতিটি মানুষকে যদি তার কিছু

---

১ deus sive natura—Spinoza, aut deus aut natura—Feuerbach —মূল লাতিন বাক্য দু'টি যা ব্যবহৃত হয়েছে। অনুবাদক।

সাফল্য অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য রূপে সামনে রাখতে হবে। কিন্তু এই আদর্শকে হতে হবে এবং হওয়া উচিত একটি মানুষী আদর্শ ও লক্ষ্য। মানুষের অপেক্ষা প্রকৃতির প্রাধান্য একমাত্র প্রকৃতিতেই থাকতে পারে।" এই অংশের উল্লেখ করে লেনিন ফয়েরবাখ-এর 'ধর্মের স্বরূপ সংক্রান্ত বক্তৃতাবলীর' সারমর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন :

"আদর্শের উপরে নৈতিকতা অথবা (প্রকৃতিবাদের) প্রকৃতির উপরে—নিরীশ্বরবাদিতা এর কোনোটাকেই লোপ করে নি।"(১) প্রকৃতির সুষমাকে 'মহাজাগতিক ধর্মে'র অযৌক্তিক নামকরণ করে আইনস্টাইন শ্রদ্ধা জানাতেন না যদি তাঁর ফয়েরবাখ ও তাঁর অনুগামীদের লেখাপত্র পড়া থাকত। কয়েকটি কারণের জন্যে দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় নিবদ্ধ ছিল স্পিনোজার যুক্তিবাদের মধ্যে।

এখন দেখা যাক, স্পিনোজার মতবাদ থেকে অথবা সারা সপ্তদশ শতাব্দীতে যে যুক্তিবাদ চলছিল তার গূঢ় অর্থ থেকে আইনস্টাইন কতোখানি লাভ করেছেন। বিশেষ করে দেখা যাক মহাবিশ্বের বিষয়মুখী সুষমার বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির পূর্ব-নির্ধারিত অথবা প্রত্যক্ষবাদী উৎসগুলি কিভাবে তাদের প্রভাব বিস্তার করছে? সমস্যাটি জড়িত রয়েছে একদিকে মৌলিক, প্রধানত জ্ঞানতত্ত্বের প্রশ্নগুলির সঙ্গে, অন্যদিকে আইনস্টাইনের পাদার্থিক তত্ত্বগুলির ছক বা প্যাটার্ন এবং ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার সমালোচকদের সঙ্গে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের গভীরতম ও একেবারে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট সিদ্ধান্তগুলি জড়িয়ে রয়েছে তার সত্তাতত্ত্বের (ontology) সঙ্গে। জগতের যথার্থ ছবি কতোখানি প্রামাণ্যভাবে উপস্থিত করা যায় তার দ্বারা যুক্তির সার্বভৌমত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। জগৎটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটা বিষয়মুখী যুক্তির (ratio—লাতিন) দ্বারা, যেটা সকল প্রক্রিয়ার পেছনে অস্তিত্ববান মহাবিশ্বের কার্যকারণ সম্পর্ক। সত্তাতত্ত্বগত এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই সারা জগৎ সম্পর্কে আগে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত করা মতবাদের বিরোধিতা করে। কিন্তু প্রকৃতি যদি সারা বিশ্বের কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে পূর্বের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করা থেকে শুরু না করেই বিজ্ঞান অস্তিত্বের

---

১ Atheism abolishes neither das moralische Uber (=das Ideal), mor das naturliche Uber (=die Natur)—মূল বাক্যাংশটি তুলে দিলাম—অনুবাদক।

ঐক্যবদ্ধ নিয়মগুলির ভিত্তিতে বিভিন্ন ধারণায় উপনীত হতে পারে। ব্যক্তি তথা বিষয়ী-নিরপেক্ষ গভীরতর সম্পর্কগুলি অনুসন্ধান করা বিজ্ঞানের কর্তব্য। এই অনুসন্ধান জ্যামিতির উপপাদ্যের রূপ নিতে পারে, যাতে কয়েকটি প্রতিপাদ্য থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির অর্থ অবশ্য বিজ্ঞানে আগে থেকে সিদ্ধান্ত-করা সূত্রগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া নয়। এর অর্থ হল, মনের 'পরে যে ছাপগুলি বিশেষভাবে পড়ে তার থেকে পর্যবেক্ষণজাত ফলাফলগুলির প্রাধান্য ; এবং তা থেকে সেই 'কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা' (একস্‌পেরিমেন্ট) করা যায়, যাতে গবেষক পাদার্থিক বাস্তবতার নতুন নিয়মগুলিতে উপনীত হতে পারেন।

স্পিনোজার কাছ থেকে আইনস্টাইন যে-ধারণাগুলি পেয়েছেন তার প্রধান প্রতিপাদ্য হল এটাই।

যদি প্রকৃতিতে সুষমা-ই আধিপত্য করে তাহলে তা থেকে যে-ধারণাগুলি প্রকাশিত হয়, সেগুলি একটা আগে থেকে ঠিক করে-নেওয়া বাঁধা ছকের ব্যাপার হতে পারে না, যার সঙ্গে বাস্তব পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলিকে খাপ খাওয়ানো যায়।

একটা সার্বজনীন সুষমা প্রতিষ্ঠিত করে ও সকল প্রক্রিয়াকে পরিব্যাপ্ত করে সাধারণ নিয়মগুলির যদি কোনো স্তরবিন্যস্ত অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে প্রতিটি বাস্তব পর্যবেক্ষণ কোনো বিষয় বা বস্তুর আসল চরিত্র প্রকাশ করতে পারে না। তাকে যুক্তিসম্মতভাবে পরস্পরের সঙ্গে ধারণাগুলির ছকের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দিতে হবে।

বিশ্বজনীন সুষমা যদি একই প্রক্রিয়ার সাধারণীকরণ না হয়, এবং যদি সেটা পাদার্থিক বাস্তবতার জটিলতা ও দ্বান্দ্বিক চরিত্রকে বাদ না দেয়, তাহলে কয়েকটি তথ্যের ভিত্তিতে ধারণাগুলির যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত হয়ত অন্যান্য আপাতবিরোধী তথ্যের সঙ্গে সংঘাতে আসতে পারে এবং পুরোনো সাধারণ ছকের পরিবর্তে তাদের বোঝাবার জন্যে নতুন কোনো ছকের প্রয়োজন হতে পারে।

বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি যে আগে থেকে স্থির-করা কোনো কিছু এবং বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণলব্ধ সুশৃঙ্খল ভাবনাচিন্তার একটা রেকর্ড—আইনস্টাইনের যুক্তিবাদ এর কোনো ধারণাকেই স্বীকার করে না।

এ থেকে কয়েকটি দার্শনিক গোষ্ঠীর মতামত সম্পর্কে আইনস্টাইনের অবস্থান আমরা প্রথমে আলোচনা করব, তার পরে ধ্রুপদী বলবিদ্যা, তাপীয় গতিবিদ্যা (থার্মোডাইনামিকস) এবং তড়িৎ-গতিবিদ্যা সংক্রান্ত (ইলেকট্রো-ডাইনামিকস) তাঁর সিদ্ধান্তগুলি এবং পরে তাঁর পাদার্থিক আবিষ্কারগুলি কী করে হল, সেগুলি দেখব। একটা 'সুশৃঙ্খল রেকর্ড' অথবা আগে থেকে স্থির-করা বিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে অবিচল ও সচেতনভাবে বরবাদ না করে দিয়ে এই আবিষ্কারগুলি হতে পারত না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আইনস্টাইন ও প্রত্যক্ষবাদ

তাঁর কাছে মায়ার পর্দাগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে এরকম কোনো ঘটনা নয়, পরন্তু এ এমন একটা নিগূঢ় সত্তা যাকে বোঝা যায় এবং তিনি যখন একের পর এক পর্দা সরিয়ে দেন ততই সেটা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

মসৎস্কভ্‌স্কি

পর্যবেক্ষণকারীর থেকে স্বতন্ত্রভাবে বহির্জগতের অস্তিত্ব রয়েছে—এটা সমগ্র প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ।

আইনস্টাইন

আমার যেটা অপছন্দ···সেটা হল মূলগতভাবে প্রত্যক্ষবাদ-সুলভ মনোভাব, যেটা আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং যেটা আমার কাছে বার্কলের এই নীতির সমতুল্য : esse est percipi।(১)

আইনস্টাইন

আইনস্টাইনের দার্শনিক মতগুলি কাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল, একথা বলতে হলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যে-ছাপ বা প্রভাব ঘটনার মতো রয়ে গেছে এবং যেগুলি তাঁর আবিষ্কারের পথ খুলে দিয়েছে—এই সব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১ বিশপ বার্কলে ছিলেন আত্মমুখী ভাববাদের (subjective idealism) সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রবক্তা, যাতে বলা হয় আমি আছি বলেই আমার কাছে দুনিয়ার অস্তিত্ব রয়েছে।—অনুবাদক।

এর সঙ্গে দার্শনিক রচনাবলীর প্রতি তাঁর বিশেষ মনোভাবকে লক্ষ্য করতে হবে। যেমন, তিনি অনেক দার্শনিক লেখাকে নান্দনিক দিক থেকে খুব মূল্যবান বলেছেন এবং একই সময়ে কাব্য-সাহিত্যের উপর যথেষ্ট দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য আরোপ করেছেন। তাঁর মনোভাব এ ব্যাপারে ছিল একজন সহানুভূতিশীল শ্রোতার মতো, যে দার্শনিক মতামতগুলি একটু প্রশ্রয় দেবার (অথবা শ্লেষাত্মক, যখন যে রকম অবস্থা) ভঙ্গিতে শুনে যাচ্ছে। তিনি হয়তো কোনো একটা লেখার আঙ্গিক সৌন্দর্য ও বক্তব্যের স্পষ্টতার তারিফ করতে পারেন অথবা একটা প্রয়োজনীয় নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করে থাকতে পারেন—হয়তো কোনো মানসিক সংস্কার কাটাবার ব্যাপার—কিন্তু তিনি কদাচিৎ ইতিবাচক বক্তব্য গ্রহণ করতেন এবং কখনও ছাত্রের মনোভাবের আশ্রয় নেন নি।(১) অনেক প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর কাছে এই ধরনের অবস্থান 'দর্শন-বহির্ভূত' ধারণাগুলি থেকে উদ্ভব হতো অর্থাৎ, খুব পুরোনো দার্শনিক ভ্রান্তিগুলি থেকে, হতবুদ্ধিকর ও পল্লবগ্রাহী আনুষ্ঠানিকতা থেকে এবং শুধু এই অর্থে এটা 'নতুন' ও 'স্বাধীন'। দর্শনের ঊর্ধ্বে আইনস্টাইন কখনও নিজেকে স্থাপন করতেন না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর দর্শন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে এইভাবে সাধারণীকরণ করা যায়।

যে-সকল পণ্ডিত ব্যক্তি উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগমন দেখেছেন এবং যাঁরা প্রকৃতির অগাধ জটিলতা লক্ষ্য করেছেন, তাঁদের কাছে এমন কি স্পিনোজার দর্শন-তত্ত্বও জগতের রহস্যোদ্‌ঘাটনের চূড়ান্ত সমাধান করার মোহের সঙ্গে জড়িত ছিল। শতাব্দী যখন পার হচ্ছে(২) পণ্ডিতরা তখন গ্যোয়েটের এই ধারণাকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন যে, কোনো সমস্যার সমাধান করতে হলে নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যদিও ভাবা হয়েছিল যে, সকল সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান পাওয়া যাবে, তবুও সেটা তখনই পাওয়া যাবার অবস্থায় আছে বলে কোনো ভণিতা করা হয় নি, এবং আরও অগ্রসর হবার পরিপ্রেক্ষিতটা সেই ভাবনার মধ্যে যথেষ্ট পরিষ্কারভাবেই ছিল। নিউটন যখন নিজেকে একজন বালকের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন যে, 'সাধারণ একটা নুড়ির চেয়ে আরও একটু মসৃণ অথবা

১ অর্থাৎ, বিনা বিচারে গ্রহণ করেন নি।—অনুবাদক।

২ আমরা ধরে নিতে পারি উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছবার কথা বলা হচ্ছে, যেটা আইনস্টাইনের কাল।—অনুবাদক।

সুন্দর নুড়ি পাবার জন্যে বালক খোঁজ করছে' সেই 'বিশাল সত্যের সমুদ্রের তীরে, 'যেটা তখনও আবিষ্কৃত হয় নি', তখন তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষের মতোই কথা বলছেন ; তাঁর ছাত্র ও অনুগামীরা বাস করছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এমন একটা যুগে যখন যুক্তিবাদ জগতের চেহারা উপস্থিত করছে একটা চতুর্দিকে বেঁধে-দেওয়া আড়ষ্ট ছবির মতো। কোনো জ্ঞানই চূড়ান্ত নয়—এই ধারণা থেকে আরম্ভ করে সমগ্র বিজ্ঞানকে ধরলে শেষ পর্যন্ত ভিত্তি-হীন সংশয়বাদ মাথা চাড়া দেয় বলে ন্যায্যভাবেই যে-মতামত বিচার করার জন্যে হাজির হতে থাকল—কোনো কোনো দার্শনিক মহল থেকে তার বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু হল।

আইনস্টাইন যখন দার্শনিক রচনাবলীর মধ্যে প্রথম অনুপ্রবেশ করছেন, তখন ইতিমধ্যেই একটা দার্শনিক মত-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, যাঁরা আগে থেকে সিদ্ধান্ত করে নিয়ে বা চূড়ান্তভাবে জগতের চেহারাটাকে সাধারণীকরণ করতেন না, পরন্তু জগৎটা ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে এবং তার বিকাশ ঘটছে বলে ধরে নিতেন। আইনস্টাইন অবশ্য এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের কথা জানতেন না। অন্যান্য দার্শনিক মতামতে গোঁড়া আনুষ্ঠানিকতাবাদের সমালোচনা করা হতো একই ধরনের গোঁড়া অজ্ঞেয়বাদিতার দ্বারা।(১) এই ধরনের সমালোচনা এমন ধরনের প্রতিপাদ্য থেকে শুরু করে যেটা কার্যকর কিন্তু যাকে পরম (চূড়ান্ত) সত্য বলে ধরা হয় এবং ইতিহাসের দিক থেকে বিশিষ্ট কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতের চেহারাটাকে তার উল্টো করে দিয়ে বিষয়মুখী সত্যকে গোঁড়াভাবে বাতিল করে দেয়।

প্রিনসিপিয়া-তে নিউটন জগতের যে ছবি এঁকেছিলেন তাকে সমালোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। বিশপ বার্কলে (আরও অনেক দার্শনিকের প্রয়াস তাঁর সঙ্গে জড়িত ছিল) নিউটনের পরম বা অপরিবর্তনীয়(২) মহাশূন্যের

১ অর্থাৎ একদিকে যেমন একদল বলছেন যে আগে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত করে নিয়ে সেইমতো জগতের চেহারা ঠিক করো, তারই পাল্টা অন্যরা খণ্ডন করতে গিয়ে বলছেন, জগৎটাকে জানা যায় না।—অনুবাদক।

২ অর্থাৎ নিউটনের ধারণাতে মহাকাশ বা মহাশূন্যের কাঠামোটা অপরি-বর্তনীয় বা অ্যাবসোলিউট, যার পটভূমিতে গ্রহ-নক্ষত্রাদি চলমান।
—অনুবাদক।

সমালোচনা করার সঙ্গে তাঁর 'আমি আছি অথবা দেখছি'(১) বলে ধারণাকে যুক্ত করেছিলেন, এই সমালোচনাকে মাহাত্ম্যে ভূষিত করা হল(২) এবং সারা বিজ্ঞানেই নিউটনের এই প্রতিপাদ্যকে প্রসারিত করা হল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য এটা নিশ্চিত আত্মমুখী ভাববাদে পরিণত হল না এবং বিষয়মুখী বহির্জগতের অস্তিত্বকে কিছুটা অনিশ্চিত ভাবে হলেও কোনো-না-কোনো ভাবে খণ্ডন করার ও তাকে বোঝাবার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল।

কয়েকজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ঐ ধরনের সমালোচনার নেতিবাচক ও আংশিক দিকটার প্রতি সাড়া দিলেন, যাতে কয়েকটি বিশিষ্ট, বাস্তব পাদার্থিক মত ও ধারণাগুলিকেই চ্যালেঞ্জ করা হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজদের অজ্ঞেয়বাদী মতবাদে হিউমের প্রাধান্য ছিল। বার্নে আইনস্টাইন হিউমের প্রধান বই, 'মানুষের বুদ্ধিবিষয়ক অনু-সন্ধান' (An Enquiry Concerning Human Understanding) পড়েছিলেন। (সোলোভিন যেদিন কনসার্ট শুনতে চলে যান, সেই সময়ে 'অলিমপিয়ান আকাদেমি' এই বইটি পড়েছিলেন)। আইনস্টাইন হিউমের লেখাকে খুবই মূল্যবান মনে করতেন। তা থেকে কী পেলেন তিনি? তাঁর নিজের জবানিতেই আমরা সেটা বলতে পারি এবং প্রশ্নটার সঠিক জবাব দিতে পারি।

বিভিন্ন পাদার্থিক ঘটনাবলীর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কি, না, এইটা দেখানো ছিল আইনস্টাইনের সমস্যা। হিউমের জবাব হচ্ছে নেতিবাচক, তা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, দৃশ্যমান ঘটনাবলীর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বার করা অসম্ভব এবং ঘটনাবলীর মধ্যেই মানুষের বোঝবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এর পরে হিউমের পথ ধরে কান্ট কার্যকারণ সম্পর্কের চরিত্র এবং দেশ ও কাল পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে বলে সিদ্ধান্ত করলেন। তবুও আইনস্টাইন হিউম পড়ে একেবারেই বিচলিত হন নি কারণ তাঁর কাছে যথার্থ বস্তুজগৎ এবং গতির বিষয়মুখী নিয়মগুলি জ্ঞেয় বলেই মনের 'পরে

---

১ Esse est percipi—আত্মমুখী ভাববাদী দর্শন, এতে জগতের কোনো বিষয়মুখী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়।—অনুবাদক।

২ অর্থাৎ বেদে আছে অতএব সত্য—এই গোঁড়ামীর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হল।—অনুবাদক।

সেগুলির ছাপ পড়ছে। আইনস্টাইন এই ধারণা থেকে শুরু করছেন যে, পর পর কয়েকটি প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী থাকলেই তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্ধারিত হয় না। কাজেই কার্যকারণ সম্পর্ককে কিছুটা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাওয়া ছাড়াই স্বতন্ত্র (বা আলাদা) ভাবে ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে। কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণাগুলিকে প্রকাশ করতে আইনস্টাইন মুক্তভাবে তাকে গাঁথবার কথা বলেছেন।(১) এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, এই ধরনের ধারণাগুলি আগে থেকেই অথবা ধারণাবশত করা হয়েছে অথবা কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণাটি পুরোপুরিই যথা-ইচ্ছার একটা ব্যাপার? জবাবটা হল, না। প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নানারকমে প্রকাশিত হতে পারে এবং এই অর্থে তাদের মধ্যে কোন্‌টাকে বেছে নেওয়া হবে সেটা নিশ্চয়ই যথা-ইচ্ছার ব্যাপার। কিন্তু পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তাদের মিল থাকা চাই এবং কি ভাবে গাঁথা হলে সেটার সর্বাপেক্ষা মিল হবে (ঘটনাবলীর সঙ্গে—অনুবাদক), সেটা বেছে নেওয়ার কাজ আমাদের।

আমরা পরে এ সম্পর্কে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব কারণ কার্য-কারণ সম্পর্কের ধারণাগুলি আইনস্টাইন দার্শনিক লেখাগুলি পড়তে এবং তাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ততটা বলেন নি, যতটা তিনি নতুন পাদার্থিক ধারণাগুলির বিস্তার করতে গিয়ে বলেছেন। সেই অনুসারে তাঁর মতামত-গুলিকে আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে দেখলে চলবে না, দেখতে হবে তারা কী অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছে, পদার্থবিজ্ঞানে বিপ্লব আনতে কী ভূমিকা তারা পালন করেছে। এই দিক থেকে আইনস্টাইনের উপরে হিউমের দর্শন একেবারে কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারে নি।

কান্টের ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থহীনভাবেই আইনস্টাইন তাঁর জ্ঞানতত্ত্বকে বরবাদ করেছেন। হিউমের অজ্ঞেয়বাদকে কান্ট একটা বিস্তৃত পদ্ধতির স্তরে উন্নীত করেছেন এবং দেশ-কাল নিয়ে কয়েকটি ধারণা যোগ করেছেন যাতে তরুণ আইনস্টাইনের ঔৎসুক্য ছিল। এর পূর্বে দার্শনিক রচনাবলী সম্বন্ধে আইনস্টাইনের খাঁটি নান্দনিক মূল্যায়ন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা কান্টের ক্ষেত্রেও পুরোপুরি প্রযোজ্য। আইনস্টাইন কান্টের দর্শন গ্রহণ

১ অর্থাৎ, গোঁড়া মনোভাব নিয়ে অথবা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিয়ে নয়।—অনুবাদক।

করেন নি এবং তিনি কান্টীয় জ্ঞানতত্ত্ব, বিশেষ করে দেশ-কাল সম্পর্কে পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা বর্জন করেছেন। একই সময়ে কিন্তু তিনি কাণ্ট পড়ে আনন্দ পেয়েছেন এবং তাঁর লেখাগুলি থেকে প্রচুর নান্দনিক রস উপভোগ করেছেন। ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু থেকেও তিনি কাণ্টের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কাণ্টের লেখাগুলিতে লেসিং, শিলার ও মোৎসার্টের জার্মান-মানসিকতা রয়েছে, যেটা বিসমার্ক, তাঁর পূর্বসূরী ও শিষ্যদের মানসিকতার অত্যন্ত বিরোধী ছিল।(১) অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সংস্কৃতির এবং রাইন নদীকে অতিক্রম করে(২) যে-মুক্ত চিন্তার প্রসার ঘটেছিল—আইনস্টাইনের কাছে তার আবেদন ছিল।

আমরা জানি, আইনস্টাইন এই মনোভাব নিয়েই তাঁর জন্মস্থান সোয়াবিয়াতে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন; সেখানে মত-প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল এবং তাঁর বিশ্ববীক্ষা গড়ে তুলতে সেটার একটা কার্যকর ভূমিকা ছিল। ধ্রুপদী দর্শন মুক্তির যুগের অন্তর্ভুক্ত এবং তার এই ঐতিহাসিক মেজাজটা তার মর্মবস্তুর চেয়েও মানুষের মনে বেশি আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এর একটা বেশ ভালো উদাহরণ হচ্ছেন হাইনে, যিনি কোনোভাবেই কাণ্টীয় দর্শনের অনুগামী ছিলেন না, যিনি আইন-মানা শান্তশিষ্ট জার্মান অধ্যাপকদের সঙ্গে রোবসপীয়রের(৩) তুলনা করতেন এবং 'শুদ্ধ বুদ্ধির বিচার' (Critique of Pure Reason—কাণ্টের বিখ্যাত দর্শনের বই—অনুবাদক) থেকে 'ব্যবহারিক বুদ্ধির বিচার'-এ (Critique of Practical Reason) কাণ্টের বিবর্তনের চমৎকার কৌতুকপূর্ণ কিন্তু বেশ রাশভারী বিবরণ দিতেন। এটা বলা উচিত যে, ফরাসিরা যা করেছিল, জার্মানরা সাধারণত তাকেই যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলত এবং বিপ্লবের দুন্দুভি জার্মান দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পে শোনা যেত। ধ্রুপদী দর্শন,

১ বিসমার্ক-কে বলা হতো লৌহ চ্যানসেলার, যিনি ১৮৭১ সালের পরে সামন্ততান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে প্রুশিয়ার সঙ্গে একীকরণ করে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র স্থাপন করেন। জার্মানিতে একনায়কত্বের মনোভাবের বিশেষ উৎস হচ্ছেন বিসমার্ক।—অনুবাদক।

২ ফরাসী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল রাইন প্রদেশে।—অনুবাদক।

৩ রোবসপীয়র ছিলেন ফরাসি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিখ্যাত বামপন্থী নেতা; কাজেই তুলনাটা বেশ পরিষ্কার।—অনুবাদক।

সাহিত্য ও সঙ্গীতের আবহমণ্ডল আইনস্টাইনকে নাড়া দিত; কিন্তু নতুন দর্শন দিত না, কারণ এখানে (যেমন ভাগনারের সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর মনোভাবে) তার মর্মবস্তু সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা কাণ্টের লেখাপত্রের অন্তর্নিহিত আবেগের দ্বারা কমে যেত না। আমরা পরে কাণ্টের দর্শন সম্পর্কে জ্যামিতির মৌলিক ধারণাগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের অবস্থানের কথা বলব। আগে থেকে সিদ্ধান্ত ধরে নেবার কাণ্টের যে-পদ্ধতি, বিশেষ করে যেটা দেশের (space) প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি যেভাবে আগে থেকে সেই ধারণায় উপনীত হয়েছেন—আপেক্ষিক তত্ত্ব উপস্থিত করে আইনস্টাইন তাকে খণ্ডন করেছেন—সমগ্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর চেয়ে চূড়ান্তভাবে কোনো কিছুকে বাতিল করে দেবার নজির আর কিছু নেই।

হিউম থেকে আইনস্টাইন একটা ধারণা নিয়েছিলেন—যেটা হিউম নিজেই অতোটা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন নি, সেটা হল হিউম মানুষের বুদ্ধির কার্যকারিতা সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, যেখানে আইনস্টাইন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে নিউটোনীয় বলবিদ্যার কার্যোপযোগিতা সম্পর্কে। এই দুটি পদ্ধতি দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত এবং একটা বাস্তব অবস্থার ঐতিহাসিক দিক থেকে সীমিত তত্ত্বের সত্যাসত্য বা কার্যোপযোগিতা চ্যালেঞ্জ করতে হলে কাউকে বিজ্ঞানের বিষয়মুখী সত্যের সম্পর্কে, পরম সত্যে সে উপনীত হতে পারে কি না, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। একটা বিশিষ্ট তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে তার মূল্যায়ন করার জন্যে তাঁকে বিষয়মুখী বাস্তবতার সঙ্গে মিল আছে, কি না, এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে হবে। কাজেই আইনস্টাইন হিউম থেকে কাণ্টে পৌঁছবার জন্যে ধ্রুপদী দর্শনের পথে এগোতে পারেন নি। শিলার প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের ও অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিকদের উদ্দেশ্য করে যা বলেছিলেন, তা আইনস্টাইন সহজেই পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন:

> "হে আমার বিরোধীরা!
> সময় হয় নি এখনও হাত মেলাবার
> কেবলমাত্র বিভিন্ন পথ ধরেই
> তোমরা সত্যে পৌঁছতে পার।"

ধ্রুপদী দর্শন এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান যথার্থই বিভিন্ন পথ ধরে সত্যে উপনীত হবার চেষ্টা করেছে। প্রকৃতি-বিজ্ঞান নিউটন থেকে শুরু করে প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এবং অষ্টাদশ শতকের গাণিতিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে শক্তির ক্ষয়হীনতা(১), তাকে উল্টো দিকে চালিত করা যায় না এই তত্ত্ব এবং বিবর্তনের ধারণাগুলিতে পৌঁছেছে। হেগেল ও ফয়েরবাখ-এর মাধ্যমে ধ্রুপদী দর্শন প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও দর্শনকে মূলত মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, যেটা উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটেছিল। মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখাগুলিতে এটা করা হয়েছে। এই পথ অবশ্য আইনস্টাইনের দৃষ্টিসীমার বাইরে ছিল।

এই কারণে স্পিনোজার পরে ধ্রুপদী দর্শনে আইনস্টাইন 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত'-র ব্যাপারটা বুঝতে কোনো ইতিবাচক কর্মসূচি পান নি। তিনি সেটা উনবিংশ শতাব্দীর ধ্রুপদী বিজ্ঞানে পেয়েছিলেন। তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর নাভিকেন্দ্র তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার বিষয়বস্তুতে পৌঁছে গেল। এখানে আইনস্টাইনের অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কে যে-রকম মনোভাব ছিল তারই মতন একটা কিছু ঘটে গেল। যৌবনে তাঁর পাদার্থিক ধারণার সঙ্গে সরাসরি খাপ খেয়ে যায়—এ রকমের কোনো অঙ্কশাস্ত্রের সমস্যা বা পথ তিনি খুঁজে পান নি; সেটা পেয়েছিলেন তিনি পরে। দর্শনে তিনি কখনও স্পিনোজার যুক্তিবাদকে ছাড়িয়ে যান নি।

১৮৯০ থেকে ১৯০০ সালের কয়েক দশকের প্রত্যক্ষবাদ সম্পর্কে আইন-স্টাইনের মনোভাবের ব্যাখ্যা সহজেই করা যায় শেষ মূল্যায়নের সাহায্যে এবং তাঁর পদার্থবিদ্যার লেখাপত্রে তার কী প্রভাব পড়েছে, তাই দিয়ে। জীবনীর দিক থেকে বিচার করলে সমস্যাটা আরও একটু জটিল, যদিও কোনো সময়েই স্পিনোজার প্রতি আইনস্টাইনের মনোভাবের যে জটিলতা বা গুরুত্ব তা দিয়ে এটাকে বিচার করা যায় না। সেই সময়ের দুটি প্রত্যক্ষবাদী ধারণার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাই আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট। এর মধ্যে একটি আর্নস্ট মাখ-এর নামের সঙ্গে যুক্ত এবং অল্প কথায় বলতে হলে এতে ঘোষণা করা হয়ে থাকে যে বিজ্ঞান "যা পর্যবেক্ষণ করে তার সারাংশ অনুধাবন করে" এবং পর্য-বেক্ষণ করা ব্যতিরেকে কোনো বিষয়মুখী কার্যকারণ সম্পর্ক নেই, বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি এবং নিয়মগুলি হল সংগঠিত, পর্যবেক্ষণজাত 'বিচক্ষণতা'র ফল। দ্বিতীয়টি, যাকে কনভেনসনালিজম বলা হয়ে থাকে সেটি অঁারি পোঁয়াকার-

---

১ Conservation of Energy—শক্তির ক্ষয় নেই কেবল এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর ঘটে বলে মোট শক্তিপুঞ্জ অক্ষয়।—অনুবাদক।

এর নামের সঙ্গে যুক্ত এবং তাতে বলা হচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি করা হচ্ছে ইচ্ছামতো গৃহীত কয়েকটি প্রচলিত রীতিনীতি থেকে এবং সেগুলি বাস্তবের সঙ্গে মিলছে কি, না, সেটা বিজ্ঞানের বিচার্য বিষয় নয়।

যদিও গোড়ার দিকে মাখ-এর দর্শনের প্রতি আইনস্টাইনের সহানুভূতি ছিল, পরের দিকে তিনি সেটা পরিহার করেন এবং তাঁর মনোভাবকে কয়েকবার দ্ব্যর্থহীনভাবে পরিষ্কার করে দেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সকল বিবৃতির মধ্যে ফরাসি দর্শন-সমিতির বক্তৃতাতে 'মাখ একজন দুর্বল দার্শনিক' বলে তাঁর উক্তির চেয়ে অন্য কোনো সমালোচনামূলক বক্তব্য আমরা পাই না।

মাখ তাঁর **গতিবিজ্ঞান** বইয়েতে পরম দেশের ধারণাকে সমালোচনা করে যে দার্শনিক তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, আইনস্টাইন বহু বছর ধরে তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। একদিকে মাখ-এর এই তত্ত্ব এবং নিউটোনীয় ধারণা সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা এবং অন্য দিকে তাঁর দর্শন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতেই হবে।

সাধারণভাবে বলতে হলে মাখ-এর তত্ত্বে বলা হচ্ছে যে, প্রকৃতির সকল ঘটনাকেই বিভিন্ন বস্তু-দেহের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। এটা অবশ্য নতুন কোনো মত নয় এবং মূলত এটা স্পিনোজার বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। মাখ কিন্তু তাঁর তত্ত্বকে নিউটোনীয় বলবিদ্যার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন। এটাকেই আইনস্টাইন বলেছেন, 'মাখ-এর সূত্র'। নিউটোনীয় বলবিদ্যাতে জাড্যের বল-কে (চলন্ত বাস-এ হঠাৎ ব্রেক কষলে তার যাত্রীরা যেমন হুমড়ী খেয়ে পড়ে) বিভিন্ন বস্তু-দেহের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বোঝানো হয় নি, পরন্তু বোঝানো হয়েছে বাইরের স্পেস (বা যাতে সে অবস্থান করছে) তার সঙ্গে সেই বস্তু-দেহের গতিবেগের বদল হয়ে যায়, এর দ্বারা। মাখ এই ব্যাখ্যাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নি। আগেই বলা হয়েছে, এটা একটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক মতামত যাতে জগতের একটা ছবি পাওয়া যায়। এটা কি কোনোভাবেই মাখ-এর দার্শনিক মতামত থেকে বেরিয়ে আসে?

নিশ্চয়ই এরকমটি আর হয় না, তা নয়। তাছাড়া বিষয়মুখী জগতের বৈজ্ঞানিক চেহারাটা যে-কোনো প্রকারের প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে বেমানান। এখানে সম্পর্কটা রয়েছে সেই একই, যেটা রূপদী বিজ্ঞানের সমালোচনায়

সঙ্গে যে-কোনো বিজ্ঞানের সত্যাসত্য সম্পর্কে সংশয়বাদ। তাঁর গতি-বিজ্ঞানের ইতিহাসের বইয়েতে মাখ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, নিউটনের পরম দেশের ধারণা ধ্রুপদী বিজ্ঞানের সাধারণ প্রতিপাদ্যের বিরোধী: বিভিন্ন বস্তু-দেহের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণ স্বরূপ। তবে তিনি এমন কোনো যান্ত্রিক ধারণা সূত্রায়িত করতে পারেন নি যাতে পরম গতি (absolute motion) ও পরম দেশের (absolute space) পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া পর্যবেক্ষণের তথ্যগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায়। পণ্ডিত হিসেবে তাঁর গুণাবলী থাকা ছাড়া (এই কাজ করার জন্যে যে পর্যায়ের পাণ্ডিত্য থাকা দরকার তা তাঁর ছিল না) নিউটোনীয় ধারণাগুলির তুলনায় মাখ জগতের নতুন চিত্র উপস্থিত করার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেন নি। নিউটনের পরম দেশের সমালোচনার ধারণা থেকে মাখ তাঁর বিষয়মুখী দেশের ধারণার সমালোচনার দিকে ঝুঁকলেন। এটা জ্ঞানের বক্রতার একটা অংশকে সরল-রেখাতে পরিণত করার দৃষ্টান্ত—যার কথা লেনিন বলেছিলেন।

আইনস্টাইনের কখনও দেশের বিষয়মুখী চরিত্র সম্পর্কে দ্বিধা ছিল না। বস্তুর অস্তিত্বের বিষয়মুখী চেহারার অনুসন্ধানে নিউটোনীয় ধারণাগুলির সমালোচনা করাটা তাঁর কাছে ছিল যাত্রাপথের সূচনা। এই দিকটাই তাঁকে মাখ-এর মতামতের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু নিউটোনীয় বলবিদ্যার সমালোচনাতে মাখ জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে যে-সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন এবং একই সঙ্গে বলবিদ্যাতে 'মাখ-এর সূত্র' এবং মাখ-এর দার্শনিক ঘরানাতে যে তফাৎ আছে, সেটা বুঝতে তাঁর সময় লাগে নি।

'মাখ-এর সূত্রগুলি' আইনস্টাইনের লেখাতে বহু বছর দেখা গেছে। একমাত্র জীবনের শেষ দিকে তিনি তার সীমাবদ্ধ চরিত্র ধরতে পেরেছিলেন। মাখ-এর দর্শনে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল অল্পদিনের জন্যে, এবং সেটা আপেক্ষিক তত্ত্বের রূপায়ণের আগেই শেষ হয়ে যায় (খুব সম্ভব তাঁর এই তত্ত্ব সম্পর্কে কাজ করতে গিয়ে)। এর পরে আসে 'মাখবাদ' সম্পর্কে তাঁর তীব্র নেতিবাচক মনোভাব।

মাখ-এর ঘরানার মধ্যে আইনস্টাইনের মতামত সম্পর্কে কোনো মতৈক্য ছিল না। মাখ নিজে আপেক্ষিক তত্ত্বকে বর্জন করেছিলেন। কয়েকজন মাখবাদী আইনস্টাইনের মতামতকে বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রত্যক্ষবাদী মনোভাবের উদাহরণ হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আইনস্টাইন যখন কয়েকটি

প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় আপেক্ষিক তত্ত্ব কোথায় নিয়ে যাবে তার লক্ষ্যটাকে বেশ পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেন তখন মাখ-এর অনেক অনুগামী বুঝলেন যে তাঁদের গুরুর মতামতগুলিকে একটু মেজে-ঘষে সংশোধন করে নিতে হবে। এর ফল হল তথাকথিত 'যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ' (logical positivism)। এই মতবাদের অনুগামীরা মাখ-এর সঙ্গে মিলে প্রধান প্রশ্নটাকে এইভাবে দেখলেন: তাঁদের কাছে 'অভিজ্ঞতা' হচ্ছে একটা খাঁটি বিষয়ীমুখী (subjective) ধারণা, এবং বিষয়মুখী (objective) বাস্তবতার কোনো অস্তিত্ব নেই, আর তাকে বোঝবার সম্ভাবনার প্রশ্ন তো ওঠেই না। একমাত্র যুক্তিনিষ্ঠভাবে এগিয়ে বিষয়ীমুখী 'অভিজ্ঞতা'-কে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করে নেবার কথাটা তাঁরা মেনে নেওয়াতে তাঁদের অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দুটা আগের থেকে একটু বদলেছে। তবে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করে নেওয়াটা বিষয়মুখী বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এগোবার ক্ষেত্রে প্রধান ব্যাপার নয়, আসল কথা হল তার বিষয়ীমুখী অর্থটা কী দাঁড়ায়, সেটাই। 'যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদে'র মধ্যমণি ছিল 'ভিয়েনা গোষ্ঠী', কয়েকজন পদার্থবিদ এবং দার্শনিক, যার মধ্যে আইনস্টাইনের জীবনীকার ফিলিপ ফ্রাঙ্কও ছিলেন, যাঁর লেখা থেকে আমরা এই বইয়ে উদ্ধৃতি দিয়েছি।

পোঁয়াকারের দার্শনিক মতবাদের প্রতিও আইনস্টাইনের কখনও সহানুভূতি ছিল না। কয়েকজন পণ্ডিত মনে করেন যে, পোঁয়াকারের বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী ও ধারণাগুলিতে যে মুক্ত, কয়েকটি কনভেনশন (বা নিয়ম) ধরে নিয়ে কাজ করা হয় (এবং বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এবিষয়ে মতের মিল ছিল) বলে ১৯৩০-এর দশকে আইনস্টাইন তাঁর কাছাকাছি এসেছিলেন। বস্তুত, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্পর্কে কাজ করার সময় আইনস্টাইন প্রায়ই পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে পরিষ্কার করে বলার এবং তার সার্বজনীনতার উপর জোর দিতেন; বিষয়মুখী বাস্তবতার সঙ্গে মিলছে কি. না, দেখেই এটাকে একটা তত্ত্বের অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে সেভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

আইনস্টাইন তাঁর প্রথম দিকের রচনায় বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা পেশ করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের এবং মূলত যে-সব ধারণা ও পরিমাণকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাদের প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু দু'জন লোক যখন একই কথা বলে, তারা যে তা থেকে একই অর্থ করছে, তা না-ও হতে পারে। বিশেষ করে যেখানে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আইনস্টাইন।

মাখ ও আইনস্টাইন, দুজনেই 'অভিজ্ঞতা' 'পর্যবেক্ষণ' প্রভৃতি নানা রকমের কথা বলেছেন। কিন্তু মাখ-এর কাছে এই কথাগুলি বিষয়মুখী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগবিহীন। আইনস্টাইনের কাছে 'অভিজ্ঞতা', 'পর্যবেক্ষণ' হচ্ছে বিষয়মুখী বাস্তবতার প্রকাশ। পোঁয়েকারে ও আইনস্টাইন, দুজনেই পাদার্থিক তত্ত্বকে 'স্বাধীনভাবে সৃষ্টি'র কথা বলেছেন। কিন্তু আইনস্টাইনের কাছে এর অর্থ হল যে, মোটামুটি কয়েকটি স্বাধীনভাবে সৃষ্ট তত্ত্বের মধ্যে ('স্বাধীন', কারণ তারা পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলিকে সব সময়ে মেনে চলে না, যেসব তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে হয়) গবেষককে বেছে নিতে হবে সেইগুলিকে যেগুলির সঙ্গে পাদার্থিক বাস্তবতার মিল আছে।

'স্বাধীনভাবে পাদার্থিক তত্ত্বের সৃষ্টি'র ধারণাটি কী তা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। ১৯২০ সালে অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় আইনস্টাইন বলেছিলেন, যুক্তিনিষ্ঠভাবে স্বাধীন সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের যে আবিষ্কার-প্রচেষ্টা সেটাই বিজ্ঞানের 'সঠিক পথ'। 'স্বাধীন সৃষ্টি'র এই ধারণা যেটা আইনস্টাইনের অনেকগুলি লেখার মধ্যে পাওয়া যায়, সেটা বেশ কয়েকটি বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। ফিলিপ ফ্রাঙ্ক, যিনি মাখ-এর সমগ্র দর্শন ও প্রত্যক্ষবাদকে নিরপেক্ষভাবে পেশ করেছেন, তিনিও কিন্তু আইনস্টাইনের মতের সঙ্গে 'ভিয়েনা গোষ্ঠী'র নব্য মাখপন্থী (neo-Machian) জ্ঞানতত্ত্বের মতামত মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর যুক্তির ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের 'যুক্তিনিষ্ঠভাবে স্বাধীন সৃষ্টির' তত্ত্ব থেকে অগ্রসর হয়েছেন।

কয়েকজন বস্তুবাদী দার্শনিক আইনস্টাইনের 'স্বাধীন কল্পনা'কে কেবলমাত্র বিষয়ীমুখী নামকরণের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বলে আখ্যাত করেছেন: অভিজ্ঞতা ও মামুলিভাবে কোনো মতবাদ ধরে-নেওয়ার থেকে স্বতন্ত্র করে আগে-থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিরুদ্ধে আইনস্টাইনের পরিষ্কার ও প্রকাশ্য বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এটাকে আসলে বিষয়ীমুখী জ্ঞানতত্ত্বের কাছে আইনস্টাইনের কিছুটা আত্মসমর্পণ বলেই মনে করেছেন। বিজ্ঞানে 'স্বাধীন সৃষ্টি'র ধারণার যে-অর্থ আইনস্টাইন করেছেন, সেটা তাঁর অক্‌সফোর্ডে প্রদত্ত বক্তৃতার এই অংশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়:

"এটাই আমার বিশ্বাস যে, খাঁটি গাণিতিক নির্মাণ(১) থেকে যে ধারণা

---

১ অর্থাৎ একমাত্র গাণিতিক যুক্তির পদ্ধতিতে ও মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হলে।—অনুবাদক।

ও নিয়মগুলি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, সেগুলি আমাদের প্রকৃতির রহস্যউদ্‌ঘাটনের চাবিকাঠির মতো কাজ করে। গাণিতিক ধারণাগুলিকে কাজে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কী বেছে নিতে হবে তাতে অভিজ্ঞতা অবশ্য আমাদের নির্দেশ দেয়; কোথা থেকে সেটা পাওয়া যাচ্ছে তার সূত্র অবশ্য এটা হতে পারে না।

"কাজেই এক অর্থে আমি মনে করি, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা যেভাবে কল্পনা করেছিলেন, সেভাবে বাস্তবকে বুঝতে বিশুদ্ধ চিন্তা আমাদের সাহায্য করে।"(১)

'স্বাধীন চিন্তা'র এই অধিকারের ঘোষণা মাখ-এর প্রত্যক্ষবাদের এবং তথ্যাবলীর বাহ্যিক চেহারার 'যথাযথ বিবরণ'(২) উপস্থিত করার ও সেই বিবরণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক চিত্রকে নির্মাণ করার প্রয়াসের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে পরিচালিত। কিন্তু আইনস্টাইন কি কান্টীয় পূর্ব-সিদ্ধান্তের অবস্থানে চলে যান নি, তিনি কি বস্তুত ঘোষণা করছেন না যে, পূর্ব-সিদ্ধান্তকে বোঝার মধ্যেই একেবারে যা অন্তর্নিহিত অথবা 'প্রথাগত'ভাবে ধরে নেওয়ার মধ্যে যা রয়েছে, মন তা থেকে স্বাধীনভাবে জগতের ছবি গড়ে তুলতে পারবে?

এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার একটা চমৎকার মাপকাঠি আমাদের রয়েছে। বিভাজন-রেখা হচ্ছে, পাদার্থিক বাস্তবতার চরিত্রকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে। উত্তরটা কাজেই নেতিবাচক: বিষয়মুখী বাস্তবতার এবং ঐ বাস্তবতার বিষয়মুখী জ্ঞানের অবস্থান: জ্ঞানকে তিনি দেখেন বাস্তবতার প্রতিফলন রূপে এবং তাঁর নিজের পাদার্থিক ধারণাগুলি এসেছে তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের এই অবস্থান থেকে। তাহলে 'মানুষের মনের স্বাধীন সৃষ্টি' বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি?

কোনো কিছুকে নির্মাণ(৩) করার জন্যে যে অভিজ্ঞতার দ্বারাই চালিত হতে হবে মন সেভাবে বিকশিত হয় না। পর্যবেক্ষণ—আমাদের ইন্দ্রিয়জ বোধগুলি—আমাদের নির্মাণ-কর্মকে বেছে নিতে সাহায্য করে, যেটা অভিজ্ঞতা থেকেই যে একমাত্র আসতে পারে, এরকম কোনো ব্যাপার নয়। কিছু

১ Philipp Frank, Einstein. His Life and Times, p. 338-39

২ অর্থাৎ, শুধুমাত্র চোখে যা আপাতদৃষ্টিতে দেখছি।—অনুবাদক।

৩ এখানে নির্মাণ করা বলতে যুক্তির সাহায্যে কোনো পদ্ধতি বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কোনো ছবি নির্মাণ করার কথা বলা হচ্ছে। —অনুবাদক।

সাধারণ সূত্র থেকেও সেটা আসতে পারে, যেগুলির চরিত্র পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত না-হয়েও থাকতে পারে এবং যেগুলি আবার সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও দুনিয়াতে যতো কিছু জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে তার 'পরে ভিত্তি করে জগতের সাধারণ ধারণা থেকে আসতে পারে।

আইনস্টাইনের কাছে জগতের সাধারণ ধারণা এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণের থেকে সিদ্ধান্তগুলি এসেছে (যেমন নেপচুন গ্রহের অস্তিত্ব বলে দেওয়া সম্ভব হল একমাত্র ইউরেনাস গ্রহের গতির চরিত্র(১) থেকেই শুধু নয়, পরন্তু মহাবিশ্বের কার্যকারণ সম্পর্ক থেকে (২)); পরে পর্যবেক্ষণ করে মিলে গেছে—তাতে বিষয়ীমুখিতার (subjectivism) যা সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত চেহারা, অর্থাৎ, একজ্ঞাতাবাদ (solipsism) খণ্ডিত হয়েছে। 'সমালোচনার উত্তরে তাঁর জবাবে' (যেটা দিয়ে 'দার্শনিক বৈজ্ঞানিক' বইটি শেষ হচ্ছে) আইনস্টাইন বলছেন, পজিটিভিজম বা প্রত্যক্ষবাদের মূলগত দৃষ্টিভঙ্গি একই স্থানে এসে পৌঁছয়, যেটা হল বার্কলির সূত্র, 'অস্তিত্ববান হওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়া' (esse est percipi)। প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে সেরা যুক্তি আসছে জগতের সাধারণ ধারণার অবিরত স্বীকৃতি থেকে, তার অস্তিত্ব ও তার ঐক্যের স্বীকৃতি থেকে। যদি এই ধারণার 'পরে ভিত্তি করে কিন্তু ঘটনাবলী থেকে সরাসরি সিদ্ধান্ত না টেনে অভিজ্ঞতার দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়, তাহলে জ্ঞান তখন ঘটনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, যে বিষয়মুখী কারণগুলি রয়েছে তাকে সামনে মেলে ধরে। কাজেই তখন 'মনের স্বাধীন সৃষ্টি' আইনস্টাইনের চোখে বার্কলি ও তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে একটা যুক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

---

১ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের লেভেরিয়েরর এবং ইংলণ্ডের এডামস্ দুজনে আলাদাভাবে ইউরেনাস গ্রহের কক্ষপথের যে বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন তা থেকে হিসাব করে বলে দেন যে, ইউরেনাস্ থেকে আরও দূরে আরও একটি গ্রহ রয়েছে যার মাধ্যাকর্ষণের টানে ইউরেনাসের কক্ষপথের বিচ্যুতি হচ্ছে।—অনুবাদক।

২ অর্থাৎ, যদিও আগে বর্ণিত ইউরেনাস গ্রহের কক্ষপথের বিচ্যুতি লক্ষ্য করেই এটা বলা সম্ভব হল, তথাপি নিশ্চয়ই সেটাই একমাত্র কার্যকারণ নয়। মাধ্যাকর্ষণের সাধারণ নিয়ম এবং সূর্যের মহাকর্ষে গ্রহদের কক্ষপথের যে জটিলতা আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছিলেন সে সবই হিসাবের মধ্যে নিতে হবে।—অনুবাদক।

'খাঁটি গাণিতিক যুক্তি-নির্মাণ পদ্ধতি' আমাদের যে-সকল ধারণা ও নিয়ম তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে, তাদের আবিষ্কার করে প্রকৃতির ঘটনাবলীকে বোঝবার চাবিকাঠিটি আমাদের হাতে তুলে দেয় কেন? কেন বিশুদ্ধ চিন্তা বাস্তবকে বোধগম্য করার ক্ষেত্রে উপযোগী—যেভাবে আমাদের প্রাচীনরা কল্পনা করতেন?

এই সকল জ্ঞানতত্ত্বের বক্তব্য সত্তাবাদের কাছে যা স্বীকার্য (postulate) তার 'পরে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে: জগৎটা বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াগুলির এলোমেলো বিশৃঙ্খলার ব্যাপার নয়, এটা এমন একটা অবস্থা যাতে প্রকৃতির প্রক্রিয়াগুলিতে বিশ্বজনীন কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে, যা তাদের পথরেখা (বা বিকাশের ধারা) নির্ধারণ করে। আমরা এই সম্পর্ক দেখতে পাই ঘটনাবলীকে অতিক্রম করে (বা তার পেছনে কী কাজ করছে তা দেখতে পাই); তাদের পেছনে কী বিষয়মুখী কারণ রয়েছে সেটা পরীক্ষার (এক্‌স্‌পেরিমেন্টের) দ্বারা 'স্বাধীন'ভাবে নির্মাণ করে (অর্থাৎ, জগতের সাধারণ ধারণা থেকে, বিশেষভাবে কোনো পর্যবেক্ষণের দ্বারা পূর্ব থেকে নির্ধারিত কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছে) প্রমাণ করার জন্যে সম্মত হতে হবে।

এই ধরনের সত্তাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বের কাঠামো খাড়া করতে হলে ধরে নিতে হবে যে, অঙ্কের ফলাফলগুলি কোনো পাদার্থিক পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে মিলতে পারে বা না-ও পারে এবং সেটা অবিলম্বে সেই ধরনের প্রাচীন (বা গোড়ার দিকের) ধারণাগুলিকে দূর করে দেবে—যাতে ঘোষণা করা হয়, পর্যবেক্ষণের বস্তু বা বিষয়ের সাধারণ বর্ণনা হল জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য; অথবা যে-ধারণাতে বলা হচ্ছে যে, জ্যামিতির মূল কথাগুলি কোনো যুক্তি-ব্যতিরেকে মামুলিভাবে ধরে-নেওয়ার 'পরে (arbitrary conventions) অথবা মানুষের মনের মধ্যে যা পূর্ব-সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, তাতেই নিবদ্ধ রয়েছে।

আইনস্টাইন তাঁর 'পাদার্থিক বাস্তবতার ধারণার বিকাশে ম্যাক্সওয়েলের প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে 'মানুষের মনের স্বাধীন সৃষ্টি' বলতে কী বোঝাতে চান তা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পাদার্থিক বাস্তবতার বিষয়মুখী চরিত্র সম্পর্কে তাঁর আস্থা বিবৃত করে তিনি শুরু করেছেন:

"সকল প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করা যায় এমন বিষয়বস্তু থেকে স্বতন্ত্র বহির্জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস।" "যেহেতু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে আমরা কেবল বহির্জগৎ সম্পর্কে খবরা-

খবর পেতে পারি অথবা পরোক্ষভাবে 'পাদার্থিক বাস্তবতা'-কে জানতে পারি, সেহেতু শেষোক্তকে আমরা কেবল অনুমানের মাধ্যমেই ধরতে পারি। এ থেকে তাহলে এটা দাঁড়ায় যে, পাদার্থিক বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা কখনও চূড়ান্ত হতে পারে না। আমাদের সব সময়েই সেই সকল ধারণাকে, অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার জন্যে যে স্বতঃসিদ্ধ সূত্রগুলিকে (axioms) ধরে নিয়ে আমরা কাজ করি, বদলে নেবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে, যাতে সর্বাপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধ প্রথাতে পর্যবেক্ষণজাত তথ্যগুলির প্রতি সুবিচার করা যায়।"(১)

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের বিরুদ্ধে অনুমানমূলক যুক্তিকে খাড়া করার বিরোধী নন আইনস্টাইন। অনুমানমূলক চিন্তার সূত্র রয়েছে অভিজ্ঞতাতে, পূর্ব-থেকে ধরে-নেওয়া সিদ্ধান্তে নয়, যেটা কাণ্ট বলেছেন, অথবা মামুলিভাবে ধরে নেওয়া কোনো কিছুতে নয়, যা বলেছেন পোঁয়েকারে। এটা (অর্থাৎ, অনুমানমূলক যুক্তি—অনুবাদক) অবশ্যই ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-বোধের 'পরে যে ছাপগুলি পড়ে তার বিরুদ্ধে, বিশেষ করে যেখানে পাদার্থিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় যে-ছবি তার সঙ্গে তার মিল নেই। পূর্ব-থেকে সিদ্ধান্ত না-করার ধারণাগুলি এবং অনুমানমূলক নির্মাণের মামুলিভাবে ধরে-নেওয়ার চরিত্রটা দেখতে পাওয়া যায় এই তথ্য থেকে যে, তাদের, এমন কি পদার্থবিদ্যার মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ সূত্রগুলিকেও, কখনই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা যায় না। তাদের নির্ভর করতে হয় পর্যবেক্ষণের সমগ্রতার 'পরে অর্থাৎ সেই সকল পরীক্ষার 'পরে যাদের পর পর সারণীর মতো করে সাজিয়ে যাওয়ার কোনো শেষ নেই এবং যা পদার্থবিদ্যাকে বাস্তবতার সত্য চেহারা কী, সেই দিকে নিয়ে যায়। পদার্থবিদ্যার স্বতঃসিদ্ধ সূত্রগুলি কখনও চূড়ান্ত নয় এবং নিশ্চিতভাবেই এমন সময় আসে যখন তাকে সংশোধন করে নিতেই হবে। কিন্তু পর্যবেক্ষক থেকে পাদার্থিক বাস্তবতার স্বাতন্ত্র্যতাকে সংশোধন করা যায় না; সেটা সকল পদার্থবিদ্যার তত্ত্বের একেবারে সাধারণ স্বীকৃত ভিত্তি (premise)।

অতএব 'স্বাধীন সৃষ্টি' বলতে বোঝায় পর্যবেক্ষণের বিশেষ ও আংশিক ফলাফলগুলি থেকে মুক্তি এবং মহাবিশ্বের সাধারণ ধারণার 'পরে নির্ভরশীলতা, মনের 'পরে যে-সকল ছাপ পড়ছে, যে পরীক্ষাগুলি করা হচ্ছে, ও হাতে-নাতে যে

১ Ideas and Opinions, p. 266

অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে—তার সবকিছু। এ থেকে বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি বেরিয়ে আসে, সেগুলি পর্যবেক্ষণ থেকেই মাত্র বিশেষভাবে পাওয়া যায় না (যদিও তাদের আভাস পাওয়া যায়) এবং তারা মানুষের মনের সৃষ্টি। তাদের বলা হয়, 'হাইপোথেসিস' বা প্রকল্প এবং তাদের যেন 'আগাম লগ্নী' করা হয় যেটা পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে হবে, যাতে হয়তো সেগুলি বাতিল হয়ে যাবে অথবা তাদের দ্ব্যর্থহীন তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে।

প্রাচীনদের পরমাণুবাদ আইনস্টাইনের কাছে এইরকমই সাধারণ সূত্রগুলি থেকে পাওয়া হাইপোথেসিসের মডেল ছিল। ডেমোক্রিটাসের পদ্ধতি সম্পর্কে সোলোভিনের লেখা একটা বইয়ের সম্বন্ধে আইনস্টাইন ১০৫০ সালে লিখছেন যে, তিনি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ডেমোক্রিটাসকে দেখেন না, দেখেন তাঁর সমসাময়িক কালের লোক হিসেবে (এটা প্রসঙ্গত আইনস্টাইনের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেটা আমরা পরে আলোচনা করব)। আইনস্টাইনের কাছে, যেটার আবেদন ছিল সবচেয়ে বেশি সেটা হল পাদার্থিক কার্যকারণ সম্পর্কে ডেমোক্রিটাসের স্থির বিশ্বাস।

"পাদার্থিক বাস্তবতা সম্পর্কে এই দৃঢ় বিশ্বাসে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা **জ্ঞানী মানুষের** ইচ্ছাতেই দূরীভূত হয় না। যতদুর আমি জানি, একমাত্র স্পিনোজা ঐ ধরনের মৌলিক এবং অবিচলভাবে অবস্থান নিতেন।"(১)

আইনস্টাইনের কাছে প্রকৃতির আসল চেহারা হল পরমাণু ও তাদের গতি এবং তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে গঠিত একটা জগৎ—এটাই ছিল তাঁর বহুদিনের ধারণা। ব্রাউনীয় গতি সম্পর্কে তাঁর লেখাপত্রে দেখা গিয়েছিল যে, নিখিল বিশ্বের বিশিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে রয়েছে চলমান অণুগুলি যারা পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লাগাচ্ছে। তাঁর বিকীরণ তত্ত্বে আলোককে গতিশীল কণিকাদের সমষ্টি বলে ধরা হয়েছে। ধ্রুপদী যে ধারণাগুলিতে অপরিবর্তনশীল বস্তুকণিকা ছিল, আপেক্ষিক তত্ত্বে তার পরিবর্তে উপস্থিত করা হয়েছে পারস্পরিক গতিসম্পন্ন বস্তুকণিকাদের। এটা ঠিক যে, আইনস্টাইন শেষ অবধি কণিকাদের রূপান্তর ঘটার ধারণাতে গিয়ে পৌঁছন, যেটা এই আদর্শ (বা একেবারে ঠিকঠাক) পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খায় না। তবে এই

১ Solovine, p. 55

পরিণতির(১) বিষয়টি আইনস্টাইনের জীবনীর সঙ্গে ততটা সম্পর্কিত নয়, যতটা সম্পর্কিত তাঁর ভাবধারার জীবন-বৃত্তান্তের সঙ্গে।

আইনস্টাইন মনে করতেন যে, কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব একটা সীমা পর্যন্ত কয়েকটি সাধারণ ঝোঁকের 'পরে দাঁড়িয়ে বিকশিত হতে পারে: দুনিয়ার ছবিটার সম্পর্কে কয়েকটি প্রাথমিক প্রতিপাদ্যের সঙ্গে খুব সাধারণভাবে কয়েকটি তথ্যকে যুক্ত করে এবং ক্রমশ আগে থেকে মন-গড়া সূত্রগুলিকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। এই ধরনের তত্ত্বের পরীক্ষামূলক ফলাফল কী দাঁড়াবে সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। আমরা পরে দেখব, আইনস্টাইনের পাদার্থিক ধারণাগুলির ছক এই ধারাই অনুসরণ করেছে। আমরা আরও দেখব যে, জগতের বিষয়মুখী বাস্তবতাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেবলমাত্র স্বীকার করেই সেটা হতে পারত না; তার জন্যে সচেতনভাবে জ্ঞানতত্ত্ব ও সত্তাতত্ত্বের দিক থেকে বিশ্বাস ঘোষণার (credo) প্রয়োজন ছিল। 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' জগৎ, স্পিনোজার দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক বিকাশের সাধারণীকরণ আইনস্টাইনকে একটা বিশিষ্ট দার্শনিক মঞ্চে নিয়ে এসেছে। তাঁর পাদার্থিক আবিষ্কারগুলির জন্যে একটা প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত ছিল। সেগুলি আবার তাদের দিক থেকে জ্ঞানতত্ত্বের মতামত-গুলিকে পরিষ্কার করে দিয়েছে। মাখ-এর লেখাগুলিতে পরমাণুর বাস্তবতাকে বর্জন করার জন্যে জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে যে-মূল উৎসগুলি রয়েছে, ব্রাউনীয় গতির তত্ত্ব আইনস্টাইনকে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা এনে দিয়েছে। জাড্যজনিত এবং পরে ত্বরান্বিত গতির আপেক্ষিকতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এই তথ্য আরও পরিষ্কারভাবে সামনে এনে দিয়েছে যে, বাস্তবতা আমাদের জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র।(২)

ক্ষুদ্রাণু জগতের সমস্যাগুলি নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কের সময়ে আইনস্টাইন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি করে পজিটিভিজম বা প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে লাগলেন। পাদার্থিক বাস্তবতার বিষয়মুখী চরিত্রের সমর্থনে নতুন যুক্তিগুলিতে এবং মানুষের তাদের বোঝবার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হয়ে আইনস্টাইন অতীত সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিকোণের পথ ধরলেন; বিজ্ঞান সম্পর্কে

১ যে মতবাদ ও ধারণা অনুসারে তিনি বিশ্বজগৎ ও প্রকৃতির চেহারা দেখছেন।—অনুবাদক।

২ অর্থাৎ বাস্তবতার জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব রয়েছে—সে সম্পর্কে আমাদের বিষয়ীমুখী জ্ঞান থাক, বা না থাক।—অনুবাদক।

বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতে কী হবে সে সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন অতীতের মূল্যায়নের সঙ্গে মিশে গেল। এই বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ 'বারট্রাণ্ড রাসেলের জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য', যেটা ১৯৪৪ সালে রাসেলের 'জীবন্ত দার্শনিকদের লাইব্রেরী' (Library of Living Philosophers)(১) সম্পর্কে বইয়েতে লেখা হয়েছে, সেটা লক্ষ্য করতে হবে। তাতে মাখ-এর প্রপঞ্চভিত্তিক প্রত্যক্ষবাদ(২) অথবা পূর্ব-থেকে সিদ্ধান্ত এবং মামুলিভাবে তাকে গ্রহণ করার ধারণা, খাঁটি যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাধারা যে অভিজ্ঞতার থেকে স্বতন্ত্র—সেটা যে আইনস্টাইন গ্রহণ করেন নি, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এতে আরও দেখা যাবে যে, এই সকল জ্ঞানতত্ত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের বিরোধ আসছে তাঁর দার্শনিক অবস্থান থেকে এবং তার ভিত্তি রয়েছে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ইতিহাস-ব্যাখ্যার মধ্যে।

"দর্শনশাস্ত্রের শৈশবে", আইনস্টাইন লিখছেন, "সাধারণত এটা বিশ্বাস করা হতো যে, একমাত্র চিন্তা করেই যা-কিছু জানা দরকার তা পাওয়া সম্ভব।" এই মোহটা বরাবরই ছিল এবং আইনস্টাইন সেটা স্পিনোজাতেও পেয়েছিলেন। তিনি আরও বলছেন যে, এই 'ধরনের আরও' পূর্ব-থেকে সিদ্ধান্ত করার অভিজাতসুলভ জ্ঞানের বিপরীত হল সেই ধরনের "সাদামাটা সরল বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদ(৩) যাতে কোনো বিষয় বা বস্তু সেইরকমই যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রাহ্য হয়।" এই মোহ থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তি তথা সমগ্র বিজ্ঞান বস্তুকে যেভাবে বোঝে সেই পথের শুরু। কিন্তু পাদার্থিক বাস্তবতার পূর্বজাত ধারণার মতো এটাও বিজ্ঞানের শৈশব অবস্থার মধ্যেই পড়ে। প্রাচীনকালেই মানুষ আবিষ্কার করেছিল যে, মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণা ও জগৎপ্রপঞ্চের বিষয়মুখী কারণগুলির মধ্যে একটা প্রভেদ রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ীমুখী মনের 'পরে ছাপগুলি এবং বিষয়মুখী বাস্তবতার মধ্যে যে প্রভেদ তাকেই তাদের পথের বাঁক বলে ধরে নিয়েছে। হিউম এর থেকে জ্ঞানের কেবল প্রত্যক্ষবাদী

---

১ Ideas and Opinions, pp. 18-24

২ Phenomenalistic Empiricism—অর্থাৎ, জগৎপ্রপঞ্চে যা ঘটছে তা থেকে প্রত্যক্ষ যা দেখছি, তার উপর নির্ভর করে দার্শনিক মতামত তৈরী করা।
—অনুবাদক।

৩ Naive Realism, অর্থাৎ যে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ সূক্ষ্মভাবে কোনো কিছুকে তলিয়ে না-দেখে যা চোখে পড়ে তাই-ই সত্য বলে ধরে।—অনুবাদক।

পদ্ধতি সংক্রান্ত তাঁর সংশয়বাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন; তিনি এইভাবে দেখেছিলেন, আপাতদৃশ্য জগৎপ্রপঞ্চের পেছনে বিষয়মুখী যে-জগৎ লুকিয়ে রয়েছে, তার বিশ্লেষণ তারা করতে পারে নি।

তারপর, আইনস্টাইন আরও বলেছেন, কান্ট আসরে অবতীর্ণ হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, নিশ্চিতভাবে যে-জ্ঞান আমাদের রয়েছে তাকে যুক্তির মাধ্যমেই যাচাই করে নিতে হবে, এবং সেটা মন-নিরপেক্ষ বিষয়মুখী জগতের সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণাতে যা দাঁড়াবে তার সঙ্গে যে মিলবেই, এরকম কোনো কথা নেই। এতেই ফলত অজ্ঞেয়বাদের বিবর্তন সম্পূর্ণ হল। হিউমের মতানুসারে জ্ঞানের যা কিছুর উৎস রয়েছে প্রত্যক্ষবাদের মধ্যে সেটা কখনই নিশ্চিত নয় এবং তা থেকে ঘটনাবলীর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। কান্ট দেশ, কাল ও কার্যকারণ সম্পর্কে ধারণাগুলির বিষয়মুখী অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলতেন, তারা মানুষের মনের সৃষ্টি, বাইরের জগতের নয়। পরে অজ্ঞেয়বাদের দর্শন কেবলমাত্র হিউম ও কান্টের পুনরাবৃত্তি করেছে।

অতএব, ইতিহাসের দিক থেকে অজ্ঞেয়বাদের দুটো পারস্পরিক পরিপূরক ও সম্পর্কযুক্ত ঘরানা (বা স্কুল) গড়ে উঠেছে। এক পক্ষের কাছে প্রত্যক্ষবাদী পর্যবেক্ষণের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয় হল জ্ঞান। অন্যদের কাছে, যারা কান্টের অনুসরণ করে, মানুষের মনের মধ্যে পূর্ব-সিদ্ধান্ত করা যে ধারণাগুলি রয়েছে তারই বিকাশের ফলাফল হল জ্ঞান। পরে যখন বিজ্ঞান ধারণাগুলি বদলাবার চেষ্টা করেছে, যাকে কান্ট ধরে নিয়েছিলেন পূর্ব-জাত, অজ্ঞেয়বাদ তখন তাদের ফলাফল হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং সেগুলিকে প্রায়োগিক দিক থেকে মূল্যবান বলে ধরে নিয়েছে, সত্তাতত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্ব দেয় নি।

স্পিনোজার যুক্তিবাদ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদের সরাসরি উত্তরসূরী হচ্ছেন আইনস্টাইন। এইজন্যে তিনি মনে করতেন যে, মানুষের মন প্রকৃতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান আহরণ করতে পারে; অতএব মন দিয়ে যা নির্মাণ করা যায় তার বিষয়মুখী সত্তাতত্ত্বগত মূল্য আছে। তবে মন তার 'স্বাধীন নির্মাণে' বাস্তব জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রত্যয়ের (concept) মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য চিত্র গড়ে তোলে, যার থেকে পরীক্ষা করে সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায়।

এটাই আইনস্টাইনের জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক বক্তব্য; স্পিনোজার যুক্তিবাদের সাধারণ গৃহীত প্রতিপাদ্য (premise) থেকে এটা এসেছে এবং এটা সবরকমের

প্রত্যক্ষবাদী ঘরানার বিপক্ষে। বহুবার আইনস্টাইন এটাকে জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এটাই যে, তাঁর পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির বিকাশে এটাই ছিল নির্দেশক সূত্র।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আইনস্টাইন প্রত্যক্ষবাদের সমালোচনা করেছেন। প্রত্যক্ষবাদীদের ক্ষেত্রে "যে সকল ধারণা ও সিদ্ধান্ত সংবেদন থেকে স্বাভাবিক বা অপরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যায় না, সেগুলির 'আধিবিদ্যক' চরিত্রের জন্যে তাদের চিন্তা থেকে দূর করে দিতে হবে।" কিন্তু "এই দাবিকে (অর্থাৎ, দূর করে দেবার দাবিকে—অনুবাদক) যদি ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে যে কোনো ধরনের চিন্তাকে পুরোপুরি 'আধিবিদ্যক' বলে বাদ দেওয়া সম্ভব। চিন্তা 'অধিবিদ্যা'-র পর্যায়ে অথবা ফাঁকা আওয়াজে যাতে পর্যবসিত না হয়, তার জন্যে ধারণাগত পদ্ধতির পর্যাপ্তসংখ্যক সূত্রকে সংবেদনজাত অভিজ্ঞতার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করতে হবে ..."(১)

এই থিসিসটি আপেক্ষিক তত্ত্ব, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে প্রযুক্ত ও পরীক্ষিত হয়; হিউমের দর্শন সম্পর্কে কিছুটা সহানুভূতির রেশ থেকে যাওয়া সত্ত্বেও—এই তত্ত্বের দ্বারা আইনস্টাইনের পক্ষে এটা দেখা সম্ভব হয়েছিল যে, বিষয়মুখী সত্যের অনুসন্ধানের সঙ্গে 'অধিবিদ্যা'-কে এক করে দেখা শুরু হয়েছে হিউমে। বস্তুত, তিনি লিখেছেন যে, হিউমই "দর্শনের ক্ষেত্রে বিপদের সৃষ্টি করে গেছেন, যখন তাঁর সমালোচনাকে অনুসরণ করে 'অধিবিদ্যা সম্পর্কে মারাত্মক ভয়ের' সৃষ্টি হয়েছে, যেটা সমসাময়িক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকতায় (বা মতামতের তর্কতে—অনুবাদক) একটা যেন ব্যাধির সৃষ্টি করেছে; এই ব্যাধি পূর্বেকার শূন্যচারী দার্শনিকতার(২) পাল্টা ব্যাপার, যেটা মনে করত যে, বোধেন্দ্রিয়গুলি থেকে যা পাওয়া যায় তাকে অগ্রাহ্য এবং নরবাদ করা সম্ভব।"(৩)

আইনস্টাইন 'অধিবিদ্যা' সম্পর্কে প্রত্যক্ষবাদী এই 'ভয়ের' ব্যাপারটা বারট্রাণ্ড রাসেলের যুক্তি-গঠনের মধ্যে পেয়েছেন, বিশেষ করে পেয়েছেন তাঁর 'ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রকৃতিসম্পন্ন একগুচ্ছ সূত্রের' ধারণার মধ্যে।

---

১ Ideas and Opinions, p. 23

২ অর্থাৎ, মাটির পৃথিবীর সঙ্গে, তথা বাস্তব জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক যার নেই।—অনুবাদক।

৩ Ibid, p. 24

সারা জীবন ধরেই আইনস্টাইনের জ্ঞানতত্ত্বের মতামতগুলি বিকশিত হয়েছে। তিনি কখনও এমন কোনো প্রতিষ্ঠিত সমাধানে লেগে থাকতেন না, যে সমাধানগুলিকে পরে বিশেষ পাদার্থিক সমস্যাতে অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রয়োগ করা যায়। জ্ঞানতত্ত্বের ধারণাগুলির বিকাশ ও বিস্তার তাদের প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে মিলে গেছে, কখনও কখনও পাদার্থিক ধারণাগুলি থেকে এগিয়ে গেছে, কখনও কখনও তাদের অনুসরণ করেছে। আইনস্টাইনের জ্ঞানতত্ত্বের সূত্রগুলি কখনও তাঁর পাদার্থিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি ও সংহতি লাভ করে নি।

এই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, তাঁর জ্ঞানতত্ত্বগত বিশ্বাসের ঘোষণার ভিত্তি তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের রূপায়ণের পূর্বেই করা হয়েছে। এটা তখনও ধোঁয়াটে ছিল এবং প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান বরঞ্চ রূপ পেয়েছে বিষয়মুখী ও জ্ঞেয় মহাবিশ্বের সুসঙ্গতির ক্ষেত্রে। এটা বহু গভীরে গাঁথা তাঁর জীবনে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করেছে, এটা তাঁর আগ্রহ, তাঁর নৈতিক মতামত এবং নান্দনিক আনুগত্যকে নির্ধারণ করেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দস্তয়েভ্‌স্কি ও মোৎসার্ট

দস্তয়েভস্কি অন্য যে কোনো চিন্তাবিদের থেকে, গাউস (১) থেকে আমাকে বেশি দিয়েছেন।

আইনস্টাইন

একদিন আরাই স্কুলের থাকার ঘরে আইনস্টাইন ও আমি একত্র হয়েছিলাম, সেখানে মোৎসার্টের সোনাটাগুলি বাজিয়ে আমরা সবসময়েই খুব আনন্দ পেতাম। আইনস্টাইনের বেহালা যখন বাজতে শুরু করল মনে হল ঘরের দেওয়ালগুলি সরে গেছে এবং এই সর্বপ্রথম আসল মোৎসার্ট তাঁর খাঁটি পর্দাগুলি নিয়ে, তার সমস্ত গ্রীসীয় সৌন্দর্য (২) নিয়ে আমার সামনে হাজির হলেন, সেগুলি আপন প্রসাদগুণে তাদের প্রগাঢ় মহিমা নিয়ে যেন খেলে বেড়াতে লাগল। "এটা স্বর্গীয়, আমাদের আবার বাজাতে হবে!" বলে উঠলেন আইনস্টাইন।

হ্যানস বাইল্যাণ্ড

আইনস্টাইন সেই রকম একজন পদার্থবিদের বিরল উদাহরণ যাঁর মধ্যে নান্দনিক রসবোধ ও ঝোঁকগুলির সঙ্গে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা গেঁথে গিয়েছিল। এটা নয় যে পাদার্থিক মতামতগুলো প্রকাশ করতে তিনি নান্দনিক সূত্রগুলির প্রয়োগ করতেন। এই ধরনের প্রকাশ সাহিত্যের ইতিহাসে

১ কার্ল এফ গাউস (১৭৭৭-১৮৫৫)—জার্মান গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী। —অনুবাদক।

২ Hellenic Beauty—গ্রীসের স্থাপত্য ও শিল্পকার্যের সৌন্দর্য হচ্ছে তার সারল্য ও সুষমা, সেটাই এখানে বলা হচ্ছে।—অনুবাদক।

লুক্রেটিয়াসের শিক্ষামূলক (didactic) কবিতার ক্যাবিন্যাক স্টাইলের মধ্যে পাওয়া যায়। ইতালিয়ান ভাষাতে গদ্য লেখার জন্যে কী রীতিনীতি পালন করতে হবে তার উদাহরণ হয়ে রয়েছে গ্যালিলিওর রচনাবলী। এখানে আমরা ভিন্ন ধরনের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

যে জটিলতা ও আপাতবিরোধী তথ্যগুলি থেকে মামুলি যুক্তিসিদ্ধ নির্মাণ ছেড়ে দিয়ে কাউকে নতুন পথের আশ্রয় নিতে হয়, তার কথা আইনস্টাইন বলেছেন। প্রথম দিকে প্রায় সহজাত প্রেরণা থেকেই এই নতুন পথে চলা শুরু করতে হয়। বিজ্ঞানীর মনে এই জটিল ও আপাতবিরোধী তথ্য কয়েকটি একই ধরনের পর পর সাজানো ধোঁয়াটে বিচিত্র ধারণার সৃষ্টি করে। এটা যেন পুরো ব্যাপারটা, যা থেকে সে সিদ্ধান্তগুলি টানছে এবং তাতে পৌঁছেছে, সে দেখতে পাচ্ছে যে, পরপর গ্রন্থিযুক্ত সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে যে জটিলতা ও আপাতবিরোধী চরিত্র রয়েছে তা থেকে পর্যবেক্ষিত তথ্যের জটিলতাকে সরিয়ে ফেলা যায়। মোৎসার্ট সৃষ্টির সেই মহত্তম মুহূর্তের কথা বলেছেন, যখন সুরকার একটা অলিখিত সিম্ফনির(১) সবটা মুহূর্তের জন্যে যেন শুনতে পাচ্ছেন। আইনস্টাইন যেভাবে দেখেছিলেন, তাতে স্বতঃলব্ধ জ্ঞান (intuition) বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির পক্ষে অনিবার্য, এই উপাদানই বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির সঙ্গে শৈল্পিক সৃজনশীলতাকে যুক্ত করে দেয়। তিনি নৈতিক স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের কথাও বলেছেন। ১৯৫৩ সালে তাঁর এক পুরোনো বন্ধুর কাছে তিনি লিখছেন :

"কুকুর ও বাচ্চা ছেলেরা চট্ করে ভালো লোককে দুষ্ট লোক থেকে আলাদা করে দেখতে পারে ; তাদের 'পরে প্রথমেই যে প্রভাব পড়ে তার দ্বারা চালিত হয়ে তারা ভালো লোককে বিশ্বাস করে এবং মন্দ লোক থেকে দূরে থাকে। সাধারণত তাদের ভুল হয় না, যদিও তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে না অথবা তাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ঐ মানুষগুলির চেহারা নিয়েও হিসাব করে না।"(২)

নৈতিকভাবে স্বতঃলব্ধ জ্ঞান কী হতে পারে সেটা আইনস্টাইনের কাছে ডন্ কুইকসট-এর ভাবমূর্তিতে ছিল এবং সারভানতিস্-এর মহৎ উপন্যাসটি তিনি

১ Unwritten Symphony—ইউরোপীয় সিম্ফনি বা সংধ্বনির পুরোপুরি পর্দা ও তার চারটি স্তবক (movement) সাজিয়ে লিখে ফেলা হয়। —অনুবাদক।

২ Helle Zeit, S. 55

কয়েকবার পড়েন, বিশেষ করে শেষের বছরগুলিতে। লা মাঞ্চার ভ্রাম্যমান নাইটের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি নানারকমের ভ্রান্তিতে মোহগ্রস্ত; সেটা কি কোনোভাবে যুক্তিসিদ্ধ চিন্তার মেধার পক্ষে সহায়ক হতে পারত ?

আইনস্টাইনের যুক্তিবাদ ছিল 'আপাতপ্রতীয়মান ব্যাপার থেকে পলায়ন' ; বিশ্বসাহিত্যে ডন্ কুইকসৃট-এর জুড়ি নেই, যেখানে একজন মানুষকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যার তীব্র অথচ মোহগ্রস্ত আবেগময় জীবনটা অন্য সকল প্রাত্যহিক স্বার্থকে ছাড়িয়ে যায়। ভালো ও মন্দের মধ্যে সহজাতভাবে বেছে নেবার প্রতীক ডন্ কুইকসৃট, বিশ্বসাহিত্যের একেবারে খাঁটি আত্মা ; তাই এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের একেবারে খাঁটি আত্মা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এই আকর্ষণ যে কত বেশি ছিল সেই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাবে ম্যাক্স বোরন্‌কে লেখা একটা চিঠি থেকে : "প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে নিজের আত্মসংহতির প্রতিভূ হয়ে ওঠা এবং সাহসের সঙ্গে নিজের নৈতিক আস্থাকে সন্দেহবাদীদের মধ্যে বাস করেও তুলে ধরা। বহু বছর ধরে আমি এইভাবেই কাজ করার চেষ্টা করেছি, অবশ্য সফলতা সব সময়ে হয় নি।"

বিজ্ঞান ও নৈতিকতার মৌলিক সমস্যাগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হওয়াতে আইনস্টাইন দস্তয়েভস্কির কাছাকাছি চলে এসেছিলেন, যদিও আইনস্টাইনের কাছে কেন্দ্রবিন্দু বিজ্ঞান, যেমন দস্তয়েভস্কির কাছে ছিল নৈতিক জগৎ। দস্তয়েভস্কি-র 'ইডিয়ট' বইতে একটা দৃশ্য আছে যাতে প্রিন্স মিস্‌কিন একজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মানুষের মানসিক আবেগের কথা বলছেন। জেনারেল ইয়েপানচিন-এর দরওয়ানের সঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ অবস্থায় কথা বলতে গিয়ে তার মতামতকে সে ব্যক্ত করছে। কিন্তু তুচ্ছ এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে তার প্রধান সমস্যার রূপরেখাটি ধরা পড়ে। আইনস্টাইনও তেমনি যে-কোনো অবস্থা ও পরিস্থিতিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান দিকগুলিকে তুলে ধরতে পারতেন। এটা করতে গিয়ে চিরাচরিত ধারণাগুলিকে তিনি এমনভাবে হঠাৎ ভেঙ্গে দিতেন যা ঠিক ভেবে ওঠা যেত না।

যে যুক্তিসম্মত ও মানসিক পথ পরিক্রমা করে আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্বে পৌঁছেছেন, তাতে তাঁর এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে অবাক হতে হয় যে, জগৎকে যেন তিনি প্রথম সদ্য ফুটে ওঠা চোখ দিয়ে দেখছেন, যাতে আগেকার কোনো চিরাচরিত মামুলি মনোভাব তাঁর ঘাড়ে চেপে নেই। সাহিত্যে বোধ হয় একমাত্র লেভ্ তলস্তয় ছাড়া আর কারুর এরকমের ক্ষমতা এত বেশি ছিল না।

এতেই জগতের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত ধারণার সমন্বয় ফুটে উঠেছে। আইনস্টাইন বলছেন, "বৈজ্ঞানিক চিন্তাতে সব সময়েই কাব্যিক উপাদান আছে। ভালো বিজ্ঞান ও ভালো সঙ্গীত তারিফ করতে হলে অংশত একই ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।"

তারপর বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক সৃষ্টির দ্বিতীয় দিকটা আসে। পুরোনো, অভ্যাসগত অনুসঙ্গগুলি ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রথাগত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তব তার টাটকা, আপাতবিরোধী বর্ণসুষমায় চোখের সামনে ঝলমল করে ওঠে। দস্তয়েভস্কি তাঁর চরিত্রগুলিকে 'নির্মম পরীক্ষা'-র মাধ্যমে এই ব্যাপারটা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। খুব কঠোর, প্রায় অসহনীয় অবস্থার মধ্যে তিনি তাদের রেখেছেন এবং এইভাবে মানুষের মন ও চরিত্রের এমন কয়েকটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যা সাধারণ অবস্থাতে লুকানো থাকত।

বিজ্ঞানীও তেমনি যখন এমন ফলাফল পেতে চান যেটা অন্যথা লুকিয়ে থাকত, তখন তিনি প্রকৃতিকে এইরকমের 'নির্মম পরীক্ষা'-র সামনে হাজির করেন। একটা গতিশীল বস্তু যখন আলোর কাছাকাছি গতিবেগ নিয়ে ধাবমান হয় তখন সেই 'নির্মম পরীক্ষা'-র সামনে তার আচরণ কী ধরনের? অত্যন্ত আপাতবিরোধী।

এর পরের ধাপ হচ্ছে বিশুদ্ধ চিন্তা, যেখানে কোনো বস্তু-দেহের জটিল আপাতবিরোধী আচরণকে দেশ ও কালের একেবারে সাধারণ অবস্থা থেকে বুঝে নিতে হয়। যেটা গোড়াতে ছিল একটা আপাতবিরোধী আচরণ সেটা বিশ্ব-সুষমার মধ্যে তার স্বাভাবিক স্থান খুঁজে পায়।

বিশ্বের শিল্পগত উপলব্ধিও তেমনি অনুরূপ কতকগুলি স্তরের মধ্যে দিয়ে যায়। পূর্ব সিদ্ধান্তজাত যুক্তি-নির্মাণের মতো 'খুঁটি বর্ণনা' মাত্র করলে সেটা সৃষ্টিশীল কাজের চৌহদ্দির বাইরেই থেকে যাবে। একটা ছবির (বা ভাবমূর্তির) সামগ্রিকতা, যে খুঁটিনাটিগুলি তার বৈশিষ্ট্যকে চিত্রিত করে তার সুসঙ্গতি (যার মধ্যে বিষম(১) পর্দা লাগানো যেতে পারে কিন্তু খাপছাড়া বেওয়ারিশ নয়)

১ পশ্চিমী ইউরোপীয় সঙ্গীতে harmony বা স্বরসঙ্গতির নিয়ম আমাদের monophonic বা ঐক্যতানিক ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত থেকে আরও জটিল। বিভিন্ন যন্ত্র বাঁধা হয়, ষড়জ, গান্ধার, পঞ্চম, এইরকমের স্বরসঙ্গতি বা harmonic স্কেলে বা ঠাটে। এর মধ্যে dissonance বা discord, যাকে আমরা বিষম পর্দা বলে এখানে অভিহিত করলাম, তা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সেই ব্যবহারেও নিয়ম মানতে হবে, একেবারে খাপছাড়া নয়।

—অনুবাদক

এবং প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রয়োজনীয়তা একটা বৈজ্ঞানিক ছবির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যময় চেহারার সঙ্গে মিলে যায়।

দস্তয়েভস্কি-র বর্ণনার সঙ্গীত অনেক সময়েই অত্যন্ত কর্কশ। ঠিক পরের ক্রিয়া বা উক্তি কী হবে, যন্ত্রণাপীড়িত আত্মাতে নতুন কী ঝড় উঠবে বা ঘটনাবলী কী রকমের মোড় নেবে, তা আগে থেকে বলে দেওয়া অসম্ভবই বলা যেতে পারে। কিন্তু সবকিছু বলে দেওয়ার ও করে ফেলার পরে যেটা মনে হবে সেটা হল, এটা একমাত্র এইভাবেই হতে পারত। এই আপাতবিরোধী জটিলতার সঙ্গে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছবার এবং চারিত্রিক বিকাশে সত্যকে অনিবার্যরূপে প্রকাশ করার জন্যেই দস্তয়েভস্কি-র সাহিত্যের প্রভাব এত বেশি। জটিল আপাতবিরোধী ঘটনাবলীর মধ্যে থেকে যা অপ্রতিরোধ্য আকারে বেরিয়ে আসে সেটাই পাঠকের মনে মননশীল ও আবেগময় টানা-পোড়েনের সৃষ্টি করে।

দস্তয়েভস্কির কাজের এই বৈশিষ্ট্য (যেটা সকল শিল্পকলার পক্ষেই সত্য কিন্তু যাকে একটা নিটোল বিন্দুতে নিয়ে আসা হয়েছে) পাদার্থিক বাস্তবতার জটিল আপাতবিরোধী চরিত্রের সঙ্গে যেন একই পর্দায় বাঁধা, এটা অসম্ভব গোলকধাঁধার জটিলতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা—যেটা আইনস্টাইনের কাজের মধ্যে এত পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

'সুষমা' ও 'সাঙ্গীতিকতা'—এই দুটি শব্দ আইনস্টাইন ও দস্তয়েভস্কির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এগুলি আইনস্টাইনের একেবারে অন্তরের চিন্তা ও আবেগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং তিনি তার প্রবন্ধ ও রচনায় বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে এবং সাক্ষাৎকারে এগুলি বহুবার ব্যবহার করেছেন। ম্যাক্স প্ল্যাংকের ৬০তম জন্মবার্ষিকীতে ১৯১৮ সালের মে মাসে আইনস্টাইন যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটা আমরা এখানে উল্লেখ করব।(১) একদিকে সেটা খানিকটা আত্মজীবনীমূলক কারণ প্ল্যাংকের অনেক বৈশিষ্ট্য আইনস্টাইনের মধ্যে ছিল, যেগুলির আবেদন তাঁর কাছে ছিল খুব বেশি।

অন্তরের যে প্রেরণা থেকে মানুষ বিজ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করে তার ব্যাখ্যা করে আইনস্টাইন লেখা শুরু করেছিলেন। তিনি বলছেন, অনেকে বিজ্ঞানকে জীবনে গ্রহণ করে উন্নত মননশীল ক্ষমতার আনন্দময় ধারণা থেকে; তাদের নিজেদের স্পষ্ট অভিজ্ঞতা ও নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যে

১ Ideas and Opinions, pp. 224-27

বিজ্ঞান তাদের কাছে সেই ধরনের একটা বিশেষ খেলার মতন, আরও অনেকে বিজ্ঞানের জগতে আসে নিছক ব্যবহারিক উদ্দেশ্যসাধনে। কিন্তু তৃতীয় আর এক ধরনের মানুষ আছে, তারা দৈনন্দিন জীবন থেকে সরে এসে বিজ্ঞান বা শিল্পে আশ্রয় নিতে পারে। তারা জীবনের যন্ত্রণাময় স্থূলতা ও নৈরাশ্যজনক একঘেঁয়েমির দ্বারা নিপীড়িত হয়; তারা ব্যক্তিগত জীবন থেকে পালিয়ে এসে জগৎকে বিষয়মুখীভাবে জানার ও চিন্তা করার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। "এই আকাঙ্ক্ষাকে" আইনস্টাইন বলছেন. "একজন শহরবাসীর তার চারপাশের হট্টগোল, ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে উন্নত পর্বত-শীর্ষের শান্ত নৈঃশব্দে চলে যাবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—যেখানে শান্ত বিশুদ্ধ বাতাসে চিরকালের জন্যে সৃষ্টি হয়ে রয়েছে এমন দৃশ্যাবলী যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।"(১)

'দৈনন্দিন জীবন থেকে পলায়ন' করার সামাজিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যাক।

আইনস্টাইন জানতেন এই আকাঙ্ক্ষাগুলি একজন বিজ্ঞানীকে **কোথায়** নিয়ে যায় কিন্তু **কোথা থেকে** তাদের উৎপত্তি তা তিনি জানতেন না। তাদের সূত্র রয়েছে, নিশ্চিতভাবেই দৈনন্দিন জীবনের বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব ও একঘেঁয়েমির সঙ্গে সুষমাময় আদর্শের যে-সংঘাত রয়েছে, তার মধ্যে। দৈনন্দিন জীবন একঘেঁয়ে কারণ 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' আদর্শের প্রতি আনুগত্য দিয়ে একে পূর্ণ করে তোলা হয় নি। সুষমার অনুসন্ধানে মানুষ বিজ্ঞান ও শিল্পকর্মের সৃষ্টি করে। কিন্তু যে-সুষমাকে আদর্শের মাধ্যমে জীবনে প্রতিভাত করা যায় না, মানুষ তাতে নিশ্চয়ই বাঁধা থাকে না। সে দৈনন্দিন জীবনে সুষমা সৃষ্টির জন্যে চেষ্টা করে এবং খুঁজে পায়। এই অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের ভাবনাতে ক্রমশ এটা পরিষ্কার হয় যে, দৈনন্দিন জীবনের বিশৃঙ্খলা আসলে মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলার জন্যেই হয়েছে। সামাজিক বিকাশের বিষয়মুখী শক্তিগুলিকে মানুষ আবিষ্কার করে যেটা নিশ্চিতভাবেই বিশৃঙ্খলা থেকে সুষমার জগতে উত্তরণ ঘটায়।

সকল পথের শেষ এক জায়গাতেই(২) এবং বিংশ শতাব্দীতে সেটা আগের

১ Ibid., p. 227

২ All roads lead to Rome—রোমে গিয়ে সব পথের শেষ বা পরিণতি। —অনুবাদক।

চাইতে আরও বেশি করে পরিষ্কার হয়েছে। দস্তয়েভস্কির আত্মা (বা মানসিক আকৃতি) সুষমার আকাঙ্ক্ষায় আক্ষরিক অর্থেই যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হতো; তিনি সামাজিক কর্মসূচিতে ইতিবাচক কিছু দেখতে পান নি এবং তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুষমার সন্ধান না পেলেও সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে তিনি এই সুষমা লাভ করেছিলেন। মানুষকে সামাজিক সুসঙ্গতির দিকে এবং সর্ব ধ্বংস-কারী বিশৃঙ্খলার দিকে কোন্ শক্তিগুলি নিয়ে যায়—এ সম্পর্কে আইনস্টাইন যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। কিন্তু সামাজিক পরিমণ্ডলে তাঁর ভাবনা চিন্তা পরিষ্কার ও একেবারে সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে নি এবং 'দৈনন্দিন জীবন থেকে অব্যাহতি লাভের' সামাজিক সূত্রগুলির চাইতে তার বৈজ্ঞানিক ফলাফল সম্পর্কে তিনি অনেক বেশি অবহিত ছিলেন।

এরই কাছাকাছি হল, যাকে বলা হয়েছে বৈজ্ঞানিক কার্যোপযোগিতাবাদ (utilitaria nism) সম্পর্কে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গি। যদিও তিনি এটা স্বীকার করেছেন যে, কার্যোপযোগিতার উপরে নির্ভর করে যে বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের মন্দির গড়ে তুলতে একটা বড়ো অবদান রেখেছে, তথাপি তিনি তাদের বিজ্ঞানের আসল **বাছাই-করা** মানুষ বলে মনে করেন না। সারা জীবন আইনস্টাইন দেখেছেন যে, বিজ্ঞানের 'পরে কার্যোপযোগিতার দাবি যেটা করা হয়ে থাকে(১) সেটা বিজ্ঞানকে তার আদর্শ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে, নিশ্চয়ই উল্টো দিকে। বিজ্ঞানের কার্যোপযোগিতার উদ্দেশ্যের প্রতি আইনস্টাইনের অনীহা আসলে তাঁর সুষমান্বিত সমাজের আদর্শেরই একটা প্রকাশ, যেখানে কার্যোপযোগিতার স্বার্থ বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত আসল আদর্শের সঙ্গে মিলে যায়।

এই আদর্শগুলি কী? আইনস্টাইন যেভাবে দেখেছেন, তাতে বিজ্ঞানে ও সৃষ্টিশীল শিল্পের ক্ষেত্রে তারা একই। বিজ্ঞানী ও শিল্পী উভয়ে একটা ছবি তৈরি করার চেষ্টা করে, যা সুষমায় মণ্ডিত।

দস্তয়েভস্কির আইনস্টাইনের সঙ্গে মিল রয়েছে—আমরা বলতে পারি এইখানে যে, তাঁর (দস্তয়েভস্কির) বর্ণনাতে এমন একটি সুষমা রয়েছে, রয়েছে এমন একটা তাঁর জগৎ যেখানে একেবারেই আশা করা যায় না এমন ব্যাপার

১ অর্থাৎ একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আশু কাজে লাগছে কি, না, তা দিয়ে তার গুণাগুণ বিচার করা হবে।—অনুবাদক।

হঠাৎ মোড় নিলেও তার যুক্তিগ্রাহ্য সাফাই পাওয়া যেতে পারে, সেটা যেন 'ইউক্লিডের বাইরের'(১) জগৎ।

বস্তুত, 'কারামাজভ ভাইদের' বইতে ইভান কারামাজভ 'অ-ইউক্লিডীয় বাস্তবতা'-কে একরকমের বিশ্বজনীন সুষমা ব'লে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "একজন সদ্যজাত শিশুর মতো আমার বিশ্বাস আছে যে, কষ্ট সেরেও যায় এবং কমেও যায়। মানবিক দ্বন্দ্বের ছোটখাটো কমেডি দুঃস্বপ্নের মতোই মিলিয়ে যাবে, মিলিয়ে যাবে ক্ষুদ্র ইতর ইউক্লিডীয় মনের নোংরা পাঁচমিশালী জিনিসের মতন। শেষ অবধি, দুনিয়ার শেষ অঙ্কে, পরম সুষমায় উত্তীর্ণ হবার মুহূর্তে এমন একটা মূল্যবান কিছু ঘটবে বা দেখা দেবে যা সকলের হৃদয়ের পক্ষে যথেষ্ট হবে, যেটা সকল রকমের ভ্রান্তিকে সরিয়ে দেবে এবং মানুষ যতো রকমের খারাপ কাজ ও তারা যতো রক্তপাত করেছে তার জবাবদিহি করবে।"

দস্তয়েভস্কি 'অ-ইউক্লিডীয়' সুষমার জন্যে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। এটা এমন একটা আকাঙ্ক্ষা, যেটা তাঁর বাইরের পাঠকদের মন কেড়ে নেয়। তিনি জানতেন যে, একমাত্র 'ইউক্লিডীয় জগতের' চৌহদ্দির বাইরেই নৈতিক সুষমার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে; তিনি জানতেন যে, চিরাচরিত বিশ্বাসকে আঁকড়ে তিনি ধরে আছেন খড়কুটোর মতো, তার প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা চলে গেছে, কিন্তু ক্ষতিটা হয়েই গেছে, সন্দেহের স্রোতোধারা অতি দ্রুত এবং ঐতিহ্যের খড়কুটো তাতে কোন কাজে লাগে না।

নিশ্চয়ই বলতে হয় যে, দস্তয়েভস্কির 'অ-ইউক্লিডীয়' জগতের সঙ্গে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের অ-ইউক্লিডীয় জগতের কোনো সম্পর্ক নেই। আইনস্টাইনের উপর দস্তয়েভস্কির প্রভাব নিছক মানসিক চরিত্রেরই ছিল। সুষমাময় ছবির জন্যে যে অনুসন্ধান, যাতে জীবনের অ-সাধারণ তথ্যগুলি তাদের জটিল

---

১ ইউক্লিডের জ্যামিতিতে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে তার সবই সমতলের ভিত্তিতে গঠিত বলে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসম্মত বলে মনে হয়। কিন্তু মণ্ডলের (spherical) বা খ-গোলের (celestial) জ্যামিতিতে এই যুক্তিগ্রাহ্যতা পাওয়া যায় না। যেমন আমরা জানি একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হল ১৮০° ডিগ্রি। কিন্তু এই ত্রিভুজটিকে যদি সমতলে না এঁকে, একটা বলের গায়ে (মণ্ডলের) আঁকি বা ভেতরে আঁকি তাহলে দেখা যাবে তার তিনটি কোণের সমষ্টি ১৮০° ডিগ্রি থেকে বেশি বা কম হচ্ছে।—অনুবাদক।

প্রতিঘাতমূলক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ছেড়ে দেয়, সেটা আরও নিবিড়-ও ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে, যখন বিজ্ঞানী দুনিয়ার অগাধ জটিলতা এবং সেই সঙ্গে তার দ্বান্দ্বিক ও আপাতবিরোধী ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্ক উপলব্ধি করে উঠতে পারেন।

বোর যেরকম 'পাগলামি'র কথা বলেছেন, বিজ্ঞান যখন তার জন্যে তৈরি থাকে, তখন শক্তিশালী মানসিক নেশার মতো উত্তেজক (stimulus) দিয়ে অভ্যস্ত সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলিকে নাড়া দেওয়াটা ভাল, যেমন দস্তয়েভস্কির মতো মর্যাদাসম্পন্ন শিল্পী করে থাকেন। রুশ জীববিজ্ঞানী তিমিরাজিয়েভ প্রজনন-বিদ্যায় (Genetics) যা করেছেন সেটার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। প্রজনন-বিজ্ঞানীরা, তিনি লিখছেন, জীবদেহের উপর এমন পদ্ধতিতে কাজ করতে পারে, যাতে তাদের বংশানুক্রমিক ভিত্তিটা ভেঙ্গে দেওয়া যায় এবং তাদের মূল বৈশিষ্ট্যযুক্ত যেটা ছিল (টাইপ) তা থেকে অনেক বিচ্যুতি হতে পারে, যার থেকে ব্যবহারযোগ্য গুণ বেছে নেওয়া যেতে পারে এবং তাদের পুনরাবৃত্তির (অর্থাৎ তাদের বৈশিষ্ট্যটুকু নিয়ে আবার জন্ম হতে পারে—অনুবাদক) ব্যবস্থা করতে পারে। এই পদ্ধতিকে ফরাসি শব্দ affoler দিয়ে বর্ণনা করা হয়, যার অর্থ 'তাদের পাগল করে দেওয়া।'

সাহিত্য মাঝে মাঝে অনুরূপ প্রভাব বিজ্ঞানের উপরে বিস্তার করে। সাহিত্য নতুন ভাবনা-চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা যোগায়। আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে এর ধাক্কা (বা প্রভাব) বিশেষভাবে বড়ো হয়ে ওঠে যদি কোনো লেখক তাঁর রচনায়, 'অ-ইউক্লিডীয়' আপাতবিরোধী সুসঙ্গতির পরিচয় দেন। আমার মনে হয়, আইনস্টাইন দস্তয়েভস্কির প্রতিভাতে প্রায়শই অবহেলিত এবং কদাচিৎ বিশ্লেষিত এই দিকটার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বেশির ভাগ পাঠকের ক্ষেত্রে দস্তয়েভস্কির প্রধান ধাক্কা যেটা পড়ে তিনি যে অ-স্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, সেটাই। দস্তয়েভস্কির লেখাতে মন ও আত্মার যে হৃদয়-বিদারক তাড়না প্রকাশ পায় খুব বেশি লোক তা বুঝতে পারে না। আইনস্টাইন নিশ্চয়ই দস্তয়েভস্কির সাঙ্গীতিক দিকটা ভালো করেই জানতেন। দস্তয়েভস্কির বিয়োগান্ত "বীটোফিয়ান(১) প্রকাশ-ভঙ্গির সঙ্গে এবং মোৎসার্টের দৃপ্ত প্রতিভার সঙ্গে আইনস্টাইনের হৃদয়ের সাযুজ্য কী করে ঘটল,—এ থেকে বোঝা যাবে।

---

১ বীটোফেন নিজে ছিলেন বদ্ধ কালা। পঞ্চম সিম্ফনি থেকে এই বধিরতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ এবং সুবিখ্যাত নবম সিম্ফনি যখন রচনা করেছেন

বেহালা বাজানোতে আইনস্টাইন এমন কিছু বিশেষজ্ঞ ছিলেন না কিন্তু তাঁর বাজানোর প্রকাশভঙ্গি ছিল খাঁটি, আশাবাদী ও আন্তরিক। মসৎস্কোভস্কি বলেছেন, আইনস্টাইন জোসেফ জোয়াকিম নামের বেহালা-বাদককে বিশেষ তারিফ করতেন, বিশেষ করে তাঁর বাজানো বীটোফেনের দশ নম্বর সোনাটা এবং বাখ-এর স্বা-কোন্ (এক ধরনের নাচের বাজনা—অনুবাদক)। আইনস্টাইন যখন বেহালা বাজাতেন, তখন সবসময়েই তিনি সঙ্গীতের গঠনকার্যের শৈলীটাকে বিশ্বস্তভাবে পেশ করার চেষ্টা করতেন, বাজিয়ে হিসেবে নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে নয়। তাঁর বাজনার পদ্ধতি এই মনোভাব থেকেই এসেছিল।

পিয়ানোতে গৎ-এর বিস্তার করতে আইনস্টাইন ভালোবাসতেন। বাড়ি থেকে দূরে থাকলে সব সময়ে পিয়ানোর চাবি টিপতে (অর্থাৎ বাজাতে) তাঁর ইচ্ছা করত।

মনে হয়, আইনস্টাইনের কাছে সঙ্গীতের যেটা প্রধান আবেদন ছিল, সেটা হল তার ভাবমূর্তি ও আবেগের নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিসম্মত চেহারা, যেটা একাধারে সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পীর (গায়ক বা যিনি বাজাচ্ছেন) ব্যক্তিত্বের 'পরে প্রভাব বিস্তার করে, ঠিক যেমন বিষয়মুখী যুক্তি গবেষকের 'পরে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি হয়তো লিবনিজ-এর প্রগাঢ় দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিতেন (যদিও সেটা সঙ্গীতের মর্মবস্তুকে মোটেই ধরে উঠতে পারে না) যে, যুক্তি-বাদী নান্দনিকের কাছে এটা আনন্দের ব্যাপার: "মনের আনন্দ হচ্ছে সঙ্গীত যাতে মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই যোগ দেয়।"

আইনস্টাইনের প্রিয় সুরকার ছিলেন বাখ, হায়ডেন, সুবার্ট ও মোৎসার্ট। বাখ্-এর সঙ্গীতের গঠনশৈলীর গথিক(১) চরিত্র আইনস্টাইনকে আকৃষ্ট

তখন বীটোফেন নিজে কিন্তু কিছুই শুনতে পান নি। এটাই বীটোফেনের জীবনে বিয়োগান্ত নাটকের মতো কাজ করেছে।

মোৎসার্টের দৃপ্ত প্রতিভাতে ইউরোপীয় রোমান্টিক সঙ্গীতের প্রধান দিক-নির্দেশ কিন্তু তাঁর জীবনে এই ট্রাজেডি ছিল না।

লেখক এখানে দস্তয়েভস্কির ট্রাজেডির সঙ্গে আইনস্টাইনের আশাবাদী প্রতিভার তুলনা করেছেন।—অনুবাদক

১ গথিক্ স্থাপত্য বলতে আমরা বুঝি—বৃহৎ খাড়া লাইনের সুন্দর ও সবল চেহারা, খুব কারিকুরি যাতে নেই। বাখ-এর সঙ্গীতের হারমনি এই চরিত্রেরই—মহান ও সরল।—অনুবাদক

করেছিল। মসংস্কোভস্কি যে-ভাবে লিখেছেন, গথিক ক্যাথিড্রালের আকাশ-স্পর্শী চূড়ার স্থাপত্য এবং গাণিতিক নির্মাণের শৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তির সঙ্গে তিনি বাখের সমুন্নত সঙ্গীত-ধারাকে সংশ্লিষ্ট করে দেখতেন।(১)

বীটোফেন সম্পর্কে আইনস্টাইনের মনোভাবে জটিলতা ছিল। ঐ মানুষটি কোথায় মহান তা তিনি বুঝতেন কিন্তু তাঁর হৃদয় বীটোফেনের সিম্ফনির সুতীব্র নাটকীয় আবেদনে সাড়া দিত না। বীটোফেনের চেম্বার মিউজিক-এর (অর্থাৎ বড়ো অর্কেস্ট্রা নয়, ছোটো ঘরে বাজাবার উপযুক্ত সঙ্গীত, যেমন সোনাটা—অনুবাদক) পরিষ্কার কাটা কাটা শব্দগুলি তাঁর ভালো লাগত। তিনি রচয়িতার অশান্ত স্রোতোধারার মতো উচ্ছ্বসিত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখতেন সিম্ফনির নৈর্ব্যক্তিক সুষমার মধ্যে, ব্যক্তিমুখী বিষয়বস্তু আচ্ছন্ন হয়ে যেত। আইনস্টাইন হ্যানডেলের সাঙ্গতিক কাঠামোর সৌকুমার্যকে তারিফ করতেন কিন্তু ভাবুক হিসেবে প্রকৃতির মর্মবস্তুর গভীরে তিনি অনুপ্রবেশ করতে পারেন নি। সুমান তাঁর কাছে মৌলিক ধরনের চমৎকার ও সঙ্গীত-রসে ভরপুর কিন্তু সুমানের কাছে সাধারণীকরণের মহত্ত্ব তিনি অনুভব করতেন না। সুবার্ট তাঁর আরও কাছাকাছি ছিলেন।

আইনস্টাইন যখন ভাগনারের সঙ্গীত শুনতেন তখন সুরকারের প্রতিভাতে সুগঠিত একটা জগৎ যেন তাঁর কাছে খুলে যেত কিন্তু সেটা ব্যক্তিক সীমা-বর্হিভূত বিশ্ব নয়—যার সুষমাকে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। অংশত এটা সুরকারের ব্যক্তিত্বের জন্যে হতে পারে কিন্তু যেভাবেই হোক ভাগনারের সঙ্গীত রচনাতে আইনস্টাইন রচয়িতার এমন কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে দেখতে পেতেন না—যাতে বাস্তবতার বিষয়মুখী সত্যকে ধরতে পাওয়া যায়। রিচার্ড স্ট্রাউস-এর সঙ্গীত রচনার মধ্যেও এই সত্যকে তিনি দেখতে পেতেন না; স্ট্রাউসের সঙ্গীত তাঁর কাছে বাস্তবতাব ভাসাভাসা ছন্দকেই প্রকাশ করত।

দেবুসি-র সাঙ্গীতিক ধ্বনি আইনস্টাইনকে উড়িয়ে নিয়ে যেত, যেভাবে বিজ্ঞানে তিনি অঙ্কের দিক থেকে খুব সুন্দর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়, এরকম সমস্যাকে তারিফ করতে পারতেন। একটা সঙ্গীত রচনার কাঠামোই তাঁকে আকৃষ্ট করত। সঙ্গীত সম্পর্কে আইনস্টাইনের খুব বেশি রকমের 'স্থাপত্যগত'

১ A. Moszkowski, op. cit, p. 201

চারধারের জীবনকে এবং তাঁর নিজের অস্তিত্বকে স্থৈর্য ও কৌতুকের সঙ্গে দেখার শক্তি যুগিয়েছিল। পরে আমরা আইনস্টাইনের নিঃসঙ্গতার প্রয়োজনীয়তা দেখব, যার কথা তিনি নিজে এবং অন্য অনেকে, যাঁরা তাঁকে জানতেন, প্রায়ই বলেছেন। তিনি যে নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন এটা সুবিদিত এবং মোটেই সেটা তাঁর অহংসর্বস্বতার প্রকাশ ছিল না। অন্য লোকেদের সম্পর্ক থেকে তাঁর পালিয়ে থাকাটা নিজের রোজকার 'অহং' থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার মতোই, এটা যেন 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' হবার চেষ্টাতেই। যতোটা দূরত্ব নয় তার চেয়ে বেশি নিজেকে আলাদা করে রাখাটাই তিনি চাইতেন।

আইনস্টাইনের কাছে 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' অবস্থাতে পলায়নের মাধ্যম ছিল তাঁর হাস্যকৌতুক। সমাজের মৌলিক ক্ষতগুলি, সমরবাদ ও শোষণ সম্পর্কে তিনি কখনও উদাসীন ছিলেন না; পণ্ডিতী নাকউঁচু মনোভাব ও ক্ষুদ্রমনা, অন্যকে বোঝানো যাবে না অতএব উদাসীন থাকব, তাঁর ও তাঁর মতামতের নিন্দা ঘটবে—এতে তিনি বিচলিত হতেন না। এগুলি তাঁকে নাড়া দিত না কারণ এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল; বাস্তবতার এগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন, আংশিক ছুঁচ ফোটানোর মতো সামান্য আঘাত, যা কোনোভাবে তাঁর মহাবিশ্বের ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করত না এবং হেসেখেলে তিনি সেটাকে ঝেড়ে ফেলতেন।

জীবন সম্পর্কে আইনস্টাইনের 'মোৎসার্ট সুলভ' মনোভাব 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' অবস্থাতে আশ্রয় নেওয়ার আর একটা পথ ছিল। কিন্তু মোৎসার্টের সঙ্গীতের হাল্কা বিস্তার মূল বিষয়বস্তুর শুদ্ধতা ও সুসঙ্গতিকে তাঁর কাছ থেকে কখনও আড়াল করে রাখতে পারত না।

আইনস্টাইনের নিজের কাজে 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' হবার প্রধান সড়ক ছিল বিশ্বের সুষমাকে প্রকাশ করার সাধারণ (এবং আরও বেশি সাধারণ!) পথ ধরে এগোনো। সামাজিক ব্যাপারে অন্যায় বিষয় সম্পর্কে হাস্যকৌতুকের মনোভাব তিক্ততাকে কমিয়ে দিত; তাতে কখনও তাদের সঙ্গে মিটমাট করা বোঝাত না, এবং প্রায়শই তাঁর হাসিঠাট্টা শুধুমাত্র নির্দোষ ব্যঙ্গতেই পর্যবসিত হত না।

'ঈশ্বর হল একটা গ্যাসীয় শিরদাঁড়াযুক্ত প্রাণী'—আইনস্টাইনের এই ধরনের তামাসাকে কিছু লোক অবিশ্বাসী মনের (cynical) পরিচয় বলে আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু মোৎসার্টের সঙ্গীতও তো অবিশ্বাসী মনোভাবের

পরিচয় বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই ধরনের 'হাল্কা কথাবার্তা' বেসতিয়া সিরিওসার বাহিনীকে কালিমালিপ্ত করেছে, সাইলেরিস, ইতালীয় ও অ-ইতালীয় দাম্ভিক, জার্মান ও অ-জার্মান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পড়াশুনার কেন্দ্রগুলির পণ্ডিতী ক্ষেত্রগুলি, বৌদ্ধিক দিক থেকে যারা কূপমণ্ডুক, তাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। সকল রকমের গোঁড়া মতান্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ মিশিয়ে পরিষ্কার করে বলার ক্ষমতা যে কত বড় হাতিয়ার তা তারা বুঝত।

অথচ মোৎসার্টের সঙ্গীতের যে আবেদন আইনস্টাইনের কাছে ছিল, সেটা তার শ্লেষ নয় অথবা তিক্ত অভিজ্ঞতাকে মুখ চেপে একটু ভ্রূকুটি করে মেনে নেবার ব্যাপার নয়। সুরারোপের, বিভিন্ন আলাদা আলাদা শব্দকে সংযোগ করে একটা অপূর্ব ও একই সঙ্গে একটা অপ্রত্যাশিত সঙ্গীতের ঝলক সৃষ্টি করা—মোৎসার্টের সঙ্গীতের এই আবেদনটা তাঁর কাছে ছিল। আইনস্টাইনের লেখাও মনের উপর অনুরূপ ছাপ ফেলে : অনন্য এবং একই সময়ে অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তগুলি বৈজ্ঞানিক চিন্তার আশ্চর্য সঙ্গীতময়তার মধ্যে যেন বিকশিত হচ্ছে, যার সঙ্গে যেন একটু শ্লেষের খাদ দেওয়া হয়েছে, ঠিক যেন মোৎসার্টের সঙ্গীতের প্যাটার্নের মধ্যে হেসেখেলে ছড়ানো নকসাগুলি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গণিত ও বাস্তবতা

বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সকল জ্ঞানের শুরু অভিজ্ঞতা থেকে এবং শেষও সেখানেই।

আইনস্টাইন

জ্যামিতি গাণিতিক বিজ্ঞান হয়েই রইল কারণ স্বতঃসিদ্ধ সত্য থেকে যে উপপাদ্যগুলি সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয় সেগুলি খাঁটি যুক্তিবিন্যাসসম্মত সমস্যা; একই সঙ্গে এটা একটা পদার্থবিদ্যার পর্যায়েও পড়ে কারণ এর স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক বস্তুগুলি সম্পর্কে এমন বক্তব্য জোরের সঙ্গে বলা হয়ে থাকে যার সত্যাসত্য একমাত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই যাচাই হতে পারে।

আইনস্টাইন

জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম প্রধান যে-সূত্র থেকে পথ ধরে আইনস্টাইনকে শেষ অবধি আপেক্ষিক তত্ত্বতে নিয়ে গেল, সেটা হল গণিত ও বাস্তবতার মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেই সংক্রান্ত তাঁর ধারণা। যদিও ঐ তত্ত্বটি (আপেক্ষিক তত্ত্ব) নিয়মানুযায়ী বিবৃত করার জন্যে সূত্রায়িত (বা সূত্রবদ্ধ, formulated) করা হয়েছিল, এর ধারণার উদ্ভব হয়েছিল তার আগেই এবং বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের (special theory of relativity) এবং আরও নির্দিষ্টভাবে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের (general theory of relativity) পূর্বশর্ত ছিল।

জুরিখ পলিটেকনিকে আইনস্টাইন পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারে বহু সময় কাটাতেন। গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা (এক্সপেরিমেণ্ট) তিনি করতেন তীক্ষ্ণভাবে এবং তাঁর যুবজনোচিত ঔৎসুক্য কতকাংশে আপেক্ষিক তত্ত্বের

রূপায়ণে সাহায্য করেছিল। এ নয় যে, ঐ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তাঁর কাছে নতুন পথ-নির্দেশ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার চরিত্র অনুধাবন করলে তাঁর পদার্থবিদ্যা ও গাণিতিক চিন্তার অন্তর্নিহিত রূপটার একটা আকর্ষণীয় দিকের হদিশ পাওয়া যায়। এটা হল পদার্থের অনুভূতিগত আভাস থেকে জ্ঞান, যা যুক্তিবিদ্যাসম্মত ও গাণিতিক পদ্ধতিগত চিন্তার প্রাক্‌পর্বে দেখা দেয়। অনুভূতিগত জ্ঞান লাভ করার অস্পষ্ট ধারণাকে বিস্তারিত করা প্রয়োজন, তা না হলে সম্পূর্ণ অন্য রকমের ধারণার সঙ্গে তাদের মিলে যাবার ভয় আছে।

আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক চিন্তা কী পদ্ধতিতে চলে সেটা বিচার করতে আমাদের কাছে অন্যান্য দলিলের মধ্যে একটি বিশেষ মূল্যবান দলিল রয়েছে, যাতে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশীল কাজের ইতিহাস ও মনস্তাত্ত্বিক দিকটা সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে আইনস্টাইনের সৃষ্টিশীলতার মনস্তাত্ত্বিক দিকটা আমরা পেতে পারি। ১৯৪৫ সালে জ্যাক হাডামার নামে একজন ফরাসি গণিতজ্ঞ তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, নিজেদের কাজ করার জন্যে তাঁরা কী কী ধরনের অন্তরের অথবা মানসিক ভাবমূর্তি নিয়ে কাজ করে। আইনস্টাইন এ সম্পর্কে এই কথা বলেছিলেন:

"যে শব্দগুলি দিয়ে ভাষাটি লেখা অথবা বলা হয়, তারা আমার চিন্তার পদ্ধতির 'পরে কোনো কাজ করে বলে মনে হয় না। চিন্তার মৌলিক উপাদান হয়ে যে পদার্থগত অস্তিত্ববান বস্তুগুলি (physical entities) কাজ করে তারা কয়েকটি চিহ্নমাত্র এবং মোটামুটি পরিষ্কার ছবিগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরে—যাকে 'ইচ্ছামতো' পুনরায় তৈরি করা যায় এবং তাদের জোড়া দেওয়া যায়।

"অবশ্যই ঐ সকল উপাদান এবং প্রাসঙ্গিক যুক্তিসম্মত ধারণাগুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। এটাও পরিষ্কার যে, যুক্তিসম্মত পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত ধারণাগুলিতে পৌঁছবার ইচ্ছার ভিত্তি হচ্ছে ঐ ধরনের উল্লিখিত উপাদান-গুলিকে নিয়ে খানিকটা হাল্কাভাবে নাড়াচাড়া করা। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখতে হলে এই ধরনের অনেকগুলি ধারণাকে একত্র করে নাড়াচাড়া করাটা সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়; আর এটা করতে হচ্ছে শব্দ দিয়ে অথবা অন্য কোনো ধরনের সংকেতের সাহায্যে, যেটা দিয়ে অন্যদের

সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, তাদের নিয়ে যুক্তিসম্মতভাবে বাঁধা কোনো কিছু তৈরি করার আগেই।"(১)

গাণিতিক প্রতীকের অথবা শব্দের সাহায্যে যুক্তিসম্মতভাবে যা নির্মাণ করা যায়, সেটা একটা দ্বিতীয় স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথমে দেখা দেয় পদার্থগত অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তুগুলির বিভিন্ন ছবি, যেগুলি দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে অথবা তাদের গতিশীল চরিত্র নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে এবং পরস্পরের সংশ্লিষ্ট হয়।

আমার ক্ষেত্রে "উল্লিখিত উপাদানগুলি দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে এবং তাদের মধ্যে কয়েকটির পেশল চেহারা থাকে। কেবলমাত্র দ্বিতীয় স্তরেই মামুলি শব্দগুলি অথবা অন্যান্য চিহ্নগুলি কষ্ট করে খুঁজে দেখতে হবে, যখন যোগাযোগকারী উল্লিখিত নাড়াচাড়া-করার ব্যাপারটা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইচ্ছামতো তাদের তৈরি করা যায়।

"এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তাতে উল্লিখিত উপাদানগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করাটা কয়েকটি যুক্তিসম্মত সম্বন্ধের অনুসন্ধানের সঙ্গে সমভাবে তুলনীয়।"(২)

পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যে চাক্ষুষ ও বস্তুদেহগত যে উপাদানগুলি আছে তারা খুব সম্ভব গতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের গতিশীলতা রয়েছে। আমরা ধরে নিতে পারি যে, অনেকগুলি বস্তুকে সংশ্লিষ্ট করে নাড়াচাড়া করার (associative play) জন্যে মনের দিক থেকে যে-চিত্র হাজির করা হয় সেটা গতিশীল অথবা স্থান-পরিবর্তনকারী বস্তু-দেহগুলির অথবা বল-প্রয়োগকারী সক্রিয় শক্তিগুলির ভাসা-ভাসা স্নায়বিক উত্তেজনা। অনেকগুলি বস্তুকে নিয়ে নাড়া-চাড়া করার এই কাজে, অনেকগুলি ছবি, তাদের মধ্যে কয়েকটি পদার্থগত অস্তিত্বশীল বস্তুদের প্রতিমূর্তি বা প্রতীক রূপে দেখা দেয়, অন্যগুলি কেবলমাত্র আরও জটিল যান্ত্রিক ও অ-যান্ত্রিক বস্তুদের অস্তিত্বের পরিচায়ক হয়—এরা সবাই জড়ো হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় অথবা পারস্পরিক সংঘাতে আসে। এটা হয়তো তড়িৎচুম্বকীয় ঢেউয়ের দোল খাওয়ার মতো, যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দৃশ্যের মতো, যেটা প্রত্যক্ষ

১ Ideas and Opinions p. 25

২ Ibid., p, 26

দৃশ্যপটে অথবা কোনো একটা বিশেষ ধরনের মাপকাঠি প্রভৃতি ধরে নিয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব করে দেখা হয়।(১)

দ্বিতীয় স্তরে যেখানে অনুভূতিবলে স্বজ্ঞালব্ধ চিন্তার বদলে যুক্তিসম্মত পদ্ধতি নির্মাণ করা হয়, সেখানে চিন্তাবিদ যেন সেই কথাগুলি শুনতে পান— যেসব কথা ধারণাগুলিকে প্রকাশ করে বলা হয় অথবা গাণিতিক প্রতীকের মতো সেগুলি যেন লেখা হয়েছে বলে দেখতে পান। আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সংশ্লিষ্ট স্তরের ছবিগুলি দৃষ্টিগোচর এবং গতিশীল মূর্তিটি যুক্তি-সিদ্ধ নির্মাণের প্রকাশস্বরূপ বাক্যগুলির শ্রুতিনিভর প্রতীক হয়ে ওঠে। গণিতবিদরা কী ধরনের মনের কথা ব্যবহার করেন, হাডামার-এর এই প্রশ্নের উত্তরে আইনস্টাইন জবাব দিয়েছেন ; "দৃশ্যমান এবং গতিশীল। একটা স্তরে কথাগুলি যদি মাঝখানে এসে পড়ে তখন, যা বলা যাক না কেন, সেটা নিছক শ্রুতিনির্ভর হয়। কিন্তু তারা কেবলমাত্র দ্বিতীয় স্তরে হস্তক্ষেপ করে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে।"(২)

চিন্তার যে পদ্ধতি বর্ণিত হল সেটা নিশ্চয়ই যুক্তিসিদ্ধ পরম্পরার ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা ভালো খাটে যাতে, পরীক্ষাগতভাবে যাচাই করা সম্ভব।

আইনস্টাইনের মতে ধারণাগুলিকে **সরাসরি** মনের 'পরে ছাপের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না, এবং তাদের সোজা কোনো পদার্থগত অর্থ নাও থাকতে পারে, যেটা প্রায়শই অন্য ধারণাগুলির জটিল বহুস্তর-বিশিষ্ট প্রক্রিয়া তৈরি করতে গেলে আয়ত্ত করতে হয়। শেষ অবধি, পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যুক্তিসম্মত-ভাবে সিদ্ধান্তগুলি তুলনীয় হয়, যা থেকে চিন্তার সবকটা গ্রন্থির পদার্থগত অর্থ পাওয়া যায়। পূর্বে বলা হয়েছে, এই ধরনের নির্মাণকার্যে যুক্তি ও অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান এক সঙ্গে কাজ করে। প্রতিটি ধারাবাহিক স্তরে শেষোক্তটি (অর্থাৎ, অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান বা intution—অনুবাদক) রচিত তত্ত্বের পদার্থগত সিদ্ধান্তগুলিকে আগে থেকে যেন (আন্দাজে) বুঝে ফেলে। যখনি যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ একটা দ্বিমুখী পথের বাঁকে এসে দাঁড়ায়, পদার্থগত অনুভূতিলব্ধজ্ঞান তার পরীক্ষাগত প্রমাণের জন্যে সোজা পথটি দেখিয়ে দেয়। আলো যেমন অনেকগুলি আয়না থাকলে, তা যত জটিলভাবেই সাজানো থাক

১ বিভিন্ন ধরনের গতিশীল বস্তুর জন্যে বিভিন্ন ধরনের মাপকাঠি ব্যবহার করতে হয়।—অনুবাদক।

২ **Ideas and Opinions, p. 25-26**

না কেন, সোজা পথটি চিরে চলে যায়, তেমনি আইনস্টাইনের চিন্তাগুলি একটি ধারণা থেকে অন্যাতে সোজা পথ ধরে চলে যায় শেষ অবধি যুক্তির গ্রন্থিগুলিকে পরপর অতিক্রম করে এমন একটা স্তরে, যেখানে সেই পুরো গ্রন্থিগুলির মালাকে পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করে নিয়ে সেইসব ধারণার পরীক্ষাগত প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব হয়। তিনি পদার্থগত অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হতেন অথবা বলা যেতে পারে 'পরীক্ষাজনিত অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞান' থেকে, যা পদার্থগত অর্থের তত্ত্বে পৌঁছবার জন্যে যে-পরীক্ষার প্রয়োজন হয় তাতে সোজা পৌঁছে যায়। এটা বলতেই হবে যে, আইনস্টাইনের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান, পরীক্ষামূলক ধারণা ও ভাবমূর্তির উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল—যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল যথেষ্ট। আলো প্রতিফলিত-করা আয়না, বিদ্যুৎবাহী সার্কিট, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নড়ানো-চড়ানো যায় এমন অংশগুলিকে যোগ করার জন্যে কঠিন 'রড' (rod)—এ সবই আইনস্টাইনের মনে এমনভাবে বিচিত্র চাক্ষুষ ও গতিশীল চিত্রের সমাবেশ ঘটাত। এগুলি থেকেই আবার মনের 'পরে নতুন ছাপ পড়ত এবং সেই ছাপগুলি নিত্যনতুন জোট বাঁধত।

আপাতদৃষ্টিতে দূরে অবস্থিত ধারণাগুলিকে সংশ্লিষ্ট, সংযোগ ও চিহ্নিত করার ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায় আইনস্টাইনের প্রতিভাতে। চিন্তাবিদের মস্তিষ্কে প্রতিটি ধারণা (অথবা আগেকার স্তরে ছবিগুলি) কার্যত এমন ধরনের জমাট-বাঁধা মেঘের অথবা এমন শক্তিক্ষেত্রের দ্বারা আবৃত থাকে—যারা নতুন ধারণাগুলিকে ধরে ফেলে, তাদের প্রায়শই পুনর্বিন্যাস করে, একটা বিশিষ্ট ধারণার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ স্থাপন করে, নতুন ধারণাগুলির জন্ম দেয় এবং পুরানো ধারণাগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। এই মেঘ, এই শক্তি-ক্ষেত্রের তীব্রতা এবং এইসব শক্তির বিকিরণরেখা যে বিরাট শক্তিকে বহন করে, প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে তার মধ্যেই।

শেষ অবধি আইনস্টাইনের পরীক্ষাগত অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান গাণিতিক অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান হয়ে দাঁড়াল। তাঁর বইগুলিতে এমন আশ্চর্য ক্ষমতা ও সুন্দর পদ্ধতির পরিচয় পাই যা আমাদের অনেকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়—যার জন্যে বাড়তি অনুমানের প্রয়োজন হয় না। পরে আমরা দেখব এই ধরনের গাণিতিক পদ্ধতিগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে এমনতরো বিস্তৃত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যাকে পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করা যেতে পারে। কিন্তু এটা পরে

এসেছে, যখন পদার্থগত অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান আইনস্টাইনকে ধ্রুপদী পদার্থ বিজ্ঞানের তুলনায় নতুন ধারণাতে নিয়ে গেছে, যাতে আনুষ্ঠানিক এবং নীতিগতভাবে অর্থপূর্ণ সেই ধারণাগুলিকে পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করা যেতে পারে। এর পূর্বে জুরিখে আইনস্টাইনের গাণিতিক নিয়ম অথবা সমস্যাগুলির মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নেবার কোনো মাপকাঠি ছিল না।

"আমি দেখেছি," তিনি লিখছেন, "যে, গণিতকে অজস্র বিশিষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়, যার প্রত্যেকটিকে নিয়ে কাজ করতে হলে আমাদের বরাদ্দ স্বল্প জীবনকাল কেটে যাবে। কাজেই আমি নিজেকে বুরিদিয়ানের গাধার(১) মতো দেখেছি, যে ঠিক করতে পারছে না খড়ের কোন্ গাদাটা নেবে। এটা অবশ্যই এই কারণে যে, গণিতের ক্ষেত্রে আমার অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান এতোটা জোরালো ছিল না, যাতে মোটামুটি না-ধরলেও চলে এমন পণ্ডিতী জ্ঞানের তুলনায় যা যথার্থ মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ, তাকে আলাদা করা যায়। অবশ্য এ ছাড়া প্রকৃতির জ্ঞান সম্পর্কে আমার আগ্রহ নিশ্চয়ই অবিসংবাদীভাবে অনেক বেশি জোরালো ছিল; এবং ছাত্র হিসাবে আমার কাছে এটা পরিষ্কার ছিল না যে, পদার্থগত নীতিগুলির গভীর জ্ঞানের পথ অত্যন্ত জটিল গাণিতিক পদ্ধতিগুলির সঙ্গে জড়িত। এটা ক্রমশ আমার কাছে বহু বছর ধরে স্বতন্ত্র-ভাবে বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম করার পরে প্রতিভাত হয়েছে। সত্য বটে, পদার্থ-বিদ্যাকে কয়েকটি আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায়, যার প্রত্যেকটি গভীর জ্ঞানের জন্যে ক্ষুধার পরিতৃপ্তি না করেও কারুর ছোট কর্মজীবনকে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত করে রাখতে পারে। পরস্পরভাবে যুক্ত পরীক্ষামূলক তথ্যগুলি এখানে যথেষ্টভাবে যুক্ত না হলেও তার পরিমাণ এত বেশি যে সেটা কাউকে বিমূঢ় করে ফেলতে পারে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য মৌলিক তথ্যে পৌঁছতে যা প্রয়োজন, সেটাতে আমি যেন গন্ধ শুঁকে শুঁকে পৌঁছতে পারতাম এবং অন্য সব কিছু থেকে, প্রচুর জিনিসপত্রের বোঝা যা মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে এবং আসল জিনিসটুকু থেকে মনকে সরিয়ে রাখে—তা থেকে সরে থাকতে পারতাম।"(২)

আইনস্টাইনের কাছে আসলটা হচ্ছে সেটাই যেটা বাস্তব জগতের নির্ভর-যোগ্য ছবি তৈরি করতে কাঁচা মাল অথবা হার্ডওয়্যারের মতো কাজ করে।

১ আমাদের চিনির বলদের মতো বলা যেতে পারে।—অনুবাদক

২ **Philosopher-Scientist, P. 15**

গণিতে তখনও সেই ধরনের সংজ্ঞা তাঁর কাছে ছিল না কিন্তু অন্তরের গভীরে এই অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, জ্যামিতিক উপপাদ্যের (থিওরেমের) ভালো নিয়ম-শৃঙ্খলা যুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে বিশ্বে সুষমার একটা প্রকাশ। প্রাথমিক ধারণাটা একেবারে সরল ; আসল বস্তুদেহের (বা দ্রব্যের) অন্য বা ছদ্মনাম হচ্ছে জ্যামিতিক দ্রব্যগুলি এবং চরিত্রের দিক থেকে শেষোক্তদের চাইতে তারা কোনো অংশে ভিন্ন নয়।

"অতএব এ থেকে যদি মনে হয় যে, বিষয় থেকে অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান নিছক চিন্তার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, সেই 'আশ্চর্য' ব্যাপারটা একটা ভ্রমের 'পরে প্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও যার প্রথম অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার কাছে মানুষের এতটা নিশ্চিত ও খাঁটি চিন্তার রাজত্বে পৌঁছনো সম্ভব, এ একটা বিস্ময়কর, প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার—যেটা গ্রীকরা জ্যামিতির ক্ষেত্রে প্রথম সম্ভব করে তুলেছিল।"(১)

ভুলটা ছিল এখানে যে, কয়েকটা জ্যামিতিক উপপাদ্যের প্রমাণের যেন কোনো প্রয়োজনই নেই, যেহেতু তারা স্বতঃসিদ্ধ গৃহীত সূত্রের পরেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই ধরনের আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবিত সমস্যা থেকে অনুমান করা যায় না, যাতে খাঁটি চিন্তার সাহায্যে ইন্দ্রিয়দের দ্বারা পর্যবেক্ষণ না করেই বস্তুগুলি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু উপপাদ্যের 'স্বতঃসিদ্ধতা' এই তথ্যের 'পরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, তাতে যে ধারণাগুলি বিধৃত হচ্ছে, সেগুলি সেই একই ধরনের সম্পর্ক যা প্রকৃতিতে বাস্তব বস্তুগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

এটা একটা বৃত্তাংশের দৈর্ঘ্যকে যদি কঠিন দণ্ডের সাহায্যে মাপা যায় (বা তার প্রতিরূপ পাওয়া যায়—অনুবাদক) তাহলে দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত সকল জ্যামিতিক সংজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দেখা দেবে, যতদূর পর্যন্ত না দণ্ডের ভৌত (physical) ধর্মকে আমরা ধরে নিচ্ছি সেটা যা, তাই বলে। আমরা বলে থাকি যে একটা বৃত্তাংশের দৈর্ঘ্য তার গতির দ্বারা হেরফের (বা প্রভাবিত) হয় না এবং এই বক্তব্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নি কারণ অবচেতন মনে আমরা জ্যামিতিক ধারণাগুলিকে তাদের পদার্থগত প্রাথমিক রূপের নকলের (prototype) সঙ্গে মেলাই। আইনস্টাইন যখন আপেক্ষিক তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন তখন ঠিক এটাই ঘটেছিল।

---

১ Ibid., p. 11

আইনস্টাইন যেমন বলেছেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটছে তার 'বিস্ময়' এবং 'স্বতঃসিদ্ধতা'—এই উভয় দিক থেকেই। বিজ্ঞান সেই সময়ে 'স্বতঃসিদ্ধতা'কে জ্যামিতিক নির্মাণকার্য থেকে(১) অব্যাহতি দেয়—যখন পর্যবেক্ষণের জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে যেটা ঐ সকল নির্মাণকার্যে আপাতভাবে একটা নির্ভুল পদার্থগত অর্থ দিতে পারে, তাতে ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায়। এটাই হল 'স্বতঃসিদ্ধতা' থেকে পলায়ন। কিন্তু তাহলে বিজ্ঞানকে খাঁটি যুক্তিসিদ্ধ নির্মাণকার্যের সঙ্গে যোগসাজস করে নিতে হবে। পূর্বোক্ত বিষয় (অর্থাৎ, বিজ্ঞান) তখন আর বিস্ময়ের উদ্রেক করবে না, আর শেষোক্তটি (অর্থাৎ, যুক্তিসিদ্ধ নির্মাণকার্য) পদার্থগত অর্থ পেয়ে যাবে, যেটা শুধুমাত্র খাঁটি চিন্তার সাহায্যে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

জ্যামিতি ও বাস্তবতার মধ্যে যে-সম্পর্ক সেটা বিজ্ঞানে যা-যুক্তিসম্মত তার সঙ্গে পরীক্ষামূলক বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (empirical) সঙ্গে সম্পর্কের একটা দিক। আইনস্টাইন এই সম্পর্কের জ্ঞানতত্ত্বগত মতামতের দিকটা অনেক বার আলোচনা করেছেন। সেটা তাঁর পদার্থবিদ্যার কাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। সমগ্র বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর কয়েকটি নির্মাণকার্যকে মনে হয় যেন আপেক্ষিক তত্ত্বের সাধারণীকৃত ব্যাখ্যার মতো। কয়েকটি পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত কাজকর্ম জ্ঞানতত্ত্বগত ছকের উদাহরণের মতো মনে হয়। আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে তাঁর সৃষ্টিশীল কাজকে দেখলে সমান জোরের সঙ্গেই এই ধারণাকে বরবাদ করা যাবে যে, তাঁর সৃষ্টিশীল চিন্তা ছিল 'স্বতঃস্ফূর্ত' এবং তাতে সচেতনভাবে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বের কোনো ভূমিকা ছিল না, যেমন ছিল না তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বতঃসিদ্ধ বা আগে থেকে সিদ্ধান্ত করে নেওয়া কোনো ধারণা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৩ সালে অক্‌সফোর্ডে তাঁর প্রদত্ত 'তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার পদ্ধতি' সম্পর্কে বক্তৃতাটি বিশ্লেষণ করা সঙ্গত হবে।(২)

এটা শুরু হয়েছে একটা পরামর্শ দিয়ে: কাউকে যদি পদার্থবিদদের কাছ থেকে তারা যে পদ্ধতি ব্যবহার করে সে সম্পর্কে কিছু জানতে হয়, তাহলে তাদের কথা শুনলে চলবে না, মনঃসংযোগ করে দেখতে হবে তারা কী কাজ-

১ কোনো কিছু উপপাদ্য প্রমাণ করতে জ্যামিতিক কোনো চিত্র নির্মাণ করা।—অনুবাদক।

২ Ideas and Opinions, p. 270

গুলি করছে। "যিনি এই ক্ষেত্রে একজন আবিষ্কারক তাঁর কাছে তাঁর কল্পনার বিষয়বস্তুগুলি এত প্রয়োজনীয় ও স্বাভাবিক হয়ে দেখা দেয় যে, তিনি তাদের (ঐ বিষয়বস্তুগুলিকে) মনে করেন এবং চান যে অন্যরাও মনে করুক তারা যেন চিন্তার সৃষ্টি নয় পরন্তু এমন ধরনের বাস্তবতা, যেটার অস্তিত্ব রয়েছে।"

তা সত্ত্বেও আইনস্টাইন তাঁর রিসার্চের ফলাফলগুলি হাজির করেন না, পরন্তু পেশ করেন সেই পদ্ধতিগুলি, যেগুলি পদার্থগত তত্ত্বের নির্মাতারা সচেতন বা অবচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। এখানে করণীয় হচ্ছে বিজ্ঞানের তত্ত্বগত মৌল বিষয়গুলির সঙ্গে অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফলগুলিকে মিলিয়ে দেখা। "আমাদের জ্ঞানের দুটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও যুক্তির মধ্যেকার চিরকালীন বৈপরীত্যের সঙ্গে আমরা আমাদের বিভাগে সংশ্লিষ্ট।"

নিছক যুক্তিবাদী বিজ্ঞান, যা এই সম্পর্ককে ধরতে পেরেছে—প্রাচীন দর্শন হচ্ছে তার একটা ধ্রুপদী উদাহরণ। যুক্তির এটা একটা বিরাট জয় যার ভাস্বরতা কখনও মিলিয়ে যাবে না।

"প্রাচীন গ্রীসকে আমরা পশ্চিমী বিজ্ঞানের শিশুকাল বলে মনে করি। এখানে সর্বপ্রথম দুনিয়া দেখতে পেল এমন একটা যুক্তিসম্মত পদ্ধতির অবাক-করা ঘটনা, যা এত ঠিক-ঠিক ভাবে ধাপে ধাপে এগিয়েছিল, যাতে তার প্রতিটি উপপাদ্যের প্রতিটি মাত্রা ছিল সন্দেহাতীত বা নিশ্চিত—আমি ইউক্লিডের জ্যামিতির কথা বলছি এখানে। যুক্তির এই প্রশংসনীয় জয় মানুষের মননশক্তিকে তার নিজের 'পরে এমন একটা অপ্রতিরোধ্য বিশ্বাস এনে দিল, যা থেকে পরে তার সাফল্য এসেছে। যদি ইউক্লিড আপনার যুবজনোচিত উৎসাহের সৃষ্টি না করে থাকে তাহলে বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদ হবার জন্যে আপনার জন্ম হয় নি।"

জ্ঞানের যুক্তির দিকটা সম্পর্কে এই রকমের সমর্থনসূচক প্রশংসা করার পরে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিকটা সম্পর্কে তিনি বলছেন এইভাবে: "বাস্তবতা সম্পর্কে সব রকমের জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে শুরু হয়ে তাতেই শেষ হয়েছে।" এই সূত্র (বা ফরমূলা) যা আমরা এই পরিচ্ছেদের শুরুতে উৎকীর্ণ করেছি, সেটা কোনোভাবেই 'মানুষের মনের মুক্ত সৃষ্টি" সম্পর্কে আইনস্টাইনের উক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান কী করে সৃষ্টিশীল চিন্তার রাজত্বের সঙ্গে একত্রে বাস করবে?

"অভিজ্ঞতাই যদি আমাদের সকল জ্ঞানের প্রথম ও শেষ কথা হয়, তাহলে বিজ্ঞানে বিশুদ্ধ যুক্তির কাজ কী?"—আইনস্টাইন প্রশ্ন তুলেছেন।

তিনি বলেছেন যে, একটা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার পুরো পদ্ধতি কতকগুলি প্রাথমিক ধারণা ও প্রাথমিক নিয়মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, যেগুলিকে ঐসব ধারণার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা হয়। এবং শেষ অবধি, যুক্তিসম্মত-ভাবে সিদ্ধান্তগুলিকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা প্রয়োজন।

"ইউক্লিডের জ্যামিতিতে ঠিক এটাই ঘটে; ব্যতিক্রম যেটা সেটা হল মৌলিক নিয়মগুলিকে বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ সত্য এবং সিদ্ধান্তগুলিকে যে-কোনো ধরনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতেই হবে সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই (বা সন্দেহই) নেই। অবশ্য কেউ যদি ইউক্লিডের জ্যামিতিকে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কার্যত কঠিন বস্তুগুলির মধ্যে সম্ভাব্য পারস্পরিক সম্পর্ক হিসাবে দেখে অর্থাৎ এটাকে যদি এর প্রাথমিক অভিজ্ঞতাজনিত উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন না করে পদার্থবিজ্ঞান হিসেবে বিচার করে, তাহলে জ্যামিতি ও তাত্ত্বিক পদার্থ-বিদ্যার সমধর্মিতা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।"

আপেক্ষিক তত্ত্বের রূপায়ণের পরে পদার্থবিদ্যা ও জ্যামিতিতে যে-দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত না করে জ্যামিতিতে জটিল যুক্তিসম্মত নির্ভুল সিদ্ধান্ত টানার পদ্ধতিগুলি তৈরি করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সেটা করবার জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে, একমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সেটা হবে, যার সাহায্যে এইসব নির্মাণকে পদার্থগত অর্থ দেওয়া যায়। গাণিতিক ধারণাগুলি ও পদার্থবিদ্যার পদ্ধতিগুলির সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক ভূমিকা এবং বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে আইনস্টাইনের কথাগুলির যথার্থ অর্থ এটাই হতে পারে।

"গাণিতিক নির্মাণকার্যের পদার্থগত উপযোগিতার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে অবশ্য অভিজ্ঞতাকেই ধরতে হবে। কিন্তু গণিতের মধ্যে সৃষ্টিশীল সূত্র রয়েছে। কাজেই এক অর্থে আমি মনে করি, খাঁটি চিন্তা, প্রাচীনেরা যেভাবে ভেবেছিলেন, বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে।"

একই ধারণাকে আইনস্টাইন অন্যভাবে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'দেশ, ইথার ও পদার্থবিজ্ঞানে ক্ষেত্রের সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখেছিলেন।(১)

১ Ideas and Opinions, p. 276—85

এই প্রবন্ধে একটা পদার্থগত তত্ত্বের পরীক্ষামূলক মৌলিক ব্যাপারের সঙ্গে গণিতের যে সম্বন্ধ আছে, সে সম্পর্কে আইনস্টাইনের মতামতের পরিষ্কার অন্তর্দৃষ্টিটা পাওয়া যায়। একদিকে, তিনি লিখছেন, একেবারে নিশ্চিত কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে একেবারে ফাঁকা যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ রয়েছে এবং অন্যদিকে রয়েছে এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, তার উদাহরণ দিয়েছেন তিনি এইভাবে :

"ধরা যাক, পরের যুগের একজন পুরাতত্ত্ববিদ ইউক্লিডের জ্যামিতির একটি বই পেলেন যাতে কিন্তু নকশাগুলি নেই। তিনি উপপাদ্যগুলিতে 'বিন্দু' 'সরল রেখা', 'তল' প্রভৃতি শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা আবিষ্কার করতে পারবেন। পরস্পরের কাছ থেকে কী করে 'শেষোক্ত'-র (অর্থাৎ 'তল' বলতে কী বোঝায়) উদ্ভব ঘটছে, তিনি তা-ও বুঝে উঠতে পারবেন। যে নিয়মগুলি তিনি বোঝেন সেই অনুসারে নতুন প্রতিপাদ্যগুলিও তিনি তৈরি করতে পারবেন। কিন্তু সেই প্রতিপাদ্যগুলি কেবলমাত্র কথা নিয়ে খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না 'বিন্দু' 'সরল রেখা' 'তল' প্রভৃতি শব্দের কোনো অর্থ তাঁর কাছে পরিষ্কার হচ্ছে।"

'বিন্দু', 'সরল রেখা', 'তল' ইত্যাদির সাহায্যে কোনো কিছু কি বোঝানো হচ্ছে? এর অর্থ হল, আইনস্টাইন বলছেন, এই শব্দগুলি যার উল্লেখ করছে সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। পুরাতত্ত্ববিদকে এমন কয়েকটি পরীক্ষা চালাতে হবে যাতে এই পর্যবেক্ষণ ঐ শব্দগুলির সঙ্গে মিলে যায়—যা খুঁজে-পাওয়া ঐ বইটির মধ্যে তখনও অর্থহীন শব্দ হয়ে রয়েছে।

১৯২৬ সালে আইনস্টাইন জ্যামিতি ও পদার্থবিদ্যার মধ্যে যে সাধারণ ধারণা আছে তার মধ্যের সম্পর্ককে একটা প্রবন্ধে(১) উপযুক্ত শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ করেন, যাতে তিনি নতুন জ্যামিতি ও আপেক্ষিক তত্ত্বকে ঐতিহাসিক দিক থেকে উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞানের বিবর্তনের সূত্র থেকে তার জাতিগত(২) বিকাশ একই স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে গেছে, ঠিক যেভাবে আইন-

১ "Geometria no euclidea y fisica", **Revista matematica hispanonericana, ser. 2, vol. I, pp.72—76**

২ **Phylogenetic**-এর অর্থ জাতিগত বা মানবগোষ্ঠীর পর্যায় থেকে বিকাশ। এখানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলা হচ্ছে, জ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে বিজ্ঞানের বিশেষ বিবর্তন শুরু হল, সেইখান থেকে।—অনুবাদক

স্টাইন বিজ্ঞানী রূপে নিজে গড়ে উঠেছেন। স্পষ্টভাবেই এটা করা হয়েছে ব্যাপারটা ঘটে যাবার পরে, আপেক্ষিক তত্ত্বের রূপায়ণের পরে, যখন আইনস্টাইন যুক্তিসম্মত নির্মাণের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ-করা ঘটনাবলীর মধ্যে যোগসূত্র সম্পর্কে তিনি যা বুঝেছেন তাকে পরিষ্কার সূত্রায়িত করতে পারলেন। তেমনি নিজের অতীতের দিকে তাকিয়েই তিনি জ্যামিতিগত ও পদার্থগত ধারণাগুলির প্রাথমিক একীকরণের বিকাশ যেভাবে হয়েছে এবং তার থেকে তাদের বিভাজন ও শেষ অবধি যেভাবে তাদের সমন্বয় ঘটেছে, তাকে দেখেছেন। এটা শুধুমাত্র যে পথ পরিক্রমা করে অতীত থেকে আপেক্ষিক তত্ত্বে তিনি এসেছেন, সেটাকে তুলে ধরাই নয়। যে ছকের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানের প্রক্রিয়া তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সেটা বিজ্ঞানের ইতিহাসে আরোপ করতে তিনি চান নি। এই ছক গণিত ও পদার্থবিদ্যার ইতিহাসের ছবি থেকে সরাসরি পাওয়া যায়। গাণিতিক ও পদার্থগত ধারণাগুলির বিকাশের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে আইনস্টাইনের মন 'বিস্ময় থেকে পলায়ন' এবং 'স্বতঃসিদ্ধ' প্রমাণের চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে ওঠে—যা আপেক্ষিক তত্ত্বে পরে প্রকাশিত হয়েছে।

আইনস্টাইন বলেছেন, প্রাচীন কালে জ্যামিতি ছিল আধা-অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিজ্ঞান—যেটা একটা বিন্দুকে একটা প্রকৃত অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তু হিসাবে ব্যবহার করত, যার মাত্রাগুলিকে হিসাবের মধ্যে না ধরলেও চলে। "একটা সরল রেখাকে হয় কয়েকটি বিন্দুকে চোখের দৃষ্টির লাইনে রেখে সোজা দৃষ্টির পথে মিলিয়ে দেওয়া হতো অথবা এটা করা হতো টান-টান একটা সুতোর সাহায্যে। অতএব আমাদের এমন সব ধারণা রয়েছে যেগুলি সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই সরাসরি পাওয়া যায়, যেটা সাধারণ ধারণাগুলি সম্পর্কে খাটে। অন্য কথায় বলতে হলে, তাদের অস্তিত্ব যুক্তিসম্মত অভিজ্ঞতার 'পরে নির্ভর করে না, যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগ আছে। তখন জ্ঞানের যে-পর্যায় ছিল তাতে বিন্দু, সরল রেখা, বৃত্তাংশ অথবা কোণগুলি সমান হবে কি, না, সেগুলি একই সময়ে প্রাকৃতিক পদার্থগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত পরিচিত অনুভূতিগুলির মূল্যায়ন।"

জ্যামিতি ও বাস্তবতার সম্পর্কে প্রাচীনদের এই ধারণার যে-বৈশিষ্ট্য সেটা আইনস্টাইনের জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করে: ধারণাগুলি অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তিসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হিসাবে আসছে না, তবুও

অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারা সবসময়েই যুক্ত। পরে তাদের পদার্থগত ছাঁচের ধারণাগুলি থেকে জ্যামিতির ধারণাগুলিতে পৌঁছবার প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর এই অবস্থানের পুনরুক্তি করেছেন।

প্রাচীন জ্যামিতি তার পরবর্তী কালের বিকাশের ধারায় সেটা পদার্থগত বা আধা-পদার্থগত যাই হোক না কেন—ক্রমশ অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের শেকড় বা উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কালে কালে দেখা গেল যে, কেবলমাত্র কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ (axioms) থেকেই অনেকগুলি জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য পাওয়া যেতে পারে। কাজেই জ্যামিতি পুরোপুরি একটা গাণিতিক বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল। "আধা-অভিজ্ঞতাবাদী হতবুদ্ধিকর ক্ষেত্র থেকে পুরো জ্যামিতিকে আলাদা করার ইচ্ছাটা" আইনস্টাইন লিখছেন, "অস্পষ্টভাবে ভুল সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেল, যাকে তুলনা করা যেতে পারে প্রাচীনকালের বীরদের দেবতাদের আসনে বসানোর সঙ্গে।" এখন 'স্বতঃসিদ্ধ' বলতে মানুষের মনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এইরকম কিছুকে সূচিত করে, যেটাকে তর্কশাস্ত্রগত বিরোধের সম্মুখীন না করলে নাকচ করে দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে পরে তর্কশাস্ত্রগত বিরোধহীন স্বতঃসিদ্ধগুলিকে—যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলেই 'স্বতঃসিদ্ধ', বিশেষ করে জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধগুলি, কী করে পদার্থগত বাস্তবতার জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে? এই রকম একটা সন্ধিক্ষণে, আইনস্টাইন লিখছেন, জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধ (a priori) রূপ হিসাবে কান্টের দেশ-সংক্রান্ত ধারণাটি সামনে এসে গেল।

আইনস্টাইন কান্টের পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণাকেই শুধুমাত্র বরবাদ করেন নি; তিনি বিজ্ঞানের কয়েকটি আসল সমস্যা ও বাস্তব বিরোধ তুলে ধরেছিলেন—যেখান থেকে একদেশদর্শী বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় (এক্ষেত্রে দেশের পূর্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণা); যখন কতকগুলি দিককে পরম সত্যের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়—তখনই এটা ঘটে। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ চরিত্রের জন্যেই পূর্বতঃ-সিদ্ধ মোহের সৃষ্টি হয়েছে। জ্যামিতির ধারণাগুলিকে তাদের পদার্থগত আদিরূপ থেকে আলাদা করে দেখার যে ঝোঁক অন্য সূত্রের মধ্যে রয়েছে সেটা পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যেই পাওয়া যায়।

"কঠিন বস্তু-দেহ ও আলোকের প্রকৃতি সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রকৃতিতে এমন কোনো বস্তু নেই যার ধর্মগুলি (properties) ইউক্লিডের জ্যামিতির মৌল ধারণার সঙ্গে একেবারে ঠিক ঠিক মিলে যায়।

কোনো কঠিন বস্তু-দেহও একেবারে নিরেট নয়, একটা আলোর রেখা কোনো সরল রেখার অথবা একমাত্রিক কোনো মূর্তির (image) অবিকল প্রতিরূপ নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্যামিতিকে আলাদা বা এককভাবে কোনো পরীক্ষার সঙ্গে মানানো যায় না ; একে বলবিদ্যা, আলোকবিদ্যা (optics) প্রভৃতির সঙ্গে একত্র করে যে পরীক্ষাগুলি করা হয় তাদের ব্যাখ্যা করার জন্যে ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া পদার্থবিদ্যার আগে আসছে জ্যামিতি, যেহেতু পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলিকে জ্যামিতি ছাড়া প্রকাশই করা যাবে না। কাজেই জ্যামিতিকে একটা বিজ্ঞানরূপে হাজির করতে হবে, যেটা যুক্তির দিক থেকে সকল অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের পূর্বগামী।"

বৈজ্ঞানিক চিন্তার এই বিচ্যুতি বুঝিয়ে দিতে গিয়ে আইনস্টাইন পুনরায় তাঁর গোড়াকার এই থিসিসের উল্লেখ করলেন, যেটা বিজ্ঞানের পদ্ধতি সম্পর্কিত তাঁর অনেক লেখার মধ্যে পাওয়া যায় : যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে মনের 'পরে যে-ছাপগুলি পড়ে তার সবকিছুর সঙ্গে ধারণাগুলি একাত্ম নয়।

সোলোভিন-কে লেখা একটি চিঠিতে(১) আইনস্টাইন এই একই মতকে ব্যক্ত করেছেন আরও জোরের সঙ্গে এবং আগের থেকেও অনেকখানি এগিয়ে। "ঠিক মতো বলতে গেলে," লিখছেন তিনি, "জ্যামিতিকে নিরেট দেহযুক্ত বস্তুর পর্যায়ে নামানো যায় না, যেটার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। এবং এটাও বিচারের মধ্যে রাখতে হবে যে, নিরেট দেহযুক্ত বস্তুদের সংখ্যাতীতভাবে বিভাজন করা যায় না।"

আইনস্টাইন বলেছেন যে, পরমাণুদের দিয়ে গঠিত বস্তু-দেহগুলিকে (bodies) ঠিক জ্যামিতির চেহারার মধ্যে ফেলা যায় না : কোণগুলি ঠিক বিন্দুতে এসে পৌঁছায় না, ইত্যাদি, এবং আলোর তরঙ্গধর্মী চরিত্রের তত্ত্বের দিক থেকে একটা রশ্মিকে একটা সরল রেখার অনুরূপ ছাঁচে ফেলা যায় না। জ্যামিতিক ধারণা-গুলিকে মামুলি অথবা পূর্বতঃসিদ্ধভাবে (a priori) অথবা পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরপেক্ষ সুতরাং অপরিবর্তনীয়—এইভাবে দেখার লোভ পোষণ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এর সঙ্গে আইনস্টাইন দেশের মাত্রা মেপে এবং বিশেষ করে বস্তু-দেহগুলির স্থানবিশেষে অবস্থিতি কোথায়, সেটা দেখিয়ে আর একটি

১ Solovine, p. 129

বিষয় যোগ করেছেন। আমরা মাপবার জন্যে উপযুক্ত মাপকাঠি ব্যবহার করি এবং একটা জানা দূরত্বের মধ্যে স্থানবিশেষে অবস্থিত বিন্দুগুলির দূরত্ব কতোখানি তা জানতে চাই। কিন্তু এগুলি যদি স্থানবিশেষে অবস্থিত বিন্দু হয়, তাহলে আমরা যে বস্তু-দেহটিকে মাপছি তার 'পরে আমাদের মাপকাঠির প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারি না। আইনস্টাইন যখন উপরের চিঠিটি লেখেন তখন ঠিক এটাই তাঁর মনে ছিল: "অনুরূপভাবে, আমরা যে বস্তু-দেহগুলিকে মাপছি তাদের উপরে আমাদের মাপবার জন্যে ব্যবহৃত বস্তু-দেহগুলির কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না, একথা ধরে নেওয়াটা নিশ্চয়ই যুক্তি-সঙ্গত নয়।"

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে আইনস্টাইনের মনোভাবের উল্লেখ যখন আমরা করব তখন এই মন্তব্যটিকে আবার স্মরণ করতে হবে। এ থেকে যে-সিদ্ধান্ত তিনি টানছেন তা হল:

"মনের 'পরে যে ছাপগুলি পড়ছে তা থেকে যুক্তিশাস্ত্রসম্মত ধারণাগুলি বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতী ও ন্যায়শাস্ত্রগত অনুসন্ধানের লক্ষ্যগুলি থেকে এই ধরনের ধারণা না করা ছাড়া গতি নেই। এ থেকে একটা নীতি বেরিয়ে আসে: যুক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ না করে (অর্থাৎ, যুক্তিবিদ্যাকে একেবারে লঙ্ঘন না করে—অনুবাদক) কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। অন্য কথায় বলতে হলে, বাড়ি তৈরি করতে যেমন ভারা বাঁধা দরকার, অথবা সাঁকো করতে যেমন খুঁটি আগে থেকে পুঁততে হয় কিন্তু তারা কেউই বাড়ি বা সাঁকোর অঙ্গ নয়।"

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মহান যুক্তিবাদীদের অনুগামীর পক্ষে এ একটা অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত। তাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, যুক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করাটা সত্যের বিরুদ্ধে অপরাধ করার শামিল। কিন্তু সেখানে আইনস্টাইন নিশ্চয়ই দেকার্ত ও স্পিনোজার যতটা না অনুগামী ছিলেন, ছিলেন তাঁদের উত্তরসূরী। তিনি তাঁদের জানতেন, কিন্তু গ্যোয়েটের কথাও তাঁর জানা ছিল: "তত্ত্ব হল ধূসর, বন্ধু, কিন্তু জীবনের বৃক্ষ চিরসবুজ।" আইনস্টাইন দেখে-ছিলেন যে, সরাসরি 'মনের 'পরে ছাপগুলি' একটা জটিল প্রক্রিয়ার দ্বারা তত্ত্বের বিমূর্ত ধারণাগুলিতে বিকশিত হয়, যার মধ্যে বাস্তবতার কয়েকটি দিককে লঙ্ঘন করার ব্যাপারটাও পড়ে। 'অপরাধহীন' যুক্তিবাদের চরম অভিব্যক্তি—লাপলাসের 'সর্বজ্ঞ' সত্তা যে মহাবিশ্বে সকল বস্তুকণিকার স্থানগত অবস্থান ও

গতিবেগ জানে—সেটা সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের কাছে ছিল ভবিষ্যতের ব্যাপার এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের কাছে অতীতের ব্যাপার।

যাই হোক, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বস্তুর পরমাণুগত ধারণা ও আলোর তরঙ্গধর্মী চরিত্রের কথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন প্রকৃতিকে আর এক ধরনের ফলিত জ্যামিতি বলে ধরা হল না। এ থেকে দাঁড়াল যে, জ্যামিতি প্রকৃতির বিমূর্ত চেহারা নয় এবং তা থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে বলা হল, পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা বা মামুলিভাবে দেখার' (conventions) 'পরে ভিত্তি করলেও জ্যামিতিতে পরের কদমে পৌঁছনো যাবে।

আরও অগ্রগতির ফলে ক্রমশ বেড়ে ওঠার কষ্টটা প্রশমিত হল। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধতার ভিত্তি আরও বিকশিত হওয়াতে জ্যামিতির পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা ও মামুলিভাবে ধরে-নেওয়ার ব্যাপারটা চুকে গেল এবং জ্যামিতির পদার্থগত ছাঁচ সম্পর্কে ধারণাগুলির আরও বিকাশ হতে লাগল।

প্রাথমিক অনুমান ও স্বীকার্যগুলির (postulates) 'পরে ভিত্তি করে যে সামগ্রিক বিস্তৃত জ্যামিতিক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে, সেটা আগে-থেকে স্বীকৃত জ্যামিতি ও আগে-থেকে স্বীকৃত দেশ-এর ধারণাকে দুর্বল করে দেয়। লোকেরা জিগ্যেস করে, বাস্তব জগতের জ্যামিতিটা কী? এই প্রশ্নের আদৌ কোনো অর্থ হয় কি? আইনস্টাইন প্রথমে হেলম্‌হোলজ্‌-এর জবাবটিকে বিশ্লেষণ করলেন: জ্যামিতির ধারণাগুলি বাস্তব বিষয়বস্তুর 'পরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং শেষ বিচারে জ্যামিতির বক্তব্য বাস্তব বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বক্তব্য।

পোঁয়েকারে অন্য মত অবলম্বন করেন: জ্যামিতির ধারণাগুলি নিছক মামুলি চালু (conventions) সিদ্ধান্ত মাত্র। আইনস্টাইন হেলম্‌হোলজ্‌-এর বিশ্লেষণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে বলেছেন যে, এ ছাড়া তিনি কখনও আপেক্ষিক তত্ত্বে আসতে পারতেন না।

পরে আমরা দেখব যে, আপেক্ষিক তত্ত্ব জ্যামিতিকে ব্যাখ্যা করে যেভাবে, সেটা বাহ্যবস্তুর (মনের বাইরের বস্তুজগৎ, এই অর্থে বাহ্য—অনুবাদক) সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় এবং তাকে খুব সঠিক ভাবে বর্ণনা করে। অতএব বাহ্যবস্তুর পদার্থগত চরিত্র ও তাদের পদার্থগত সত্যাসত্য কী হবে সে সম্পর্কে জ্যামিতি উদাসীন থাকতে পারে না, এটা তর্কশাস্ত্র ও গণিত, দুইয়েরই

বৈশিষ্ট্য। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, বিশুদ্ধ গণিত এই ধরনের ছকের উপরেই জোর দেয়, কোনো একটা বস্তু সম্পর্কে যদি অনুমানগত সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তাহলে আরও একটা ঐ ধরনের অনুমানগত সিদ্ধান্ত থাকতে হবে, যার সম্পর্কেও ঐ বস্তুটি সত্য। রাসেল আরও বলেছেন, প্রথমত, আসল কথাটা হচ্ছে যে, প্রথম অনুমানগত সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্নটি অবহেলিত হয় এবং দ্বিতীয়ত, বস্তুটির চরিত্রকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না। রাসেল বলছেন, গণিতকে তখনই বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে যাতে আমরা সত্য কি মিথ্যা বলছি তা কখনও জানা যাবে না।

আমরা যদি বিষয়টির সত্তাতত্ত্বগত দিকটা লক্ষ্য না করি, তাহলে সেটা কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। প্রথম অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত থেকে দ্বিতীয় অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত টানবার নানা উপায় রয়েছে এবং তাদের বাছাই করার ব্যাপারটা নির্ভর করে প্রথম অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু ও যে-বিষয়-বস্তুকে উল্লেখ করা হচ্ছে, তার চরিত্রের উপর। গণিত, এক্ষেত্রে জ্যামিতি — সত্তাতত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যার অর্থে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। আইনস্টাইনের কাছে এর অর্থ ছিল যে, গণিতের সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে, পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণ করা যেতে পারবে।

তাহলে আমরা দেখছি, গণিতে পূর্বতঃসিদ্ধতা ও মামুলিভাবে ধরে-নেওয়া, এবং স্বতঃসিদ্ধ ও অলঙ্ঘনীয় পদার্থগত সম্পর্কের সঙ্গে জ্যামিতির একাত্মতার প্রাচীন ধারণার বিরোধিতা করেছেন আইনস্টাইন। প্রকৃতির বিশ্লেষণে বিশুদ্ধ চিন্তা কোনো পূর্বসিদ্ধান্তের জন্ম দেয় না ; তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে হয়। একমাত্র তখনই তাদের পদার্থগত অর্থ পাওয়া যেতে পারে। আগে-থেকে ধরে-নেওয়া স্বতঃসিদ্ধ সত্য কিছু নেই কিন্তু অভিজ্ঞতাজাত স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ও সমানভাবেই মরীচিকার সৃষ্টি করে। জ্যামিতির ধারণাগুলি নতুন পদার্থগত মর্মবস্তু লাভ করে এবং সেই প্রক্রিয়াতে তারা বদলেও যায়।

আগে যে বিশ্লেষণ করা হল, তাতে আইনস্টাইন যে পথ ধরে আপেক্ষিক তত্ত্বকে বিস্তার ও বিকাশ করেছেন তার বৈশিষ্ট্যটা পাওয়া যায়। গণিত ও পদার্থবিদ্যায় আইনস্টাইন প্রথম দিকে যে-শিক্ষা লাভ করেছিলেন, এর মধ্যে তারও পরিচয় মেলে। আপেক্ষিক তত্ত্ব রূপায়িত হবার পরে যেখানকার যেটি যেখানে থাকা দরকার তা সম্ভব হল কিন্তু ইমারত নির্মাণ করতে যে মালমশলার দরকার পড়ে তাকে আগে থেকে তৈরি করতে হয়েছিল। সম্ভ-

নির্মিত ইমারতে(১) ঐ মালমশলার মূল্য যে কী এবং তাদের স্থান যে কোথায় —সেটা নির্ভর করছিল ইমারত-গঠনের রূপের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার উপর। এবং এটা আবার পালাক্রমে নির্ভর করেছিল সঞ্চিত গাণিতিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের উপর—সেটা পরে বিশেষভাবে তাঁর কাজে লেগেছিল।

এই পাতাগুলিতে যে গাণিতিক ধারণাগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিকে এই পর্যায়ে আরও পদ্ধতিগতভাবে পর্যালোচনা করে দেখা সঙ্গত হবে।

স্কুলে জ্যামিতির যেসব একেবারে সরলতম প্রাথমিক প্রতিপাদ্যগুলি (থিওরেম) পড়ানো হয় তার সবটাই এই অনুমানের 'পরে ভিত্তি করে করানো হয় যে, একটা লাইনের অংশবিশেষকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও এবং তাকে বিভিন্ন স্থানে রেখে মাপজোক করলেও তার পুরো দৈর্ঘ্যটার কোনো বদল হয় না। এই অনুমানের গুরুত্ব সবিশেষ এবং এতেই রয়েছে সেই সকল ধারণা যা আপেক্ষিক তত্ত্বের মৌলিক বিষয়গুলিকে ঠিকমতো সাজাবার জন্যে একান্ত আবশ্যক।

দুটো সীমার মধ্যে একটা লাইনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে তার দূরত্বের মাপকাঠি। একটা বিন্দুর অবস্থান নির্ধারণ করতে হলে অন্য বিন্দুর থেকে তার দূরত্ব কতটুকু তা দিয়ে তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়; আর দূরত্বকে মাপা হয় বিভিন্ন বিন্দুর অবস্থানকে মাপজোক করে। একটা বিন্দুর অবস্থান কোথায় সেটা কিন্তু একটা আপেক্ষিক ধারণা; অন্য বিন্দুর অথবা সরলরেখার অথবা তল-এর অবস্থানের তুলনায়(২) একে ধরা হয়। এমনকি যে-সকল অবস্থানকে আয়তনের দিক থেকে সংশ্লিষ্ট করা হয় না, যেমন 'উপরে', 'নীচে', 'ডান দিকে', 'সামনে', তাদেরও অন্য বিন্দুদের, সরলরেখার অথবা তল-এর সঙ্গে তুলনা করে উল্লেখ করতে হয়, যার সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু হয়ত বা 'নীচে' অথবা 'সামনে' হতে পারে। দেকার্তে একটা বিন্দুকে দেশের পটভূমিতে (point in space) আয়তনের দিক থেকে বর্ণনা করার উপায় বার করেছিলেন। এই দেশ (space) যদি একটা তল হয়, তাহলে দুটো পারস্পরিক-

---

১ ইমারত শব্দটি তুলনামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আসলে বুঝতে হবে, 'ইমারত' বলতে এখানে আপেক্ষিক তত্ত্বের পুরো ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে।—অনুবাদক।

২ রেফারেন্স—অর্থাৎ, একটার অবস্থানকে বিচার করে অন্যের অবস্থান ঠিক করা।—অনুবাদক।

ভাবে লম্ব সরলরেখা—যাকে স্থানাঙ্কের অক্ষ (বা co-ordinate axis) বলে তাকে তল-এর একটা বিন্দুর মধ্যে দিয়ে টানতে হবে—সেই বিন্দুটাই তার উৎস স্বরূপ—এবং নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে তাদের প্রতি অন্য লম্ব-রেখাকে নামিয়ে নিতে হবে। এই লম্বগুলির দৈর্ঘ্য কতটুকু,—এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক-গুলি কী, সেটাই সমতলে সে কোথায় অবস্থান করছে তা নির্ধারণ করবে। দেশে-এ একটা বিন্দুর কোথায় অবস্থান রয়েছে সেটার বর্ণনা করতে যে দুটো স্থানাঙ্কের দরকার হয়, সেটাকে আমরা দ্বিমাত্রিক বলি। তাকে যে একেবারে সমতল হতে হবে তা নয়, সে একটা গোলকের (sphere) উপরের জমির মতো বক্রাকৃতিও হতে পারে। ঐ ধরনের বক্রাকৃতি ভূমির ভালো উদাহরণ হল আমাদের পৃথিবী এবং একটা বিন্দুর অবস্থান নির্ধারণ করতে হলে মেরুদেশ (অথবা নিরক্ষরেখা) থেকে এবং একটা মধ্য-রেখাকে (meridian) শূন্য ধরে নিয়ে তার থেকে মাপা। এই ধরনের স্থানাঙ্কের ব্যবস্থাতে (নির্দেশক কাঠামো) দুদিকের দুই স্থানাঙ্ক নিশ্চয়ই বক্রাকৃতি।

দেকার্তের স্থানাঙ্কের সাহায্যে একটা বিন্দুকে ত্রিমাত্রিক দেশ-এর পটভূমিতে বর্ণনা দিতে হলে আমাদের তিনটি পারস্পরিকভাবে লম্ব সরলরেখার প্রয়োজন হয়। বিন্দুটির স্থান নির্ধারণ করা হয় তিনটি স্থানাঙ্কের দ্বারা—যারা লম্বগুলির দৈর্ঘ্য তিনটি তল-এ বিন্দু থেকে যে আঁকা হয়েছে তাদের বোঝায়।

একটা দেকার্তীয় পদ্ধতির বদলে আমরা অন্য ধরনের দেকার্তীয় পদ্ধতি আনতে পারি, যাতে একটা সূত্রের নতুন বিন্দু ঠিক করতে হবে এবং যে কোনো দিকে তিনটি পারস্পরিকভাবে লম্ব এক্সিস (বা অক্ষ) টানতে হবে। এই ধরনের বদল করাকে বলা হয় কো-অর্ডিনেটের (স্থানাঙ্কের) **স্থান পরিবর্তন** করা। এতে স্থানাঙ্কের পরিমাণ বদলে যায় কিন্তু একটা অংশের দৈর্ঘ্যের নয়। আমরা যদি একটা সরলরেখার প্রান্তদিকের দুটি স্থানাঙ্ককে জানি তাহলে আমরা তার দৈর্ঘ্য হিসাব করতে পারি। আমরা যদি অন্য কোনো পদ্ধতি (reference system) নিই, আমাদের সরলরেখার শেষ যেখানে হচ্ছে তার নতুন স্থানাঙ্ক নিই এবং তার দৈর্ঘ্য মাপি, তাহলে আমরা পুরানো পদ্ধতির হিসাব একই হচ্ছে বলে দেখব। একটা সরলরেখার অংশবিশেষ পরিমাণবাচক মাপের পর্যায়ে পড়ে, যেটা স্থানাঙ্কদের বদল করতে সাহায্য করে না এবং এই ধরনের বদলকে **অপরিবর্তনীয়** (invariants) বলা হয়।

এই ধরনের জ্যামিতির ধারণা নিয়ে কাজ করার সময়-কারুর মনের মধ্যে তার পদার্থগত অনুরূপ অন্যান্য ছাঁচের কথা মনে পড়ে। চোখের সামনে একটা লাইনের অংশবিশেষ ভেসে ওঠে, যেন একটা বারবেলের মতো : দুদিকের দুটো ওজনবিশিষ্ট গোলার (বারবেলের দুদিকের—অনুবাদক) মাঝের দূরত্বটা কখনও বদলায় না এবং তাদের সবটাকে নিয়ে একটা নিরেট যান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। একটা সমতলে কো-অর্ডিনেটের (স্থানাঙ্কের) দুটো লম্ব লাইনকে মনে হয় যেন একটা চৌকোণা টেবিলের আড়-লম্বা দুই ধার, সেটা মেঝেতে বা জমিতে যেখানেই টানা হোক। একটা ত্রিমাত্রিক নির্দেশক কাঠামোর ধারণার নির্দিষ্ট ভাবমূর্তি হল একটা মেঝে এবং পারস্পরিকভাবে দুটো কোনাকুনি দেওয়াল সবদিকে নিঃসীমভাবে বিস্তৃত—যা কোনো জাহাজ, সূর্য অথবা সাইরাস নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত। একটা দণ্ডের দৈর্ঘ্য (অথবা আরও জটিল কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থার) একই হবে, তার কো-অর্ডিনেট (স্থানাঙ্কের) বিন্দুগুলি জাহাজ অথবা পৃথিবী ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেভাবেই মাপা হোক না কেন ; অর্থাৎ বলতে গেলে, আসল কোনো বস্তুর জ্যামিতিক গুণাবলী কী, তা বর্ণনা করতে হলে আমাদের তাদের উৎস-ক্ষেত্রটিকে ধরতে হবে। একটা কো-অর্ডিনেট (স্থানাঙ্ক) ব্যবস্থার উৎসমুখে একটা বিন্দুকে নির্বাচন (বা ঠিক করে) করে ধরার ফল একই দাঁড়াবে, যেহেতু যাকে আমরা দেশ এর ঠাসা-বাঁধা চরিত্র (homogeneity) বলি, তা রয়েছে। অতএব আমরা ঘোষণা করতে পারি যে, যখন কোপারনিকাস একটা কো অর্ডিনেট (স্থানাঙ্ক) ব্যবস্থা পেয়ে গেছেন পৃথিবীকে একটা বিশেষ স্থানে বসিয়ে(১), তখন তিনি দেশ-এর ঠাসা-বাঁধা চরিত্রই বলতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন যে, যখন তিনি অন্য একটা কো-অর্ডিনেট (স্থানাঙ্ক) ব্যবস্থাতে যাচ্ছেন (কোপারনিকাস সূর্যকে এই নতুন স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ধরেছেন) তখন বস্তু-দেহগুলির চেহারা, মাত্রা, অথবা চলাফেরা কিছুই বদলাচ্ছে না।

অতএব আমরা শেষ অবধি সেই ধারণাতে উপনীত হলাম যেখানে

১ অর্থাৎ, পৃথিবীকে কেন্দ্র না ধরে গতিশীল একটা বস্তু হিসাবে, একটা বিশেষ পয়েন্ট হিসাবে ধরে নিয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে সৌরজগৎকে দেখা।
—অনুবাদক।

দেশ-এর প্রতিটি দিকই একটা আর একটার মতো একইভাবে কাজে লাগবে, এই ব্যাপারটাকে আমরা দেশ-এর Isotropy (সমাকৃতি) বলে থাকি। যখন প্রাচীন গ্রীসের পণ্ডিতরা এই ধারণা ছেড়ে দিলেন যে, antipodes-দের (প্রতিপাদদের) পৃথিবী থেকে 'পড়ে' যাবার ভয় রয়েছে, অর্থাৎ, কিনা বলতে হলে দেশে বা মহাকাশে একটা দিকই মাত্র যেন বিশেষ সুবিধা(১) ভোগ করে, এই ধারণা যখন ছেড়ে দিলেন—তখন তারা কার্যত আবিষ্কার করলেন, যে বিভিন্ন আয়তনের সাহায্যে বস্তুদেহগুলির চেহারা, মাত্রা ও চলা-ফেরার বৈশিষ্ট্যকে মাপা হচ্ছে, সেগুলি (অর্থাৎ, ঐ আয়তনগুলি—অনুবাদক) যে-কোনো নির্দেশক কাঠামোর (frame of reference) মধ্যে একটা axis (অক্ষ) দাঁড়াচ্ছে যেন 'উঁচু', যে ব্যবস্থাতে অন্যকে ধরা হচ্ছে যেন 'নীচু'।

কিন্তু জ্যামিতিক-ভাবে অপরিবর্তনীয় যারা, যাদের কথা আগে বলা হয়েছে,—স্কুলে যা পড়ানো হয় তাতে এই অনুমানের 'পরে ভিত্তি করা হয় যে একটা সরলরেখাকে সরিয়ে অন্যত্র দিয়ে নিয়ে গেলেও তার দৈর্ঘ্যের কোনো বদল হয় না। একটা সরল রেখার দুটি প্রান্ত-বিন্দুর স্থানাঙ্কের থেকে তাকে একটা ফরমুলার সাহায্যে হিসাব করে বার করা সম্ভব হয়। আমরা আগেই বলেছি, নির্দেশক কাঠামোটি কী হবে সেটা বেছে নেওয়ার পরে তার কো-অর্ডিনেটের (স্থানাঙ্কের) রদবদল নির্ভর করে কিন্তু তার দৈর্ঘ্যটা একই থাকে ; কো-অর্ডিনেটদের (স্থানাঙ্কের) রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এটা অপরিবর্তনীয়। প্রান্তবিন্দুর কো-অর্ডিনেটদের (স্থানাঙ্কের) সঙ্গে লাইনের দৈর্ঘ্যকে সংযুক্ত করে আমরা অন্য ফরমুলা ভাবতে পারি।—অন্য কোনো স্ববিরোধী অবস্থার মধ্যে না পড়ে আমরা জ্যামিতির মৌল অনুমানগুলিকে বদলে নিতে পারি।

১ দেশ বা মহাকাশকে যদি তার আসল ত্রিমাত্রিকরূপে বুঝতে পারা যায় তাহলে উচ্চ-নীচ ব্যাপারটা ধারণার মধ্যে আর থাকে না।

একটা উদাহরণ দিলে হয়ত আর একটু পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একটা রকেট কলকাতা শহর থেকে উপরের দিকে যাত্রা করল। কিন্তু সেই রকেট যখন উপরের দিকে যাত্রা করে ১০০ মাইল বা তারও থেকে 'উপরে' চলে গেছে, তখন সেই রকেট থেকে পৃথিবীকে একটা গোল বলের মতো দেখাচ্ছে এবং তখন বলতে হবে, সেই রকেট কলকাতা থেকে ১০০ মাইল 'উপরে' তো নয়ই,—এটা বলার কোনো অর্থই হয় না—বলতে হবে, সারা পৃথিবী থেকে ১০০ মাইল দূরে রয়েছে।—অনুবাদক।

শেষোক্ত এই সম্ভাবনা দেশ-এর পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণার প্রতি শক্তিশালী আঘাত দিয়েছিল।

ইউক্লিডের জ্যামিতির সম্পর্ককে কান্ট মনে করতেন পূর্বতঃসিদ্ধ (a priori) যেটা মনের মধ্যেই আছে এবং যেটা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। ইউক্লিড যখন খৃষ্টপূর্ব তিন শতাব্দীতে মাত্র কয়েকটি পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত থেকে সবকটি থিওরেম (বা উপপাদ্য) বার করলেন, তখন তার মধ্যে তথাকথিত সমান্তরাল রেখার ধারণাগত সিদ্ধান্তগুলিও তিনি ধরে নিলেন, যে সিদ্ধান্তগুলিতে একদিকে কার্যত বলা হচ্ছে একটি, কেবলমাত্র একটি লাইনকেই একটি বিন্দুর মধ্যে দিয়ে অন্য লাইনকে ছেদ না করে টানা যায়, যেখানে বিন্দুটি উক্ত লাইনের বাইরে রয়েছে। এই ধারণাগত সিদ্ধান্ত এই প্রমাণের ভিত্তি যে একটা ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল হবে ১৮০° ডিগ্রি, যে একই সরল রেখার উপরে দুটি লম্ব রেখা টানলে তারা পরস্পরের সমান্তরাল হবে এবং এই রকমের আরও কয়েকটি প্রতিপাদ্য যার মধ্যে ধরতে হবে একটি সরল রেখার অংশবিশেষের দৈর্ঘ্য মাপা যেতে পারে যদি তার দুই প্রান্তবিন্দুর কো-অর্ডিনেট (স্থানাঙ্ক) দেওয়া থাকে।

১৮২৬ সালে নিকোলাই লোভাচেভস্কি অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রবর্তন করে দেখালেন, যাতে ঠিক ঐ সমান্তরাল রেখার ধারণা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত খাপ খাচ্ছে না। লোভাচেভস্কি'র জ্যামিতিতে একটা সরল রেখায় অবস্থিত নয় এ রকমের বিন্দুর ভেতর দিয়ে অসংখ্য সরল রেখা টানা যায় যারা আগের ঐ সরল রেখাকে ছেদ করে না, একটা ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল ১৮০° ডিগ্রির কম, একটা সরল রেখার উপরে লম্ব রেখাগুলি বেঁকে যাবে (বা পরস্পরের সমান্তরাল হবে না) এবং দুই প্রান্ত-বিন্দুর কো-অর্ডিনেট (স্থানাঙ্ক) মেপে সরল রেখাকে নির্ধারণ করতে হয়। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে এ রকমটা হয় না।

তিরিশ বছর পরে বারনার্ড রিম্যান ইউক্লিডের সমান্তরাল রেখার স্বীকার্যের পরিবর্তে এই নতুন বক্তব্য পেশ করলেন যে, একটা রেখাতে অবস্থিত নয় এমন কোনো বিন্দুর মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে ছেদ করে এমন লাইন টানা একেবারেই সম্ভব নয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, রিম্যানের জ্যামিতিতে সমান্তরাল রেখাগুলির অস্তিত্ব নেই ; একটা ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল ১৮০° ডিগ্রির বেশি একই সরল রেখার উপরে দাঁড়-করানো লম্ব রেখাগুলি এক

বিন্দুতে মিলে যাবে (অর্থাৎ তারা সমান্তরাল নয়—অনুবাদক) এবং কো-অর্ডিনেট (স্থানাঙ্ক) থেকে একটি সরল রেখার দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করাটা আবার অন্য রকমের।

লোভাচেভস্কি ও রিম্যানের এই সকল আপাতবিরোধী জ্যামিতির সিদ্ধান্ত সহজ ও ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা জ্যামিতির রেখাগুলিকে একটা সমতলে না এঁকে তাদের বক্র পৃষ্ঠের উপরভাগে বা ভেতরের দিকে আঁকি। উদাহরণ স্বরূপ একটা গোল বলের মতো মণ্ডল (sphere) ধরা যাক। তারা বর্তুলাকার গাত্রে একটা সমতলে আঁকা সরল রেখাগুলির অংশবিশেষ একটা চাপের (আর্কের বা বক্র রেখার অংশবিশেষ) হ্রস্বতম অংশ যাতে দুটো বিন্দুকে (যাদের বলা হচ্ছে জিওডেসিক বা ভূ-পৃষ্ঠের গাত্রে একই দ্রাঘিমাতে স্থাপিত দুটি বিন্দু—অনুবাদক) যোগ করা হচ্ছে। ভূগোলকের গাত্রে জিওডেসিকের উদাহরণ হচ্ছে নিরক্ষবৃত্তের মধ্যরেখার (meridians) চাপগুলি, যেমন নিরক্ষ-বৃত্ত অথবা অন্য কোনো বৃহৎ বৃত্তের(১) যোগ করা সরল রেখা। কিন্তু নিরক্ষ-বৃত্তের মধ্যরেখা দুটি নিশ্চয়ই পরস্পরকে ছেদ করবে, এজন্যেই দুটি সমান্তরাল জিওডেসিক লাইন পাওয়া যায় না। নিরক্ষবৃত্তের পরে লম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে বৃত্তের যেসব মধ্যরেখা বা মেরিডিয়ান, সেগুলি মেরুদেশে গিয়ে মিলে যাচ্ছে। বৃত্তর ও দুটি মধ্যরেখার মধ্যে একটি ত্রিভুজ আঁকলে, অর্থাৎ যার শীর্ষদেশ হবে একটি মেরুদেশ, আমরা দেখি সেই ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রির বেশি হবে।(২)—একটি মণ্ডলের গাত্রে বিন্দুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা হ্রস্ব অংশের দৈর্ঘ্যকে নির্ধারণ করতে হবে একটি সূত্রের (বা ফরমুলার) দ্বারা যার সঙ্গে একটি সমতলে দুটি বিন্দুর মধ্যে অনুরূপ অংশের মাপ যেভাবে করা হয় সে পদ্ধতিতে নয়।

বক্রতলে (curved surface) সরল রেখাকে জিওডেসিক দিয়ে বদল করলে সকল রকমের সম্পর্ককে লোভাচেভস্কির জ্যামিতিতে পরিণত করা হয়; একটা নির্দিষ্ট জিওডেসিকের মধ্যে নেই এই রকমের একটা বিন্দুর মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে ছেদ করে না এরকমের জিওডেসিক টানা যায়, একটা ত্রিভুজের

১ যেটি মণ্ডল সম্পর্কে প্রযোজ্য সমতল সম্পর্কে নয়।—অনুবাদক।

২ একটি সমতলে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল হবে ১৮০° ডিগ্রির সমান আর সেটাই ইউক্লিডের জ্যামিতিতে বলে।—অনুবাদক

তিনটি কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রির চেয়ে কম হয়, লম্বগুলি বিভিন্ন দিকে যায়(১) ইত্যাদি।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতি যেটা সমতল-এর উপরে গড়ে উঠেছে, তা থেকে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে নিয়ে যেতে হলে সমতলকে (যেটা ইউক্লিডীয় জ্যামিতির আধার—অনুবাদক) বক্র করতে হবে।

কিন্তু দেশ-এর পটভূমিতে(২) অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে কী করে ধারণায় আনা যাবে যেটা আসলে ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় (অর্থাৎ ঘন বা Solid—অনুবাদক) জ্যামিতি থেকে ত্রিমাত্রিক অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে রূপান্তরণ? বক্র ত্রিমাত্রিক দেশ বা মহাকাশকে আমরা চোখের সামনে রেখাচিত্র দিয়ে আঁকতে বা ধরতে পারি না। কিন্তু ইউক্লিডীয় থেকে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সম্পর্কের যেকোনো রূপান্তরকে আমরা ত্রিমাত্রিক দেশের বক্রতা হিসেবে গণ্য করতে পারি।

জুরিখ পলিটেকনিকে আইনস্টাইন যখন ইউক্লিডীয় এবং অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সম্পর্কে লেকচারে যোগ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর জ্যামিতির কল্পিত বস্তু বা বিষয়গুলি সম্পর্কে এরকম কোনো ধারণা ছিল না যাতে তিনি বুঝতে পারতেন যে এ থেকে তিনি নতুন পদার্থগত তত্ত্বের বিকাশে পৌঁছে যাবেন। মাত্র বহু বছর পরে যখন তিনি গতির আপেক্ষিকতার সমস্যাটা বুঝতে পারলেন, যেটা ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, একমাত্র তখনই কো-অর্ডিনেটের (স্থানাঙ্কের) রূপান্তরণের সঙ্গে দেশ-এর বক্রতার সরাসরি সম্পর্কটা দেখা দিল। এর জন্যে 'দেশ' সম্পর্কে ধারণা বা 'দেশ' বলতে আমরা কী বুঝি, তার ব্যাপকতর অর্থ পরিষ্কার হল।

১ অর্থাৎ সমতল-এ কয়েকটি বিন্দু থেকে টানা সরলরেখার উপরে যদি পরপর কয়েকটি লম্ব টানা যায়, তারা যেমন পরস্পরের সমান্তরাল হবে, যেটা ইউক্লিডের জ্যামিতিতে পাওয়া যাবে, মণ্ডলের জ্যামিতিতে (spherical geometry) তা হবে না।—অনুবাদক।

২ Space—আমরা এখানে মহাকাশের পটভূমিও বলতে পারি, কারণ মহাকাশে খ-বলবিদ্যার বা জ্যামিতির সবটাই বক্ররেখার মণ্ডলীয় জ্যামিতির নিয়মে চলে।—অনুবাদক।

আইনস্টাইন ত্রিমাত্রিক দেশ (বা মহাকাশ) এবং ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে নতুন পদার্থগত মর্মবস্তু আরোপ করেছেন। পদার্থগত প্রক্রিয়াগুলি কি ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সম্পর্কের মধ্যে খাপ খায়? ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা বলবে, হ্যাঁ। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বলবে, না। সেটা চতুর্মাত্রিক জ্যামিতিতে নতুন পদার্থগত মর্মবস্তু এনে দেয়।

নবম পরিচ্ছেদ

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাছাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার ভিত্তি

প্রকৃতি তার সহজ সরল সত্যে মানুষের হাতের তৈরি কোনো সৃষ্টির এবং আধ্যাত্মিক কোনো মায়াজালের অপেক্ষা অনেক বেশি সুন্দর।

রবার্ট মেয়ার

১৯৪৯ সালে তাঁর 'আত্মজীবনীমূলক নোটস'-এ আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বাছাই ও মূল্যায়ন করতে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। প্রথমটি তত্ত্বের 'বহির্জগতের সত্যাসত্য নির্ণয়ের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট : কোনোরকমেই সেটা যেন অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) তথ্যের বিরুদ্ধে না যায়। এই দাবিটা আপাত-দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কিন্তু তার প্রয়োগ করাটা বেশ সূক্ষ্ম ব্যাপার, কারণ তত্ত্বকে কৃত্রিম বাড়তি অনুমানের সাহায্যে গ্রহণ করাটা প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও অস্পষ্টভাবে সূত্রায়িত করা হয়, তত্ত্বের 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা', 'প্রকৃতিগতভাবে সহজ' অথবা 'যৌক্তিকভাবে সরল' এইভাবে। 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'র জন্যে কম-বেশি সমান গুরুত্বসম্পন্ন তত্ত্বগুলির মধ্যে কোনো একটিকে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যেন খামখেয়ালী পদ্ধতি অবলম্বন না-করা হয়।

আইনস্টাইনের ভাষায়, পদার্থগত তত্ত্বগুলিকে বেছে নেবার জন্যে দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত এই জোরালো দাবির নির্ভুলতা বা যাথার্থ্য সামান্যই এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই, সম্ভবত কোনো সময়েই এগুলিকে আন্দাজে ধরার বদলে একেবারে যথাযথ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারেন না।

তিনি বলেছেন, "যেভাবেই হোক, এটা দেখা যায় যে, যারা এটাকে উপস্থিত করে তাদের মধ্যে তত্ত্বের 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা' সম্পর্কে সাধারণত আগে থেকে এবং 'বহির্জগতের সত্যাসত্য' কতখানি যাচাই হবে তার মাত্রা সম্পর্কেও একটা মতৈক্য রয়েছে।"(১)

প্রথমে এটা জোর দিয়ে বলা দরকার যে, এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আসলে একটা ধারণাকেই প্রকাশ করে। তারা তত্ত্বের সত্তাতত্ত্বগত মূল্যকে নির্ধারণ করার মানদণ্ড রূপে এবং সেটা বাস্তবতার সঙ্গে কতখানি মিলে যায় তার জন্যে কাজ করে। এ থেকে অবশ্য এটা দাঁড়ায় না যে, সুন্দরের, সরলতার অথবা সর্বজনীনতার (general) কোনো রীতিসম্মত নান্দনিক মানদণ্ড নেই। আইনস্টাইন কিন্তু ঐ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতন্ত্র মূল্য দিতে চান না। তত্ত্বের সত্যতা সম্পর্কে এই বৈশিষ্ট্যগুলি কেবলমাত্র বাড়তি ইঙ্গিত দিয়ে থাকে।

এই ধারণাকে সমর্থন করতে অন্য ক্ষেত্র থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, স্থাপত্যবিদ্যার দিক থেকে দেখতে হলে একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সৌষ্ঠবপূর্ণ, সহজ ও স্বাভাবিক এবং আকর্ষণীয়; সুন্দরের নান্দনিক অনুভূতির নিজস্ব মূল্য আছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটা কাঠামো ও তার স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেকার সুষমার একটা পরিচয় তুলে ধরে।

সুষমা সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ম অনুভূতি, 'স্বাভাবিকত্ব' এবং যাকে তিনি বলতেন বৈজ্ঞানিক চিন্তার 'সঙ্গীতধর্মিতা'—এ সব নিয়ে আইনস্টাইন তত্ত্বের 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার' 'পরে নান্দনিক প্রভাব কী পড়ছে তাতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁর কাছে 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'র দৃষ্টিভঙ্গি অভিজ্ঞতামূলক তথ্যগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দ্ব্যর্থহীন কোনো তত্ত্বকে বেছে নেবার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'সম্পন্ন হল সেটাই যেটা তার ক্ষুদ্রতম মাত্রাতেও ইচ্ছামতো অনুমানের 'পরে নির্ভর করে। ঐ ধরনের তত্ত্ব অন্য যে-কোনো তত্ত্বের চাইতে দুনিয়ার চেহারাটার বিকাশ ও তার কাঠামোর বর্ণনা দিতে পদার্থগত বাস্তবতার সমরূপ, সর্বজনীন নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই তত্ত্ব মহাবিশ্বের বিষয়মুখী অনুপাতের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি।

---

১ Philosopher-Scientist, p. 25.

আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার দৃষ্টিভঙ্গি গাণিতিক পরিচ্ছন্নতার মানদণ্ডের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে: পোঁয়েকারে যাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: যত সামান্য সূত্র থেকে যত বেশি প্রতিপাদ্য আহরণ করা যাবে ততই বেশি হবে গাণিতিক নির্মাণের পরিচ্ছন্নতা, যাকে তিনি (পোঁয়েকারে) তুলনা করেছেন এমন স্তম্ভশ্রেণীর সঙ্গে যারা একটা ত্রিকোণ-বিশিষ্ট অট্টালিকার সম্মুখভাগকে অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে ধরে রাখে।(১) ঠিক ঠিক বলতে হলে, স্থাপত্য-শিল্প (বিশেষ করে প্রাচীন) দেখলে মনে হয় যেন তার স্থাপত্য-সমস্যার সমাধান যেভাবে করা হয়েছে, তার একটাই সমাধান থাকতে পারে: অনেকগুলি সম্ভাব্য স্থাপত্য-শৈলীর মধ্যে যখন শুধু একটির মধ্যেই পুরো কাঠামোটাকে ধরে রাখার স্থিতিবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়, তখন সেটাই সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন সমাধান হয়।

অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার জন্যে আইনস্টাইনের দাবি ছিল কয়েকটি বাড়তি ঠেক্না দেওয়ার (বা সমর্থন করার জন্যে সিদ্ধান্তের—অনুবাদক) চেয়ে বেশি কিছু, যা কিনা অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার কয়েকটি মানদণ্ডের মধ্যে একটি। তাঁর কাছে গাণিতিক পরিচ্ছন্নতার সত্তাতত্ত্বগত অর্থ ছিল, তত্ত্বের পরিচ্ছন্নতা বাস্তব জগতের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ হবারই প্রতিফলন মাত্র। আমরা পরে দেখব, আপেক্ষিক তত্ত্বে তড়িৎ-গতিবিজ্ঞান ও আলোকবিদ্যার জানা তথ্যগুলির সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে।

আইনস্টাইনের তাত্ত্বিক নির্মাণপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল পরিচ্ছন্নতা। বোলট্‌জমানকে অনুসরণ করে আইনস্টাইন বলেছেন, "পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে দরজি ও মুচিদের কাজ।" তবে পদার্থ-বিজ্ঞানের তত্ত্বের ক্ষেত্রেও তাঁর এই বক্তব্য প্রযোজ্য। অনেকগুলির মধ্যে একটি তত্ত্বকে বেছে নেওয়া, যেখানে সব কটা তত্ত্বেরই অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সঙ্গে মিল রয়েছে (যেগুলি নিজেরাই, আইনস্টাইন বলেছেন, কোনো তত্ত্বকে নির্ধারণ করতে পারে না), সেটা একটা সক্রিয় পদ্ধতি। এক্ষেত্রে মন অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই অগ্রসর হয়, বিশেষ করে অগ্রসর হয় সর্বাধিক পরিচ্ছন্নতা ও সর্বনিম্ন স্বতন্ত্র প্রতিপাদ্য থেকে, যার 'পরে তত্ত্বটির ভিত্তি রয়েছে।

---

১ অর্থাৎ সূত্র থেকে সিদ্ধান্তগুলি যখন বেরিয়ে আসে তখন যেন মনেই হবে না যে, তার মধ্যে কোনো প্রচেষ্টা আছে।—অনুবাদক।

আইনস্টাইন ও পোঁয়েকারে-এর মধ্যে জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে বিভেদ-রেখাটা তক্ষুণি পরিষ্কার হয়ে যায় যখন এই প্রশ্নটা তোলা হয়: পরিচ্ছন্নতা, স্বতন্ত্র নিম্নসংখ্যক প্রতিপাদ্য ইত্যাদির মূল্য কী? পোঁয়েকারে-এর কাছে পরিচ্ছন্নতার আসলে কোনো অর্থই নেই, এটা তত্ত্বের গভীর গুণাবলীর কোনো ইঙ্গিত দেয় না বা প্রকাশ করে না। আইনস্টাইনের কাছে তত্ত্বের বিশ্বস্ততার প্রমাণ হচ্ছে তার পরিচ্ছন্নতা(১), তার বিষয়মুখী নিশ্চিত অবস্থা—এই ধরনের বিচারের ভিত্তি সেই রকমের দর্শনে থাকতে পারে না—যাতে বিজ্ঞানকে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বা পছন্দসই রীতির উপর দাঁড় করানো হয়।

অল্পসংখ্যক প্রতিপাদ্য থেকে যে-তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় সেটা বাস্তবতার কাছাকাছি আসে এই সহজ কারণে যে, জগৎপ্রপঞ্চে যেসব বস্তু-দেহের ঐক্যবদ্ধ চেহারা প্রতিফলিত হয়, তাদের আচরণ পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ বিরাট বিশ্বের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের যে শৃঙ্খল রয়েছে, তাতে কোনো শিথিল গ্রন্থি নেই—যেখান থেকে অনুসন্ধান শুরু করা যেতে পারে। পূর্বতঃ-সিদ্ধ তত্ত্বের প্রবক্তারা যাই বলুন না কেন, এগুলি হল বিষয়মুখী নিয়ম। একটা তত্ত্ব যখন নিম্নসংখ্যক প্রাথমিক নিয়মগুলি থেকে একটা প্রতিপাদ্যে পৌঁছয়, তখন সেটা মহাবিশ্বের বাস্তব ঐক্যের আরও কাছাকাছি হয়। শৃঙ্খলের প্রতিটি গ্রন্থিরই উৎস ও কারণ রয়েছে এবং কাউকেই প্রাথমিক বা স্বতন্ত্র বলে ধরা যায় না। এই ধরনের গ্রন্থি না-থাকার জন্যেই জগতের ঐক্য এবং কার্যকারণ সম্পর্কের ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খলের বিশ্বজোড়া, সর্বব্যাপক চরিত্র পদার্থগত তত্ত্বে পরিচ্ছন্নতার সত্তাতত্ত্ববাদী মূল্য সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে। যখন তত্ত্ব কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রতিপাদ্যের 'পরে নির্ভরশীল, তখন দুনিয়ার আসল ঐক্যের অনেক কাছাকাছি সে এসে পড়ে এবং তাকেই সর্বাপেক্ষা ভালোভাবে প্রতিফলিত করে। দুনিয়ার নিয়মশৃঙ্খলা, যুক্তিভিত্তিক চেহারা এবং সেটা যে নির্ধারণ করা যায়—এগুলি বিষয়মুখী ব্যাপার। 'খাঁটি বর্ণনা'র সাহায্যে উল্টো-পাল্টা যাই বলা হোক না কেন, তারা সকল ঘটনার আপাত-প্রতীয়মান

১ অর্থাৎ, একটা তত্ত্বকে যদি পরিষ্কারভাবে রূপায়িত করা যায় যাতে সব যেন ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে, তাহলে সেই তত্ত্বের 'পরে নির্ভর করা যায়।

—অনুবাদক।

চেহারার তলায় লুকিয়ে থাকে।(১) তারা জ্ঞানের একটা আগে-থেকে ধরে-নেওয়া কাঠামো হয় না, যার সঙ্গে মনের 'পরে ছাপগুলিকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।

কয়েকটি সম্পর্কের সংরক্ষণের মাধ্যমে, দেশ-এর একটা বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যাওয়ার মধ্যে, কাল-এর একটা মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে পরিক্রমার দ্বারা এই ঐক্যের প্রতিফলন ঘটে। পদার্থগত বাস্তবতার নিয়মের এই অপরিবর্তনীয়তা, যেটার পেছনে দেশগত ও কালগত পরিক্রমণ রয়েছে, সেটা সেই পথে যাত্রারম্ভের সূচনা, যেটা শেষ অবধি আপেক্ষিক তত্ত্বে নিয়ে যাবে। একটা তত্ত্বের 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা' মাপা হয় জগতের বাস্তব ঐক্যের সঙ্গে ঐ তত্ত্বের কতোটা মিল রয়েছে তার দ্বারা। যেসব সমীকরণ পদার্থগত বাস্তবতার নিয়মগুলিকে প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন দেশ ও কালে স্থানান্তরণের মধ্যে তাদের সঙ্গতি বজায় রাখে (অর্থাৎ তাদের যাথাথ্য রক্ষা করে), আইনস্টাইন যখন সেইসব সমীকরণের সন্ধান শুরু করেন, তখন তিনি তাঁর তত্ত্বের চূড়ান্ত 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'র জন্যে অনুসন্ধান চালান। কার্যত এর অর্থ হল, জগৎ-প্রপঞ্চের বিষয়মুখী ঐক্য ও তার চূড়ান্ত বাস্তব অস্তিত্বের নির্ধারণযোগ্যতা, পদার্থগত সম্পর্কগুলির অস্তিত্বের স্থায়িত্ব এবং অনন্ত মহাবিশ্বকে ব্যেপে প্রাকৃতিক কার্যকারণ সম্পর্কের সর্বাধিক সুসঙ্গতি।

পদার্থবিদ্যার ভিত্তিরূপে ধ্রুপদী বলবিদ্যাকে সেইভাবে নামাঙ্কিত করার অথবা সে সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ছবি পাবার অনেক আগেই আইনস্টাইন 'বহির্জগতের সত্যাসত্য নির্ণয়' (external confirmation) এবং 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'র দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন।

ছাত্র অবস্থাতেই পদার্থবিদ্যার চরিত্র নিরূপণ করতে গিয়ে আইনস্টাইন লিখছেন: "বিশেষ বিশেষ সকল বিষয়ে কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও নীতিগত ব্যাপারে গোঁড়ামীসুলভ কাঠিন্য বজায় ছিল। গোড়ার দিকে (যদি সেরকম কিছু থেকে থাকে) ঈশ্বর নিউটনের গতিবিদ্যার নিয়মগুলি সৃষ্টি করেছেন—তার সংশ্লিষ্ট ভর ও বল-এর প্রয়োজনীয় হিসাব করে। সেটাই সব; এ

অর্থাৎ, একটা ঘটনাকে বাইরে থেকে বা ওপরে-ওপরে দেখতে যতোই বেমানান মনে হোক না কেন আসলে তার মর্মবস্তুতে বা তার গভীরে পাওয়া যাবে নিয়মশৃঙ্খলা, যুক্তিভিত্তিক অবস্থা এবং তাকে নির্ধারণ করা যাবে।
—অনুবাদক

থেকে সব কিছু যথাযথ অনুমানের (deduction) সাহায্যে গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে করা হচ্ছে।" (১)

সমস্যাটা এখানে শুধুমাত্র গোঁড়ামীসুলভ ধারণার ব্যাপার নয়, যেটা নিউটোনীয় বলবিদ্যার সকল নিয়মের মধ্যে নামিয়ে আনা যাবে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই ধারণাকে বর্জন করা হয়েছিল। পদার্থবিজ্ঞানের তাপ, বিদ্যুৎ ও আলোক বিভাগে তাদের নিজস্ব নিয়মগুলি আছে বলে দেখা গেল এবং মানুষ আর কোনোভাবেই লাপলাস-এর সেই সর্বজ্ঞ সত্তার ধারণাকে মেনে নেয় না—যে সত্তা মহাবিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্র কণার অবস্থান ও গতিবেগ জানাকে প্রকৃতির চূড়ান্ত জ্ঞান বলে মনে করে। গোঁড়ামীর দৃষ্টিভঙ্গি অন্যত্র রয়ে গেল।

বেশির ভাগ প্রকৃতি-বিজ্ঞানীই ধরে নিয়েছিলেন যে, কোনো গুরুতর সংঘর্ষের মধ্যে না-গিয়েও সমগ্র পদার্থগত জ্ঞানকে নিউটনের নিয়মগুলি থেকে পাওয়া যায়। পদার্থবিজ্ঞানের একেবারে গোড়াকার অলঙ্ঘনীয় ভিত্তিপ্রস্তর রূপে নিউটোনীয় বলবিদ্যার স্বীকৃতিকে উনবিংশ শতাব্দীর তত্ত্ব নাড়া দিতে পারে নি। (২) ইতিমধ্যেই মানুষ জেনেছিল যে, কণাগুলির গতিশীলতার সহজ ছক থেকে পদার্থগত তথ্যাদির গভীর তাৎপর্য টানা যায় না। বৃহৎ সংখ্যার গতিশীল অণুদের চরিত্র বুঝতে হলে জানা প্রয়োজন ছিল তারা কোন্ সম্ভাব্য অবস্থাতে থাকতে পারে, সামান্য থেকে অধিক সম্ভাব্য অবস্থাতে থাকতে তাদের অপরিবর্তনীয় রূপান্তর কী রকমের ইত্যাদি, যেটা বলবিদ্যার ধ্রুপদী ছকের সঙ্গে খাপ খায় না।

তবুও এই বিশ্বাসই বজায় ছিল যে, গতির মোট যোগফল যা দাঁড়ায়, সেটা যতই জটিল হোক না কেন, সেটা শেষ বিচারে নিউটনের নিয়মগুলিকে বিশ্বস্ত ভাবে মেনে যান্ত্রিক গতি বা স্থান পরিবর্তন মাত্র হয়ে দাঁড়াবে। পরম দেশ ও পরম কাল—এই দুইয়ের ধারণা যে-নিয়মগুলি থেকে সূত্রায়িত হয়েছিল—তাদেরই মতো অলঙ্ঘনীয় ছিল।

অতএব আইনস্টাইন যখন বলবিদ্যাকে পদার্থবিদ্যার ভিত্তিভূমি বলে ধরেন তখন কিন্তু তাঁর অবস্থান যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক দূরে, যার সূত্রপাত

---

১ Philosopher-Scientist, p. 19.

২ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর তত্ত্বগুলি সত্ত্বেও সেই অবস্থাই বজায় ছিল।—অনুবাদক।

সপ্তদশ শতাব্দীতে, অষ্টাদশ শতকে যার উত্থান এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বিরাট আবিষ্কারগুলির প্রভাবে যেটা পড়েছিল। এই যে ছক—যাতে প্রকৃতির সকল নিয়মকে বলবিদ্যাতে নামিয়ে আনা যায়, সেটা শতাব্দী পার হবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে বাতিল হয়ে গিয়েছিল এবং আইনস্টাইনের মন্তব্যগুলি ছিল ব্যাপকতর ও অপেক্ষাকৃত আরও সাধারণ ধারণা সম্বন্ধে—যে ধারণা অনুসারে প্রকৃতির জটিল নিয়মগুলির পেছনে কণার গতিশীলতার নিউটোনীয় নিয়মগুলি কাজ করে যাচ্ছে, যদিও তাতে বিশ্বের চেহারাটাকে ঢেকে ফেলা বা অতিক্রম করা হচ্ছে না।

তড়িৎ-গতিবিদ্যার (electro-dynamics) অগ্রগতির দ্বারা তড়িৎ-চুম্বকীয় প্রক্রিয়াতে প্রকৃতিকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা এবং দুই শতাব্দী ধরে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির দ্বারা নিউটনের নিয়মগুলি কতখানি সত্য, সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে মানুষকে শিখিয়েছে। আমরা একটু পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করব। এখন নিউটনের ধারণাগুলির মধ্যে দু'টির আলোচনা করা যাক, যাদের সমালোচনা হওয়াতে পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে নিউটনের নিয়মগুলির পুনরায় বিচার করে বদলাবার বা সংশোধন করার চেষ্টা হয়েছে।

প্রথমত, **অনপেক্ষ বা পরম কাল** (absolute time)। নিউটন বলেছেন, পরম বা অনপেক্ষ কাল সমানভাবে বয়ে চলেছে, যেটা সমগ্র মহাবিশ্বের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, কয়েকটি ঘটনা একই সময়ে ঘটছে, একই মুহূর্তে, অনন্ত দেশ-এর যে-কোনো বিন্দুতে। সমগ্র পদার্থগত মহাবিশ্বের যে-কোনো একটি মুহূর্তের ধারণা এবং সেই মুহূর্তগুলি নিয়ে পরপর যে ঘটনাবলী ঘটে যাচ্ছে তাদের মধ্যে সাধারণ বা সর্বজনীন (common) কাল অবাধে বয়ে চলেছে (absolute passage of time) এবং দূরের ঘটনাবলী যে একই সঙ্গে ঘটতে পারে—এ সবই ছিল ধ্রুপদী পদার্থ-বিদ্যার ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। আমাদের কাছে মনে হয় যে, একটি বিশেষ মুহূর্ত সমগ্র মহাবিশ্বকে নিয়ে জড়িয়ে রয়েছে, আমরা এ সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত এবং আমাদের এই প্রত্যয় মনে হয় (অথবা প্রায় যেন মনে হতো) প্রশ্নাতীত ও অলঙ্ঘনীয় এবং হয়ত-বা পূর্বতঃসিদ্ধ (a priori)।

আইনস্টাইন পরম কালপ্রবাহের ধারণাতে পৌঁছতে শুরু করেছিলেন 'বহির্জগতে এর সত্যতা' যাচাই করে নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমাদের পর্যবেক্ষণ করার সঙ্গে কি তার মিল আছে?

কাল পূর্বতঃসিদ্ধ অথবা খামখেয়ালী কোনো ধারণা নয়, অতএব পর্যবেক্ষণ করলে কালকে নিয়ে যে সুষম ধারণাগুলি গড়ে উঠেছে কোনো একদিন তার সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে, কালের ধারণা শুধুমাত্র কয়েকটি পর্যবেক্ষণের রেকর্ড (বা সাক্ষ্য) মাত্র নয়; এটা (অর্থাৎ কালের ধারণা—অনুবাদক) সরাসরি ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু বা বিষয়ের (phenomenon) বিষয়মুখী কার্যকারণ সম্পর্ক পর্যন্ত বিস্তৃত; অতএব তাকে 'অভ্যন্তরীণ-পূর্ণতা'র দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু বা বিষয়গোছের কিছু নয় (non-phenomenological) বলে দেখার জন্যে এগোতে হবে। (১)

জুরিখ পলিটেকনিকে আইনস্টাইন যে-জ্ঞান আহরণ করেছিলেন তার বিস্তৃতি তাঁকে কতোখানি পরম কালপ্রবাহ (absolute time) সম্পর্কে ধারণাকে সংশোধন করতে সাহায্য করেছিল সে সম্পর্কে যথেষ্ট ঔৎসুক্যের কারণ রয়েছে।

পরম বা অনপেক্ষ কালপ্রবাহ যদি পূর্বতঃসিদ্ধ যৌক্তিক ধারণা না হয় তাহলে তার বাস্তবতা প্রতিপন্ন হয় এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিল থাকতেই হবে। পরম বা অনপেক্ষ কালপ্রবাহ তখনই পদার্থগত অর্থ

১ non-phenomenological শব্দটির ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের phenomenon-এর দার্শনিক ব্যাখ্যার মধ্যে যেতে হবে। আমরা এখানে phenomenon-কে সাহিত্য-সংসদের ইংরাজি-বাংলা অভিধান থেকে ইন্দ্রিয়-গোচর বস্তু বা বিষয় বলেছি। কিন্তু phenomenon-র অর্থ মস্কো প্রণীত দর্শনের অভিধানে—যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে phenomenon-কে আরও ভালো করে বোঝাবার জন্যে এটা দার্শনিক কাণ্ট-এর noumenon থেকে কোথায় পৃথক, সেটা দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ, phenomenon যেমন একটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার যেটা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, তেমনি noumenon হচ্ছে ইন্দ্রিয়াতীত, অতএব আমাদের ধারণার বাইরের একটা ব্যাপার। কাণ্ট তা থেকে বলেছেন 'essence' বা মর্মের সঙ্গে 'appearance' বা 'বাহ্যিক চেহারার' পার্থক্য রয়েছে। কাণ্ট-এর মতে প্রথমটি, অর্থাৎ essence বা মর্মকে জানা যায় না, যেটা তার অজ্ঞেয়বাদিতার মূল কথা। তাহলে এখানে non-phenomenology বলে বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, phenomenon এবং noumenon-এর মাঝামাঝি একটা কিছু। অর্থাৎ, 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'র জন্যে ইন্দ্রিয়গোচর হলেও সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়, কিছুটা যেন উপলব্ধিসঞ্জাত।—অনুবাদক।

অধিকার করে যখন একটা বস্তুদেহের 'পরে অন্য বস্তুদেহের তাৎক্ষণিক ক্রিয়া ঘটে, অর্থাৎ অনন্ত গতিবেগের সাহায্যে সেটা চাক্ষুষভাবে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা—অনুবাদক) দেখার চেষ্টা হয়। একটা বস্তুদেহ দূরবর্তী বস্তুদেহের 'পরে বহু উপায়ে কাজ করতে পারে অভিকর্ষের টানে; একটা কঠিন দণ্ডের মাধ্যমে যে ধাক্কা প্রবহমান হয় (১) অথবা আলোর সাহায্যে সংকেত পাঠিয়ে (একটা আলোর উৎস থেকে অন্য কিছুকে আলোকিত করা)। কোনো দূর বস্তুদেহের ক্রিয়ার একটি মুহূর্ত যদি অনন্ত গতিবেগে চালিত হয় তাহলে একই মুহূর্তে সমকালীনতা যে পরম (অ্যাবসোলিউট) তার পদার্থগত ধারণা করার জন্যে সেটা যথেষ্ট। যেকোনো ধরনের একটা তাৎক্ষণিক (অর্থাৎ, একটি মুহূর্তের মধ্যে—অনুবাদক) কথা ভাবা যাক: একটা কঠিন দণ্ডের মাধ্যমে একটা ধাক্কা যেটার কম্পন তৎক্ষণাৎ চালিত হচ্ছে; অভিকর্ষের তাৎক্ষণিক বিস্তার (২); অনন্ত গতিবেগ নিয়ে একটা শব্দের সঞ্চলন (৩); অনন্ত গতিবেগ নিয়ে রেডিও বার্তার প্রেরকের কাছ থেকে গ্রাহকের কাছে গমন (৪); একটা আলোর রশ্মি আলোটি জ্বালা মাত্র সেই মুহূর্তে প্রতিফলিত হয় (৫)। প্রতিটি ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা একটা পদার্থগত ধারণা—যেটা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে করতে হয় এবং সেটা যে বিষয়মুখী বাস্তবতার সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে, তা প্রমাণ করা যায়। একটা সংকেত যদি অনন্ত গতি নিয়ে প্রবহমান হয়, যদি

১ যেমন একটা কঠিন দণ্ডের একদিকে আঘাত করলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, সেটা অন্য প্রান্তে ধরা সম্ভব হয়।—অনুবাদক।

২ যেমন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান তৎক্ষণাৎ একটা বস্তুর 'পরে কাজ ক'রে তাকে টেনে মাটিতে বা নীচে নামিয়ে দেয়।—অনুবাদক।

৩ কিন্তু অভিকর্ষের টান বা শব্দের সঞ্চলন যখন হয় তখন তারা একটা নির্দিষ্ট গতিবেগেই সেটা ঘটে থাকে অতএব এখানে তাৎক্ষণিক শব্দটির প্রয়োগ সহজবোধ্য ধারণা অনুসারে।—অনুবাদক।

৪ এখানেও রেডিও তরঙ্গ নিশ্চয়ই আলোর গতিবেগের সমান প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩ লক্ষ কিলোমিটার কিন্তু তাহলেও সেটার পরিমাপ করা যায়, নিশ্চয়ই অপরিমেয় নয়।—অনুবাদক।

৫ এখানেও ঐ একই ব্যাপার। আলোর উৎস থেকে পর্দাটি অত্যন্ত আপেক্ষিকভাবে নিকট বলে 'তৎক্ষণাৎ' মনে হয়, তা নাহলে ঠিক বলতে গেলে সামান্য সময় অতিবাহিত হচ্ছে।—অনুবাদক।

দুটি বস্তুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া একেবারে তাৎক্ষণিক হয় তাহলে এই ঘটনাগুলি যে 'ক' বস্তুদেহটি কিছু দূরে অবস্থিত 'খ' বস্তুদেহের 'পরে তৎক্ষণাৎ কাজ করছে কিংবা 'খ' বস্তুদেহটির 'পরে বস্তুদেহটির তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া ঘটছে এ সবগুলিই একেবারে সমকালীন ঘটনা বা একেবারে একই সময়ে ঘটছে।

কিন্তু প্রকৃতিতে কোনো তাৎক্ষণিক সংকেত ঘটছে এরকম ব্যাপার নয় এবং বস্তুদেহগুলি পরস্পরের 'পরে কাজ করে সসীম গতিবেগ নিয়ে। এমন কোনো একেবারে পরম (অ্যাবসোলিউট) কঠিন দণ্ড নেই, যেটা তৎক্ষণাৎ একটা ধাক্কাকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চালনা করতে পারে। অভিকর্ষের (বা মহাকর্ষের বা মাধ্যাকর্ষণের) সঞ্চলন অথবা তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের গতিও নিশ্চয়ই 'তাৎক্ষণিক' নয়। একের পর এক সংকেতগুলি আবিষ্কৃত হয়, যাদের গতিবেগ সীমিত বা নির্দিষ্ট, এবং দূরের বস্তুর 'পরে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা দুনিয়ার পুরো চিত্রটার সামনে থেকে ক্রমশই দূরীভূত হয়ে যায়। তার ফলে সম্পূর্ণ একসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটার ধারণার 'বহির্জগৎ থেকে সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার' ব্যাপারটা হারিয়ে গেল। শেষ অবধি যখন পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সেটা মিলে গেল, তখন সেটা ঘটল একমাত্র তার 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার' যথেষ্ট রকম হানি করে।(১) দুনিয়ার চিত্রে সম্পূর্ণ এক সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটার ও পরম অনপেক্ষভাবে কালপ্রবাহ দুনিয়ার চিত্রের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে আর রইল না এবং তারা যে একেবারে ঠিক ঠিক নয়, খানিকটা বেঠিক এবং সত্যের কাছাকাছি, পরম নয়—এই ভাবে দেখা হতে লাগল; উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পরম বা অনপেক্ষ কালপ্রবাহের (ধারণার) বিপর্যয় ও পতনের সঙ্গে আলোক-বিজ্ঞান ও বিদ্যুৎগতিবিজ্ঞানের অগ্রগতি যুক্ত হল। আমরা একটু পরে এদের কথা বলব, এখানে পরম বা অনপেক্ষ কালপ্রবাহের ধারণার সঙ্গে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিকে যে ভাবে ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে কিছু বলা সঙ্গত হবে।

বিশ্বটা যে চার মাত্রা নিয়ে নানা আকারে গঠিত এই ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই চালু রয়েছে। প্রকৃতিতে যাই ঘটুক না কেন, সেটা দেশ ও কালেও

---

১ অর্থাৎ একটা ঘটনা সাধারণভাবে যাকে 'পর্যবেক্ষণ করে সত্য বলে বলে বুঝছি'—সেটা যে 'অভ্যন্তরীণভাবেও পূর্ণতার' চরম নির্দশন এই ধারণা চলে গেল।—অনুবাদক।

ঘটবে। একটা মুহূর্তকে ধরার জন্যে যখন ছবি তোলা হয় তখন সেই মুহূর্তে কী ঘটছে, সেটাকে ধরে রাখা হয়: কিন্তু সামান্য মাত্র সময় অতিবাহিত হয় না এরকম কোনো ঘটনা ঘটে না। শূন্য মাত্রার একটা বিন্দু, একটা সরলরেখা যেটা প্রস্থে শূন্য অথবা একটা তল যেটা শূন্য আয়তনের—এরকম কোনো বস্তু-দেহের যে বাস্তব অস্তিত্ব নেই, সেটা একেবারেই মামুলি বক্তব্য মাত্র (অর্থাৎ, যেটা না বললেও চলে—অনুবাদক)। ঠিক তেমনি একটা ঘনক্ষেত্র (cube), যার জীবনকাল শূন্য, তার কি কোনো অস্তিত্ব আছে?

বাস্তব জগতের চতুর্মাত্রিক প্রকৃতি সম্পর্কে এই ধরনের যুক্তি এতো সহজ ও সাধারণ যে, অন্য কোনো রকম ধারণার উদ্ভব হতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। অন্য এই দৃষ্টিভঙ্গির মূলে ছিল এটাই যে একই মুহূর্তে বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে এই ধারণাকে গ্রহণ করা, অর্থাৎ, একের থেকে দূরে অবস্থিত অন্য ঘটনা যে একই সময়ে ঘটছে সেই ধারণা। দুটো বস্তু-দেহকে যুক্ত করে রেখেছে এই রকমের হেলানো যায় এমন দণ্ডতে একটা ধাক্কার কম্পন তৎক্ষণাৎ দণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি চলে যাচ্ছে—এই ঘটনাকে একটা মুহূর্তের মধ্যে তোলা ছবির (স্ন্যাপসট) সাহায্যে দেখানো যেতে পারে, অথবা ছবি প্রক্ষেপণ-কারী যন্ত্রকে (প্রজেকটারকে) চালু করা মাত্র একটা আলোর রেখা ঠিক সেই মুহূর্তে পর্দাতে আঘাত করছে বলে দেখানো যেতে পারে, তাহলে সেই ধরনের স্ন্যাপসট (মুহূর্তের মধ্যে তোলা ছবি) আসল একটা ঘটনাকে প্রতিফলিত করে।

বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত অথচ একই মুহূর্তে ঘটনাগুলি ঘটে যাচ্ছে, সেটা এই আপাতসাধারণ ধারণাকে খণ্ডন করে যে—প্রতিটি ঘটনা যে-কারণে ঘটেছে, তার পরে একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পরে ঘটবে। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মানুষের মনে কিন্তু এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, একটা ঘটনা ঘটামাত্র সেটা যেন দেখতে পাওয়া যায়, এমন কি যেন শুনতেও পাওয়া যায়। যেমন একটা দড়ি দিয়ে টানামাত্র ঘণ্টা বেজে ওঠে।

শেষোক্ত এই ভুল ধারণাটা বহুদিন পূর্বেই ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু আলো মুহূর্তের মধ্যে প্রবাহিত হয় এ ধারণা সপ্তদশ শতাব্দী অবধি ছিল। নির্দিষ্ট দ্রুতি নিয়ে সকল ধরনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (সংকেত) যে চলে থাকে (বা প্রেরিত হয়) সেটা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যে মানুষ প্রথম বুঝতে পেরেছিল যে, দড়ি দিয়ে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দেবার কয়েক

সেকেণ্ড পরে সে শুনতে পাচ্ছে, সেটা নিশ্চয়ই আইনস্টাইন যেমন প্রথম (বালক বয়সে) কম্পাসের কাঁটা নড়তে দেখে উত্তেজিত হয়েছিলেন, সেই রকমই ব্যাপার হয়েছিল। এর চাইতেও আরও বড়ো 'আশ্চর্যজনক' ব্যাপার হচ্ছে এই চিন্তা যে, এখন ঝিকিমিকি করছে এই রকমের কয়েকটি নক্ষত্রের হয়তো বহুদিন পূর্বেই মৃত্যু হয়েছে (বা অস্তিত্ব নেই ১)। বিংশ শতাব্দী অবধি 'অবাক বিস্ময়ের পাখনায় ভর করে দূরে পাড়ি জমানোর' ('flight from wonder') ব্যাপারটা ছিল এমন একটা জগতের ধারণাকে মেলে ধরা, যেখানে সংকেতের জন্যে যে-সীমিত গতিবেগ তার সঙ্গে একেবারে পরমভাবে একই মুহূর্তে ঘটনাবলী ঘটে যাওয়ার ধারণাকে পাশাপাশি রেখে চলা সম্ভব।

১ নক্ষত্রের দূরত্ব আমাদের পৃথিবী থেকে মাপতে হলে সাধারণ মাইলের হিসাব দিয়ে করা চলে না, কারণ তাদের দূরত্ব এতো বেশি যে, মাইলের হিসাবে প্রায় অগুনতি সংখ্যা লিখতে হয়। কাজেই আমাদের নতুন মাপকাঠি ব্যবহার করতে হয়, যাকে আমরা 'আলোকবর্ষ' বলে থাকি। সেটা কী ?

আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। তাহলে এক বছরে আলো ছুটে চলে যায় ১,৮৬,০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫—একটা বিরাট সংখ্যা, মোটামুটি ছয়ের পরে যদি বারোটা শূন্য বসানো যায়, তাহলে যা দাঁড়ায়, তাই-ই।

আচ্ছা, এই সংখ্যাটাকে আমরা এক 'আলোকবর্ষ' ধরে থাকি এবং সেইভাবে হিসাব করে দেখছি, আমাদের একেবারে সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী নক্ষত্রের দূরত্ব ৪½ আলোকবর্ষ।

এইভাবে নক্ষত্রলোকের দূরত্ব হিসাব করতে গিয়ে আমরা দেখছি, এমন নক্ষত্র রয়েছে, যার দূরত্ব পৃথিবী তথা আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে ২০০ কোটি আলোকবর্ষ এবং তার অপেক্ষাও বেশি দূরে বহু নক্ষত্র রয়েছে। এখন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, যে নক্ষত্র যতো আলোকবর্ষ দূরত্বে রয়েছে, সেখান থেকে আলো আসতে ঠিক ততো বছরই সময় লাগছে।

আচ্ছা, এবারে বোঝার সুবিধার জন্যে একটা অত্যন্ত পরিচিত নক্ষত্র, আমাদের ধ্রুবতারাকে নেওয়া যাক। উত্তর আকাশে স্থির হয়ে আছে যে ধ্রুবতারা, তার দূরত্ব ৪৭ আলোকবর্ষ। তাহলে ধ্রুবতারা থেকে আলো আসতে সময়ও লাগছে ৪৭ বছর।

আচ্ছা, তাহলে যখন ধ্রুবতারা থেকে আলো ঠিকরে আমার চোখে পড়ে তখন আমি ধ্রুবতারাকে দেখতে পাই, তাহলে যে আলোর বিন্দু

আইনস্টাইন বলছেন, এই সম্ভাবনাকে এইভাবে দেখা যেতে পারে। মনে করা যাক, দুটো পর্দা রয়েছে যার ঠিক একেবারে মাঝখানে রয়েছে একটা বাতি৭ ঐ বাতি থেকে আলো একটা সীমিত গতিতে দৌড়ে একই মুহূর্তে নিশ্চয়ই দুটো পর্দার ওপরে পড়বে। যে সময়ে দুটো পর্দা আলোকিত হয়ে উঠবে, সেটা যদি ধরতে পারা যায় তাহলে 'একই মুহূর্তে' শব্দটার নিশ্চয়ই পদার্থগত অর্থ রয়েছে এবং আমরা তাহলে বলতে পারি যে, মহাকাশে (বা দেশে) দূরের বিন্দুগুলিতে একই মুহূর্তে ঘটনাটা (আলোর বিন্দু পড়ে আলোকিত হওয়াটা—অনুবাদক).ঘটছে এবং কাল সমান গতিতে বয়ে চলেছে। তাহলে, একই 'মুহূর্তে স্ন্যাপস্‌ট তোলার' ধারণাটিতে তিন মাত্রার দিক থেকে, নিছক দেশগত সমকালে সমরূপ (uniformity) হওয়ার দিক থেকে পদার্থগত অর্থ এসে যাচ্ছে। আমরা একটু পরেই দেখব যে, সংকেত করার সীমিত গতি নিয়ে পরম বা অনপেক্ষ (absolute) কাল-এর তত্ত্বকে 'বহির্জগতের বাস্তবতা থেকে সমর্থন' (external confirmation) করা যায় নি। আলোকবিজ্ঞান ও বিদ্যুৎ-গতিবিজ্ঞানের অগ্রগমনে সেটাকে উল্টে দেওয়া হয়েছে।

---

৭ ধ্রুবতারা থেকে যাত্রা করে আমার চোখে আজ, ১৯৮৩ সালে, পড়ল বলে আমি ধ্রুবতারাকে দেখতে পারলাম, সেই আলোর বিন্দু কিন্তু ধ্রুবতারা থেকে যাত্রা শুরু করেছে ৪৭ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৮৩—৪৭ =১৯৩৬ সালে।

তাহলে আজকে ১৯৮৩ সালে যে ধ্রুবতারাকে দেখছি, সেটা কিন্তু ১৯৩৬ সালের।

অবশ্যই আলোর বিন্দুগুলি ক্রমাগত বর্ষিত হচ্ছে বলে আমরা ধ্রুবতারাকে ক্রমাগতই জ্বলতে দেখছি। কিন্তু দেখছি ৪৭ বছর অতীতের ধ্রুবতারাকে।

তাহলে এই মুহূর্তে ধ্রুবতারা যদি লুপ্ত হয় বা তার আলো নিভে যায়, তাহলে নিভে যাবার আগের মুহূর্ত অবধি যে-আলোর বিন্দু নির্গত হল, সেটি আগামী ৪৭ বছর পরে বা ভবিষ্যতে আমার চোখে পড়বে।

অর্থাৎ ১৯৮৩+৪৭=২০৩০ সাল অবধি আমি ধ্রুবতারাকে জ্বলতেই দেখব।

তাহলে এবারে বোঝা গেল যে, এই মুহূর্তে আমার মাথার ওপরে আকাশে যে নক্ষত্রগুলি ঝিকিমিকি করছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি নির্বাপিত হয়ে থাকে, তাহলে আগামী বহু বছর অবধি (যতো আলোক-বর্ষ দূরত্বে সেই নক্ষত্র অবস্থিত) তাকে জ্বলতেই দেখব।—অনুবাদক।

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যাতে অনপেক্ষ কালের ধারণা সম্পর্কে একটু খাপছাড়া ব্যাপার রয়েছে। এখানে 'আপেক্ষিক' শব্দের বিপরীত হিসাবে 'পরম বা অনপেক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তার অর্থ হচ্ছে যে, কোনো সংজ্ঞার (অথবা, যার ধর্ম মাপা গিয়েছে, পরিমাণ) পদার্থগত অর্থ করা যেতে পারে একমাত্র অন্য সংজ্ঞার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে। যেমন, কোন্‌টা দক্ষিণ এবং কোন্‌টা বাম, এটার অর্থ করতে হলে কোনো একটা তল-এর অক্ষরেখা ধরে তার তুলনায় তবে ঠিক করতে হবে। ঠিক তেমনি 'দুই ফুট দূরে' কথাটা বললে সমানভাবেই সেটা আপেক্ষিক হবে যদি সঙ্গে সঙ্গে বলা না যায় 'কার থেকে দূরে'। মহাকাশ বা দেশ-এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে এগুলির সত্যতা সামান্যই। একটা বস্তু-দেহের দেশগত অবস্থান নির্ণয় করাটা অন্য কোনো নির্দিষ্ট (reference) বস্তু-দেহের অবস্থানের সঙ্গে তুলনা না করলে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। এবং এই ধরনের যে কোনো একটি বস্তু-দেহই অন্যের তুলনায় সমানভাবে কার্যোপযোগী; সকল বস্তু-দেহের অভ্যন্তরীণ বা অন্তর্নিহিত সম্পদের প্রকাশটা কোনো নির্দেশক কাঠামোর (reference system) তুলনায় একই দাঁড়াবে। (১)

অন্যদিকে 'পরম বা অনপেক্ষ' পরিমাণ বলতে তার বাইরের কোনো কিছুর উল্লেখ ছাড়াই তার স্বাধীন অর্থ বোঝায়। কোনো বস্তু-দেহের অনপেক্ষ কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হলে কোন্‌ বিন্দু বা সূত্র থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার কোনো প্রয়োজন নেই। মহাবিশ্ব-সংক্রান্ত প্রাচীন শাস্ত্রে মহাকাশে বা দেশে কোনো বস্তু-দেহের একেবারে পরম বা অনপেক্ষ উপস্থিতির ব্যাপারটা,—যার মধ্যে একটা কেন্দ্র রয়েছে এবং মহাবিশ্বের সীমানার দ্বারা নির্ধারিত—মনশ্চক্ষুর সামনে যেন দৃশ্যত ধরার চেষ্টা হয়েছিল। আমরা দেখব, পরম মহাকাশকে যখন অসীম বা অনন্ত বলে ধরা হচ্ছে, তখন তার জটিলতা কতো বেশি বেড়ে যায়।

পরম বা অনপেক্ষ কাল (absolute time), মনে হতে পারে, কোনো খামখেয়ালী প্রাথমিক বা একেবারে গোড়াকার মুহূর্তের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সময় (যেমন দিনের, বছরের বা সকল সময়ের আরম্ভ থেকে গণনা করা) এবং

১ যেমন আমরা একটা বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করতে যেখানে তার অক্ষরেখা সেটা ধরে বাম বা দক্ষিণ নির্ধারণ করি, সেখানে সেটা মোটা কি সরু, এই গুণাগুণে কিছু যায়-আসে না।—অনুবাদক।

আপেক্ষিক সময় হচ্ছে ইচ্ছামতো কোনো প্রারম্ভের সময়কে ধরে_ নিয়ে তা থেকে কতো সময় গেল এইভাবে গণনা করা : (যেমন) একটা বছরের দৈর্ঘ্য কতো, সেটা যেখান থেকেই, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে বা যে-কোনো সময়ের শুরু থেকেই গণনা করা যাক না কেন। এই অর্থে পরম বা অনপেক্ষ ক্ষণকে কোনো বিশেষ মুহূর্তকে সূত্র করে নিয়ে গোনা যাবে না, যেটা বিভিন্ন পঞ্জিকাতে গণনা করার জন্যে ইচ্ছামতো ধরে নেওয়া হয়—যেমন বলা হয়, সেই তারিখের দিনটি থেকেই জগতের শুরু হয়েছে। কাজেই মহাবিশ্বের সীমানার সঙ্গে এটা মিলে যায়, যেটা নিশ্চয়ই পরম বা অনপেক্ষ মহাকাশের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবেই।

তবে আমরা পরম বা অনপেক্ষ কালের এই ধারণার কথা আগে বলি নি। পরম বা অনপেক্ষ কাল বলতে কোনো কালগত নির্দেশক কাঠামো বোঝায় না (যেমন একটা পঞ্জিকা ইত্যাদি)। পরন্তু সেই কাল যেটা দেশ বা মহাকাশের অবস্থানের যে-বিন্দু থেকে গণনা করা হচ্ছে তা থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন।(১) তা থেকে তাহলে পরম বা অনপেক্ষ কালের মর্মবস্তু (বা আসল কথা) হল 'পরম' পরিমাণগত থেকে পৃথক, যেমন 'পরম বা অনপেক্ষ দেশ।' অ্যারিস্ততলের সীমিত মহাবিশ্বের ধারণা যখন ধূলিসাৎ হয়ে গেল তখন পরম বা অনপেক্ষ মহাকাশকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হল। কিন্তু সারা মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, এই ধারণার যখন পতন হল, তখন কোনো এক সুদূর অতীত কাল থেকে মহাকালের গণনা শুরু হয়েছে এটাও শেষ হয়ে গেল। যেটা রয়ে গেল সেটা হল সারা বিশ্ব জুড়ে প্রবহমান কালের ধারণা—যে কাল সমস্ত ঘটনা ও সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। অনেকগুলি বিন্দুকে যাতে মাপা যায় (অর্থাৎ, তাদের স্থানাঙ্ক হিসাব করে বার করা ইত্যাদি—অনুবাদক) তার জন্যে দেশ-এর পটভূমিতে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে—ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা সমগ্র উনিশ শতক ধরে কালপ্রবাহ সংক্রান্ত এই ধারণাকে বজায় রেখেছিল। পরম বা অনপেক্ষ কাল সম্পর্কে

সাধারণত কাল বা সময় গণনা করা হয় পঞ্জিকার সাহায্যে, যে পঞ্জিকার গণনা করা হয় পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণ অথবা চাঁদের পৃথিবী-প্রদক্ষিণের সময় দিয়ে। কাজেই এখানে অনপেক্ষ কাল বলতে অন্য কোনো কিছুর উল্লেখ করে গণনা করা হচ্ছে না, যেমন এক বছর অতিবাহিত হল ১-লা জানুয়ারি থেকে গণনা করে বা ঐরকম কিছু।—অনুবাদক।

এই ছিল আইনস্টাইনের ধারণা—যাকে তিনি সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

এখন **পরম বা অনপেক্ষ** দেশ-এর কথায় আসা যাক। নিউটন শুরু করেছিলেন দেশকে অসীম ধরে নিয়ে। কাজেই দেশ-এর কেন্দ্র থেকে অথবা তার সীমানা থেকে কোন বস্তুর অবস্থানের অনপেক্ষ দূরত্ব কত এই মর্মে কোনো চিত্র তাঁর 'প্রাকৃতিক দর্শনের গাণিতিক সূত্র' (**Mathematical Principles of Natural Philosophy**) বইয়েতে আসতে পারে না। (**Principia** নামেই তাঁর মহান বইটি নামাংকিত হয়ে আছে)। পরম বা অনপেক্ষ মহাকাশ (বা দেশ) সম্পর্কে একটা নতুন মাপকাঠি পাওয়া যাচ্ছে—একটা বস্তুর স্থানচ্যুতির অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে দেশ-এর একটা বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে সরে যাওয়া। আমরা দেশ-এর সীমানা অথবা সেখানে একেবারে পরমভাবে নিশ্চল কোনো বস্তুর কথা জানি না। একটা বস্তুর অবস্থিতি ঐ ধরনের সীমা বা বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, তাদের দেখতে হবে দেশ-এর পটভূমিতে, দেখতে হবে মহাশূন্যের পটভূমিতে, যেখানে প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব স্থান রয়েছে। অবস্থানকে নির্ণয় করতে অন্য বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে নয়, পরন্তু (পৃথিবীর) বাইরের মহাকাশের অনন্ত সীমাহীন শূন্যের পটভূমিতে বস্তুদেহের অবস্থান আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে (যা ইন্দ্রিয়গোচর হয়—অনুবাদক) ব্যাহত করে: অন্য কোনো বস্তু-দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না করে কোনো একটি বস্তু-দেহের অবস্থান দেখতে পাওয়া অথবা হিসাব করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রাচীনদের কাছে ছিল একেবারে স্থির পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের সীমানা, যদিও মহাবিশ্বের অবস্থান ও তার কেন্দ্র পৃথিবীকে নির্ধারণ করতে তাঁদের দারুণ মুস্কিলে পড়তে হতো। কিন্তু তারপর একটা নিশ্চিত বস্তু দেহের একেবারে পরম বা অনপেক্ষ অবস্থান কোথায় হবে সেটা নির্ধারণ করা শক্ত ছিল। নিউটন নিম্নোক্তভাবে এই মুস্কিলের আসান করেছিলেন।

প্রাচীনরা একটা বস্তু-দেহের অনপেক্ষ অবস্থিতি ধরে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন: সেটা ছিল স্থির পৃথিবী এবং বাইরের মহাকাশের চৌহদ্দির মধ্যে। অতএব সেই অনুসারে কোনো বস্তু-দেহের একটা অনপেক্ষ স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাওয়াকে তাঁরা অনপেক্ষ গতির সংজ্ঞা রূপে নির্ধারণ করেছেন। নিউটন এই যুক্তিটাকে উল্টো করে দিয়ে অনপেক্ষ

গতি থেকে শুরু করেছেন। অনপেক্ষ গতির পরিচয় পাওয়া যায় একটা চলন্ত বস্তু-দেহের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার ছন্দের তারতম্য থেকে। এই ধরনের বিচারের মানদণ্ড ঠিক করতে কোনো নির্ধারিত অক্ষের (১) প্রয়োজন হয় না। অনপেক্ষ গতি থেকেই পরম বা অনপেক্ষ দেশকে পাওয়া যায়: অনপেক্ষ গতি নিয়ে চলার সময়ে পরম বা অনপেক্ষ দেশ-এর স্থান পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ, সেটা এমন একটা ব্যাপার যাতে বস্তু-দেহ অথবা ছকের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে।

অভ্যন্তরীণ এই পরিবর্তনগুলি কী? তা থেকে কী ধরনের গতির সৃষ্টি হয়?

অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের হেতু হচ্ছে জাড্যের পরিবর্তন, যেটা ত্বরণবেগে চালিত একটা ছকের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাধারণ বা স্বাভাবিক ছন্দকে ভেঙে দেয় এবং তার মধ্যে যে-সব বস্তু-দেহ আছে তাদের গতিবিধিকে প্রভাবিত করে। ত্বরণবেগ নিয়ে যখন কোনো কাঠামো দেশ-এর একটা অংশ থেকে অন্য অংশে ধাবমান হয় তখন তার মধ্যের বস্তু-দেহগুলি, সেই কাঠামো স্থির থাকলে অথবা সেটা সোজা সরল রেখা ধরে চললে যে-পদার্থগত গুণ পাওয়া যায়, তা থেকে অন্য রকমের হয়। একটা কাঠামো যখন ত্বরণবেগ নিয়ে চলে না—যেমন একটা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া—তখন একটা নিশ্চল বস্তু-দেহ গতিবিহীন-ই (বা স্থির) থেকে যায়; সমানুপাতিক গতি নিয়ে ধাবমান একটা বস্তুকে নিজের 'পরে ছেড়ে দিলে (অর্থাৎ, তার গতিবেগে অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ না করলে—অনুবাদক) সেই সমান গতিবেগ নিয়েই চলতে থাকে, একটা বস্তু-দেহের 'পরে যখন বল (ফোর্স) প্রয়োগ করা হয়, তখন সে ঐ বল-এর আনুপাতিক ত্বরণবেগ নিয়ে চলে। ত্বরণবেগে চালিত হলে চেহারাটা একেবারে বদলে যায়: বস্তুগুলির নিজের 'পরে ছেড়ে দিলে (অর্থাৎ, তাদের উপর হস্তক্ষেপ না করলে) তাদের গতিবিধিতে মনে হবে যেন তাদের 'পরে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ধরনের বলকে আমরা জাড্যের বল নামে অভিহিত করে থাকি, যদিও সাধারণভাবে প্রণালী কাঠিকাতে বল-এর অবস্থিতি পাওয়া যায় বিভিন্ন বস্তু-দেহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। কোনো প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জাড্যজনিত বল-কে সংশ্লিষ্ট করে দেখা

১ দেশ-এ কোনো বিন্দু বা বস্তু-দেহের অবস্থান ঠিক করতে হলে একটা অক্ষ বা কাঠামোর প্রয়োজন হয়। এখানে তার প্রয়োজন হচ্ছে না।—অনুবাদক।

যায় না (১), তারা স্বরণবেগ থেকে উদ্ভূত হয় এবং তারা ত্বরান্বিত গতির (accelerated motion) পরম বা অনপেক্ষ চরিত্রের প্রমাণ।

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাতে অনপেক্ষ গতির লক্ষণ পাওয়া যাবে এই ধরনের বল-এর মাধ্যমে। আপেক্ষিক গতির উদাহরণ হচ্ছে সুষম, সমানুপাতিক গতিবেগ নিয়ে চলে যে ট্রেন, তাকে যখন অন্য একটা পাশের লাইনে একই দিকে চলছে যে ট্রেন তার গতির সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে তুলনা করা হয়, অথবা উলটো দিকে চলছে যে ট্রেন তার গতির সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে তুলনা করা হয়, তখন প্রথম ট্রেনটা যে আদৌ চলছে সেটাই মনে হবে না। যদি ট্রেনের গতিবেগটা ত্বরান্বিত হয় অথবা সেটার গতি ধীর হয়ে আসে(২) তাহলে যে ধাক্কা পড়ে তাতে দুটো গতিবেগের সমতাতে ধাক্কা পড়ে এবং আরোহীরা তখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে, তাদের ট্রেনটাই চলছে। এমন কি একটা নির্দেশক কাঠামো(৩) ছাড়াই জাড্যের বলগুলি একটা দর্শককে তাদের ছুটের গতিবেগকে বর্ণনা করতে সাহায্য করে; তার পরম বা অনপেক্ষ চরিত্রটা ধরা পড়ে এবং কোনো বস্তু-দেহের সঙ্গে উল্লেখ না করেই পরম বা অনপেক্ষ গতির পদার্থগত অর্থ পাওয়া যাবে, যেখানে গতিকে খোদ দেশ-এর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে বলে বোঝা যাচ্ছে।

অক্ষের চারধারে ঘুরছে এমন একটা বালতির উদাহরণ নিউটন দিয়েছেন। এর মাধ্যমে নিউটন তাঁর প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থে অনপেক্ষ গতি এবং অনপেক্ষ দেশ-এর দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন, সেটা পর্যবেক্ষণের ব্যাপার বলেই দেখতে হবে (যেভাবে আগে দেওয়া হল)। দড়িতে একটা বালতি বেঁধে এবং তাকে টান টান করে টেনে ধরে তাকে তার লম্বা অক্ষরেখার চতুর্দিকে দ্রুত ঘোরানো যায়। কেন্দ্রাতিগ বল বালতির মধ্যের জলকে বালতির গায়ের উপরের দিকে ঠেলে দেবে। আপেক্ষিক গতির দিক থেকে

---

১ অর্থাৎ জাড্য থেকে যে বল উদ্ভূত হয় তার কারণ খোঁজবার জন্যে অন্য কোনো প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।—অনুবাদক।

২ বলা যেতে পারে সেটা নেতিবাচকভাবে ত্বরান্বিত হচ্ছে।—অনুবাদক।

৩ নির্দেশক কাঠামো বা frame of reference বলতে বোঝায় দেশ-কালের অবিচ্ছিন্নতার একটা কাঠামো যার মধ্যে রয়েছে একজন দর্শক, একটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা বা co-ordinate system এবং কোনো বিন্দু বা বস্তু-দেহের অবস্থানকে সময়ের সঙ্গে মেলাবার জন্যে একটা ঘড়ি।—অনুবাদক।

দেখতে হলে পৃথিবী, আকাশ, ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এবং মহাকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বালতির আবর্তনে একই পদার্থগত ফল পাওয়া যাবে এবং 'বালতিটি পৃথিবীর তুলনায় আপেক্ষিকভাবে ঘুরছে' এবং 'পৃথিবীটা বালতির তুলনায় আপেক্ষিকভাবে ঘুরছে',—এই উভয় উক্তিই একই প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়। কিন্তু কেন্দ্রাতিগ বল এবং সাধারণভাবে জাড্যের বল এই উক্তির সমতাকে লঙ্ঘন করে। বালতির চারধারে পৃথিবীটা ঘুরছে বলে উপরকার জল-এ কোনো রদবদল হয় না কিন্তু ঘূর্ণায়মান বালতিতে জলটা উপরের দিকে উঠছে বলে স্পষ্টভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। এই জন্যে বালতির ঘূর্ণনটি এখানে অনপেক্ষ।

আমরা যখন বলছি যে, দুটো উক্তি পরস্পরের সঙ্গে সমভাবে বিনিমেয় তখন আমরা কী বলতে চাইছি? আমরা একটা অক্ষ-ব্যবস্থা নিলাম (অক্ষরেখাতে কয়েকটি স্থানাঙ্ক), যাতে পৃথিবীটাকে স্থির ধরা হচ্ছে এবং বালতিটা ঘুরছে। তারপরে আমরা বালতির সঙ্গে যুক্ত করে একটা স্থানাঙ্কের কাঠামো নিলাম, অর্থাৎ এমন একটা কাঠামো যেটা বালতির সঙ্গে ঘুরছে অথবা আরও ভালো করে বলতে গেলে যাতে বালতিটা স্থির এবং পৃথিবীটা ঘুরছে। একটা ধারণা (ঘূর্ণায়মান বালতি) থেকে অন্যতে (ঘূর্ণায়মান পৃথিবী) রূপান্তরণ করতে এক ধরনের স্থানাঙ্কের কাঠামো থেকে অন্য ধরনে বদল বোঝাচ্ছে।

ঘূর্ণায়মান বালতি থেকে স্থির বালতিতে অথবা স্থির বালতি থেকে ঘূর্ণায়মান বালতিতে রূপান্তরণ হলে কি অভ্যন্তরীণ কোনো ফল পাওয়া যায়? আমরা দেখেছি যে, এই রূপান্তরণ বস্তু-দেহগুলির চলাফেরার ঐ কাঠামোর অভ্যন্তরে একটা পরিবর্তন আনে। এ থেকে পরম বা অনপেক্ষ গতি সূচিত হয়। নিউটোনীয় বলবিদ্যাতে আমাদের বলা হয় 'কাঠামো ক কাঠামো খ-এর তুলনায় আপেক্ষিকভাবে ত্বরণবেগ নিয়ে গতিশীল হয়' অথবা 'কাঠামো খ কাঠামো ক-এর তুলনায় আপেক্ষিকভাবে ত্বরণবেগ নিয়ে গতিশীল হয়'—এই দুই রকম বক্তব্য দুই বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির বিবরণ দেয়। ত্বরিত বেগ নিয়ে যে কাঠামোগুলির অভ্যন্তরীণ অবস্থা তাদের পরিমাণকে বর্ণনা করে, সেগুলি স্থানাঙ্কের রূপান্তরণের সঙ্গে যে বদলে যায়, তা নয়।

যখন ক কাঠামো ত্বরণ বেগ নিয়ে চলতে আরম্ভ করে তখন জাড্যের বল এবং পরে যখন সেটা স্থির অবস্থায় রয়েছে অথবা সমরূপ বেগ নিয়ে চলছে,

তখন তাদের চেহারা থেকে বোঝা যায় যে, ত্বরণ-বেগ-পরম বা অনপেক্ষ এবং সেটা কেবলমাত্র খ কাঠামো সম্পর্কে নয় (যেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারতাম, খ কাঠামো ক-এর তুলনায় আপেক্ষিকভাবে চলছে)। নিউটন মনে করতেন কোনো কিছু পরমভাবে স্থির অবস্থায় থাকার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে এই ত্বরণবেগ পরম বা অনপেক্ষ। সেই অনুসারে, বলা যেতে পারে, খ কাঠামো যেখানে জাড্যের বলগুলি অনুপস্থিত, সেটার যে-বস্তু পরম বা অনপেক্ষভাবে স্থির হয়ে রয়েছে, তার তুলনায় কোনো ত্বরণ-বেগ নেই। একেবারে 'পরম বা অনপেক্ষভাবে স্থির' কোনো কিছু, যেটা জাড্যের বলগুলিকে ত্বরণ-বেগে চালিত করতে সাহায্য করে, সেটা নিউটনের মতে হল দেশ—একেবারে ফাঁকা মহাশূন্য বা মহাকাশ।

ভেসে চলে যাচ্ছে, কোনো ত্বরণবেগ নেই, এই রকমের কোনো চিত্র সামনে আনতে হলে পরম বা অনপেক্ষ দেশের প্রকাশ আমরা দেখে থাকি। 'দুটি বড়ো বিশ্ব-ব্যবস্থা নিয়ে কথোপকথন' বইয়েতে সমগতিতে ধাবমান একটা জাহাজের কেবিনে কী ঘটতে পারে তার উদাহরণ দিয়ে গ্যালিলিও এটা দেখিয়েছেন। সবটাই ঘটছে আর জাহাজটা যেন স্থির রয়েছে। মাছিরা উড়ে যায় এবং ঠিক নীচে ধরে রাখা বোতলে টিপ টিপ করে জল পড়বেই(১) ঠিক যেমন যে জাহাজটা স্থির ছিল এবং যখন সে ত্বরণবেগ নিয়ে চালিত নয়, তাতে যা ঘটত। এই উদাহরণগুলি জাড্যের গতির ধ্রুপদী সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে।

আইনস্টাইন যেভাবে দেখিয়েছেন তাতে কিন্তু জাড্যের সূত্রগুলি এতো সহজে চোখে পড়ে না। যা দেখা হচ্ছে এবং যে ধারণাগুলিকে এক সময়ে আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী বলে মনে হতো, তার বিশ্লেষণ করে সেটা যে স্বতঃ-প্রতিভাত, তা ঐতিহ্যের উপর নির্ভরশীল। বস্তুত, কেবলমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণ আমাদের বলে, যে-গতির পেছনে ক্রমাগত কোনো বল কাজ করছে না তার মধ্যে আস্তে আস্তে থেমে যাবার ঝোঁক দেখা যায়। অ্যারিস্টটলের কাছ থেকে আসা যৌক্তিক রীতিনীতিতে সেটা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল, চক্রবৎ গতিকেই সবচেয়ে স্বাভাবিক গতি বলে ধরা হতো।

১ অর্থাৎ ধাবমান জাহাজ হলেও তার ভেতরের জিনিসগুলির 'পরে সেই গতির প্রভাব পড়ে, তাতে তাদের পথরেখা বদলাচ্ছে না।—অনুবাদক।

"একটা বস্তু-দেহকে নিজের 'পরে ছেড়ে দিলে সেটা সরল রেখা ধরে চলবে এটা অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় না", বলছেন আইনস্টাইন, "ঠিক এর উলটো। এবং চক্রবৎ গতিকেই অ্যারিস্ততল ও অতীতের অন্যান্য বড়ো চিন্তাবিদ সরলতম গতিপথ-রেখা বলে বর্ণনা করেছেন।"(১)

যে সকল তথ্যকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায়, জাড্যের ধারণা কেবলমাত্র তাদের পর্যবেক্ষণ করার ফলেই গড়ে ওঠে নি। বরঞ্চ চিরাচরিতভাবে পর্যবেক্ষণ করার এবং সাধারণীকৃত ধারণার মধ্যে সংঘাতের ফলেই এর জন্ম, যেটা সৃষ্টি হয়েছে একটা সামঞ্জস্যময় দুনিয়ার সাধারণ চিত্রের খোঁজ করতে গিয়ে; এমন ধরনের নতুন জিনিস খোঁজ করার চেষ্টা হয়েছে, যার পেছনে সব সময়ে চাপা বল না থাকলে তার গতি বজায় থাকবে না—অ্যারিস্ততলের গতির ধারণার সঙ্গে এটা খাপ খায় না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে জাড্যের ধারণা একদিক থেকে একটা নতুন বিজ্ঞান প্রবর্তন করার সূচনা করেছিল। প্রথমত, এতে সপ্তদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের মূল ধারণাটি রয়েছে—দেবতাতে নরত্ব আরোপ(২) করে যে চিন্তার ছকটি গড়ে উঠেছিল তা থেকে প্রকৃতিকে বার করে আনা। বস্তুত 'প্রকৃতি' সম্পর্কে ধারণার অর্থটাই বদলে গেল। আগে বোঝানো হতো যে, প্রকৃতি হল বাস্তব জগতের ঊর্ধ্বে মানুষের জ্ঞানাতীত কোনো শক্তি যা বাস্তব জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করছে। "ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসি লেখক, লা বোয়েতি যে ভাবে লিখেছেন, প্রকৃতি হল ঈশ্বরের মন্ত্রী।"(৩)

এখন প্রকৃতিকে বস্তু-জগতের সঙ্গে এক করে দেখে মহাবিশ্বকে মানুষের ঊর্ধ্বে অবস্থিত শক্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হল। এই ধারণার যান্ত্রিক প্রতিফলন হল গতি সম্পর্কে ধারণা, যাকে প্রকৃতির বহির্ভূত কোনো শক্তির 'পরে নির্ভর করতে হয় না। যে-কোনো মুহূর্তে একটা বস্তু-দেহের গতি বোঝানো যেতে পারে তার আগের মুহূর্তে সে ধাবমান, এটা দেখিয়ে; ত্বরণকে বোঝান হতো অন্যান্য ধাবমান বস্তুদেহের তার প্রতি কী ক্রিয়া ঘটছে তা

১ Moszkowski, op. cit. s. 25.

২ অর্থাৎ, নরমূর্তিধারী দেবতার কল্পনা করা, যেমন ঝড়ের দেবতা, বৃষ্টির দেবতা ইত্যাদি।—অনুবাদক।

৩ অর্থাৎ ঈশ্বরের তরফেই কাজ করেন অতএব ঐশ্বরিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে বস্তু-জগতের কার্যকারণের ঊর্ধ্বে।—অনুবাদক।

দেখিয়ে অথবা শেষ বিচারে, সকল বস্তুদেহের বিশ্বজনীন গতি দেখিয়ে, যেটা স্পিনোজা তাঁর 'এথিকস্' বইয়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষ মন্তব্যে বলেছেন। অ্যারিস্ততলের 'আদি গতিক্রিয়া'কে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে প্রকৃতির ব্যবস্থাপনাকে একটা যন্ত্র হিসাবে দেখিয়ে, যেটা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করছে এই ধরনের বিভিন্ন অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে। রবার্ট বয়েলের কাছে প্রকৃতি ছিল একটা 'মহাজাগতিক যন্ত্র' এবং তার কাজ কিভাবে চলছে তার জন্যে কোনো দার্শনিক হেতু খুঁজে বার করার প্রয়োজন ছিল না, ঠিক যেমন আমরা একটা ঘড়ি কেন চলছে তার জন্যে কোনো দার্শনিক কারণ (বা হেতু) খুঁজে বার করি না। বস্তু-দেহগুলির অবাধ গতি এবং প্রকৃতিতে যে দার্শনিক বা আধিবিদ্যক কোনো হেতু নেই সেটার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় প্রকৃতিজাত বিশেষ কোনো অবস্থা অথবা অনেকগুলি অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকার মধ্যে: Omnis natura est conservatrix sui—সর্বব্যাপী প্রকৃতিতে সব কিছুই বজায় থাকে।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের ভাবাদর্শগত সূত্র খুঁজতে হলে বস্তুর নিত্যতা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে স্পিনোজার মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। আপেক্ষিক তত্ত্বের ধ্রুপদী সূত্রগুলি মহাকাশের সমরূপ চরিত্র এবং একটা বস্তু-দেহের নিজের 'পরে ছেড়ে দিলে সে সমান গতি নিয়ে ধাবমান থাকবে—এ সবই অষ্টাদশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের ধারণার শুধু প্রতিফলন নয়, তার চেয়ে বেশি। তাতে রয়েছে বিশ্বজোড়া একটা সুষমা, কার্যকারণ সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বজনীন কার্যকারণ নিয়মের অধীন বিষয়মুখী জগতের একটা অনুপাত। এ জন্যেই আইনস্টাইন তাঁর বুদ্ধিমত্তার সবটুকু শক্তিকে এই ধারণার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। জাড্য এবং জাড্যের গতির আপেক্ষিকতা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি স্পিনোজাতে গিয়ে পৌঁছেছে।

দেকার্তের দর্শনকে উপস্থিত করতে গিয়ে স্পিনোজা বস্তু-দেহগুলির নিত্যতার অবস্থাকে এক-একটা সত্তা হিসাবে বিচার করেছেন। তাহলে তা থেকে যা দাঁড়ায় সেটা হল যে, একটা বস্তুতে গতি সঞ্চার করে দিলে সে অনন্তকাল অবধি চলতেই থাকবে যদি না কোনো বাইরের ঘটনা তার গতিকে রুদ্ধ করে দেয় (বা কমিয়ে দেয়)।

স্পিনোজা জাড্যের ধারণাকে (অথবা আরও ঠিক করে বলতে হলে

বস্তুদের নিত্যতার সাধারণ ধারণা সম্পর্কে) বস্তুদেহের পদার্থগত অস্তিত্বের সঙ্গে, তার নিজের সত্তার সঙ্গে অভিন্নতা বজায় রাখার বিষয় হিসাবে যুক্ত করেছেন। "প্রতিটি বস্তুই যতোটা তার নিজের 'পরে নির্ভর করে, ততোটা তার অস্তিত্ব (সত্তা) নিয়ে থেকে যাবার জন্যে চেষ্টা করে।" কিন্তু অন্তর্নিহিত গুণগুলির মধ্যেই তো সত্তার অস্তিত্ব। যদি 'বস্তুটা' (thing) অনেকগুলি বস্তুদেহের (bodies) একটা ব্যবস্থা হয়, যেটা তার 'সত্তা', তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তাহলে সেটা যেসব বস্তুদেহ নিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার কার্যকলাপ হিসাবে গড়ে উঠবে।

বলবিদ্যার ভাষাতে একে তর্জমা করলে (বা রূপান্তরিত করলে) যা দাঁড়ায় তা হল: প্রবহমান গতিশীলতায় কোনো একটা কাঠামোর মধ্যে গতি ও বস্তুদেহের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেকার সম্পর্কগুলি পরিবর্তিত হয় না। অতএব প্রবহমান ব্যবস্থার মধ্যে তার গতির কোনো হদিশ তার অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলি থেকে পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন বস্তুদেহের মধ্যে দূরত্বের বদল হওয়া ছাড়া গতি আর কিছুই নয় এবং আমরা সমান জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে, একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অন্য বস্তুদেহের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে চলছে অথবা সেই বস্তুদেহ ব্যবস্থাটির তুলনায় আপেক্ষিকভাবে চলছে।(১)

গতি বজায় থাকবেই, যদিও যে-অবস্থাতে সেটা ঘটছে সেটা ধ্রুব অবস্থা (conserved state)—জাড্যের গতির এই ধারণা প্রথম উপস্থিত করেছিলেন গ্যালিলিও এবং তিনি এর আপেক্ষিক চরিত্রের দিকটা তুলে ধরেন। প্রবহমান সকল ব্যবস্থাতে যান্ত্রিক ঘটনাগুলি একই ধরনের হয়ে থাকে এবং আমরা তাদের সংশ্লিষ্ট বা প্রাসঙ্গিক বস্তুদেহগুলির তুলনা করেই বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বস্তুর গতি বিচার করতে পারি। কোনো নির্দিষ্ট জাড্যজনিত ব্যবস্থাকে সঠিকভাবেই স্থিতিশীল বলা যায় ও যেখানে আগে যেসব বস্তুদেহকে গতিহীন মনে করা হয়েছিল তারাই গতিশীল হবে। আপেক্ষিকতার এটাই হল ধ্রুপদী সূত্র, যেখানে গ্যালিলিও-র উদাহরণে জাহাজের কেবিনের কথা বলা হয়েছে, সেই রকমের পর্যবেক্ষণের সাধারণীকরণের প্রতিফলন পাওয়া যায়।

---

১ অর্থাৎ, সোজাভাবেই বলি আর ঘুরিয়েই বলি—আসল কথাটা হল একে অন্যের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে চলছে।—অনুবাদক।

বিশ্বজগতের রূপগী চরিত্র, যেটা কেবলমাত্র বস্তুদেহগুলির আপেক্ষিক গতি এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে গড়ে উঠেছে, তাতে গ্যালিলিও-নিউটনের আপেক্ষিক সূত্রটা স্বাভাবিক ভিত্তি রূপে দেখা দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ত্বরণবেগ সঞ্চারিত ব্যবস্থাদের যে বিশেষভাবে দেখা হয় সেটা কোনো নিয়মমাফিক নয়। পরম বা অনপেক্ষ গতির সম্পর্কে জাড্যের বলের ব্যাখ্যা গতিশীল ও পারস্পরিক প্রভাব-বিস্তারকারী বস্তুদেহের চিত্র থেকে পাওয়া যায় না। এই সকল জাড্যজনিত বলকে দুই বস্তুর মধ্যে উদ্ভূত যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, পরন্তু এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় দেশ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত একটা বস্তু-দেহের সাহায্যে। শূন্য দেশ-এর ক্ষেত্রে ত্বরণবেগ যেভাবে সঞ্চারিত হয় তার সাহায্যে জাড্যের বল সৃষ্টি হয়। এই ধারণা থেকে শূন্য দেশ-কে বস্তু-জাগতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্কের কর্তার পর্যায়ে উন্নীত করা যায়।

এই দিক থেকেই মাখ ত্বরণবেগ জড়িত ব্যবস্থার পরম বা অনপেক্ষ গতির নিউটোনীয় ধারণার সমালোচনা শুরু করেছিলেন। পরম বা অনপেক্ষ ত্বরণবেগের প্রমাণ-রূপে জাড্যের বলের নিউটোনীয় ধারণার বিরুদ্ধে মাখ বললেন যে, ভরের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যেই প্রকৃতিতে সব কিছু বোঝানো সম্ভব। এর পরে আইনস্টাইন মাখ-এর সূত্রকে যে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব সেভাবে দেখা থেকে বিরত হলেন; তিনি এমন সব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব মেনে নিলেন, যে-সম্পর্কে মাখের সূত্রের কোনো অর্থ নেই। আইনস্টাইন শুরু করলেন ক্ষেত্রকে (field) একটা বাস্তব মাধ্যম হিসেবে ধরে—যাতে ক্ষেত্রের মধ্যে গতিশীল বস্তুদেহগুলির প্রভাবিত করার ক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়া একটা ক্ষেত্রে যে ঘটনাবলী ঘটে, সেগুলিকে বস্তুদেহগুলির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পর্যবসিত করা যায় না। নিউটোনীয় বলবিদ্যার সংস্কার করতে হলে তাকে আর কেবলমাত্র বস্তুদেহ এবং তার প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যেই একমাত্র সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। আইনস্টাইন লিখেছেন, মাখ-এর ধারণা যে জাড্য কেবলমাত্র ভরের জাড্যের 'পরেই নির্ভর করবে "তা থেকে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, মূল তত্ত্বটা নিউটোনীয় বলবিদ্যার সাধারণ ছাঁচেই হবে: গোড়াকার ধারণাগুলি ভরের এবং তাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে।"(১)

১ Philosopher-Scientist, P. 29.

নিউটোনীয় বলবিদ্যা অথবা ঐ ধরনের সাধারণ বলবিদ্যার ছাঁচ ধরতে গিয়ে নিউটনের পরম বা অনপেক্ষ ত্বরণবেগের সমালোচনার নেতিবাচক দিকটির গুরুত্ব থেকেই যায়, এটা ধরে নেওয়া হয় যে, বস্তুদেহগুলির ব্যবহার অন্য বস্তুদেহের দ্বারা ত্বরান্বিত হয় না। পরন্তু প্রভাবিত হয় কোন্ দেশ-এর পটভূমিতে তারা চলাফেরা করছে—তা থেকে বিশ্বজগতের একটা ইচ্ছামতো অ-স্বাভাবিক ধারণা আন্দাজ করে নেওয়া হয়। এই ধরনের আন্দাজ মহাবিশ্বের সুষমা ও ঐক্যের ধারণার পরিপন্থী।

শূন্য মহাকাশ, আইনস্টাইনের মতে, যে-কোনোভাবেই বস্তুদেহগুলির ব্যবহারকে(১) প্রভাবান্বিত করতে পারে না। তাদের ব্যবহার একমাত্র বিভিন্ন ভর-এর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার 'পরে নির্ভর করে। আমরা এবার দেখব, এই সূত্রটি মাখ-এর সাধারণ জ্ঞানতত্ত্বের ধারণার সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না।

বিষয়মুখী বাস্তবতার সমালোচনার জন্যে মাখ নিউটনের অনপেক্ষ ত্বরণবেগের সমালোচনাকে একটা উপলক্ষ বলে ধরেছেন। আইনস্টাইনের কাছে অনপেক্ষ ত্বরণবেগ এবং পরম বা অনপেক্ষ দেশ-এর সমালোচনা করার দ্বারা মহাবিশ্বের পদ্ধতি যে যুক্তিগ্রাহ্য হিসেবে জ্ঞেয় (অর্থাৎ, তাকে জানা যায়—অনুবাদক) সেই ধারণার পুনর্বাসন করা (বা পুনরায় চালু করা—অনুবাদক) সম্ভব হয়েছে, যেটাকে 'পরম বা অনপেক্ষ'(২) ধারণাগুলিকে এনে খর্ব করা হয়েছিল। আইনস্টাইন যেভাবে দেখেছেন, তাতে নিউটনের পরম সংজ্ঞাগুলি তাঁর ব্যবস্থার মৌল অর্থকে লঙ্ঘন করে। আইনস্টাইন নিউটনের সঙ্গে নিউটনের জন্যেই লড়ে যাচ্ছেন, নিউটোনীয় ব্যবস্থার মধ্যে যে পরম ধারণাগুলি রয়েছে তা থেকে মূল যা বোঝানো যেতে পারে, তার বিরুদ্ধে।

আইনস্টাইন নিউটনকে বিষয়মুখী সত্যের জন্যে সংগ্রামের প্রতীক বলে ধরে নিয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞানের মৌল সূত্রগুলি থেকে পরীক্ষার দ্বারা

---

১ অর্থাৎ, বস্তুদেহগুলি তাদের নিজের ভর-এর টানে বা জাড্যের প্রভাবে ধাবমান হয়। তার জন্যে মহাকাশে অবস্থিত অন্য বস্তুদের অভিকর্ষের প্রয়োজন হয় না।—অনুবাদক।

২ অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সবকিছুই পরম বা অনপেক্ষ অতএব অজ্ঞেয়, এর বিরুদ্ধে মতামত।—অনুবাদক।

যেসব সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করা সম্ভব, সেগুলি থেকে নিউটোনীয় পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যে যৌক্তিকভাবে পৌঁছনো যায়। এই সম্ভাবনা অজ্ঞেয়বাদিতার সকল রকমের যুক্তিকে খণ্ডন করে। যদি অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সঙ্গে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তগুলি মেলে তাহলে সেই যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবতাকে প্রতিবিম্বিত করে।

১৯৪২ সালে(১) 'আইজ্যাক নিউটন' নামে তাঁর প্রবন্ধে আইনস্টাইন ধ্রুপদী বলবিদ্যার স্রষ্টা সম্পর্কে নিম্নলিখিত এই কথাগুলি বলেছেন :

"এই ধরনের মানুষকে একমাত্র বুঝতে পারা যায় যদি আমরা এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করি যেখানে শাশ্বত সত্যের জন্যে সংগ্রাম চালানো হয়েছিল। নিউটনের বহু পূর্বে এমন বলিষ্ঠ মানুষ ছিল যারা মনে করত যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলীর সুসঙ্গত ব্যাখ্যার দ্বারা সরল পদার্থগত প্রকল্প(২) থেকে নিছক যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত টানা সম্ভব। কিন্তু নিউটনই প্রথম যিনি গাণিতিক চিন্তাকে যুক্তিসিদ্ধভাবে এবং ঐ চিন্তার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য রেখে পরিমাণগত-ভাবে ব্যাপক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বাস্তবিকই তিনি ভালো করেই আশা করতে পারেন যে, তাঁর বলবিদ্যার মৌলিক ভিত্তিটি যথা-সময়ে ঘটনাবলীকে বুঝতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। তাঁর ছাত্ররাও সেই রকমই ভেবেছিল—তাঁর চাইতে অনেক বেশি জোরের সঙ্গে এবং তাঁর উত্তরসূরীরাও, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি।"(৩)

সকল জানা তথ্যের ভিত্তিতে নিউটন মৌলিক নীতিগুলির একটা কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। 'মনের মুক্ত বা অবাধ সৃষ্টির' সাহায্যে তিনি অনেকগুলি অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। এগুলি পর্যবেক্ষণের দ্বারা নির্ধারিত একেবারে ঠিক ঠিক পরিমাণগত সম্পর্ক। যখন একটা পর্যবেক্ষিত ঘটনাকে এইভাবে মৌল প্রয়োজনীয় বা স্বীকার্য শর্ত থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় তখন সেটা আর 'অলৌকিক ঘটনা' থাকে না। "প্রতিটি চিন্তাবিদের কার্যকলাপের এটা লক্ষ্য", আইনস্টাইন লিখেছেন, "একটা 'অলৌকিক ঘটনা'কে এমন কিছুতে

১ নিউটনের জন্ম ১৬৪২ সালে। অতএব তাঁর তিনশ' জন্মবার্ষিকীতে এই প্রবন্ধ লেখা।—অনুবাদক।

২ Hypotheses—যাকে প্রমাণ করতে হবে।—অনুবাদক।

৩ A. Einstein, Out of My Later Years, Thames and Hudson, London, 1950, p. 219 (afterwards referred to as Later Years)

বদল করা যাকে তিনি ধরতে পারেন।"(১) নিউটনের চিন্তায় কয়েকটি ঘটনা স্তর-এর পারস্পরিক সম্পর্কের উপর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির নির্ভরতার মৌল সূত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয় নি। আপেক্ষিক তত্ত্ব সমগ্র ঘটনাবলীকে এই সূত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। যদিও আপেক্ষিক তত্ত্বকে পরে তার সীমানা ছাড়িয়ে যেতে দেখা গিয়েছে, তবুও মূল ধারণাটা বহালই ছিল: প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সঙ্গে নিউটোনীয় বলবিদ্যার সিদ্ধান্ত থেকে গৃহীত মতের মিল হয়ে যাওয়াতে বিশ্বপ্রপঞ্চের সম্পর্কে মানুষের মনের ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল। এই ধরনের জ্ঞান কখনও চূড়ান্ত হয় না, অনন্ত অবধি এর বিস্তার এবং সব সময়েই এটা বিষয়মুখী সত্যের কাছাকাছি আসছে। এই জন্যেই আইনস্টাইন তাঁর নিউটন সম্পর্কে প্রবন্ধ শুরু করেছেন যুক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং বিশেষ করে আইনস্টাইনের বিশ্ববীক্ষার যেটা বৈশিষ্ট্য, যুক্তির ক্ষমতার থেকে সমাজতাত্ত্বিক ও নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

"যুক্তির অনিঃশেষ কর্তব্যের মাপকাঠিতে তাকে মাপলে সে নিশ্চয়ই দুর্বল। মানুষের নানারকমের ভ্রম (বা বিভ্রান্তি) এবং তার আবেগ, যা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে, তারা বড়ো এবং ছোট, সব ক্ষেত্রেই মানুষের নিয়তিকে প্রায় নিয়ন্ত্রণ করে।" মনে করা যেতে পারে, এটা বলা হয়েছে যখন নাৎসীদের আগ্রাসন চূড়ান্ত পর্যায়ে।(২) তিনি আরও বলেছেন, "তবুও এই বোধ থেকে যে বইগুলি লেখা হয়েছে তা কয়েক পুরুষের চিৎকার চেঁচামেচি ছাপিয়ে বেঁচে থাকবে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে আলো ও উত্তাপ বিকীরণ করবে।" নিউটনের স্মৃতিতে পুনরায় ফিরে যাওয়াকে(৩) আইনস্টাইন যুক্তির ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা বলে দেখিয়েছেন।

আইনস্টাইনের দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং নৈতিক নীতিসমূহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুক্তির প্রতি এই শ্রদ্ধা, যেটা ধ্রুপদী বলবিদ্যার প্রতি তাঁর অবস্থানের সঙ্গে

---

১ Ibid, p. 220.

২ ১৯৩২ সালে আইনস্টাইন লিখছেন, যখন বাধ্য হয়ে তাঁকে হিটলারের জার্মানি প্রাণ রক্ষার তাগিদে ত্যাগ করতে হয়; এবং ১৯৩৩-এ হিটলার পুরোপুরি জার্মানিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ফ্যাসিস্তদের বা নাৎসীদের পয়লা নম্বরের শত্রু বলে যাদের ঘোষণা করে তার মধ্যে আইনস্টাইনের নাম ছিল।—অনুবাদক।

৩ অর্থাৎ, নিউটনের মতামতের প্রতি নতুন করে শ্রদ্ধা জানানোকে।

—অনুবাদক

নির্দিষ্টভাবে যুক্ত। নিউটনের ধারণায় আলো-বিকীরণকারী সূর্যকে আইনস্টাইন কখনও নিভিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। তিনি একমাত্র তাঁর প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে আধিবিদ্যক পরমধর্মী চিহ্নগুলিকে(১) সরিয়ে ফেলার জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন। আসলে আমরা যেটা দেখব, আপেক্ষিক তত্ত্ব নিউটনীয় বলবিদ্যার কেবলমাত্র পরম বা অনপেক্ষ মৌল ধারণাগুলিকে (categories) দূর করার জন্যে সামান্য পুনরীক্ষণ মাত্র নয়। এটা নিউটনীয় চিন্তার সূর্যকে অপসারিত করেছে অন্য সূর্যের সাহায্যে অথচ এই মৌল ধারণাটিকে কখনও নাড়া দেয় নি: যুক্তির আলোকে বিষয়মুখী, সুষমাময় ও জ্ঞানগ্রাহ্য জগৎটি আলোকিত হচ্ছে।

১ অর্থাৎ নিউটোনীয় বলবিদ্যার তত্ত্বকে প্রমাণ করতে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে অনুমান ধরে নেওয়া হয়েছে, যেগুলি আধিবিদ্যক পর্যায়ে পড়ে।—অনুবাদক।

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রাউনীয় গতি

> তাপগতিবিদ্যা···হচ্ছে একমাত্র পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব, যাতে এমন সর্বজনীন মর্মবস্তু রয়েছে যে, আমার স্থির বিশ্বাস তার মৌল ধারণাগুলির প্রয়োগ করার কাঠামোর মধ্যে তাকে কখনও বরবাদ করা যাবে না।
>
> আইনস্টাইন

১৯০৫ সালে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের সম্পর্কে মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশিত হবার অল্পদিন আগে আইনস্টাইন আণবিক (molecular) গতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা শেষ করেন। এই সিরিজের শেষ নিবন্ধটি যেটি Annalen der Physik পত্রিকার (এনালেন ডের ফিজিক্) প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে তিনি কোনো তরল পদার্থে ভাসমান ক্ষুদ্র কিন্তু অণুবীক্ষণে দৃষ্টিগ্রাহ্য কণাগুলির আপাতগতির একটা ব্যাখ্যা দেন, যার নামকরণ করা হয়েছে, ব্রাউনীয় গতি।

তাপগতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের গবেষণা এবং বিশেষ করে ব্রাউনীয় গতি সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের স্বতন্ত্র আকর্ষণ রয়েছে (অর্থাৎ, এ সম্পর্কে যে কাজ তিনি করেছেন তার মূল্য আলাদাভাবে বুঝতে হবে।—অনুবাদক)। তবুও আপেক্ষিক তত্ত্বের স্রষ্টার বিজ্ঞানসম্মত জীবনী লিখতে হলে তাঁর এইসব গবেষণাকে তাঁর জীবনাদর্শের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তুরূপে আলোচনা করা দরকার।

তাঁর জীবনের এই লক্ষ্যবস্তুর কেবলমাত্র আলাপ(১)-এর (বা সূচনাটুকু)

---

১ ইংরাজিতে আছে : 'opening bars'। অর্থাৎ, আইনস্টাইনের জীবনকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের সিম্ফনির সঙ্গে তুলনা করে প্রথম সূচনাটুকু, যেমন আমাদের ধ্রুপদী সঙ্গীতে 'আলাপ' করা হয়, তাই বলা হচ্ছে।

—অনুবাদক।

সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। আপেক্ষিক তত্ত্বে পৌঁছতে এখনও বাকি আছে, যদিও আমরা ইতিমধ্যেই যে-ঝোঁক সেখানে আমাদের নিয়ে যাবে, সেটা ধরতে পারছি। আইনস্টাইন সবচেয়ে সাধারণ, সবচেয়ে স্বাভাবিক (যা 'অভ্যন্তরীণ দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ') এমন তত্ত্ব খুঁজেছেন, যেটা প্রকৃতির মৌলিক প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করবে। এইসব প্রক্রিয়া 'নিছক বা খাঁটি বর্ণনা'-র সীমানার বাইরে অবস্থিত, তারা ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তি। এই ধরনের প্রক্রিয়াদের মধ্যে বস্তুদেহ নিয়ে গঠিত দ্রব্যদের এবং তাদের নিয়ে যে বস্তুগত ব্যবস্থা (সিস্টেম) গড়ে উঠেছে, তাদের আপেক্ষিক স্থান পরিবর্তন ঘটছে। বস্তুদেহগুলির এই আপেক্ষিক গতিকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বিষয়মুখী ভিত্তিভূমি বলে গণ্য করা হয় এবং এই ধারণাটা অসংখ্য পৃথক পৃথক বাস্তবতা নিয়ে গড়ে-ওঠা বিশৃঙ্খলার বদলে জগৎপ্রপঞ্চের একটা সুসঙ্গত চেহারা দেয়।

যেমন আমরা দেখতে পাব একে (অর্থাৎ এই আপেক্ষিক গতিকে—অনুবাদক) 'নিউটোনীয় বলবিদ্যার সাধারণ ছাঁচের' তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চেরও এমন একটা ছবি গড়ে তোলা যায়, যেখানে প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি হল বিভিন্ন বস্তু-দেহের মধ্যে গতি এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া, তারা নিজেরা কিন্তু অভিন্নরূপেই বর্তমান থাকে। ধ্রুপদী বৈজ্ঞানিক ধারণার মধ্যে আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল নিহিত রয়েছে যাতে আপেক্ষিক গতিটা হল প্রাথমিক ধারণা। এই ধারণাকে সাধারণীকরণ ও বিস্তার করার ফলে, ধ্রুপদী তত্ত্বগুলির মধ্যে যাদের সঙ্গে তার সংঘাত ছিল, তার থেকে সেই সব কিছুকে বাদ দেওয়া সম্ভব হল।

তাপগতিবিদ্যাতে গ্যাসের গতি সম্পর্কে তত্ত্বের যে মডেল খাড়া করা হয়েছিল, যাতে তাপমাত্রার অবস্থার মূল বিষয়মুখী ভিত্তি হল আণবিক গতি ও গ্যাসের অণুদের পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি, সেটা ধ্রুপদী আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছেছিল। কিন্তু এই মডেলগুলি জানা ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে একমাত্র বৃহৎ-জগৎদের নিয়ন্ত্রিত করছে যে নিয়মাবলী তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, যেখানে স্বতন্ত্র বা আলাদা আলাদা অণুদের এবং তাদের গতিকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না।

সাদি কারনো তাঁর Reflections sur la Puissance Motrice du

Feu বইয়েতে উলটে দেওয়া সম্ভব নয় এই রকম একটি সূত্র উপস্থিত করেছেন : উষ্ণতর বস্তু-দেহ থেকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বস্তু-দেহে তাপ প্রবাহিত হয়। (১)

এর উলটো দিকে প্রবাহ হতে পারে যদি একমাত্র শক্তি সঞ্চার করা যায়। তাপ-প্রবাহকে যে উলটে দেওয়া যায় না—তাপগতিবিদ্যার প্রক্রিয়ার এটা একটা একেবারে ঠিক ঠিক উদাহরণ, যা উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকে আগের শতাব্দীর যান্ত্রিক ধারণাগুলি থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল। অণুদের অবস্থান, গতিবেগ এবং ত্বরণবেগ কত সেটার সম্পর্কে একেবারে সঠিক জ্ঞান থাকলে তাপ-প্রবাহমানতা (উঁচু থেকে নীচু) যে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না, তা কি বোঝানো সম্ভব ? এটা সম্ভব একমাত্র যেমন বায়ুর কণাগুলির অবস্থান সম্পর্কে একটা বিশেষ মুহূর্তের জন্যে সঠিক জ্ঞান থাকলে গলার আওয়াজের আসল চরিত্রটা কী, (২) তার সম্পর্কে ধারণা করা যায়, যেটা শেষ অবধি কেবলমাত্র কণাদের দোলায়িত অবস্থার ফলে শ্রবণ-প্রক্রিয়াতে কতোখানি তারতম্য ঘটে একমাত্র তার 'পরে নির্ভর করেই ধরা যায় না। তাপ কেন গরম দিক থেকে ঠাণ্ডা দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেটা ব্যাখ্যার জন্যে কোনো ধাতুদণ্ডের অণুদের স্থানাঙ্ক ও গতিবেগ জানার প্রয়োজন হয় না। বস্তুত, বলবিদ্যার নিয়মাবলী (যা অণুদের মধ্যে সংঘাতকে, তাদের ধাকাধাকির মধ্যে তারা কোন্ পথরেখা ধরে চলে এবং অতিক্ষুদ্র জগতের সামগ্রিক চেহারাটাই) এই উলটে না-দেওয়ার ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না।

গতিবিদ্যাতে তাপকে অণুদের এলোমেলো (random) গতি এবং সংঘাতের ফলে উদ্ভূত বলে ধরা হয়। প্রতিটি সংঘাতকেই বলবিদ্যার ভাষাতে বর্ণনা করা যেতে পারে। তবুও তাপগতিবিদ্যার নিয়মাবলীতে (যেটা বড় আকারের অণুদের সমষ্টিকে অর্থাৎ অতিবৃহৎ জগতের(৩) প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে) তারা একক অণুদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কী ঘটবে সেটা নিয়ে ব্যস্ত নয়। তাপগতিবিদ্যার নিয়মগুলি হচ্ছে রাশিবিজ্ঞানের সম্ভাব্যতার নিয়ম (probability laws) : তাদের পাওয়া যাচ্ছে একটা অণুর ভাগ্যে কী ঘটবে তার সম্ভাব্যতা (probability) থেকে এবং যখন এই রকমের বহু অণুর ভাগ্যে

১ যেমন জল উঁচু থেকে নীচুতে প্রবাহিত হয়, যেমন গরম চা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে ঘরের তাপমাত্রার সমান হয়, এর উলটোটা নয়।—অনুবাদক।

২ অর্থাৎ সেটা হেড়ে না সরু, মিষ্টি না কর্কশ ইত্যাদি বোঝা যায়।—অনুবাদক।

৩ বাস্তবতার দুটি দিক—macroscopic বা অতিবৃহৎ বস্তু-জগতের কথা,

সম্ভাব্য একই ফল পাওয়া যাবে, তখন তাকে বলা যেতে পারে বাস্তবতা বা বাস্তবে এটাই ঘটবে। আমরা যদি সম্ভাব্যতার তত্ত্বের একটি উদাহরণ দেখি—একটা টাকাকে ছুঁড়ে দিলে কতবার তার মাথার দিকটা আর কতবার তার উলটো দিকটা পড়বে, তাহলে আমরা দেখব যে টাকার এপিঠ কি ওপিঠ পড়ছে তার সম্ভাবনা শতের বা হাজারের হিসাবে ধরলে একই হবে (প্রতিবার টাকাটাকে ছুঁড়ে নীচে ফেললে বা টস করলেও সমান সম্ভাবনাই পাওয়া যাচ্ছে)। দশবার মাত্র যদি টাকাকে ছুঁড়ে নীচে ফেলা যায় তাহলে কিন্তু একই সম্ভাব্যতা (probability) না-ও থাকতে পারে কারণ হয়ত দশবারই টাকাটা মাথার দিকেই পড়ল এবং তাতে সম্ভাব্যতার কোনো নিয়ম পাওয়া গেল না। ঠিক তেমনি ওজন খানেক অণুদের গতিবিধি কোনো তাপগতিবিদ্যার নিয়ম দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাদের হয়ত বিচিত্র রকমের গতিবেগ থাকতে পারে যেটা অকস্মাৎ, কোনো আপাতচক্ষু অনুসারে নয়, বললে যেতে পারে। আমরা যখন অনেক সংখ্যক এলোমেলোভাবে গতিশীল অণু নিয়ে কাজ করি, তখন কিন্তু তাদের গতিবেগের ভাগ কীরকমের হবে সে সম্পর্কে আমরা বেশ খানিকটা আস্থা নিয়ে বলতে পারি যে, সেটা সম্ভাব্যতা তথ্যের (probability data) সঙ্গে মিলে যাবে। একটা ধাতুর দণ্ড, যেটা গরম করা হয় নি, তার সম্ভাবনা হচ্ছে যে, অণুগুলি সেখানে একটা গড়পড়তা সমতাসূচক গতিবেগ নিয়েই চলবে, অর্থাৎ বলতে হয় যে, দণ্ডের পুরো দৈর্ঘ্যটা ধরে একই তাপমাত্রা থাকবে। দণ্ডের একটা দিক যদি অন্য দিকটার চাইতে বেশি গরম থাকে, তাহলে সেই গরম দিকটার অণুগুলির সমানুপাতিক গড় গতিবেগ বেশি থাকবে এবং তাহলেই একটা সময়ে দু'দিকের তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে। বৃহৎ-জগতের পক্ষে প্রযোজ্য এটা একটা নিয়ম যা একমাত্র বৃহৎ অণুর সমষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ-জগতের পক্ষে প্রযোজ্য তাপগতিশীলতার নিয়মাবলী পৃথক পৃথক

যেমন গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য ইত্যাদি। microscopic বা অতিক্ষুদ্র বস্তু-জগতের কথা, যেমন পরমাণু, প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদি।
এই দুই জগৎ যেন গ্যালিভারের ভ্রমণকাহিনীর দানবদের আর লিলিপুটদের দেশের কাহিনী।
বৃহৎ-বস্তুজগতে যেমন নিউটনীয় বলবিদ্যা চলে, তেমনি ক্ষুদ্রতম বস্তু-জগতে প্রয়োগ করা হয় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা।—অনুবাদক।

অণুদের গতিবিধিকে (বা চলাফেরাকে) নিয়ন্ত্রিত করে বলবিদ্যার যে নিয়মগুলি, তা থেকে আলাদা, এবং তারা বৈজ্ঞানিক সূত্রের দিক থেকে কয়েকটি নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে। বৃহৎ-জগতের তাপগতিশীলতার সঙ্গে আণবিক বলবিদ্যার সম্পর্ক কী? তেমনি জীববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৃহৎ-জগতের রাশিবিজ্ঞানের নিয়মাবলীর সম্পর্কে একই প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে: যেমন প্রজাতির বিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করছে যে-নিয়মাবলী এবং কোনো স্বতন্ত্র প্রাণীর ভাগ্য নির্ধারণ করছে যে-নিয়মাবলী—এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী?

বৃহৎ-জগতের পক্ষে প্রযোজ্য জটিল নিয়মাবলীকে অবশ্যই অতিক্ষুদ্র জগতের নিয়মাবলীতে নামিয়ে আনা যায় না। বিভিন্ন বস্তু-দেহের মধ্যে অথবা একই বস্তু-দেহের মধ্যে তাপ-প্রবাহ যে একই দিকে (উঁচু থেকে নীচে) প্রবাহিত হবেই তাকে যে উলটো দিকে ফেরানো যাবে না, অথবা তাপ-গতিশীলতার প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে বোঝবার আশা আমরা করতে পারি না, যদি আমরা বলবিদ্যার নিয়মাবলীর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি এবং যদি আমরা কেবলমাত্র যান্ত্রিকভাবে স্থান পরিবর্তনের ঘটনা ছাড়া জটিলতর কোনো ঘটনাবলীতে তাদের প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। এই অর্থে নিউটোনীয় বলবিদ্যার সাহায্যে প্রকৃতির কয়েকটি দিক ব্যাখ্যা করা সীমিতভাবে সম্ভব। জটিল এই প্রক্রিয়াগুলিকে এড়িয়ে ব্যাখ্যা করতে হলে নিউটোনীয় বলবিদ্যাতে তা পাওয়া যায় না, এরকমের কয়েকটি নতুন ধারণার প্রবর্তন করতে হয়। অন্যান্য কয়েকটির মধ্যে, উলটো দিকে ফেরানো যায় না,—এই নতুন ধারণাটিও রয়েছে। এক গুচ্ছ বাস্তব ঘটনার মধ্যে এই ধারণাগুলি রয়েছে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শ্রেণীবিভাগ করার জন্যে, নিউটনের নিয়মাবলীর ভিত্তিতে এবং বলবিদ্যা ছাড়া (অর্থাৎ, নিউটোনীয় বলবিদ্যা ছাড়া—অনুবাদক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে যে-নিয়মাবলী, তাদের মধ্যে সীমানা টানবার জন্যে, একটা স্বাভাবিক ভিত্তি পাওয়া যেতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর বিরাট আবিষ্কারগুলি দেখিয়ে দিল যে, পদার্থবিদ্যা, যাতে রাশিবিজ্ঞানের নিয়মগুলি এবং উলটে-না-দেওয়ার ব্যাপারটা বলবিদ্যাতে অথবা রসায়নবিদ্যাকে পদার্থবিদ্যাতে বা জীববিদ্যাকে যান্ত্রিক, পদার্থগত এবং রাসায়নিক ঘটনাবলীতে নামিয়ে আনা যায় না, যেমন জৈব প্রাণকে যান্ত্রিক,

আণবিক, রাসায়নিক এবং অন্যান্য ঐ ধরনের প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করা যায় না, যদিও এদের না হলে জৈব প্রাণ গঠিত হওয়া সম্ভব নয়। গতির উন্নততর রূপকে নীতিগতভাবে সরলতর এবং আরও সাধারণরূপে পর্যবসিত করা যায় না—এই কথাটা সাধারণ আকারে প্রথম এঙ্গেলস তাঁর Dialectics of Nature (প্রকৃতিতে ডায়ালেকটিকস্) বইয়েতে বলেছিলেন। এটাকে যে নামানো সম্ভব নয়, তার আপেক্ষিকতার 'পরে তিনি জোর দিয়েছিলেন এইভাবে যে, উন্নততর ধরনের গতিকে কখনও নিম্নতর ধরনের গতি থেকে আলাদা করা যায় না। যদিও উন্নততর ধরনের গতিকে নিম্নতর করা যায় না, এঙ্গেলস লিখছেন, তথাপি প্রতিটি উন্নততর ধরনের গতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আসল (বহির্জগতের(১) বা আণবিক) গতি যুক্ত রয়েছে।(২) এই ধারণা যে, পদার্থগত—এবং বিশেষ করে তাপগতিবিদ্যার নিয়মগুলি বলবিদ্যার এবং ভৌত কণাসমূহের গতি থেকে আলাদা করা যায় না বা তাতে পর্যবসিত করা যায় না,—তা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিতর্কের আসল সূত্রের একটা হদিশ পাওয়া যাবে।

'পর্যবসিত করা যায় না', এই তথ্যকে হিসাবের মধ্যে গণ্য না করলে যান্ত্রিক মতামতের পুনঃপ্রকাশ দেখা যাবে ; তাপগতিশীলতার প্রক্রিয়াগুলি যে স্বতন্ত্র অণুদের গতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়—এটা না দেখতে পাওয়ার ফলে গতির ধারণাকে তার বাস্তব ভিত্তি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখার চেষ্টা হয়েছে। জার্মান ভৌত-রসায়নবিদ ভিলহেলম ওস্টভাল্ড প্রস্তাব করেছেন যে, তাপগতিশীলতাতে যে-শক্তি সঞ্চারিত রয়েছে তার সঙ্গে আণবিক গতির কোনো সম্পর্ক নেই ; শেষ অবধি তিনি দাবি করে বসলেন যে, বস্তুর বদলে শক্তির ধারণাকে নিয়ে আসতে হবে। মাখও অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন এবং বস্তুর পারমাণবিক চেহারাকে নির্ভেজাল 'বিশ্বাস'(৩) বলে চালিয়ে দিলেন।

---

১ external or molecular—অর্থাৎ বস্তুর গঠনতন্ত্রের মধ্যে যে আণবিক গতি রয়েছে, সেটা ছাড়া তার বাইরের বা বহির্জগতের, যান্ত্রিক বা পদার্থগত গতি থাকতে পারে।—অনুবাদক।

২ F. Engels, Dialectics of Nature, Moscow, p. 246.

৩ অর্থাৎ তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, সম্পূর্ণ মনোজগতের ব্যাপার।
—অনুবাদক।

প্রাথমিক এই মন্তব্যগুলি সেরে নিয়ে আমরা এখন ব্রাউনীয় গতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের কাজের বিশ্লেষণে এগোতে পারি।

১৮২৭ সালে স্কটল্যাণ্ডের উদ্ভিদতত্ত্ববিদ রবার্ট ব্রাউন প্রথম অনুবীক্ষণ যন্ত্রে লক্ষ্য করেন যে পরাগের ধূলো জলে কিছুটা ভেসে থাকলে ক্রমাগত এলোমেলো-ভাবে গতিশীল হয়। অতি-সামান্য, প্রায় মুহূর্তমাত্র সময়ের ব্যবধানে প্রতিটি কণা অতি-অল্প, প্রায় নজরে পড়ে না, এতোটুকু স্থান পরিবর্তন করে। যখন দীর্ঘ সময় ধরে তার ছবি তোলা হয় তখন সেই কণা ফটোগ্রাফের প্লেটে একটা ঝাপসা ধ্যাবড়া ফোঁটার মতো দেখায়। ধরা যাক, প্রতি ত্রিশ সেকেণ্ডের ব্যবধানে যে ছবিগুলি তোলা হয় তাদের দেখায় যেন কাটা কাটা একটা লাইনের মতন, যাদের যুক্ত করা যায় (যেন একটা শেকলের মতো —অনুবাদক)।

আইনস্টাইন এই ঘটনাকে এবং এলোমেলোভাবে গতিশীল এবং ধাক্কা খাচ্ছে এমন অণুদের বুঝিয়ে দিলেন তাপমাত্রার গতিশীলতা দিয়ে, যেটা বোঝাতে গিয়ে পরাগ-কণাদের' পরে চারধারের জলীয় পদার্থে যে অণুগুলি রয়েছে তাদের অস্থিরতাকেও হিসাবের মধ্যে ধরলেন।

চঞ্চলতা বা অস্থিরতা বলতে আমরা বুঝি, সম্ভাব্য কালগত অথবা স্থানগত-ভাবে ঘটনাদের ভাগ করা। আমরা যখন ঘটনাবলীকে বাড়িয়ে দেখি, যেমন ধরা যাক. একটা মুদ্রাকে আমরা দশ শত, সহস্র বার ছুঁড়ে ফেললাম, তখন কতো বার মুদ্রার সামনের দিকটা আর কতোবার উলটো দিকটা পড়বার যে সম্ভাবনা আছে সেটা খুব সম্ভব আধাআধি হবে। আমরা যখন ঘটনাবলীকে কমিয়ে (যেমন অল্পবার যদি মুদ্রাকে ছুঁড়ে ফেলি) তাহলে সম্ভাব্য যেটা হতে পারত তা থেকে ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনাটাই বেশি হবে বলে ধরা যেতে পারে, যেমন কিনা পরপর কয়েকবার হয়ত মুদ্রার মাথার দিকটা চিৎ হয়ে পড়ল, তার পরে হয়ত এর উলটোটা, যেটা সাধারণত হয় না। তত্ত্বের দিক থেকে অবশ্য, একেবারে বিশবার মাথার দিকটাই যে পড়বে না তাঁর বিরুদ্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না, তবে এটা হওয়ার সম্ভাবনা অতি বিরল। কিন্তু পাঁচবার এই রকমের মুদ্রা ছুঁড়ে ফেলা হলে (টস করা হলে) এই ধরনের অস্থিরতা দেখা দেবার সম্ভাব্যতা যথেষ্ট রয়েছে। অণুদের এলোমেলো গতির ফলে একটা ঝুলন্ত কণাতে যতবার ধাক্কা পড়ে তাতে একদিকে ভারসাম্যের অভাব দেখা দিতে পারে। কণা আকারে যত বড়ো হবে তত অস্থিরতা কম হবার সম্ভাবনা;

কারণ তাতে যেহেতু অনেক বেশিসংখ্যক অণু ধাক্কা মারবে ততই সম্ভাব্যতার ছক (বা প্যাটার্ন) এবং পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষার সুযোগ বেড়ে যাবে। কণাটা যখন খুবই ক্ষুদ্র তখন অস্থিরতার এবং কোনো দিকে ভারসাম্য না-থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অতি সামান্য সময়ের ব্যবধানে ভারসাম্য যেটা নষ্ট হয়, তাতে যে-স্থান পরিবর্তন ঘটে সেটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা সম্ভব।

মনে করা যাক, একটা বেশ বড়ো পাত্র তরল পদার্থ দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে, যাতে তাপমাত্রার সমতা যতখানি সম্ভব ভাগ করে সমানভাবে রাখা রয়েছে: অর্থাৎ, বলা যেতে পারে, ঐ পাত্রের সর্বত্র কণাগুলির গতিবেগ গড়পড়তা হিসাবে একই আছে। ঐ পাত্রে কোনো স্রোত বা ঘূর্ণন নেই, কোনো অতি-বৃহৎ জগতের আলোড়ন নেই, অণুদের একেবারে চরমভাবে এলোমেলো কিন্তু গড়পড়তা হিসাবে আন্দোলনের ক্ষমতা বেশির ভাগ সময়েই রক্ষিত হচ্ছে (যদি সেটা লঙ্ঘিতও হয় তো অল্পক্ষণের জন্যে)। তা সত্ত্বেও সমতা ক্রমাগত লঙ্ঘিত হয় ছোট, অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে। এই ধরনের অস্থিরতা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যখন আমরা খুব ছোট আকারে পদার্থগত মাপ নিয়ে কাজ করি। আমাদের পাত্রে পরাগ কণাগুলির স্থান-পরিবর্তন তারা করিয়ে থাকে একেবারে আক্ষরিক অতি-ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক মাপে (অর্থাৎ, এতই ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাদের পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়)।

এখন ধরা যাক, এই অতি-ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক নিয়মাবলীর উপরে বৃহৎ-জগতের নিয়মাবলী চাপানো গেল। তরল পদার্থটিকে পাত্রের একদিকে গরম করা গেল। আমরা যখন ব্রাউনীয় গতি নজর করব তখন দেখব যে, অণুদের স্থান-পরিবর্তনের মধ্যে কোনো প্রতিসাম্য (symmetry) নেই। তাপ দেওয়ার ফলে স্রোতের অনুকূলে যে স্থান-পরিবর্তন ঘটছে সেটা উলটো দিকের স্থান-পরিবর্তনের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করবে (অর্থাৎ, সেটাই বাস্তবে ঘটবে —অনুবাদক)। ফটোগ্রাফ তুললে দেখতে পাওয়া যাবে, অনেকগুলি ব্রাউনীয় স্থান-পরিবর্তনের পরে একটা কণা তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে স্রোতের অনুকূলে অনেক দূর চলে যাবে।

অণুর গতিকে বর্ণনা ক'রে যে গতিবেগের তত্ত্ব অতি-ক্ষুদ্র জগতের নিয়মাবলীর সঙ্গে অতি-বৃহৎ জগতের বৃহৎ ভরযুক্ত বস্তুদের নিয়ন্ত্রিত করে যে তাপগতিশীলতার নিয়ম, এই দুইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেই পদার্থগত তত্ত্বে

চলে যাওয়া যাক। প্রধানত, ডারউইনের এই তত্ত্বে পৃথক পৃথক জৈবদেহের ক্ষেত্রে কী ঘটে থাকে, যেটা সমগ্র প্রজাতির দিক থেকে নিছক এলোমেলো কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিবেশটা অপরিবর্তনীয় থাকুক যাতে প্রজাতিরা তার সঙ্গে যতদূর সম্ভব খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই ধরনের অবস্থাতে স্বতন্ত্রভাবে আলাদা আলাদা পরিবর্তন এবং অস্থিরতা প্রকাশ পায় প্রজাতির মধ্যে একক, স্বতন্ত্র যে প্রাণীরা রয়েছে তাদের খাপছাড়া, কিন্তু ভারসাম্যযুক্ত পরিবর্তনের দ্বারা, যেটা সারা প্রজাতিকে প্রভাবিত করে না, ঠিক যেমন যে-অস্থিরতার কারণে ব্রাউনীয় গতির সৃষ্টি হয়, তারা তরল পদার্থের সমতা নষ্ট করে না অথবা তার প্রবাহের জন্যে দায়ী হয় না। যত কম এই ধরনের স্বতন্ত্র সংখ্যায় পর্যবেক্ষণ করা যাবে, তত ঐ ধরনের অস্থিরতা আপেক্ষিকভাবে বেশি বেশি পাওয়া যাবে। পরিবেশ যখন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা পরিবর্তন দাবি করে, তখন স্বতন্ত্রভাবে নানা রকমের রূপ পরিবর্তন এবং অস্থিরতার মধ্যে যে-প্রতিসাম্য পাওয়া যায়, সেটার চরিত্র ব্যাহত হয়। তারা একদিকে জমা হয়, তারা তাদের আগের পুরুষ (বা প্রজন্ম) থেকে কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে পায় এবং তাতে প্রজাতির জীবনে এমন-সব বড় বড় পরিবর্তনের ঝোঁক থাকে যাকে উলটো দিকে পরিচালিত নানারকম পার্থক্যের দ্বারা আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। প্রকৃতিরাজ্যে নির্বাচনের(১) ব্যাপার রাশিবিজ্ঞানের নিয়মে চলে। তাদের যেন কোনো একটা জৈবদেহের ব্যক্তিগত ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়; তাদের স্বতন্ত্র নিজ ভাগ্যকে যেন আলাদা করে দেখেই তবে তার সম্ভাব্য পরিণতি কী দাঁড়াবে অথবা তার ভাগ্যে কী আছে, তা নির্ধারণ করা হয়। অনেকগুলি জৈবসত্তা সম্পর্কে, সমগ্র প্রজাতির ভাগ্যে কী আছে সেটা বিচার করে দেখতে গিয়ে এই সম্ভাব্যতার ব্যাপারগুলি আসল ঘটনাবলীর গতি কী হবে তা প্রতিফলিত করে। রাশিবিজ্ঞানের নিয়মাবলীর ধারণা (যা বিচ্ছিন্ন আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে ঘটনাবলীর বিকাশে সম্ভাব্যতা কী দাঁড়াবে তা নির্ধারণ করে, যেটা একেবারে নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায় যখন অনেকগুলি কেস বা ব্যাপার নিয়ে কাজ করা হয়)—এটাই উনবিংশ

১ natural selection—ডারউইনের বিবর্তনবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক দিক। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টাতে কিছু প্রজাতি শেষ অবধি টিকে যায়, আর কিছু নষ্ট হয়। —অনুবাদক।

শতাব্দীর প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান নীতি ছিল। সেটা ছিল, ধ্রুপদী বৈজ্ঞানিক গতির (এটা কি ওটার সম্ভাব্য গতি নয়, সমগ্র গতিটার কথাই বলা হচ্ছে) মৌলিক চেহারাতে কোনো রদবদল আনে নি ; যে মৌলিক চেহারাটা ছিল এই যে, প্রতিটি পরমাণু, প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিটি বিন্দু একটি প্রাথমিক ধাক্কার এবং একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে অন্য বস্তুদেহের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রতিটি রাশিবিজ্ঞানের নিয়মের পেছনে ছিল কণাদের গতি, যাকে নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া'-তে পেশ করা হয়েছে, তার উপর নির্ভরশীল।

ব্রাউনীয় গতির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আইনস্টাইন এই সকল গতিশীল রাশিবিজ্ঞানের নিয়মের বহির্ভূত (রাশিবিজ্ঞানকে ছাড়িয়ে গিয়ে অথবা 'রাশিবিজ্ঞানের চেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের', এইভাবে আমরা বলতে পারি কারণ তারা তাপগতিশীলতার রাশিবিজ্ঞানের নিয়মের প্রান্ত দেশে যেন ওঁত পেতে ঘাপটি মেরে রয়েছে) দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। রাশিবিজ্ঞানের হাতিয়ারগুলি এবং তার ধারণাগুলি নিয়ে আইনস্টাইন দেখালেন যে আলাদা আলাদা অণুর গতিশীলতার নিয়মগুলির অস্তিত্ব রয়েছে 'রাশি-বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে'।

নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া'তে যা বর্ণনা করা হয়েছে, আপেক্ষিক তত্ত্ব জগৎ-প্রপঞ্চের গতিশীলতার নিয়মগুলি যে তা থেকে আলাদা, সেটা দেখিয়েছে। এ থেকে অবশ্য বলবিদ্যার নিয়মগুলির গতিশীল চরিত্রের বদল হয় না (তাপগতিশীলতার নিয়মগুলির ক্ষেত্রে যা হয়)।

বলবিদ্যার নিয়মগুলির এই গতিশীল চরিত্র যার সঙ্গে সম্ভাব্যতার ধারণার বিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটা বিশ বছর পরে বিজ্ঞানে নতুন এক বিপ্লবের দ্বারা উৎখাত হয়। এই বিপ্লবের সূত্র Annalen der Physik-এর ঐ একই সংখ্যাতে পাওয়া যাবে যাতে আলোর কণা (light quanta) সম্পর্কে আইনস্টাইনের নিবন্ধ রয়েছে। তবে রাশিবিজ্ঞানের নিয়মগুলি যে জগৎ-প্রপঞ্চের মৌলিক নিয়ম হয়েই দাঁড়াবে এ সম্পর্কে আইনস্টাইনের ধারণাতে যথেষ্ট জটিলতা ছিল এবং আইনস্টাইনের সমগ্র কাজকর্মের মধ্যে যে সুসঙ্গতি আছে, তাকে বুঝতে হলে সেটাকে জানতে হবে। আমরা এখানে তাপ-গতিশীলতার রাশিবৈজ্ঞানিক চরিত্র সম্পর্কে এতটা খুঁটিয়ে দেখছি

যাতে কোয়াণ্টাম রাশিবিজ্ঞানের(১) নিয়মগুলি সম্পর্কে আইনস্টাইনের মনোভাব এক্ষেত্রে পেশ করা অপেক্ষাকৃত সোজা হবে এবং বোঝানো যাবে। এটা কেবলমাত্র পদার্থবিদদের কাছেই ঔৎসুক্যের ব্যাপার নয়। আমাদের কালের সর্বাপেক্ষা বড়ো পদার্থবিদ জগৎপ্রপঞ্চের মৌলিক প্রাথমিক নিয়মা-বলীতে যে ভাবে পৌঁছেছেন সেটা কেবলমাত্র পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে ঔৎসুক্যের ব্যাপার নয়, সেটার প্রভাব বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির পুরো ইতিহাসের 'পরেই পড়েছে।

তাপগতিবিদ্যার নিয়মাবলী থেকে যে আণবিক বলবিদ্যাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—তরুণ বয়সে এটা আইনস্টাইনকে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। তাপগতিবিদ্যা তাঁর চোখে কণার গতিশীলতার নেতি নয়, যে কণার গতি জগৎপ্রপঞ্চের চেহারার ভিত্তিরূপে বলবিদ্যাকে নাকচ করে দেয় না (যেটা মাখ ও ওসট্‌ভাল্ড বিশ্বাস করতেন) অথবা সেটা সরাসরি বলবিদ্যার নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না (যেটা বলবিদ্যাভিত্তিক দর্শনের ছাত্ররা বিশ্বাস করতেন)। আইনস্টাইন তাপগতিবিদ্যাকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যম বলে এবং বস্তুর পৃথক পৃথক অংশের গতির নিয়মাবলীর সত্যতা যাচাইয়ের প্রমাণ বলে মনে করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বলবিদ্যাভিত্তিক দর্শন এবং তার ছাত্রদের কাছে বলবিদ্যার সাহায্যে পদার্থগত সমস্যার সমাধানের ব্যাপারটা ছিল মূলতই একটা ভিন্ন ধরনের। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সমস্যা-গুলির জটিলতা ও বিচিত্র চরিত্রের জন্যে তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রভেদ ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই একেকে অন্যতে নামিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। আইন-স্টাইনের কাছে বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয়ের এতগুলি দিক একটা তত্ত্বের সত্যতা ও যাথার্থ্যের শক্তির পরিচায়ক, যেটা শেষ বিচারে, বিভিন্ন সমস্যার বিশিষ্ট চরিত্রকে বাতিল না করে দিয়ে তাদের সমাধানের চাবিকাঠি যোগায়। "একটা তত্ত্ব" তিনি লিখছেন "ততই আকর্ষণীয় হয়, যতই তার মূল সূত্রগুলি সহজসরল, যতই সেটা নানারকমের জিনিষের বর্ণনা দেবে এবং ততই তার প্রয়োগের এলাকাটা ব্যাপক হবে। এ জন্যেই ধ্রুপদী তাপগতিবিদ্যা আমার 'পরে এতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এটাই একমাত্র পদার্থগত

১ আমরা কোয়াণ্টাম-এর বাংলা তর্জমা করলাম না কারণ পরমাণুর গতিশীলতাতে, যাকে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা বলে, মৌলিক কণার দুরকম চরিত্রই পাওয়া যায়—কণীয় এবং তরঙ্গধর্মী।—অনুবাদক।

তত্ত্ব, যার মর্মবস্তু এত সর্বজনীন যে, আমার স্থির বিশ্বাস, মৌলিক ধারণার প্রয়োগের চৌহদ্দির মধ্যে তাকে কখনও বরবাদ করে দেওয়া যাবে না (যারা নীতিগত ব্যাপারে খুঁতখুঁতে তাদের বিশেষ মনোযোগের জন্যে)।"(১)

ধ্রুপদী তাপগতিবিদ্যাকে যে এতটা স্থায়িত্ব দেয়, সেটা কী?

ত্বরণ, গতিবেগ এবং প্রতিটি মুহূর্তে অণুদের গতিবেগ ও অবস্থান—ধ্রুপদী এই নিয়মাবলী যেটা নিউটোনীয় বলবিদ্যা, সেগুলি তাদের অপেক্ষা আরও সঠিক নিয়মাবলীতে পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন পরিমাপের দেশগত ও কালগত ব্যাপারে প্রধান সূত্রগুলিকে নড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি, তাপগতিবিদ্যার পদ্ধতি (সিস্টেম) অপেক্ষাকৃত কম সম্ভাব্য অবস্থা থেকে অধিকতর সম্ভাব্য অবস্থায় চলে যাচ্ছে, যাতে স্বতন্ত্র অণুদের বহু সংখ্যায় এলোমেলো গতিবেগ থেকে একটি নিয়ম বার করা সম্ভব। এই গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে যেসব নিয়ম তাদের বদল করা সম্ভব, কিন্তু কণাদের গতির সম্ভাব্যতা যে রাশি-বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলির নিয়মে জটিল, উলটে-ফেলা-যায় না এইরকম বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের নড়ানো সম্ভব নয়।

বৃহৎ জগতের নিয়মাবলী, যাতে অণুদের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়, তারা যে গতিবিজ্ঞানের মডেলগুলি থেকে স্বতন্ত্র, ব্রাউনীয় গতির তত্ত্ব এই মোহকে ভেঙ্গে দিয়েছে। ব্রাউনীয় গতির নিয়মাবলী এবং তাপমাত্রা ও অণুদের গতিবেগ-সংক্রান্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি কিভাবে যারা পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়গ্রস্ত. তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করেছে—এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আইনস্টাইন বলেছেন যে মাখ ও ওস্টভাল্ডের সংশয়বাদিতা তাদের আগেকার প্রত্যক্ষবাদী (positivistic) ধারণা থেকে এসেছে।

"পরমাণু-তত্ত্ব সম্পর্কে এই সকল পণ্ডিতের যে অনীহা তার সন্ধান নিশ্চিতভাবেই তাদের প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক মনোভাবের মধ্যে পাওয়া যায়। দুঃসাহসী মনোভাব ও চমৎকার সহজাত প্রেরণা রয়েছে এমন পণ্ডিতরাও যে দার্শনিক ঝোঁক থাকলে তথ্যের ব্যাখ্যাতে বাধা পেতে পারেন—এ তার একটা চমৎকার উদাহরণ।"(২)

আইনস্টাইন বলছেন যে, মুক্ত ধারণার নির্মাণ-কার্য ছাড়া কেবলমাত্র তথ্যের

---

১ Philosopher-Scientist p. 33.

২ Ibid, p. 49.

ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। মাখ-এর তথ্যের ধারণাগুলি পর্যবেক্ষণ থেকে করা হয় কিন্তু সে পর্যবেক্ষিত ঘটনাবলীকে বিষয়মুখী কারণগুলি দিয়ে সমর্থন করা হয় না—আইনস্টাইন এটাকে আক্রমণ করেছেন। পরমাণু, অণু এবং তাদের গতি সম্পর্কে, যেগুলি সরাসরি প্রত্যক্ষ নয়,—তাদের নিয়ে নানা রকমের প্রকল্প (অর্থাৎ, যাকে প্রমাণ করতে হবে—অনুবাদক) গড়ে ওঠে, যেগুলি ধারণাভিত্তিক নির্মাণকার্যের মধ্যে পড়ে। মাখ মনে করেন যে, যাদের সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাদের রাজত্বে প্রবেশ করা হল 'অধিবিদ্যা'। গতিশীল ভৌত অণুদের যে প্রচ্ছন্ন জগৎ রয়েছে তার মধ্যে প্রবেশ না-করে বৃহৎ জগতের শক্তিদের লক্ষ্য করার মধ্যে সমস্যাকে ধরে রাখতে চান ওস্টভাল্ড। আইনস্টাইনের কাছে ঠিক ঐ ধরনের প্রবেশ করাই হল পদার্থগত প্রক্রিয়ার সম্যক জ্ঞান। সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় এমন তথ্যদের বর্ণনা (এক্ষেত্রে বৃহৎ-জগতের প্রক্রিয়াগুলি) আপনা-থেকেই কোনো দ্ব্যর্থহীন তত্ত্ব এনে হাজির করে না। কেবলমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফলে যে তথ্যগুলি সরাসরি পাওয়া যায়, তাদের বিষয়মুখী বাস্তবতা থেকেই শুধু সেগুলি পাওয়া সম্ভব নয়। তারা যে 'স্বতঃপ্রত্যক্ষ', এই মোহ বহুদিনের ব্যবহার থেকে এসেছে। আমরা ইতিমধ্যেই এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছি, যাতে আইনস্টাইন মাখ ও ওস্টভাল্ড-এর মতামতের বিরোধিতা করতেন। আমরা পরে দেখব যে, বলবিদ্যার 'স্বয়ং-প্রতিভাত' ধারণাগুলির সর্বাপেক্ষা সমালোচনামূলক সংশোধনের পরে, যেটা সরাসরি পর্যবেক্ষণ থেকে করা হয়েছিল—আপেক্ষিক তত্ত্বের রূপায়ণ সম্ভব হয়। আইনস্টাইনের প্রত্যক্ষবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাপগতিবিদ্যার পারমাণুগত অন্তঃপ্রবাহের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে—সেটাই এখানে প্রশ্নের বিষয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফোটন

> আলোর রশ্মিগুলি কি ছোট্ট, অতি ক্ষুদ্র কণিকার প্রবাহ নয় যা আলো-বিকীরণকারী বস্তু থেকে নির্গত হয় ?
>
> নিউটন

আগের পরিচ্ছেদে আমরা জগৎপ্রপঞ্চের চেহারাটা বিজ্ঞানের 'ধ্রুপদী আদর্শে' কিরকমের হয় তা বলেছি, যাতে নিউটনের ধারণা থেকে বস্তুদেহ-গুলির গতি ও নিয়মের ধারণা বদলে গেলেও একই ধরনের রয়ে গেছে : এর প্রাথমিক ধারণা হচ্ছে গতির আপেক্ষিকতা এবং যেসব কণা ও বস্তু-দেহ নিয়ে তারা গঠিত তাদের আপেক্ষিকতা ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া। নিউটোনীয় বলবিদ্যা ও তাপগতিবিদ্যার মধ্যে যে সংঘাত ছিল তাতে নিউটনের বলবিদ্যা এবং সাধারণভাবে 'ধ্রুপদী আদর্শের' পক্ষে সানন্দেই রায় দেওয়া হয়েছিল। তাপগতিবিদ্যার রাশিবিজ্ঞানের ক্রিয়মাবলীর পটভূমিতে নিউটোনীয় বল-বিদ্যার অবস্থান বজায় রয়েই গেল। তবে এতে 'ধ্রুপদী আদর্শের' নিউটোনীয় পরিবর্তন যেটা সাধিত হল, সেটা যে একেবারে সঠিক তার কোনো গ্যারান্টি পাওয়া গেল না। এর পরে যে সকল সংঘাত ঘটল (যেমন, তাপগতিবিদ্যার সঙ্গে) তাতে নতুন পরিবর্তনকে আরও বিশদ করে তোলা সম্ভব হল।

আপেক্ষিক তত্ত্বের অর্থ দাঁড়াল নানারকমের বিরোধ ও যুক্তি ছাড়া কোনো কিছুকে অনুমান করে ধরে নেওয়ার থেকে 'ধ্রুপদী আদর্শের' মুক্তি : নিউটনের পরিবর্তনের কথা বরবাদ করে এটা 'বাইরের থেকে প্রমাণ হাজির করার' এবং 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'তে পৌঁছনোর আদর্শ উপস্থিত করল। এটা কি করে সম্ভব হল সেটা বোঝা যাবে যখন আমরা আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব (১৯০৫) এবং সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে (১৯১৫) পৌঁছব।

এর পরে আরও অগ্রগতি ঘটেছে। তারা শুধুমাত্র 'ধ্রুপদী আদর্শে'র নিউটনীয় রূপটিকেই চ্যালেঞ্জ করল না, স্থানচ্যুতি কিভাবে ঘটছে সেই চিত্র এবং প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী অনড় বস্তু-দেহগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পুরো মতবাদটাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসল। ১৯৩০-৫০ সালে আইনস্টাইনের কাজের প্রসঙ্গে আপেক্ষিক তত্ত্বের এই ফলাফলের দিকটি আমরা আলোচনা করব।

পরবর্তীকালে 'ধ্রুপদী আদর্শে'র এই সংশোধন করা হয়েছে যতটা আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে, তার চেয়ে বেশি আইনস্টাইনের আর এক তত্ত্ব থেকে, সেটাও ১৯০৫ সালেই প্রথম রূপায়িত করা হয়; সেটা হল আলোর কণিকা অথবা ফোটন। নিশ্চিতভাবে বলতে হলে 'ধ্রুপদী তত্ত্বের' জয় সূচিত করেই এর যাত্রা শুরু হয়, যদিও আইনস্টাইন তাঁর ফোটন তত্ত্বে যেসব ভাবধারার বিকাশ ঘটান, তাতে পুরো 'ধ্রুপদী আদর্শ'টাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এবং যখন আপেক্ষিক তত্ত্বের নীতিগুলি কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যেতে থাকল, তখন অপরিবর্তনীয় বস্তুর পারস্পরিক স্থানচ্যুতিকে 'বিশ্বজগতের' প্রাথমিক, একেবারে মৌলিক ধারণা হিসাবে আর ধরা গেল না।

১৯০০ সালে ম্যাকস প্ল্যাংক বিকীরণ তত্ত্বের কয়েকটি দ্বন্দ্বের সমাধান করতে গিয়ে এটা মেনে নিলেন যে, তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের শক্তি (আলোর) নির্গত হচ্ছে এবং তারা বিশোষিত হচ্ছে (absorbed) বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো অবিভাজ্য অংশের মধ্যে, যাদের তিনি নাম দিলেন 'কোয়ান্টা'।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বের রূপায়ণ করলেন, যাতে আলো শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে (টুকরো টুকরো অংশ হিসাবে—অনুবাদক) নির্গত হচ্ছে না, পরন্তু আলো গড়ে উঠেছে টুকরো টুকরো অদৃশ্য অংশগুলির সমষ্টি নিয়ে, যাকে বলা হচ্ছে আলোক-কণিকা, পরে যারা ফোটন নামে পরিচিত। তারা এমন ধরনের কণিকা, যেটা বায়ুশূন্য অবস্থাতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার দৌড়ে যায়। এই শতকের বিশ দশকে তাদের নামকরণ হয়েছে ফোটন।

ফোটনের বা আলোর কণিকার উপস্থিতি থাকলেই এই তথ্যে সহজেই পৌঁছনো যায় না যে, আলো নির্গত হচ্ছে এবং বিশোষিত হচ্ছে অবিভাজ্য অংশ হিসাবে। ফোটন প্রকল্প (হাইপোথেসিস) এবং প্ল্যাংকের তত্ত্বের মধ্যে যে-সম্পর্ক তাকে আইনস্টাইন এইভাবে বুঝিয়ে বলেছেন: "যদিও বীয়ার

পাইন্টের বোতলেই সবসময়েই বিক্রি হয়, তবুও তা থেকে এটা দাঁড়ায় না যে, বীয়ার তৈরি হয় পাইন্টের অবিভাজ্য অংশগুলি দিয়ে।"

আইনস্টাইনের জীবনী লিখতে গিয়ে ফিলিপ ফ্রাংক এই উপমাকে আরও বিস্তৃত করেছেন।(১) তিনি বলছেন, একটা পিপেতে বীয়ার যথার্থ অংশরূপে গড়ে উঠেছে কি, না, এটা অনুসন্ধান করতে হলে দেখতে হবে অনেকগুলি পাত্রে, ধরা যাক দশটা পাত্রে, বীয়ারটাকে যেরকমভাবে ইচ্ছা ঢেলে ফেলা হল। প্রতিটি পাত্রে কতটা বীয়ার ধরে সেটা মেপে নিয়ে তারপর বীয়ারকে আবার পিপেতে ঢেলে ফেলা হল। এই প্রক্রিয়াটাকে কয়েকবার করা হল। বীয়ার যদি টুকরো টুকরো অংশ হয়ে না থাকে তাহলে প্রতিটি পাত্রে যে পরিমাণ বীয়ার আছে তাদের **গড়পড়তা** দাম একই হবে। যদি বীয়ারটা অবিভাজ্য অংশগুলি দিয়ে গঠিত হয়ে থাকে তাহলে গড়পড়তা দামে তাদের হেরফের হবে। এখানে পিপের মধ্যে যা আছে, সেটাই যদি একটা মাত্র অংশ হয়, তাহলে সেটাকে একটা পাত্রে প্রতিবারই ঢেলে ফেলা সম্ভব হবে এবং দশটা পাত্রে যে পরিমাণের বীয়ার আছে তাদের মধ্যে তফাতটা হবে সর্বাধিক—একটাতেই সব বীয়ারটা থাকবে আর অন্যগুলি থাকবে একেবারে খালি। যদি বীয়ারটা দুই, তিন প্রভৃতি অবিভাজ্য অংশবিশেষ নিয়ে হয় তাহলে গড়পড়তা দামে যে হেরফের হবে সেটা ক্রমশ কমে আসবে। তাদের এই হেরফের ঘটার বা কম-বেশি হওয়ার ব্যাপারটা অনুযায়ী আমরা বীয়ারের অবিভাজ্য অংশগুলির আয়তন বিচার করতে পারি।

এখন তড়িৎ-চুম্বকীয় বিষয়টি আলোচনা করা যাক। পিপেতে বীয়ারের মতো একটা বন্ধ বাক্সে এটাকে ভর্তি করা যাক, যেটাকে আমরা কয়েকটি ছোট ছোট অংশে (যেন কোষে) ভাগ করা আছে বলে ধরে নেব। আমরা কি বিকীরণের শক্তিকে অজস্র অংশগুলিতে ভাগ করে নিতে পারি অথবা আমাদের আবার অবিভাজ্য 'অংশগুলির' পর্যায়ে নেমে আসতে হবে? আর তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকীরণ যদি টুকরো টুকরো হয়, তাহলে তার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র 'অংশের' মূল্য কী?

এই প্রশ্নগুলির জবাব দিতে হলে বিভিন্ন কোষগুলির মধ্যে গড়পড়তা মূল্য থেকে শক্তির যতখানি তারতম্য ঘটছে সেটা মাপতে হবে। যদি বিকীরণের

১ Philip Frank, op. cit p. 91.

অংশগুলি বড় বড় হয় তাহলে কোষগুলির মধ্যে শক্তির তারতম্য হবে বড় মাপের, আর সেটা যদি ছোট হয় তাহলে তারতম্যও হবে ছোট মাপের।

মাপ করলে দেখা যায় যে, বেগনী আলোতে (যাতে তড়িৎ-চুম্বকীয় কম্পাঙ্ক খুব উচ্চ) শক্তির তারতম্য ঘটছে অপেক্ষাকৃত অনেক বড় করে। লাল আলোতে (নিম্নতর কম্পাঙ্কে) তারা অনেক ক্ষুদ্র। তাহলে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, বেগনী আলো লাল আলোর চাইতে শক্তির বেশি অংশ নিয়ে গঠিত।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, বীয়ার কেবলমাত্র 'পাইন্টের বোতলেই' বিক্রি করা হয় না, তারা আসলে অবিভাজ্য 'পাইন্টের অংশবিশেষ' দিয়ে গঠিত, যেটা বলার অর্থ দাঁড়ায় যে, আলো অদৃশ্য কণাদের সমষ্টি। সেটা শুধুমাত্র যে নির্গত হচ্ছে এবং তাকে শুষে নেওয়া হচ্ছে অদৃশ্য কণা রূপে, তাই নয় : নির্গমন এবং বিশোষিত হয়ে যাওয়ার অন্তর্বর্তীকালে এতে অনেক অবিভাজ্য কণা রয়েছে, যার যত বেশি শক্তি রয়েছে, তত বেশি তার তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক। আলোক-কণার (ফোটনের) শক্তি কম্পাঙ্কের অনুপাতে এবং একটা বিশেষ ধরনের আলোর (এক বর্ণালী বিশিষ্ট)(১) বিশেষ ধরনের মূল্যমান। আলোর কণিকা-প্রবাহের চরিত্র এবং ফোটনের অস্তিত্ব বিশেষ কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ বুঝতে পারা যায় তথাকথিত আলোকবৈদ্যুতিক (Photoelectric) ক্রিয়াকে, যাতে আলোকে কোনো কিছুর 'পরে ফেলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। একটা ধাতুর পাত্রে আলো ফেললে তা থেকে ইলেকট্রনগুলি ছিটকে বেরিয়ে যায় ; ইলেকট্রনদের এই গতি বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে।

একটা ইলেকট্রনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে বেশ খানিকটা শক্তির প্রয়োজন হয়।(২) দেখা গেল এই শক্তি একটা আলোর রশ্মি কতখানি পরিক্রমা করে তার 'পরে নির্ভর করে না। মনে করা যাক, একটা আলোর উৎস অর্থাৎ

১ অর্থাৎ, সাধারণ ভাষায় এক-রঙা আলো—হয় বেগনী, নয় লাল, নয় সবুজ —সূর্যের সাদা আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে যে সাতটা রং পাওয়া যায় তার যে কোনো একটা —অনুবাদক।

২ একটি এ্যাটম বা পরমাণুর কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে থাকে একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তিবিশিষ্ট প্রোটন, তার চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষপথে বা শক্তিস্তরে (energy level) থাকে ঘূর্ণমান ধনাত্মক ইলেকট্রনগুলি। প্রোটনযুক্ত নিউক্লিয়াসের যে টান বা আকর্ষণ ইলেকট্রনের 'পরে থাকে তা থেকে বিযুক্ত করতে বাইরে থেকে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন হয়।—অনুবাদক।

যা থেকে তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকীরণ নির্গত হচ্ছে। বিকীরণটি যতই সবদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে ততই তার তরঙ্গ-আকারে শক্তিপুঞ্জের ধাক্কাটা কমে যাচ্ছে। কিন্তু যে ইলেকট্রনগুলি ধাক্কা খেয়ে শক্তিস্তর(১) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তাদের নিজেদের মধ্যে যে শক্তি ছিল, সেটা কিন্তু কমে যাচ্ছে না, যদিও অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ধাক্কা খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। যদি একটা ধাতুর প্লেট থেকে বিকীরণের শক্তি (আলোর উৎস থেকে—অনুবাদক) একটা ইলেকট্রনকে যথেষ্ট জোর ধাক্কা দিতে পারে তাহলে ইলেকট্রনের বহিষ্কারটা ঘটবেই অর্থাৎ আমরা একটা আলোক-বৈদ্যুতিক প্রভাবের ক্রিয়া দেখব, যদিও এখানে আলোর উৎসটা বহুদূরে রয়েছে। এইচ ক্র্যামার্স বলেছেন, একটা নাবিক যখন সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় তখন যা ঘটে এটাও সেই রকম এবং জলে ঝাঁপ দেওয়ার পরে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় সেটা সমুদ্রের অন্য প্রান্তে পৌঁছায় এবং ঐ ছড়িয়ে-পড়া ঢেউয়ের শক্তি আর একজন সন্তরণরত নাবিক যে অনুরূপভাবে তার জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল, তার উপর দিয়ে বয়ে যায়।

আলোকবৈদ্যুতিক ক্রিয়ার তত্ত্ব থেকে তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে, একটা ইলেকট্রনকে তার শক্তিস্তর (বা শক্তিগর্ভও বলা যেতে পারে—অনুবাদক) থেকে বিচ্ছিন্ন করতে যে-শক্তির দরকার হয় সেটা আলোর উৎস থেকে ধাতুর প্লেটটি কতদূরে আছে তার 'পরে নির্ভর করে না। তবে নিশ্চয়ই সেটা নির্ভর করে তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকীরণের কম্পাঙ্কের (বা কত পরিমাণে তার থেকে তরঙ্গ নির্গত হচ্ছে—অনুবাদক) 'পরে। প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রনকে ধাক্কা মেরে বার করে দেবার জন্যে ঠিক যতটুকু শক্তির দরকার হয় সেইটুকুই সে পেয়ে থাকে, একমাত্র দূরত্বটা যত বেড়ে যাবে ততই কম পরিমাণে ইলেকট্রন কণাগুলি নির্গত হবে। আইনস্টাইনের মতে এই প্যাটার্নটা (বা ছকটা) একটা আলোর উৎস থেকে সর্বদিকে যে টুকরে টুকরো কণাগুলি ছুটে বেরিয়ে যায় সেই ছবির সঙ্গে মেলে। উৎস থেকে দূরত্ব যত বেশি হবে ততই একটি সংখ্যাগত মাপের দেশের (space) আয়তনের মধ্যে গড়পড়তা অণুদের সংখ্যা কম হবে এবং ততই একটা বিন্দুতে সেই আলোর শক্তিবিশিষ্ট একক কণার সন্ধান কম পাওয়া যাবে। কিন্তু একবার ধাক্কা লেগে গেলে সেটার

১ অর্থাৎ পরমাণুর কেন্দ্রকের বা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন শক্তিস্তরে বিরাজ করে, তারা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

—অনুবাদক।

শক্তি তার উৎস থেকে যত দূরেই থাক না কেন একই হবে এবং সেটা একমাত্র দোলনের কম্পাঙ্কের 'পরে নির্ভর করবে।

কিন্তু মনোযোগী পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন—আলো যদি কণার সমষ্টি হয় তাহলে কম্পাঙ্কের কথা কী করে আমরা বলতে পারি? বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের সামনে এটাই ছিল প্রধান সমস্যা, এবং তার উৎপত্তি হয়েছে আইনস্টাইনের আলোক-কোয়ান্টা থেকে।

আলোকের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ রয়েছে এবং সেটার চরিত্র যে তরঙ্গের মতো এটা অস্বীকার করা যায় না। আবার আলোকের চরিত্র যে কণাপ্রবাহের মতো, আলো যে ফোটনের সমষ্টি, সেটাও কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। এই যে দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ আলোর চরিত্র তরঙ্গের মতো না কণাপ্রবাহের মতো—অনুবাদক) সেটা প্রচণ্ড ধাঁধাঁর সৃষ্টি করেছে এবং দুই দশকের পূর্বে পদার্থবিদরা তার সমাধান করতে পারেন নি।

এই দ্বন্দ্ব, তরঙ্গ ও কণাধর্মী দুই ধরনের যুগপৎ আলোর চরিত্র, আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির বৈশিষ্ট্য। এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না যে, আলোর মধ্যে তরঙ্গ ও কণিকা, এই দুই ধরনের চরিত্রই পাওয়া যাবে। আপাতদৃষ্টিতে কোনো স্ববিরোধী চরিত্র দেখা গেলে তা থেকে পালিয়ে যাবার লোক তিনি ছিলেন না, যদিও আলোর ক্ষেত্রে এই আপাতদৃষ্টিতে যুগপৎ দ্বৈত চরিত্র দুটো মৌলিক ধ্রুপদী ধারণার বিরুদ্ধে যাচ্ছিল, যেটা হল কণাদের চরিত্রে কোনো তরঙ্গধর্মিতা পাওয়া যেতে পারে না, তারা কণাই এবং তরঙ্গের চরিত্রে আবার কণাপ্রবাহের মতো কোনো কিছু থাকতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে, আলোর কোয়ান্টাম চরিত্র(১) সম্পর্কে নিবন্ধটি বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের সঙ্গে Annalen der physik-এর একই সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে সমানভাবেই হয়তো আরও একটু বেশি আপাত-বিরোধী প্রতিপাদ্যে বলা হয়েছিল: প্রতিটি বস্তু যারা পারস্পরিকভাবে গতিশীল, তাদের তুলনায় আলো সমান গতিবেগ নিয়ে ধাবমান।

উভয় তত্ত্বেই আপাতবিরোধী অবস্থাকে(২) পেশ করা হল—কোনো

১ এখানে কোয়ান্টাম বলতে কণা ও তরঙ্গধর্মী, উভয়কে বোঝাচ্ছে।—অনুবাদক।

২ দুটি বস্তু-দেহ দুদিকে দৌড়চ্ছে, কিন্তু একের থেকে অন্যের প্রতি আলোর গতিতে কোনো তারতম্য দেখা যায় না—এটা নিশ্চয়ই আপাত-বিরোধী একটা ব্যাপার।—অনুবাদক।

আপাতবিরোধীভাবে নয়, এরকমের প্রক্রিয়ার ভাসা-ভাসা ঘটনাবলী থেকে উদ্ধৃত চেহারা দেখিয়ে নয়। আমরা এর পরে দেখব যে হেনড্রিক লোরেঞ্জ আলোর গতিবেগের ধ্রুবত্বকে আপাতবিরোধী নয় এই রকমের প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং প্ল্যাংক বিশ্বাস করতেন যে আলো নিছক একটা তরঙ্গায়িত প্রক্রিয়া (অর্থাৎ, তরঙ্গধর্মী—অনুবাদক) এবং তার মধ্যে কণার চরিত্র কিছু নেই। তিনি মনে করতেন যে, আলোর শক্তির বর্ণালীতে যে অবিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয় সেটা আলোর বিকীরণ ও বিশোষণের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যেটা এখনও বোঝা যায় নি। উভয় সমস্যাকে আইনস্টাইন যেভাবে দেখেছেন এবং যথাক্রমে লোরেঞ্জ ও প্ল্যাংক যেভাবে দেখেছেন, তার মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই আইনস্টাইনের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারা যায় কেবলমাত্র তাঁর পদার্থগত ধারণার বিষয়বস্তুর মধ্যেই নয়, পরন্তু পদার্থগত বাস্তবতাতে আপাতবিরোধী যা রয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য বোধশক্তি দেখে; অথবা এটাকেই অন্যভাবে বলা যায় আপাতবিরোধী সিদ্ধান্তগুলি 'স্বয়ং প্রতিভাত' অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও 'স্বয়ংপ্রতিভাত' যুক্তিসম্মত নির্মাণকার্যের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তবুও ঐ আপাত-বিরোধী সিদ্ধান্তগুলির নির্ভরযোগ্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতার উপলব্ধি তাঁর মধ্যে থেকেই যায়। পরস্পর-বিরোধী আলোর তরঙ্গধর্মী ও কণাপ্রবাহের চরিত্র-বিশিষ্ট ফোটন তত্ত্ব বেশ কয়েক বছর স্বীকৃতি পায় নি। বস্তুত, কয়েকজন নেতৃস্থানীয় জার্মান পদার্থবিদ, যার মধ্যে প্ল্যাংক ছিলেন, প্রাশিয়ান বিজ্ঞান আকাদেমিকে ১৯১২ সালে লেখা এক চিঠিতে ঐ আকাদেমিতে আইনস্টাইনের সভ্যপদ দেবার জন্যে সুপারিশ করলেন, তাতে কিন্তু তাঁরা সত্যিসত্যি আইনস্টাইনের আলোক-কোয়ান্টাম প্রকল্প সম্পর্কে একটু মার্জনা চেয়ে নিলেন।

"তাঁকে খুব কঠোরভাবে বিচার করা ঠিক হবে না," লিখলেন তাঁরা, "যদি যুক্তিসম্মত কার্যকারণ সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে মাঝে মাঝে তিনি লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন, যেমন আলোর কোয়াণ্টা সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের ব্যাপারটা। কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে-শাখা 'একেবারে সঠিকভাবে দেখে থাকে, সেখানেও সত্যিকারের নতুন কিছু করতে হলে খানিকটা ঝুঁকি নিতেই হবে।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আলোর গতিবেগের নিত্যতা

> দুজন পদার্থবিদকে ধরা যাক। প্রত্যেকেরই কাছে তাঁর কাজের জন্যে পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা চালাবার মতো যত রকম সম্ভব যন্ত্রপাতি রয়েছে। মনে করা যাক, একটা গবেষণাগার যেন খোলা মাঠের কোথাও রয়েছে এবং অন্যটা রয়েছে সমান গতিতে ধাবমান একটা রেলের কামরার মধ্যে। আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্রে বলা হয় যে, দুই পদার্থবিদই তাঁদের সব যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রকৃতির নিয়মগুলিকে বিচার করে দেখছেন—একজন দেখছেন তাঁর স্থির গবেষণাগারে বসে, অন্যজন রয়েছেন গতিশীল গবেষণাগারে—তাঁরা দুজনেই প্রকৃতির কয়েকটি নিয়ম আবিষ্কার করবেন, তবে কি-না ট্রেনটা যদি ধাক্কা মেরে মেরে না চলে এবং দৌড়য় সমান গতিতে। আরও সাধারণ ভাবে আমরা বলতে পারি : আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্র অনুযায়ী প্রকৃতির নিয়মাবলী নির্দেশক কাঠামোর (reference system) সাহায্যেই তাদের গতি কিভাবে রূপান্তরিত চেহারা নিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে না।
>
> আইনস্টাইন

আরাও শহরে ষোল বছর বয়সে ছাত্র অবস্থাতেই এবং পরে জুরিখে আইনস্টাইন বিভিন্ন নির্দেশক কাঠামোর পারস্পরিকভাবে গতিশীল

অবস্থাতে আলোর গতিবেগ নিয়ে আলোচনা করেছেন ; এটা আপেক্ষিক তত্ত্ব রূপায়ণের দশ বছর পূর্বের ঘটনা। তাঁর মনশ্চক্ষুতে তিনি গতিশীল নির্দেশক কাঠামোগুলিকে দেখেছেন বিভিন্ন বস্তু-দেহ হিসেবে, যাদের মাপবার জন্যে দণ্ড ও ঘড়ি লাগানো রয়েছে, যার সাহায্যে যে কোনো মুহূর্তে তাদের অবস্থান ও গতিবেগ নির্ধারণ করা যায়। একটি নির্দেশক কাঠামো যেটা বাস্তব পদার্থের চেহারা নেয়, অর্থাৎ যার কোনো বিন্দুতে উৎপত্তি হচ্ছে এবং তার সঙ্গে অসীম(১) অবধি স্থানাঙ্ক যুক্ত রয়েছে এবং রয়েছে অনেকগুলি অনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের দণ্ড এবং একটা বিশেষ মুহূর্তে একটি বস্তু, যেটা যেখানেই থাকুক না কেন, সেটা অনেকগুলি মাপবার দণ্ডের সঙ্গে পরস্পরকে ছেদ করে খাপ খেয়ে যায় ; অর্থাৎ বলতে হয় তার বিশিষ্ট স্থানাঙ্ক রয়েছে। ঐ 'বিশেষ মুহূর্ত'-টি অবশ্য দেশ-এর (space) প্রতিটি দিক্-পরিবর্তনকারী (orientated) বিন্দুর ক্ষেত্রে একই এবং প্রতিটি বিন্দুতে যে ঘড়িগুলি রাখা থাকবে তাদের পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে (সময়ের তারতম্য হচ্ছে, কি-না—অনুবাদক) দেখা যাবে। বিভ্রান্তি যাতে না ঘটে তার জন্যে একজন মানুষ একটা নির্দিষ্ট নির্দেশক কাঠামোতে গতিশীল হবার সময়ে তাকে অন্য কাঠামোর কথা ভুলে যেতে হবে, তার একমাত্র কাজ হবে তার নিজস্ব নির্দেশক কাঠামোতে বস্তু-দেহ মাপবার যে দণ্ডগুলি আছে তার সঙ্গে অন্য বস্তু-দেহগুলির অবস্থান মেপে বার করা।

আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রায় প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাতেই এই 'দর্শক'-এর সন্ধান পাওয়া যাবে, যদিও স্থানাঙ্ক এবং মাপবার দণ্ডগুলির মতোই তাকেও (অর্থাৎ, ঐ 'দর্শক'কেও—অনুবাদক) গতিশীল বস্তুদেহগুলির সঙ্গে একেবারে যুক্ত বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, যেখানে নির্দেশক কাঠামোর তুলনায় বস্তু-দেহটি স্থির রয়েছে। 'দর্শক'কে আমদানি করে আপেক্ষিক তত্ত্বের বিষয়মুখী চরিত্র থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটছে না, যেমন যখন বলা হয় যে, 'পৃথিবী থেকে সূর্য অবধি একটা কাল্পনিক দড়িকে টেনে বাঁধা হচ্ছে…' তখন খ-গোলের দুটি বস্তুর মধ্যে যে নির্দিষ্ট দূরত্ব রয়েছে, সেটার বিষয়মুখী বাস্তবতাটা এই আসল

---

১ infinity—এখানে 'অসীম' বলতে অংকের হিসাবে বুঝতে হবে, অর্থাৎ আপেক্ষিকভাবে। যেমন আমরা বলে থাকি, দুটি সমান্তরাল সরল রেখা একই তল-এ কখনও পরস্পরকে ছেদ করবে না, যদি-না তাদের 'অসীম' অবধি বিস্তৃত করা যায়।—অনুবাদক।

বা কাল্পনিক মাপবার প্রণালীর দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে না। এই ধোঁয়াটে (বা বায়বীয়) 'দর্শক'কে মনে করা যেতে পারে রেলের কামরাতে অথবা জাহাজের কেবিনের একজন যাত্রী (ধ্রুপদী আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গ্যালিলিও যে-উদাহরণ ব্যবহার করেছিলেন), যার জানলা বা পোর্টহোলের সামনে পর্দা দিয়ে রাখা হয়েছে।

মনে করা যাক, সমুদ্রের ঢেউগুলি যে গতিবেগে নিয়ে চলছে, সেই একই গতিবেগ নিয়ে চলছে সমুদ্রে একটি জাহাজ। জাহাজের ডেকে একজন দর্শক, অর্থাৎ, এমন একজন মানুষ যে জাহাজের গতির সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে অন্য গতিবেগ মাপতে পারে, তার কাছে মনে হবে ঢেউগুলির যেন কোনো গতি নেই। উপরের আকাশ ছাড়া তার দেখবার আর কোনো নির্দেশক কাঠামো না থাকাতে(১) দর্শক একমাত্র নিশ্চল জলের বিস্তৃতিই দেখবে। ঢেউয়ের যে গতি আছে তার কোনো অর্থই তার কাছে নেই, কারণ জাহাজের গতির সঙ্গে তুলনায় (বা আপেক্ষিকভাবে) ঢেউগুলি মোটেই নড়ছে না (বলে মনে হবে)। মনের 'পরে এই বিষয়ীমুখী ছাপগুলি কিন্তু এই বিষয়মুখী তথ্যকেই প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, ঢেউগুলি স্থির একটা নির্দেশক কাঠামোর পটভূমিতে, যাতে জাহাজটা ঢেউয়ের সঙ্গে প্রবহমান হলেও স্থিতিশীল (এখানে কাঠামোটা, অর্থাৎ জাহাজ এবং ঢেউ নিয়ে পুরো ব্যবস্থাটা)।

যে সমস্যাটা আইনস্টাইনের কাছে যথেষ্ট ঔৎসুক্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটা হচ্ছে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গমালার ক্ষেত্রেও কি ব্যাপারটা একই হবে, বিশেষ করে আলোর(২) ক্ষেত্রে। পৃথিবীর গা দিয়ে আলো প্রতি সেকেণ্ডে মোটামুটিভাবে ৩ লক্ষ কিলোমিটার গতিতে দৌড়য়। যদি জাহাজটা ঐ একই গতি নিয়ে দৌড়য়, তাহলে জাহাজের ডেকে যে দর্শক রয়েছে তার কাছে আলোর গতিবেগ হবে শূন্য। সেক্ষেত্রে ঐ জাহাজের উপরে দৃশ্যমান সব কিছুর একটা আমূল পরিবর্তন ঘটবে ; যেমন, জাহাজের

১ উপরের অতো বড়ো আকাশটা নিশ্চয়ই নিশ্চল বলে মনে হবে।—অনুবাদক।

২ দৃশ্য আলো হল তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালী-বিন্যাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। দৃশ্য আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যটুকুই মাত্র আমরা চোখে দেখতে পাই রামধনুর সাতটা রংয়ের আলো রূপে। কিন্তু তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালী-বিন্যাসের বাকিটা, যেমন অতি-বেগনী রশ্মি বা লাল-উজানী আলো আমাদের কাছে অদৃশ্য।—অনুবাদক।

সম্মুখভাগে যদি একটা আলোর রেখা দেখা যায়, সেটা কিন্তু জাহাজের সামনের কোনো পর্দাকে আলোকিত করবে না।(১) সমগ্র তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রটা হয়ে দাঁড়াবে জাহাজকে ঘিরে যেন একটা নিথর সমুদ্র: দেশ-ভেদে তার চরিত্রের বদল হবে, যেখানে ঢেউয়ের উপর (বা উঁচু) ভাগের পরে থাকবে নীচু, কিন্তু সময়ের সঙ্গে তারা বদলায় না।(২) এই ধরনের দৃশ্যমান ঘটনাবলীর প্রকারভেদ দর্শককে সমগ্র কাঠামোটির গতিবেগকে একেবারে পরম বা অনপেক্ষভাবে নজর করে দেখতে সাহায্য করবে: ঠিকমতো দেখবার যন্ত্র থাকলে দর্শক একটা গতিশীল ও স্থিতিশীল জাহাজের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারবে। এটা কিন্তু ম্যাক্‌সওয়েলের তত্ত্বের পরিপন্থী, যাতে বলা হচ্ছে যে, আলো হচ্ছে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের গতি থেকে উদ্ভূত। একটা গতিশীল কাঠামোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলি কী ঘটে তাতেই নিবদ্ধ করে সমতাযুক্ত (বা একরূপীয়) সরলরেখা ধরে যে-গতি তাকে হিসাবের মধ্যে আনা সম্ভব বলে আমাদের যে স্বভাবসিদ্ধ আস্থা আছে, এটা তারও পরিপন্থী।

ষোল বছর বয়সেই যে আপাতবিরোধী সত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন আইনস্টাইন, তা তিনি লিখেছেন: "আমি যদি গতিবেগ (বায়ুশূন্য অবস্থাতে আলোর গতিবেগ) নিয়ে ধাবমান একটা আলোর রেখার পেছনে যাই, তাহলে আমি দেখব যে, এই ধরনের আলোর রশ্মি যেন দেশগত পটভূমিতে দোল খাচ্ছে (যেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো) তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রে, যেটি স্থির অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই হোক, আর ম্যাকসওয়েলের সমীকরণের দ্বারাই হোক, সে ধরনের কোনো কিছু হতে পারে না। গোড়া থেকেই আমার অনুভূতিগত জ্ঞানের বলে পরিষ্কার হয়েছে যে, ঐ ধরনের দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সব কিছুই একই নিয়মের দ্বারা চালিত হবে, যে-দর্শক পৃথিবীর গতির তুলনায় আপেক্ষিকভাবে স্থির রয়েছে। কারণ তা না হলে প্রথম দর্শক কী করে জানবে, (অর্থাৎ, যার সাহায্যে সে নির্ধারণ

১ কারণ আলো ও জাহাজ একই গতিবেগ নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে।—অনুবাদক।

২ অর্থাৎ জাহাজের গতি ও আলোর গতিবেগ একই হওয়াতে জাহাজের চতুর্দিকে সমুদ্রের ঢেউগুলি উঁচুনীচু থাকছে ঠিকই কিন্তু তারা যেন গতিশীল নয় বা আছড়ে পড়ছে বলে মনে হবে না। তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটবে।—অনুবাদক।

করতে পারবে) যে সে নিজেই একজন সমান দ্রুত মাত্রার গতিতে-অবস্থান করছে।"(১)

মূলত এই আপাতবিরোধিতা হচ্ছে, বলবিদ্যার দুটি ধ্রুপদী সূত্রের মধ্যে সংঘাত—যেটাকে তড়িৎ-চুম্বকীয় ঘটনাবলীর এলাকার মধ্যে আনা হয়েছে। একটি হচ্ছে, **বিভিন্ন গতিবেগ যোগ করার ধ্রুপদী নিয়ম।** একজন মানুষ যে রেলের কামরাগুলির করিডর দিয়ে ঘণ্টায় ৫ কিলোমিটার বেগে হেঁটে যাচ্ছে ট্রেনেরই গতির অনুকূলে, যেখানে ট্রেনটি দৌড়চ্ছে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে, তাহলে পৃথিবীর তুলনায় মানুষটির গতিবেগ নিশ্চয়ই ঘণ্টায় ৫৫ কিলোমিটার আর ট্রেনের গতির উলটো দিকে গেলে নিশ্চয়ই মানুষটির গতিবেগ পৃথিবীর তুলনায় প্রতি ঘণ্টায় ৪৫ কিলোমিটার হবে। যদি মানুষটা পৃথিবীর তুলনায় প্রতি ঘণ্টায় ৫৫ কিলোমিটার যায়, যেখানে ট্রেনটা দৌড়চ্ছে প্রতি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার, তাহলে আমরা জানি যে, সে কামরাগুলির মধ্যের করিডর দিয়ে ঘণ্টায় ৫৫—৫০ = ৫ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে। যদি তার তুলনায় সমুদ্রের ঢেউগুলি প্রতি ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগে প্রবহমান হয় এবং জাহাজটিও যদি ঢেউয়েরই অনুকূলে ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগে যায়, তাহলে জাহাজের তুলনায় (বা আপেক্ষিকভাবে) ঢেউয়ের গতি হল ৩০—৩০ = ০ (শূন্য) এবং জাহাজের গতির হিসাবে ঢেউগুলি গতিহীন। কিন্তু তড়িৎ-চুম্বকীয় ঢেউগুলির ক্ষেত্রে কী ঘটে ? আপাতদৃষ্টিতে গতিবেগের এই যে হিসাব সেটা কি খাটে ?

গতিবেগ যোগ করার যে ধ্রুপদী নিয়ম তা এক নির্দেশক কাঠামো থেকে অন্য নির্দেশক কাঠামোতে স্থানাঙ্কের রূপান্তরণের নিয়ম, যাতে একজন আগের জনের তুলনায় ত্বরণবেগ না নিয়েই চলছে। এই ধরনের রূপান্তরণে আমরা একই সঙ্গে দুটি ঘটনা ঘটবার (simultaneity) ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকি, যাতে দুটি ঘটনাকে তখনই একসঙ্গে ঘটছে বলে ধরা হবে। তাতে সেটাকে একই স্থানাঙ্কের কাঠামোর অথবা অন্য কোনো জাড্যের কাঠামোর মধ্যে ধরা হোক না কেন, সেই রূপান্তরণকে আমরা **গ্যালিলিওর রূপান্তরণ** বলে অভিহিত করব। গ্যালিলিও ধরনের রূপান্তরণে দুটি বিন্দুর মধ্যে দেশগত দূরত্ব—একই জাড্যের

১ **Philosopher-Scientist, p. 53.**

নির্দেশক কাঠামো বলে ধরা হচ্ছে, তাদের স্থানাঙ্ক সবসময়েই অন্য কোনো জাড্যের কাঠামোতে একই থাকবে।

দ্বিতীয় সূত্রটি হল আপেক্ষিকতার সূত্র। একটা জাহাজের উপরে সরল রেখা ধরে সমান গতিতে যে চলছে(১) তার গতিবেগ কোনো জাড্যজনিত, যান্ত্রিক প্রভাব থেকে মাপা যাবে না। এই সূত্রটি কি দৃশ্যমান ঘটনাবলীতেও প্রযোজ্য? চোখে যা দেখা যাচ্ছে তা থেকে কি একটা কাঠামোর অনপেক্ষ গতিবেগ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, অথবা একই ব্যাপারকে অন্যভাবে বলা যায়, তা থেকে যে তড়িৎ-চুম্বকীয় ঘটনাবলী ঘটছে তা কি বোঝা যায়? অনুভূতি বা স্বভাবলব্ধ জ্ঞান (আপেক্ষিকতার ধ্রুপদী সূত্রের সঙ্গে যার মিল রয়েছে) থেকে আমরা জানি যে অনপেক্ষ গতিকে নজর করে দেখবার আর অন্য কোনো উপায় নেই। কিন্তু জাড্যের সকল কাঠামোর সঙ্গে বা পরিপ্রেক্ষিতে আলো যদি একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ নিয়ে প্রবহমান হয়, তাহলে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থাতে যেতে এই গতিবেগ নিশ্চয়ই বদলাবে, যেটা গতিবেগ সৃষ্টির ধ্রুপদী নিয়ম থেকে আমরা পেতে পারি। গণিতের দিক থেকে বলতে গেলে এর অর্থ হল আলোর গতিবেগ গ্যালিলিও-র রূপান্তরণের সঙ্গে যে অপরিবর্তনীয় হতে পারে না, তা নয়। কিন্তু এটা আপেক্ষিক সূত্রকে লঙ্ঘন করে অথবা যেন, দৃশ্যমান ঘটনাতে এই সূত্রের প্রয়োগ করা যায় না। অতএব ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার দুটি আপাতদৃশ্য স্বতঃসিদ্ধ ধারণার মধ্যে যে-যোগসূত্র তাকে তড়িৎ-চুম্বকীয় গতিবিজ্ঞান নষ্ট করে দিল: সেটা হল গতিবেগ যোগ করার নিয়ম এবং আপেক্ষিকতার সূত্র। তাছাড়া তড়িৎ-চুম্বকীয় গতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের অসঙ্গতি প্রমাণিত হয়ে গেল। জগৎপ্রপঞ্চের সুসঙ্গত চেহারাটা তাহলে আপাতবিরোধী 'পাগলের মতন' এবং সাধারণ চলিত তথা স্বয়ং-প্রতিভাত প্রতিপাদ্যের বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যে কোন্‌টিকে বরবাদ করতে হবে, সেটা পরীক্ষার দ্বারা ঠিক করার ব্যাপার।

১৮৮২ সালে আমেরিকান পদার্থবিদ অ্যালবার্ট মাইকেলসন এ সম্পর্কে চূড়ান্ত পরীক্ষা করেন। ইনটারফেরোমিটার নাম দিয়ে তিনি একটা যন্ত্র তৈরি করেন, যাতে আলোর গতিবেগের সামান্যতম তারতম্যও ধরা পড়বে। এই যন্ত্রটি হল দুটো টিউব, তার দৈর্ঘ্য সমান, যেখান দিয়ে আলোর রশ্মিকে চালনা করা

১ অর্থাৎ জাহাজের ও সেই মানুষের গতি একই—অনুবাদক।

হচ্ছে। মাইকেলসন একটা টিউবকে পৃথিবীর গতিবেগের দিকে মুখ করে রেখে দিলেন এবং অন্যটাকে রাখলেন, তার মুখকে আগেকার টিউবটার সঙ্গে লম্ব ভাবে, ৯০ ডিগ্রি কোণে। ইথারের জগতের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর গতিবেগের অনুকূলে আলোর রশ্মির দ্রুতি নিশ্চয়ই পৃথিবীর গতিবেগের প্রতিকূলে আলোর রশ্মির যে গতিবেগ দাঁড়াবে তার অপেক্ষা অধিক হবে।(১) টিউবের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি আলো কত দ্রুতি নিয়ে প্রবহমান, সেটা নিশ্চয়ই মাপা যায় না। যেটা পরখ করে দেখা সম্ভব সেটা হল—একটা আলোর রশ্মি যখন একবার এদিকে আবার উলটো দিকে যাচ্ছে তখন তাদের মধ্যে সময়ের তারতম্য কতটুকু। পৃথিবীর গতির অনুকূলে যে আলোর রশ্মি প্রবহমান, সেটা গতিহীন টিউবের মধ্যে আলোর রশ্মির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে যে সময় লাগে তার থেকে একটু বেশি লাগবে। আবার উলটো পথে নিশ্চয়ই সময় কম লাগবে কিন্তু একেবারে গোড়াকার সময় কমে যাবার জন্যে যতটা কম হবার কথা তা হয় না। ফলে লম্বভাবে যে টিউবটি রয়েছে তাতে যন্ত্রের যেখান থেকে চোখ দিয়ে দেখা হচ্ছে (টিউবের এক প্রান্তে—অনুবাদক) তাতে আলোর রশ্মির যাতায়াতের যে সময় লাগছে, সেটা সোজাভাবে রাখা আছে যে টিউব তার চেয়ে কিছু বেশি। এই তফাতটা খুঁজে বার করা সম্ভব, যদি **পৃথিবীর পটভূমিতে পৃথিবীর গতি আলোর গতিবেগের 'পরে প্রভাব বিস্তার করে।**

প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার গতিতে পৃথিবী পাক খাচ্ছে; আলোর গতিবেগের 'পরে এই গতিবেগের (পৃথিবীর) প্রভাব পড়লে মাইকেলসন-এর ইনটারফেরোমিটার যন্ত্রে সেটা ধরা পড়ার পক্ষে যথেষ্ট দ্রুত। কিন্তু পরীক্ষাতে ফল পাওয়া গেল নেতিবাচক; তা থেকে অর্থ দাঁড়াল যে, হিসাবের মাধ্যমে পৃথিবীর গতিবেগের থেকে আলোর গতিবেগ স্বতন্ত্র বা দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য ধরে নেওয়া যেতে পারত যে, ইনটারফেরোমিটার ইথারকে সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে; তাহলে অবশ্য হিসাবের পটভূমিতে ইনটারফেরো-মিটার স্থির রয়েছে বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু অন্য দৃষ্টিগ্রাহ্য পরীক্ষার দ্বারা এই অনুমানকে বাতিল করতে হল।

১ যেমন স্রোতের অনুকূলে যে নৌকা ভেসে যায়, সেটা স্রোতের গতিবেগের সঙ্গে নৌকার গতিবেগ যোগ হয়ে নৌকার দ্রুতি বেড়ে যায়।—অনুবাদক।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে লর্ড কেলভিন মন্তব্য করেছিলেন যে বিজ্ঞান তার এমন একটা শীর্ষদেশে শেষ অবধি পৌঁছে গেছে যেখানে সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব : বাকি যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু হল খুঁটিনাটি কিছু কিছু কাজ করা। তবুও তিনি দুটো সমস্যার কথা বলেছিলেন যার সমাধান হয় নি। একটা ছিল বিকীরণ তত্ত্বের ফলে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল সেটা ম্যাকস প্ল্যাংককে ১৯০০ সালে তাঁর কোয়াণ্টার ধারণাকে রূপায়িত করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়টা ছিল, মাইকেলসনের পরীক্ষা। এই দুটো বাদ দিলে কেলভিনের বিশ্বাস ছিল, বিজ্ঞানের ভয় পাবার আর কিছু নেই এবং তার তাত্ত্বিক ভিত্তির কোনো সংশোধন হবার বিপদ থেকে বিজ্ঞান নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারে। সাধারণত যা হয়ে থাকে, আবহাওয়া বিভাগ যখন ঘোষণা করল যে আবহাওয়া ভালো যাবে, ঠিক তখনই কিনা বজ্রপাত হল। আর সেটা হল ঠিক সেই দুটো মেঘ থেকেই যার কথা কেলভিন বলেছিলেন। মাইকেলসনের ও অন্যান্য ঐ ধরনের পরীক্ষার দ্বারা যেটা জগৎপ্রপঞ্চ সম্পর্কে এক সময়ে অতি সাধারণ স্বতঃপ্রতিভাত ধারণা বলে চালু ছিল, সেটা বরবাদ হয়ে গেল। এবং তারপর ১৯০৫ সালে বার্ন পেটেণ্ট অফিসে একজন ঘোষণা করলেন যে কোনো বস্তু যা সম-আপেক্ষিক গতি নিয়ে দৌড়চ্ছে, তার তুলনায় আলো সর্বদিকে সমান গতিবেগ নিয়ে ধাবমান হয় : তা সে একেবারে সামনা-সামনি, পাশাপাশি, পেছন-পেছন যেভাবেই যাক না কেন।

নিম্নলিখিত উদাহরণের দ্বারা এই উক্তির আপাতবিরোধী চরিত্রটা বুঝতে পারা যায়। দুজন সাঁতারু একটা দ্রুতগামী জাহাজের ডেক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজেরই গতি নিয়ে একজন জাহাজের সামনের দিকে, অন্যজন জাহাজের পেছন দিকে সাঁতরাতে আরম্ভ করল। বেশ পরিষ্কার, যে-সাঁতারু জাহাজের সম্মুখ দিকে যাচ্ছে, সে অন্য সাঁতারু—যাঁকে জোর করে সাঁতরে জাহাজটার পেছন দিকে পৌঁছতে হচ্ছে, তার অপেক্ষা অনেক আগে সামনের দিকে পৌঁছে যাবে। অথচ নতুন মত যা দেওয়া হল সেই অনুসারে এবং যা সাধারণভাবে চোখে পড়ে তার বিপরীতে দুই সাঁতারুর ঐ দূরত্ব পার হতে একই সময় লাগবে অর্থাৎ এই জাহাজের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে তাদের দ্রুতি (speed) একই থাকছে। দ্রুতির তারতম্য ঘটলে জাহাজের গতিটাকে বোঝবার একটা নির্দেশ পাওয়া যেত। এই ধরনের তফাৎ না থাকাতে তীরের থেকে দূরত্ব কতটুকু বদলাচ্ছে অথবা ঐ জাহাজের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে অন্য

জাহাজ কিভাবে নড়ছে একমাত্র তার সাহায্যে ঐ জাহাজের গতিকে বিচার করা যাবে। আলোর চরিত্র এই রকমই। একটা বস্তুর দৃশ্যমান ঘটনাবলী থেকে তার অন্তর্নিহিত গতির কোনো হদিশ পাওয়া যায় না, তাদের থেকে অনপেক্ষ গতির চেহারা কী, তা ধরা যাবে না। আপেক্ষিক গতিযুক্ত বিভিন্ন বস্তুর তুলনায় আলো একই দ্রুতি নিয়ে দৌড়য়। একটু আগে আমরা কল্পিত মাপবার দণ্ড যুক্ত কাঠামোর কথা বলেছি যা দিয়ে গতিবেগ, এমন কি আলোর গতিবেগও মাপা যায়। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে আগে থেকে ধরে নেওয়া হচ্ছে; তার প্রধান বক্তব্যটি এইভাবে বলা হচ্ছে: "ত্বরণবেগ ছাড়া আপেক্ষিকভাবে প্রতিটি নির্দেশক কাঠামোর আলোর গতি সবদিকে একই হবে।"

আমাদের জাহাজে আমরা একটা নির্দেশক কাঠামো লাগিয়ে দিতে পারি (বা ধরে নিতে পারি—অনুবাদক) এবং মনে করতে পারি যে, ডেকে প্রতিটি জিনিসই স্থির হয়ে রয়েছে; আমরা তাকে তীরের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি এবং জাহাজে অবস্থিত জিনিসগুলি কি ভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের গতিকে রেকর্ড করতে পারি; আমরা তাকে পৃথিবীর সঙ্গেও যুক্ত করতে পারি, যুক্ত করতে পারি সূর্য বা সিরিয়াস নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা মহাবিশ্বে বস্তুগুলি কিভাবে চলমান তার বিভিন্ন ছবি পাব। তবে একটা নির্দেশক কাঠামো থেকে অন্যতে চলে যেতে হলে বস্তু-দেহগুলির অন্তর্নিহিত ঘটনাবলীতে কোনোই পরিবর্তন হয় না। একটা বস্তু-দেহকে একটা কাঠামাতে আবদ্ধ করা হল এবং অন্যটাতে সে গতিশীল রইল কিন্তু কোনটা 'আবদ্ধ করা হল' আর কোনটা 'গতিশীল হল'—এটা নিশ্চয়ই আপেক্ষিক: একমাত্র একটা নির্দেশক কাঠামোতেই তাদের কোনো অর্থ পাওয়া যেতে পারে। একটা বস্তু-দেহের গতি অন্য বস্তু-দেহগুলির সঙ্গে কতোটুকু দূরত্বে আছে এবং তাতে কী পরিবর্তন ঘটছে একমাত্র এর দ্বারাই তাকে প্রকাশ করা যেতে পারে; স্থির রয়েছে বলতে আমরা বলতে চাই একমাত্র তাদের দূরত্বের মধ্যে কোনো রদবদল হয় নি, সেটা অপরিবর্তনীয় রয়েছে, এইভাবে। তাদের মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত তফাৎ হচ্ছে না, তাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াতে কোনো প্রভেদ ঘটছে না এবং আলোর গতিবেগের কোনো হেরফের হচ্ছে না।

এটার অর্থ দাঁড়ায়, কোনো বিশেষ সুবিধাজনক আপেক্ষিক নির্দেশক কাঠামোর ধারণার সমাপ্তি, একটা পরম বা অনপেক্ষ কাঠামোর অস্তিত্ব

রয়েছে যাতে গতি ও গতিবেগের 'আসল সত্য মূল্য' পাওয়া যাবে, যার তুলনায় অন্য নির্দেশক কাঠামোতে কেবলমাত্র আপাতদৃষ্টিতে গতি ও স্থিতাবস্থার প্রতি-ফলন ঘটে এই বিশ্বাসকে ছাড়তে হবে। এই সাফল্যের দ্বারা কোপারনিকাসের বিপ্লবের নিষ্পত্তি সূচিত হল, যাতে পৃথিবীকে তার চরম নিশ্চল অবস্থা এবং পৃথিবী যে 'স্থির রয়েছে' এই বিশেষ সুবিধাভোগী অবস্থা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হল। কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও যখন দেখিয়ে দিলেন যে, পৃথিবী থেকে বস্তু-দেহগুলির গতি এবং পৃথিবীর সঙ্গে সংলগ্ন নির্দেশক কাঠামোর যে পরিমাপ করা হয়, সেটা পরম বা অনপেক্ষ চরিত্রের নয়, তখন আপেক্ষিক তত্ত্বের ধারণার আরও অগ্রগতিতে মানুষ আর অবাক হল না। কিন্তু পরম বা অনপেক্ষ গতির ধারণার পক্ষে যখন শেষ যুক্তিটুকুও বরবাদ হল, তখন যতোদূর ভাবা যেতে পারে সেই রকমের আপাতবিরোধী চিত্রকে গ্রহণ করার প্রয়োজন ঘটল : যেটা হল, পরস্পরের সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে গতিশীল এমন অনেকগুলি কাঠামোতে আলো একই দ্রুতি নিয়ে প্রবহমান।

জগৎপ্রপঞ্চের এই নতুন আপাতবিরোধী চেহারাকে গ্রহণ করতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুন পালাবদল ঘটল। আইনস্টাইনের আপাত-বিরোধী উক্তিগুলিতেও এতটা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না যদি না সেগুলি যুক্তি ও ইতিহাসের দিক থেকে একদিকে আদর্শের এবং অন্যদিকে বিজ্ঞানে পূর্বে যে আলোড়ন হয়েছিল, (যাতে নরকেন্দ্রিক পরম মনোভাবকে বরবাদ করা হয়)—এই উভয়ের সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে যেত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আলোর গতিবেগের নিত্যতার সূত্র ও ধ্রুপদী পদার্থবিজ্ঞান

আমাদের কোনো বিপ্লবী কাজ এতে নেই; পরন্তু আমরা যা করছি তা হল একটা স্বাভাবিক ধারাকে চালিয়ে যাওয়া, যা কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছে।

আইনস্টাইন

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, জাহাজের ডেকে যে মানুষ চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে, সে ডেকের অন্য পাশ দিয়ে যাওয়া জাহাজ অথবা তীরের তুলনায় বিভিন্ন গতিবেগ নিয়ে চলছে। তেমনি আগে এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, আলোও বিভিন্ন কাঠামোতে বিভিন্ন গতিবেগ নিয়ে পরস্পরের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে চলে। বিজ্ঞানকে নরকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করার পূর্বে, যা কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও শুরু করে গিয়েছিলেন, এই ধারণাকে ভেঙ্গে দেওয়ার দরকার ছিল। পরম বা অনপেক্ষ গতির বিরুদ্ধে যে নতুন আক্রমণ এল, তা আগেকার সূর্যকেন্দ্রিক দর্শন থেকেও অনেক বেশি আপাত-বিরোধী ধারণাগুলির সৃষ্টি করল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে 'স্থির' পৃথিবীকে যখন গতিশীল বলে ধরে নেওয়া হল তখন গতির অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা ছিল আগের মতোই। এর তুলনায় কিন্তু অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি, যাতে একটা ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রির বেশি বা কম হয় এবং পরস্পরকে ছেদ করছে অথবা একই কেন্দ্র থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া যে সরল রেখা লম্বভাবে রয়েছে—তার সমস্যা অনেক বেশি আপাতবিরোধী জটিলতার সৃষ্টি করল। কিন্তু সেখানে জ্যামিতির উপপাদ্যগুলি অনেক

সময়ে মুক্ত বুদ্ধির পরিচায়ক হিসাবে দেখা যেতে পারে এবং দেখা হয়ে থাকে, যাকে ইচ্ছামতো কোনো ধরে-নেওয়া অনুমান থেকে এবং যুক্তিসম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত টানা হয়। একদিক থেকে আইনস্টাইনের তত্ত্বের 'পাগলামি' অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির 'পাগলামি'-র মতোই একই পর্যায়ের। এমন কি আজও বিভিন্ন কাঠামোতে যারা পরস্পরের সঙ্গে আপেক্ষিক গতি নিয়ে চলছে তাদের একই দ্রুতি রয়েছে, এটা ভেবে নেওয়া বেশ শক্ত। এক সময়ে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সম্পর্কগুলিকে ভেবে নেওয়াটা ঠিক একই ধরনের মুস্কিল ছিল। কিন্তু এদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। একটা ঘোষণা, তা সে যতোই পাগলাটে হোক না কেন, তাতে আশ্চর্য হবার বা ঘাবড়ে যাবার কোনো কারণ নেই। যেটা বাস্তব কিন্তু 'পাগলাটে', যেটা সাধারণত যা ঘটে এবং তত্ত্বের দিক থেকে তাকে যে ভাবে বোঝানো সম্ভব, তা থেকে যখন পৃথক, তখনই অবাক হবার কারণ ঘটে। আপেক্ষিক তত্ত্ব যে-প্রতিপাদ্যের 'পরে গড়ে উঠেছে তাতে ইচ্ছামতো কোনো অনুমান নেই। বরঞ্চ সেটা অভিজ্ঞতার কঠিন ভিত্তির 'পরে দাঁড়িয়ে আছে। পদার্থগত বস্তুগুলির ব্যবহারকে (চলাফেরাকে) লক্ষ্য করার জন্যে যে প্রমাণ থাকে, তার সঙ্গে গতির এবং আগে-থেকে নির্ধারিত যুক্তিসম্মত অন্তর্নিহিত জ্যামিতিগত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত সত্যের সংঘাত লাগে। আইনস্টাইন এই দুই ধরনের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত সত্যকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন: একটি হল পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতালব্ধ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত সত্য এবং দ্বিতীয়টি হল জ্যামিতিগত স্বতঃসিদ্ধ-প্রতিপাদ্যগুলির স্বয়ংপ্রতিভাত সত্য।

আপাতবিরোধী চেহারা সত্ত্বেও আপেক্ষিক তত্ত্ব আমাদের কাছে যথার্থ সৃষ্টিমূলক, একটা প্রাসাদের শীর্ষদেশ বলে মনে হয়—যার ভিত্তি গড়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রূপদী যে জগৎপ্রপঞ্চের চেহারা বিকশিত হয়েছিল, সেটা কেবল স্বয়ংপ্রতিভাত নিয়মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না: কোনো বস্তু যখন একটা কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এক রকমের গতিবেগ নিয়ে চলে, তখন তাকে প্রথম যে-কাঠামো, তার তুলনায়, আপেক্ষিকভাবে দ্বিতীয় কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে অন্য গতিবেগ নিয়ে চলতেই হবে। এটা সারা জগৎকে আপেক্ষিক গতি নিয়ে চলমান বিভিন্ন দ্রব্যের সমগ্রতা হিসাবে দেখে।— সারা মহাকাশকে (বা দেশকে) ব্যেপে যে ইথারের ধারণা রয়েছে, তাতে

প্রাথমিক ধ্রুপদী জগতের চিত্রের ছককে ভেঙে দেওয়া হল। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এই ছককে পুনরায় ফিরিয়ে আনল, যদিও গতিবেগ যোগ করার যে 'স্বয়ংপ্রতিভাত' নিয়ম আছে তাকে বরবাদ করে। এদিক থেকে দেখতে গেলে আপেক্ষিক তত্ত্বের কাঠামোটাই হল আপাতবিরোধী: একদিকে রয়েছে এমন একটা গতিবেগের পাগলামির ধারণা যেটা কিনা বিভিন্ন নির্দেশক কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের আপেক্ষিক গতি থাকা সত্ত্বেও অপরিবর্তনীয় থেকে যাচ্ছে, অথচ অন্যদিকে সেখানে পুরানো বহু যুগের জগতের ছবি রয়েছে (সেই ডেমোক্রিটাসের যুগ থেকে) যাতে মহাবিশ্ব গঠিত হয়েছে কেবলমাত্র আপেক্ষিকভাবে গতিশীল বস্তুগুলি দিয়ে।

এর তুলনায় ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা একটা অসমাপ্ত বাড়ির চেহারা বলে আমাদের মনে হয়। বস্তুগুলি শুধুমাত্র নিজেদের তুলনাতেই আপেক্ষিকভাবে চলে না, তারা পরম বা অনপেক্ষ গতি নিয়ে স্থিতিশীল ইথারের মধ্যে দিয়ে চলে যেটা তাদের পরম বা অনপেক্ষ গতিবেগ নির্ধারণ করতে একটা নির্দেশক কাঠামো তৈরি করে। ইথারের মাধ্যমে গতিবেগ আলোর গতিবেগের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। এ থেকে আলোকবিজ্ঞান পরম বা অনপেক্ষ গতি স্থাপন করার ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল, যদিও সরল-রেখা ধরে সমগতিতে চলার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো ব্যাপার হওয়া সম্ভব ছিল না। গতিবেগ যোগ করার ধ্রুপদী সূত্রকে বরবাদ করে আইনস্টাইনের তত্ত্ব আপেক্ষিকতার সূত্রকে সব রকমের সমতাযুক্ত এবং সরল-রেখা ধরে গতিশীল প্রক্রিয়ার উপরে আরোপ করেছেন। কোনো প্রক্রিয়াই, তা সে বলবিদ্যা অথবা আলোকবিজ্ঞান যার নিয়মের দ্বারাই চালিত হোক না, ঐ ধরনের গতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সমগতির কোনো অভ্যন্তরীণ প্রভাব নেই এবং তার একমাত্র অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় পদার্থগত বস্তুগুলির পারস্পরিক অবস্থানের পরিবর্তনের দ্বারা।

এই ধারণাটি আপেক্ষিক তত্ত্বের ধ্রুপদী নীতির খুব কাছাকাছি চলে এল, যেটা আবার তার দিক থেকে আইনস্টাইনের তত্ত্বকে গ্রহণ করার সুবিধা করে দিল এবং আলোকের গতির নিত্যতা সম্পর্কে পাগলামির সূত্র থাকলেও তাতে বিশ্বাস এনে দিল। এই নতুন তত্ত্বটা জগৎপ্রপঞ্চের ধ্রুপদী চিত্রকে স্পষ্টতই এমন একটা সম্পূর্ণতা দিল যে, এটা ঐ চিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার মধ্যেই এসে গেল—যেটা গতিবেগ যোগ করার নিয়ম এবং আপেক্ষিকতার ধ্রুপদী

নীতি, উভয়কেই নিয়ে হয়েছে। সমস্যাটা হচ্ছে, বলবিদ্যাগত ও দৃশ্যগত ঘটনাবলী—এই দুটোই প্রথমত, আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্রের মধ্যে এবং দ্বিতীয়ত, গতিবেগ যোগ করার ধ্রুপদী নিয়মের আওতার মধ্যে আসছে কি না।

দেখা গেল যে, দৃষ্টিগ্রাহ্য ঘটনাবলী আপেক্ষিকতার সূত্রকে মেনে চলে কিন্তু গতিবেগ যোগ করার নিয়মকে নয়। অতএব আপেক্ষিকতার সূত্রকে সম্প্রসারণ করার জন্যে ধ্রুপদী গতিবিজ্ঞানকে সংশোধন করা দরকার যাতে দেশগত ভাবে বস্তুদের গতির ধারণা গৃহীত হয়েছে। শীঘ্রই দেখা গেল, এই ধরনের প্রসার সাধন করলে ধ্রুপদী গতিবিজ্ঞানের অর্থাৎ যে বিজ্ঞানে বল সম্পর্কে এবং সংশ্লিষ্ট ত্বরণবেগ সম্পর্কে কথাবার্তা রয়েছে, তারও সংশোধন দরকার। আপেক্ষিকতার সঙ্গে ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার যোগাযোগটা কেবলমাত্র শেষোক্তের সম্প্রসারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বস্তুদেহ যখন আলোর গতিবেগের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে অতি আস্তে চলে তখন আমরা আলোর গতিবেগকে অনন্তের(১) পর্যায়ে ধরি এবং আমরা পুরানো ধ্রুপদী বলবিদ্যার সম্পর্কতে পৌঁছে যাই, যেটা বাস্তবতার কাছাকাছি একটা বর্ণনা মাত্র। আপেক্ষিক তত্ত্ব একটা তত্ত্বের কাছাকাছি এসে পড়ে যখন একটি গতিশীল বস্তুর গতিবেগের অনুপাতে আলোর গতিবেগ শূন্যের কোঠার কাছাকাছি পৌঁছয় অথবা এটাকেই অন্যভাবে বলা যায়, আলোর গতিবেগ একটা বস্তুর গতিবেগের(২) অনুপাতে অনন্ত হয়ে দাঁড়ায়। দুই তত্ত্বের মধ্যে এই সম্পর্ক, যাতে কোনো মাপ করবার

১ আলোর গতিবেগ যেখানে প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল বা ৩ লক্ষ কিলোমিটার, সেখানে অতি দ্রুতগামী রকেট বা মহাকাশযান প্রতি সেকেণ্ডে ৫ থেকে ৭ মাইলের বেশি চলে না; অতএব তুলনামূলক ভাবে প্রথমোক্তকে অনন্তের পর্যায়ে ধরা হচ্ছে।—অনুবাদক।

২ আইনস্টাইনের সময়-সংকোচনের সূত্রটি হল: $t = \dfrac{t_0}{\sqrt{1-\dfrac{V^2}{C^2}}}$

যেখানে t হল গতিশীল বস্তুর সময়, V বস্তুর গতিবেগ এবং C = আলোর গতিবেগ। তাহলে V যদি C-এর অনুপাতে শূন্য হয়, তাহলে $t = t_0$. অতএব সময়-সংকোচন হচ্ছে না বললেই চলে বা সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।—অনুবাদক।

মাত্রা যখন শূন্য অথবা অনন্ত হয়ে দাঁড়ায়, তখন একটা অন্যে রূপান্তরিত হয়, এটা গণিতশাস্ত্রে পাওয়া যায়। একটা গোলাকার বস্তুর (sphere) উপরিভাগে আঁকা একটা ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রির চেয়ে বেশি : এ সম্পর্কটা অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির। যদি গোলাকার বস্তুর ব্যাসার্ধকে অবাধে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই সম্পর্কগুলি সামঞ্জস্যহীন অপ্রতিসমভাবে ইউক্লিডীয় সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়ায় এবং আমরা বলতে পারব যে, একটি গোলাকার বস্তুর উপরের গাত্রে যদি ব্যাসার্ধকে অনন্ত অবধি বিস্তৃত করা যায়, তাহলে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে পরিণত হবে।

অবশ্যই এ থেকে এটা দাঁড়ায় না যে, প্রতিটি পদার্থগত তত্ত্ব অন্য একটাতে পরিণত হবে, যদি তার কোনো একটা মাপ করবার অংশকে অবাধে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যাতে এই দুই তত্ত্বের মধ্যে কিছুটা একই ধরনের সম্পর্ক ছিল। আণবিক গতির বিজ্ঞানে বিপরীত দিকে পরিবর্তন হওয়ার প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, যখন অণুর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি হয় এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিকে পরিবর্তন না হওয়ার প্রক্রিয়াটা আরও সঠিক হয়ে দাঁড়ায়। স্বল্পসংখ্যক অণুদের নিয়ে যে কাঠামো—তার প্রক্রিয়াটা উলটে দেওয়া যায় এবং বিরাট সংখ্যক অণুদের নিয়ে রাশিবিজ্ঞানে যে কাজ করতে হয়, তাকে উলটে দেওয়া যায় না। এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কটাই তাপবিজ্ঞানের মূল সমস্যা। বিভিন্ন পরিমাপের (স্কেলের) ঘটনাবলীর জন্যে প্রয়োগ করা যায়, (অর্থাৎ তারা বাস্তবতাকে যথেষ্ট সঠিক বর্ণনা দিয়ে থাকে) এমন ধরনের বিভিন্ন তত্ত্ব মাখ ও পোঁয়েকার এর বিভিন্ন স্কেলের ঘটনাবলীর ছককে ভেঙ্গে দেয়। যদি তাপগতিবিজ্ঞানের বৃহৎজাগতিক নিয়মাবলী আণবিক স্কেলে রূপান্তরিত হওয়ার সময় অপ্রত্যাশিত ও 'বিস্ময়কর' ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে তাপবিজ্ঞানের পূর্বতসিদ্ধতা বা ইচ্ছামতো ধরে নেওয়া ব্যাখ্যার কী গতি হবে? তাপবিজ্ঞানের যে তত্ত্ব এই ধরনের খাঁটি বর্ণনার মানদণ্ড, সেটা যদি সরাসরিভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য অণুগুলি ও তাদের গতির তত্ত্বে পরিণত হয়, তাহলে 'খাঁটি বর্ণনার' ধারণাটির আর কী অবশিষ্ট থাকে?

তাপবিজ্ঞানে বৃহৎ-জগতের তাপগতিবিজ্ঞান এবং আণবিক বলবিদ্যা—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো আপাতবিরোধ নেই। তাপগতিবিজ্ঞানের নিয়মাবলী

কণাদের বলবিদ্যার নিয়মাবলীতে উপরের সৌধের ব্যাপার এবং তারা ওদের খাটো করে দেয় না। যেখানে অনেকগুলি বস্তুদেহ নিয়ে কাজ করতে হয়(১) সেখানে রাশিবিজ্ঞানের নিয়মগুলি কাজে লাগে কিন্তু আলাদা আলাদা অণুর ক্ষেত্রে যে নিউটোনীয় বলবিদ্যার নিয়মাবলী একেবারে সঠিক সঙ্গতিপূর্ণতা নিয়ে কাজ করে—সেখানে দুয়ের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই।

আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যে ধ্রুপদী বলবিদ্যার চরিত্র ভিন্ন প্রকারের। এটা নয় যে, প্রকৃতির ঘটনাবলীকে সহজ বলবিদ্যাগত সমস্যার মধ্যে নামিয়ে আনা যায় না। আসল কথাটা হল বলবিদ্যার পুরানো নিয়মগুলি দেখা গেল নির্ভুল নয় অথবা একেবারে ঠিক ঠিক ভাবে বলতে হলে বলা উচিত, তারা ছিল ভুল। এজন্যেই পদার্থগত ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই সমানভাবে প্রযোজ্য, এটা আর বলা যায় না। জগৎপ্রপঞ্চকে বর্ণনার জন্যে একটা নতুন মৌলিক প্রতিমার প্রয়োজন। প্রশ্ন এটা নয় যে, কয়েকটি মৌলিক, প্রাথমিক নিয়মাবলীতে জটিল নিয়মগুলিকে নামিয়ে আনা সম্ভব কি না। প্রশ্নটা হচ্ছে নিয়মগুলিকেই নিয়ে। যদি এটার জ্ঞান 'স্বয়ংপ্রতিভাত' নিয়ম থেকে পৃথক হয় তাহলে কয়েকটি প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরি ক'রে এই আপাতবিরোধের সমাধান করা যাবে না। তাতে সমতার বদলে উঁচুনিচু স্তরের প্রশ্ন দেখা দেবে।

আলোর গতিবেগই শেষ কথা এবং সকল ধরনের জাড্যের কাঠামোতে এর অপরিবর্তনীয় চরিত্রকে হিসাবের মধ্যে নিলে আরও একটা গভীর, সাধারণ এবং আরও সঠিকভাবে পদার্থগত বাস্তবতার কাছে পৌঁছনো যাবে। পুনরায় জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন আছে যে, আপেক্ষিক তত্ত্ব পদার্থগত বাস্তবতার সর্বাপেক্ষা গভীর, সবচেয়ে সঠিক এবং সর্বোপরি নির্ভরযোগ্য নিয়মাবলীকে তার আপাতবিরোধী চরিত্র সত্ত্বেও সম্ভাব্য স্বীকৃত বিষয়রূপে হাজির করেছে। মানুষের মনকে, তার নিজস্ব পূর্বতসিদ্ধ ধারণাগুলিকে নয়, তার 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূ'ত' জগতে যে যথার্থ 'বিস্ময়' রয়ে গেছে, তাকেই আত্মস্থ করতে হবে। আপেক্ষিকতা ও নিউটোনীয় বলবিদ্যার মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে শেষোক্তকে বোঝা সম্ভব, একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কেন একটা

১ ইংরাজিতে কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে 'ensemble'। উপমাটা পাশ্চাত্য সংগীতের থেকে নেওয়া, যাতে একটা সিম্ফনিতে অনেকগুলি যন্ত্রকে একসঙ্গে বাজিয়ে একটা ঐক্যতান তথা সংধ্বনি সৃষ্টি করা হয়।
—অনুবাদক।

নির্দিষ্ট গতিবেগে(১) যা পর্যবেক্ষণ করা হয় তা নিউটোনীয় বলবিদ্যার সঙ্গে সংঘাত উপস্থিত করে না। তাহলে যে সকল পরীক্ষা এবং পরীক্ষালব্ধ যাচাই করা তথ্য নিউটোনীয় ধ্রুপদী বলবিদ্যার সঠিকতা প্রমাণ করে এবং একই সঙ্গে আইনস্টাইনের নতুন বলবিদ্যাকেও সমর্থন করে, সেটা বোঝা যাবে।

বিশ্বাস উৎপাদন করেই আপেক্ষিকতা পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তত্ত্বরূপে দেখা দিয়েছে। জনসাধারণের 'পরে এর প্রভাব একাধারে যেমন তার বিশ্বাসযোগ্যতার জন্যে, তেমনি তার আপাত-বিরোধী চরিত্রের জন্যেও। এই তত্ত্ব যে প্রচণ্ড ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছে, তার কারণও এটাই, যদিও ঐ ঔৎসুক্যকে সব সময় সহৃদয়ভাবে গ্রহণ করা হয় নি।

পূর্বে এই অবস্থার কোনো নজির নেই। জেনোর(২) কূটাভাসের (paradox) যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ যাই হোক না কেন, মানুষের বুদ্ধির কাছে শেষ অবধি এ একটা চ্যালেঞ্জ, প্রকৃতির কূটাভাসের কাছে নয়। কেউই সন্দেহ পোষণ করে না যে, এচিলিস কচ্ছপকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির যা আপাতবিরোধিতা, তা আপেক্ষিকতার তত্ত্বের রূপায়ণের পরে পদার্থগত বাস্তবতার সঙ্গে আপাতবিরোধী হয়ে গেল। বাস্তবতার চরিত্র বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে বিষয়মুখী হওয়াটা ছিল একটা নতুন ব্যাপার। আইনস্টাইন আপাত-বিরোধী বাস্তবতাকে তাঁর দার্শনিক ধারণাগুলির সাহায্যে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, যেগুলি 'নিছকমাত্র ব্যক্তিগত' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপেক্ষিক তত্ত্বের মতাদর্শগত ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করছিল।

আইনস্টাইনের কাছে পদার্থগত বাস্তবতার আপাতবিরোধিতা জগৎ-প্রপঞ্চের বিষয়মুখী চরিত্রের প্রমাণ এবং তার সম্পর্কে জ্ঞান যে আগে-ভাগে ঠিক করে নেওয়া যায় না, এ বিষয়ে যুক্তি হিসাবে হাজির হয়েছিল।

---

১ পৃষ্ঠা ১৯৯ ও ২০১-এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য। V যদি C অনুপাতে অতি সামান্য হয়, এত সামান্য যে অংকের হিসাবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তাহলে $t = t_0$ দাঁড়ায়, অর্থাৎ আইনস্টাইনের সময়-সংকোচন হচ্ছে না। এবং তাহলে নিউটোনীয় বলবিদ্যার নিয়ম চলবে। কারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অন্যতম বক্তব্য এটাই যে, সময় বা কাল একটা চতুর্থ মাত্রা। —অনুবাদক।

২ জেনো (৩৯০ খৃঃ পূঃ থেকে ৪৩০ খৃঃ পূঃ)—গ্রীক দার্শনিক। তর্কবিদ্যার কূটাভাস রচনার আদি পুরুষ। তাঁর বিখ্যাত কূটাভাস হল 'অ্যাচিলিস ও কচ্ছপ' এবং 'ছুটন্ত তীর'। —অনুবাদক।

আমাদের মনের 'পরের সব রকমের ছাপগুলির ভিত্তি হল বিষয়মুখী বাস্তবতার বস্তুপুঞ্জ। যে ঘটনাবলীকে পর্যবেক্ষণ করা যায় তার যুক্তিসম্মত নির্মাণের সঙ্গে বাস্তবতার জ্ঞানের সংঘাত লাগে, যেটা নতুন এবং আরও ভালো নির্মাণকার্য করে থাকে। বিশ্বাসযোগ্য জগতের চেহারার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল সকল রকম জাড্যের কাঠামোতে আলোর গতিবেগের নিত্যতার 'বিস্ময়', যেটা স্বীকৃত যুক্তিসম্মত নির্মাণের সঙ্গে খাপ খেল না, যাতে অনন্ত মহাবিশ্বে নিরবচ্ছিন্ন কাল বয়ে চলেছে এবং ধ্রুপদী জগতের ছবি সম্পর্কে আরও অনেকগুলি মৌলিক ধারণা রয়েছে। ধাপে ধাপে আইনস্টাইন জগতের নতুন একটা ছবি গড়ে তুললেন। তাঁর কাজটা মূলত গঠনমূলক ছিল। এর নেতিবাচক যেটা ছিল—পুরানো জগতের ছবিকে ভেঙ্গে দেওয়া—সেটা নতুন ছবির অপেক্ষা পদার্থগত বাস্তবতার অনেক কাছাকাছি। প্রতিটি এই ধরনের ছবিই কয়েকটি অবস্থার দ্বারা সীমিত এবং যথাসময়ে তারা আবার নতুন 'বিস্ময়ে'র সামনে এসে হাজির হবে। 'বিস্ময় থেকে পালাতে গিয়ে'এ আরও সাধারণ এবং আরও সঠিক চিত্রের সম্মুখীন হবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

লোরেনজের সঙ্কোচন

> আইনস্টাইনের কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনিই প্রথম আপেক্ষিকতার সূত্রকে সর্বজনীন ও সঠিক নিয়ম হিসেবে রূপায়িত করেছেন।
>
> লোরেন্‌জ্‌

মাইকেলসনের পরীক্ষার ফলে যখন ইথারের জগতের অস্তিত্বই চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল, হেন্‌ড্রিক্‌ লোরেন্‌জ্‌ নামে বেশ বড়ো একজন ওলন্দাজ পদার্থবিদ, উদ্ধারের কাজে এগিয়ে এলেন। ইনটারফেরোমিটারে আলোর গতিবেগ যে-পৃথিবীর গতির 'পরে নির্ভর করছে এটার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লোরেনজ তর্কের খাতিরে মেনে নিলেন যে, ইথারের পটভূমিতে গতিশীল বস্তুগুলির গতি যে দিকে তাদের সেই দিকে সঙ্কুচিত হবার ঝোঁক রয়েছে। তিনি এই সঙ্কোচনকে বিদ্যুৎগতিশীলতা থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গিয়ে ধরে নিলেন যে, সকল বস্তুরই প্রাথমিক বিদ্যুৎশক্তি রয়েছে। ইথারের পটভূমিতে গতি এমন বল সৃষ্টি করে যে গতির অভিমুখে বিদ্যুৎশক্তিকে যেন একস্থানে জড়ো করে দেবার চেষ্টা করে। কোনো বিদ্যুৎগতিশীলতার ঘটনাবলী দিয়ে এক বোঝাবার দরকার পড়ে নি এবং তাকে খানিকটা যেন এই বিশেষ উদ্দেশ্যের (এড্‌হক্‌) জন্যে ধরে নিয়ে মাইকেলসনের পরীক্ষার নেতিবাচক ফলাফলকে বোঝানোর জন্যেই আমদানী করা হল। বস্তুগুলির যে সঙ্কোচন হচ্ছে সেটাকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করবার কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু লোরেন্‌জের তাতে কোনো মাথাব্যথা হয় নি, কারণ মাপবার যে দণ্ড দিয়ে ঐ ধরনের বস্তুগুলিকে মাপবার জন্যে চেষ্টা করা হবে, সেই ধরনের বস্তু (অর্থাৎ মাপবার দণ্ডটিও) গতির অভিমুখে সঙ্কুচিত হবে এবং হবে একই অনুপাতে।

সঙ্কোচনের এই প্রকল্পটি(১) মাইকেলসনের পরীক্ষার ফলাফলকে ধ্রুপদী বলবিদ্যার মৌলিক সূত্রগুলিকে লঙ্ঘন না করে বুঝিয়ে দিল। ইনটারফেরোমিটারের লম্ব দিকে (বা দ্রাঘিমার দিকে) যে টিউব রয়েছে তাতে আলোর গতিবেগ পাশে বা সামনের দিকে সোজা যে টিউব তার থেকে আস্তে চলে। অতএব আলোর গতিবেগের নিত্যতা নিয়ে কোনো আপাতবিরোধিতা নেই। সোজা কথায় বলতে হলে দুটি নিছক ধ্রুপদী ঘটনা থেকে উদ্ভূত দুটি ফলাফল পরস্পরকে নাকচ করে দিচ্ছে: একটি হল ইথারের মাধ্যমে ইনটারফেরোমিটারের গতিবেগ আলোর গতিবেগকে রুখে দিচ্ছে এবং দ্বিতীয়টি হল, ইনটারফেরোমিটার টিউবটি সঙ্কুচিত হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণে যেটুকু আলোর রশ্মিকে ঠিক একই সময়ে চলে যেতে দেবার জন্যে প্রয়োজন আছে। লোরেন্‌জ্‌-এর সঙ্কোচন ঠিক একই ধরনের ধ্রুপদী পর্যায়ে পড়ে যাতে একটা ভিজে দড়িকে সঙ্কুচিত করে দেওয়া যায়। একমাত্র তফাৎ হচ্ছে এই যে, শেষোক্তর উপরে একটা শুকনো দড়িকে লাগিয়ে দিয়ে এই সঙ্কোচনকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, যেখানে 'শুকনো দড়ি'-র অভাবে, অর্থাৎ এমন একটা দণ্ড যেটা সঙ্কুচিত হয় না, সেটা না-থাকাতে লোরেন্‌জ্‌-সঙ্কোচনকে অনুসন্ধান করে বার করা সম্ভব নয়। সহজেই দেখা যায় যে, লোরেন্‌জ্‌-এর প্রকল্প আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তৈরি করতে মোটেই কাজে লাগে না। যদিও পর্যবেক্ষিত তথ্যের সঙ্গে তা মিলে যায়, তাহলে তাতে 'প্রকৃতিগত সরলতা' এবং 'অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণতা'র অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে। এটাই এর সর্বাপেক্ষা দুর্বলতা: একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যে ধরে নেওয়াতে (বা অনুমান করাতে) দৃশ্যমান ঘটনার 'পরে কী প্রভাব পড়ছে তা দিয়ে যাচাই করার কোনো উপায় ছিল না।

তা সত্ত্বেও লোরেন্‌জ্‌-এর তত্ত্বে গতির আপেক্ষিকতার ধারণাকে বিকশিত করার সুযোগ ছিল, যদিও এই আপেক্ষিকতা হচ্ছে প্রপঞ্চবাদ ধরনের।(২)

---

১ যাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া আছে তার প্রমাণার্থে কিছু অনুমান —**hypotheses**।—অনুবাদক।

২ **Phenomenological type**—
ফেনোমেনোলজি—দর্শনের ক্ষেত্রে এক ধরনের ঝোঁক, যার প্রধান বক্তব্য হচ্ছে চেতনার একটা 'উদ্দেশ্য' আছে, যাতে আত্মমুখী বা বিষয়ীমুখী ভাববাদের নীতি ব্যক্ত হয়। 'বিষয়ী' ছাড়া কোনো 'বিষয়' থাকতে

আপাতদৃষ্টিতে গতির আপেক্ষিকতা আলোর গতিবেগের আপাতনিত্যতা থেকে এলেও আসলে স্থিতিশীল এবং গতিশীল কাঠামোতে পরম গতিকে প্রকাশ করে আলোর বিভিন্ন দ্রুতি দিয়ে। কারণ কেউ যদি সরাসরি গতিশীল বস্তুগুলির মধ্যে লোরেন্‌জ্‌-সংকোচনকে লক্ষ্য করতে পারতেন তাহলে পরম গতির প্রমাণ পেয়ে যেতেন। কিন্তু একে খুঁজে পাওয়া যায় না, এবং লোরেন্‌জ্‌-এর তত্ত্বতে এটা 'পরম' গতির আওতায় ঘটছে বটে কিন্তু সেটা (পরম গতি) প্রতিটি ঘটনার 'পরে তার নিয়ম চাপিয়ে দেয় না, পর্যবেক্ষণ করা যায় যে দৃশ্যপট তার পেছনেই সে তার শাসনভার চাপিয়ে দেয় কিন্তু তাতে যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষগোচর করা সম্ভব, তাতে কোনো হেরফের হয় না। অতএব লোরেন্‌জ্‌-এর তত্ত্ব, যদিও তার মৌলিক পূর্বানুমান (premises—যে অনুমান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—অনুবাদক) মূলত ধ্রুপদী, তথাপি এটা যে-পরিমাণে পরম গতির ধারণাকে নিজের আওতার মধ্যে নিয়ে আসে তাতে আপেক্ষিক তত্ত্বের গাণিতিক আনুষ্ঠানিক বিকাশের, রূপান্তরণের যে ফরমূলাগুলি যাতে আলোর গতিবেগ অপরিবর্তনীয়,—এ সবের বিস্তারের পক্ষে কোনো বাধা হয় না।

এই সূত্রগুলি লোরেন্‌জ্‌ এবং পোঁয়েকারে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের মৌলিক পেপারগুলির সঙ্গে প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে তাদের মধ্যে পদার্থগত তত্ত্ব বলে এমন কিছু ছিল না যা একটা নতুন জগতের ছবি পেশ করার প্রধান ভিত্তি-প্রস্তর হতে পারে।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বে বলা হয়েছে, সকল গতিই আপেক্ষিক এবং সকল গতিশীল কাঠামোতেই আলোর দ্রুতি হচ্ছে একই। এর মধ্যে যেটা আসল কথা সেটা হচ্ছে, লোরেন্‌জ-সংকোচনের মতন এটা একটা প্রপঞ্চবাদ ধরনের নয়।

কেউই এখন ইথারের তুলনায় সম্পূর্ণ স্থিতিশীল বস্তুর 'আসল' দৈর্ঘ্যের কথা বলেন না—যেটা বস্তুটি যখন চলতে শুরু করে তখন ছোট হয়ে যায়। আসলে সঙ্কোচনটা উভয়ত। ধরা যাক, আমাদের দুটি কাঠামো আছে ক, খ, গ, এবং ক১, খ১, গ১, যারা পরস্পরের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে

পারে না—এইটি তাদের প্রধান বক্তব্য। সবটাই আত্মনির্ভর বলে অস্তিত্ববাদী বা existentialist দার্শনিক মতামতের এটা প্রধান স্তম্ভস্বরূপ।
—অনুবাদক।

চলাফেরা করছে। একটা দণ্ড যদি এমন কাঠামোতে থাকে, যার সংখ্যাগুলি গোণা নেই এবং সেটা অন্য একটাতে গতিশীল, যার সংখ্যাগুলি গোণা আছে, তাহলে শেষোক্তের গোণা হলে এটা হ্রস্বতর হবে যখন তাকে প্রথমোক্তের তুলনায় শেষোক্ততে মাপা হবে। বিকল্পে, এটা যদি গণনা যোগ্য কাঠামোতে স্থিতিশীল থাকে, তাহলে তাকে হ্রস্বতর হতে হবে—যখন তাকে সংখ্যা গণনা করা যায় না যে কাঠামোতে তার তুলনায় মাপা হবে। সঙ্কোচন কি তাহলে সত্যি সত্যি ঘটছে? উত্তর হল, হ্যাঁ। মাত্রাগুলি সত্যিসত্যিই সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং সঙ্কোচনের (পারস্পরিক) আসল কারণ হচ্ছে দুটি কাঠামোর পারস্পরিক গতি। অবশ্য পারস্পরিকভাবে সঙ্কুচিত হচ্ছে এমন দণ্ডের ধারণা বাস্তবিক আপাতবিরোধী, কিন্তু বস্তুগুলির মাত্রাতে এটা একটা যথার্থ সম্পর্কের পরিচয়, যে সম্পর্কটা পর্যবেক্ষণের 'পরে নির্ভরশীল নয়। এটা বস্তুদের আসল পারস্পরিক স্থানচ্যুতির 'পরে নির্ভর-শীল, যাকে অন্য বস্তুদের সম্পর্কে যে পরম বা অনপেক্ষ গতির কথা বলা হয় তাকে সহজেই দৃশ্যপটে আনা যায়, সেটা ধ্রুপদী বলবিদ্যাতেও পাওয়া যাচ্ছে।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রধান মৌলিক এবং অত্যন্ত সাধারণ ধারণা, দেশ ও কালের ধারণার কঠোর ও-ঠিক বিশ্লেষণ থেকে লোরেন্‌জ-সঙ্কোচনে পৌঁছেছে। এই বিশ্লেষণ থেকে মাইকেলসনের পরীক্ষাতে যে নতুন পরীক্ষার তথ্য পাওয়া গেছে তার একটা ব্যাখ্যা আইনস্টাইন করেছেন। এই অর্থে আইনস্টাইনের তত্ত্ব 'বাইরের দিক থেকে সঠিক' এবং 'অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণতা'র কাঠামোর সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়।

যখন একটা দারুণ আপাতবিরোধী তথ্যকে—মাইকেলসনের ইনটার-ফেরোমিটারে আলোর গতিবেগের নিত্যতা—কোনো উপায়ে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হল, তখন লোরেন্‌জ একটা ধারণা পেশ করলেন, যেটা আগেকার জানা এবং নতুন পাওয়া তথ্যগুলির সঙ্গে ঐক্যমত প্রকাশ করেও তা থেকে সহজে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে উদ্ভূত হল না। আইনস্টাইন যেভাবে নতুন ও আপাতবিরোধী তথ্যগুলিকে বুঝিয়ে দিলেন, সেটাই হল সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের ছবিটাকেই সংশোধন করার (বা খানিকটা ঢেলে সাজানোর) ভিত্তি—যাতে আরও সর্বজনীন এবং আরও বাস্তব ভিত্তিতে জানা তথ্যগুলির সবটাকে ব্যাখ্যা করে দেশ-কাল-এর নতুন ব্যাখ্যা পেশ করা হল। 'বিস্ময় থেকে

পালিয়ে যাওয়া' কাজেই শেষ অবধি এমন একটা তত্ত্বে পর্যবসিত হল, যাতে 'বাইরের দিক থেকে যে ঠিক বলে প্রমাণিত' হচ্ছে, সেটা 'অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণ'তা'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল।

একই সময়ে দুই তত্ত্ব আপেক্ষিকতা এবং লোরেন্‌জ-পোঁয়েকারে-র ধারণাগুলি—আপেক্ষিকতার জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে এনে হাজির করল। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর (আইন্‌স্টাইনের) এবং লোরেন্‌জ ও পোঁয়েকারে-র কাজের সম্পর্কে সেলিগ-এর কাছে একটা প্রশ্নের উত্তরে আইনস্টাইন লিখেছিলেন:

"বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের বিকাশের দিকে পেছনে ফিরে তাকিয়ে এটা আজ স্পষ্ট যে, ১৯০৫ সালেই এটাকে (অর্থাৎ, বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে—অনুবাদক) আবিষ্কার করার অবস্থা পরিণতি লাভ করেছিল। লোরেন্‌জ এই পরিবর্তনের মূলাগুলি জানতেন, যা ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের বিশ্লেষণ—যা তাঁর (অর্থাৎ, লোরেন্‌জ-এর) নামাঙ্কিত হয়েছিল এবং পোঁয়েকারে যে ধারণাকে আরও বিকশিত করেছিলেন। আমার নিজের কথা বলতে হলে লোরেন্‌জ-এর মৌলিক কাজের সঙ্গে আমার শুধু পরিচয় ছিল, যেটা ১৮৯৫ সালে লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পরের কিংবা পোঁয়েকারে-র সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানের কাজের সঙ্গে নয়। এই অর্থে আমার কাজটা ছিল স্বতন্ত্র। নতুন ধারণাতে যা ছিল তা হচ্ছে, লোরেন্‌জ-এর পরিবর্তন ম্যাকস্‌ওয়েলের সমীকরণের বাইরে যায় এবং দেশ কাল সম্পর্কে যেটা মৌলিক সে সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়।"(১)

এই মন্তব্যগুলি করে প্রায় সব কিছুই বদলে দেওয়া হল। আইনস্টাইন জোর দিয়ে বললেন যে, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সম্পর্কে জমি তৈরি হয়ে গেছে এবং তাঁর 'গতিশীল বস্তুদেহগুলির বিদ্যুৎগতিশীলতা সম্পর্কে বিজ্ঞান' (On the Electrodynamics of Moving Bodies) নিয়ে লেখা পেপারগুলি একই সময়ে লেখা হলেও তাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণা রয়েছে, যাতে আলোর গতিবেগ জাড্যের কাঠামোর গতি থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বতে লোরেন্‌জ-এর পরিবর্তনের (যাতে দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচনের, সময় বর্ধিত হওয়ার এবং আলোর গতিবেগের নিত্যতা কী করে

১ C. Seelig, op. cit. S. 116.

হচ্ছে তা বোঝানো হয়েছে) ব্যাপারটা সর্বজনীন নিয়ম রূপে দেখানো হয়েছে, যেটা বিদ্যুৎগতিশীলতার সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং দেশ-কাল-এর সাধারণ সম্পর্ককে পুরোপুরি ধরে নিয়ে পেশ করা হচ্ছে। এটাই লোরেন্‌জ তাঁর গোড়াকার ১৯০৪ সালের পেপারে নোট যোগ করে বলতে চেয়েছিলেন, যেটা তাঁর পরিচ্ছেদের যেন শেষ কথা হিসাবে লিখিত হয়েছে।

আইনস্টাইনের মূল ধারণাটা হচ্ছে, একটা যুক্তিসম্মত নির্মাণকে পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করে নেওয়া। একটা ধারণাকে বাস্তবতার সঙ্গে আগে-ভাগে মিলিয়ে নিয়ে দাঁড় করানো যায় না। এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে, যাতে তাকে পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করা সম্ভব। আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-গুলি খুব চালাকি দিয়ে তৈরি করা প্রতিপাদ্য থেকে আসে নি: তারা স্বভাবতই সাধারণ সূত্রগুলি থেকে এসেছে।

"অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে", লিখেছেন আইনস্টাইন, "পদার্থবিদ্যাতে এমন কোনো ধারণা নেই যার ব্যবহারকে প্রয়োজনীয় অথবা পূর্বতসিদ্ধ বিবেচনার 'পরে দাঁড় করিয়ে করা যেতে পারে। ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং নিশ্চয়ই পদার্থগত বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত হলে তবেই কোনো একটা ধারণার টিঁকে থাকার পক্ষে যুক্তি থাকতে পারে। আপেক্ষিকতার তত্ত্বে একেবারে চরমভাবে যুগপৎ কিছু ঘটা (অর্থাৎ, একই মুহূর্তে দুটি ঘটনা ঘটা—অনুবাদক), পরম বা অনপেক্ষ গতিবেগ, পরম বা অনপেক্ষ ত্বরণবেগ ইত্যাদি ধারণাগুলিকে বাতিল করা হয়েছে। কারণ তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো দ্ব্যর্থহীন সম্পর্ক নেই···প্রতিটি পদার্থগত ধারণাকে, নীতিগতভাবে, বাস্তবতার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকুক আর না-ই থাকুক, রূপায়িত করার দরকার ছিল।"(১)

বাস্তব পদার্থগত তত্ত্বগুলিকে একেবারে সাধারণ ও আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবতার যে সকল সমস্যার সমাধান হয়েছে, সেখান থেকে শুরু করার ক্ষমতা হচ্ছে আইনস্টাইনের বৈশিষ্ট্য। জেমস্ ফ্রাংকের সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলবার সময়ে তিনি বলছিলেন: "মাঝে মাঝে আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি: কী করে এটা ঘটল যে, আপেক্ষিকতার তত্ত্বের বিকাশটা আমাকে দিয়েই হল? আমার মনে হয় এর কারণ এই যে, একজন সাধারণ পূর্ণবয়স্ক

১ Solovine, p. 21.

মানুষ দেশ ও কাল সম্পর্কে সমস্যাগুলি না ভেবে পারে না। এগুলি এমন একটা ব্যাপার যা সে বালক বয়সেই ভেবেছে। কিন্তু আমার বৌদ্ধিক বিকাশ খানিকটা ব্যাহত ছিল বলে আমি দেশ ও কাল সম্পর্কে ভাবতে শুরু করি বেশ বড়ো হয়ে। স্বভাবতই একজন বালক সাধারণ ক্ষমতা নিয়ে যতোটুকু যেতে পারে তার চেয়ে আমি অনেক বেশি দূর গেছি।"(১)

এই আশ্চর্যজনক উক্তির (যা থেকে মনে হতে পারে, যে-তত্ত্ব দেশ ও কাল সম্পর্কে আমাদের মৌলিক ধারণাকে বদলে দিয়েছে, তার অস্তিত্ব বুঝি তার সৃষ্টিকর্তার মানসিক শ্লথতার জন্যেই হয়েছে) মধ্যে একটা সত্যের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। বলা যেতে পারে যে, অনেক বালক এবং কিশোরের মনের তাত্ত্বিক গঠন একদিক থেকে দেখলে সারা মানুষের চিন্তার বিকাশেরই পুনরাবৃত্তি : পদার্থগত বাস্তবতা সম্পর্কে সাধারণ চিন্তাগুলি আরও বেশি পরিপক্কতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দেয়। জগৎকে প্রথম দেখার এই অনুভব—যেটা অনেক বড়ো চিন্তানায়ক ও শিল্পীর মধ্যে পাওয়া যায়—আইনস্টাইনের বরাবর ছিল এবং যাতে বয়োজ্যেষ্ঠদের এই বিশ্বাস ছিল না যে, জগতের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। গভীর জ্ঞানের দ্বারা অথবা নতুন ব্যাপারে ঔৎসুক্য জেগে ওঠার মধ্যে দিয়ে এই অনুভবের তৃষ্ণাকে মেটানো যায় নি। আইনস্টাইন গতির সমস্যাগুলি নিয়ে অনেক ভেবেছেন এবং মানুষের ইতিহাসের শৈশবকালের ধারণাতে উপনীত হয়েছেন : আপেক্ষিকতার প্রাচীন ধারণা, যেটা পরে বলবিদ্যার সামনে পিছু হটে যায় এবং ইথারের পরম ধারণা, যার কাঠামোতে সব কিছুকে হিসাবের মধ্যে পাওয়া যাবে। ইথারের বায়ুতরঙ্গকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন আপেক্ষিকতা আবার পদার্থবিদ্যার মূল ভিত্তিপ্রস্তর রূপে স্থাপিত হল। ইথারের মাধ্যমে গতিকে খুঁজে না পাওয়াতে আইনস্টাইন দ্রুত ধরে নিয়েছিলেন যে, কোনো ইথার নেই যার মাধ্যমে গতি থাকবে : অতএব এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গতির ধারণার কোনো অর্থ নেই। তাহলে শেষ অবধি যেটা রইল, সেটা হল এই তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত টানা যে, নীতিগতভাবে কোনো বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছকের পটভূমিতে পরম বা অনপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই।

তাপগতিবিদ্যার সৃষ্টিকর্তা অনুরূপ একটা পথ অবলম্বন করেছিলেন। যখন

১ C. Seelig, op. cit. S. 119.

বরাবর গতিশীল থাকবে এই রকমের একটা অবস্থা তৈরি করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল, তখন তারা এটা করতে না-পারার অক্ষমতাকে একটি সর্বজনীন সূত্রে পরিণত করলেন, যাতে শক্তি হারিয়েও যায় না কিংবা কোনো কিছু থেকে ছাড়া উৎপন্নও হতে পারে না। এর পরে তাপগতিবিদ্যা কৃত্রিম প্রকল্প থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারল এবং শক্তি যে সংরক্ষিত থাকে সে সম্পর্কে অনুসিদ্ধান্তের বিস্তার করতে পারল।

মরিস সোলোভিন-এর কাছে লেখা তাঁর অন্যতম একটা চিঠিতে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার মূল ধারণা সম্পর্কে নিম্নলিখিত ছোট্ট ব্যাখ্যাটি দিলেন :

"আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ভিত্তিরূপে নানারকমের পদার্থগত পরীক্ষা করা হলেও তার পদ্ধতি ও মর্মবস্তুকে কয়েকটি বাক্যের দ্বারা গুছিয়ে বলে দেওয়া যায়। প্রাচীনরা জানতেন যে, গতিকে কেবলমাত্র **আপেক্ষিকভাবে** বোঝা সম্ভব ; কিন্তু এই তথ্যের বিপরীতে পদার্থবিদ্যা নিজেকে **পরম বা অনপেক্ষ** গতির 'পরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আলোকবিজ্ঞানে ধরে নেওয়া হল যে অন্য গতিদের তুলনায় এক ধরনের গতি আছে, যেমন, উজ্জ্বল ইথারের মধ্যে দিয়ে গতি, যার সম্পর্কে সকল বাস্তব বস্তুদেহের গতিকে বিচার করে দেখা যায়। তাহলে উজ্জ্বল ইথারের ধারণাটা দাঁড়াল এক ধরনের পরম বা অনপেক্ষ স্থিতিশীল অবস্থা। যদি সারা মহাকাশ জুড়ে স্থিতিশীল উজ্জ্বল ইথারের অস্তিত্ব সত্যিসত্যিই থাকত, তাহলে গতিকে তার পটভূমিতে বিচার করা সম্ভব হতো এবং তাহলে তার পরম বা অনপেক্ষ চরিত্রটা বোঝা যেতে পারত। এই ধারণা বলবিদ্যার-ভিত্তিস্বরূপ হয়ে কাজ করতে পারত। কিন্তু যখন অনুমানমূলক উজ্জ্বল ইথারের অস্তিত্ব খুঁজে বার করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল, তখন সমস্যাকে নতুন করে আবার ভাববার দরকার পড়ল। এটা আপেক্ষিকতার তত্ত্বে পদ্ধতিমতো করা হল। এতে প্রকৃতিতে বিশেষ ধরনের গতিশীল অবস্থা যে নেই, সেটা ধরে নেওয়া হল এবং সেই ধরনের অনুমান থেকে যে সিদ্ধান্তগুলি বেরিয়ে আসে, তাকে বিশ্লেষণ করা হল। এর পদ্ধতিটা দাঁড়াল তাপগতিবিজ্ঞানেরই অনুরূপ। শেষোক্ততে নিচের প্রশ্নটার পদ্ধতিগত জবাব দেবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর বেশি কিছু করা হয় নি : প্রকৃতির কী কী নিয়ম আছে, যা নিরন্তর গতিশীল (perpetuum mobile) অবস্থা সৃষ্টি করা অসম্ভব করে তোলে ?"(১)

১ Solovine p. 19.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দেশ, কাল, শক্তি ও ভর

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণে প্রয়োগ করলে আপেক্ষিকতার সূত্রের জন্যে বিশেষ করে প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, ভর হচ্ছে একটা বস্তু-দেহের শক্তির সোজা পরিমাপ। আলোর ভর আছে। এটা নিশ্চয়ই একটা অবাক-করা বিশেষ কৌতুহল-উদ্দীপক ধারণা। আমার মাঝে মাঝে শুধু মনে হয় যে ঈশ্বর কি আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করে আমাকে একেবারে বোকা বানাচ্ছেন না।

আইনস্টাইন

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নির্বাচনের জন্যে আইনস্টাইন যে-মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, সে সম্পর্কে পরম বা অনপেক্ষ গতির ধ্রুপদী ধারণা এবং ধ্রুপদী বলবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের বিশ্লেষণ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। জগৎ-প্রপঞ্চের ধ্রুপদী চেহারার যে সর্বাপেক্ষা সাধারণ সূত্রগুলি আছে তা থেকে এই ধারণা উদ্ভূত হয় না, যে-ধারণাকে আমরা বিজ্ঞানের 'ধ্রুপদী আদর্শ' বলে অভিহিত করেছি। 'ধ্রুপদী আদর্শে' বিজ্ঞান এমন একটা জগতের চিত্র আঁকতে চায়, যাতে আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন বস্তু-দেহ ছাড়া আর কিছুই নেই। গতি বলতে আমরা ধরে নিচ্ছি অন্য বস্তু-দেহের কালগত পরিবর্তন। কাল-এর একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'কাল স্রোত', অর্থাৎ, এক মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে চলে যাওয়া। ধ্রুপদী বিজ্ঞান বস্তু-দেহের গতিবেগের 'পরে যেমন কোনো সীমা চাপিয়ে দেয় নি, তেমনি সে অনন্ত (বা অসীম) গতি-

বেগও কল্পনা করে নি ; বরঞ্চ উলটে, এটাই স্পষ্ট যে, একটি স্থানে এক বিশেষ মুহূর্তে যে বস্তুটি অবস্থিত, সেই একই মুহূর্তে অন্য স্থানে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতএব 'ধ্রুপদী আদর্শে' একটা চতুর্মাত্রিক জগতের চেহারা গড়ে ওঠে : একটি বস্তু-দেহের অবস্থান, অর্থাৎ তার তিনটি দেশগত স্থানাঙ্কের(১) কথা বলতে হলে একই সঙ্গে কোন্ সময়ে (বা কাল-এ) ঐ বস্তুটি ঐ অবস্থানে পৌঁছেছে, সেটিও বলতে হবে। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে, কোনো বস্তুই কখনও স্থির (বা স্থিতাবস্থায়) থাকে না, এবং যেভাবেই হোক না কেন, একটা স্থির বস্তু কোনো ঘটনাতে অংশীদার হতে পারে না। ধ্রুপদী এই চতুর্মাত্রিক চিত্রটা উলটে বা বদলে গেল যখন অসীম গতিবেগসম্পন্ন বল-এর ধারণা করা হল। একটা দূরত্বে তৎক্ষণাৎ একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (action at a distance) হতে পারে, সেটা ধ্রুপদী বিজ্ঞানের সাধারণ মৌলিক ধারণাগুলি থেকে আসে নি পরন্তু সেটা তার 'অন্তর্নিহিত পূর্ণতার' সঙ্গে সংঘাত হয়েছিল, মহাবিশ্বের সহজ সুষমাকে খর্ব করে দিয়েছিল এবং সেটা যেন 'ধ্রুপদী আদর্শের' প্রতি একটা বিধিবহির্ভূত পরিপূরকের মতো ছিল।

আইনস্টাইন 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' আদর্শের দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের সুষমাকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন এবং সেটা তাঁর সারা জীবন ও কাজকে প্রভাবিত করেছিল। বর্তমান যেটা আমরা আলোচনা করছি, তাতে ইথারের ধারণাতে ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্ল্যাংক ইথারের বর্ণনা দিয়েছেন, 'ধ্রুপদী বিজ্ঞানের দুঃখের সময়ের জাতক' বলে : সেটা যুগপৎ একই সময়ে কোনো ঘটনা ঘটবার অবস্থা (simultaneity) তৈরি করে দিয়েছিল এবং একই সময়ে চতুর্মাত্রিক 'ধ্রুপদী আদর্শে'র ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে কালকে (বা সময়কে) একটা স্বতন্ত্র মাত্রা (যে কালস্রোত সারা মহাকাশকে ব্যেপে বয়ে চলেছে এবং যেটা দেশগত স্থান(২) কোথায় হবে তার 'পরে নির্ভর-শীল নয়) এবং দেশকেও স্বতন্ত্র (যাতে বিভিন্ন ঘটনা যুগপৎ একই সঙ্গে ঘটতে পারে, যদি কাল বা সময়কে শূন্য ধরা যায়) বলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

---

১ অর্থাৎ, তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা।—অনুবাদক।

২ অর্থাৎ দেশগত যে তিনটি স্থানাঙ্ক বা co-ordinates—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, তার পরে চতুর্থ মাত্রা সময় বা কাল নির্ভরশীল নয়।
—অনুবাদক।

আমরা দেখেছি, একটা স্থিতিশীল ইথারকে যদি সকল বস্তুকে নির্দেশ করার জন্যে একটা পরম বা অনপেক্ষ ছক তৈরী করা যায়, তাহলে এক সঙ্গে দুটো যুগপৎ ঘটনাকে যোগ করে দেওয়া সম্ভব, যদিও যে সিগন্যাল (বা নিশানা) দেওয়া হচ্ছে, সেটা একটা নির্দিষ্ট দ্রুতি নিয়ে প্রবহমান। একই উৎস(১) থেকে দুটি নিশানা দুটি বিন্দুতে যুগপৎ একই সঙ্গে পেঁৗছয়, যেখানে সূত্রটি বিন্দুদের থেকে সমদূরত্বে রয়েছে এবং যেখানে নিশানাগুলি একই দ্রুতি নিয়ে ধাবমান। যদি জাহাজের সম্মুখের এবং পশ্চাতের দিকে দুটি পর্দা টাঙ্গানো হয়, তাহলে তাতে যে আলো ফেলা হবে তার উৎস যদি জাহাজের মধ্যেই একেবারে ঠিক করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়(২) তাহলে একই সঙ্গে তারা যুগপৎ আলোকিত হয়ে উঠবে। যদি ইথারের অস্তিত্ব থাকে এবং জাহাজের গতি যদি আলোর দ্রুতির 'পরে প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে ঘটনা-যে একই মুহূর্তে ঘটবে (এখানে পর্দাগুলি আলোকিত হয়ে যাওয়া), সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব যতক্ষণ ইথারের তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে জাহাজটি স্থির হয়ে হয়ে রয়েছে। মনে করা যাক, প্রথম জাহাজটির পাশ দিয়ে আর একটি জাহাজ যাচ্ছে, ঠিক যখন আলোটি জ্বেলে দেওয়া হল। যদি দ্বিতীয় জাহাজটিরও দুটি ঐরকম (সামনের ও পেছন দিকে—অনুবাদক) পর্দা থাকে, তাহলে আলো তাদের কাছে যুগপৎ পৌঁছাবে না, যেহেতু সামনের দিকে যে পর্দা আছে তাতেই প্রথম আলোটি ধরা পড়বে, যখন সেই সামনের দিকের পর্দাটি আলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, (অবশ্য নিশ্চয়ই যদি ইথারের অস্তিত্ব থাকে, যদি দ্বিতীয় জাহাজটি ইথারের তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে গতিশীল থাকে এবং যদি সেই গতি জাহাজ থেকে যে নিশানাগুলি দেওয়া হচ্ছে তাকে প্রভাবিত করে)। প্রথম জাহাজের লোকটি জানবে যে, পর্দাগুলি আলোকিত হচ্ছে যুগপৎ একই সময়ে, এই ঘটনাটা অনপেক্ষ কারণ জাহাজটির গতি নেই, ইথারে সে স্থিতিশীল হয়ে রয়েছে। একই সময়ে গতিশীল জাহাজে যে লোকটি রয়েছে সেই কিছু মন্তব্য করছে না কারণ সে জানে যে, পর্দাগুলি যে একই সময়ে যুগপৎ আলোকিত হচ্ছে না তার কারণ জাহাজটি গতিশীল রয়েছে।

কিন্তু যদি ইথার না থাকে এবং আলোর গতিবেগ যদি গতি-নিরপেক্ষ

১ অর্থাৎ দেশগত স্থানাঙ্কের হিসাবে একটি বিশেষ স্থান, যাকে উৎস বলা হচ্ছে।—অনুবাদক।

২ যেটি একেবারে মধ্যবর্তী নিশ্চয়ই।—অনুবাদক।

হয়, তাহলে দ্বিতীয় জাহাজে যে লোকটি রয়েছে সেও দাবি করতে পারে যে তার জাহাজটি গতিহীন (কারণ গতির কোনো প্রভাব আলোর গতিবেগের 'পরে নেই) এবং আলোর রশ্মি দুটি পর্দার উপরে যুগপৎ একই সময়ে পড়বে। নিশ্চয়ই প্রথম জাহাজের লোকটি ধরেই নেবে যে, তার জাহাজ স্থির হয়ে রয়েছে এবং পর্দাগুলি একই সময়ে আলোকিত হচ্ছে। যখন কোনো অনপেক্ষ গতি নেই, তখন অনপেক্ষভাবে যুগপৎ দুটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটার কোনো অর্থই নেই। একটা ছকের পটভূমিতে যে ঘটনাগুলি যুগপৎ একই সময়ে ঘটতে পারে, যেটা অন্য ক্ষেত্রে যুগপৎ একই সময়ে না-ও ঘটতে পারে এবং এর বিপরীতও হতে পারে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে একই কাল-প্রবাহ সারা মহাবিশ্ব ব্যেপে বয়ে চলেছে এবং একেবারে খাঁটি যুগপৎ দেশগত স্থান-পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হচ্ছে বলে যে কল্পনা করা হয় তাকে শেষ করে দিয়েছে। এ থেকেই জগৎপ্রপঞ্চের দেশগত-কালগত ধারণার যুগ শুরু হয়েছে।

১৯০৮ সালে হেরমান মিনকাউস্কি এই ধারণার গাণিতিক যে হিসাবপত্র করা দরকার তা খাড়া করেছিলেন, তিনি সে সময়ে গটিনগেনে(১) বাস করতেন। গাউস্-এর সময় থেকে গটিনগেনে গণিত শিক্ষা ও গবেষণার সর্বাপেক্ষা ভালো ঐতিহ্য ছিল। প্রায় একশ বছর আগে গটিনগেনের পণ্ডিতরা লোভাচেভ্স্কি-র জ্যামিতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন; এবং এই গটিনগেনেই রিম্যান তাঁর বহুমাত্রিক জ্যামিতির ধারণা প্রথম ব্যক্ত করেন, যেটা অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি থেকে পৃথক ধরনের।(২) গটিনগেনে গাণিতিক সূক্ষ্ম ব্যাপার নিয়ে যে আলোচনা হতো তা সেখানকার পণ্ডিতরা পছন্দ করতেন। এমন কি পদার্থবিদরাও গাণিতিক নির্মাণকার্য করতেন, যাতে নিশ্চয়ই ঘটনাবলীর পদার্থগত মর্মবস্তুকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করে তার বিস্তার করার উদ্দেশ্য থাকতো না। আইনস্টাইন একবার হাল্কাভাবে টিপ্পনী কেটেছিলেন:

১ জার্মানির বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়।—অনুবাদক।

২ ইউক্লিড-এর জ্যামিতিতে সব কিছু উপপাদ্য, প্রমাণ ইত্যাদি এক তল্-বিশিষ্ট (on the same plane)। লোভাচেভস্কি এবং রিম্যান যথাক্রমে মণ্ডলাকৃতি বলয়ের গাত্রে—প্রথম জন উপরে, দ্বিতীয় জন ভিতরে—সকল রেখা, ত্রিভুজ ইত্যাদির কী গুণাবলী দাঁড়াবে, তা নিয়ে কাজ করেন। মহাকাশ বা পৃথিবী যেহেতু বলয়ের আকার (spherical) অতএব এই নতুন জ্যামিতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে।—অনুবাদক।

"গটিনগেনের লোকদের আমার কাছে মনে হয় তারা যেন কাউকে কোনো কিছু পরিষ্কারভাবে সূত্রায়িত (formulate) করার কাজে সাহায্য করতে চায় না, পরন্তু তারা যেন কেবল আমাদের, পদার্থবিজ্ঞানীদের দেখাতে চায় যে, তারা আমাদের চাইতে কত বেশি বুদ্ধিমান।"(১)

এই উক্তি থেকে একজন পদার্থবিজ্ঞানীর হতাশা বুঝতে পারা যায়, যিনি তাঁর প্রয়োজন মতো যন্ত্রপাতি(২) খুঁজতে গিয়ে দেখছেন যে, এমন কাজকর্ম (তথা গণিতের হিসাব ইত্যাদি) করা হচ্ছে, যেটা তাঁর পদার্থগত ধারণাতে অতি অল্পই কাজে লাগে, তা সেগুলি অন্যভাবে যত বড়ো মেধার কাজই হোক না কেন। গটিনগেনের পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে প্রখ্যাত, তাঁদের কাছে গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে জটিল তর্কের ও একেবারে নিখুঁত ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করার প্রবণতা এসেছিল গণিতের পদার্থগত সূত্রের মধ্যে গভীর-ভাবে অনুপ্রবেশের ফলে। "সকল রকমের সম্ভাব্য পরস্পরবিরোধী (বা নিদ্বন্দ্বমূলক) জ্যামিতিকে বাস্তবতার সঙ্গে মেলাবার জন্যে" গটিনগেনের অনেক পণ্ডিত এই সকল প্রশ্নের পরীক্ষামূলক সমাধানের ধারণার প্রবর্তন করতেন। এটা গাউস এবং রিম্যান সম্পর্কে খাটে এবং আইনস্টাইনের যাঁরা সমসাময়িক যাঁদের মধ্যে আছেন, হারমান মিনকাউস্কি, ডেভিড হিলবার্ট, ফেলিক্স্ ক্লাইয়েন এবং এমা নোয়েথার—তাঁরা সকলেই আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে ব্যবহার করে কয়েকটি অপূর্ব গাণিতিক সাধারণীকরণ করেছেন।

ব্যাপক ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেখতে গেলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম-চতুর্থাংশের গাণিতিক গবেষণায় দুটি ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়, যেটা পূর্বোক্ত পণ্ডিতদের কাজকর্ম ও লেখাপত্রের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। জ্যামিতিক ধারণাগুলিকে বিস্তার করা কিন্তু যার কোনো, বলতে গেলে, ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই এবং একেবারে নির্দিষ্ট, সূক্ষ্ম ও জটিল সংজ্ঞাগুলি নির্ধারণ করা, যেগুলি পদার্থগত ধারণাগুলির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় এবং সেগুলি তাদের গাণিতিক যন্ত্রপাতির (বা হিসাবপত্র ইত্যাদি নিয়ে সবকিছু apparatus) জন্যে কাজে লাগে। এর জন্য প্রয়োজন ছিল এমন একজন

১ Philip Frank, op. cit. p. 240.

২ এখানে অবশ্য যন্ত্রপাতি বা apparatus বলতে শুধু গবেষণাগারের যন্ত্র-পাতির কথা বলা হচ্ছে না, পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যার সমাধান করতে যে ধরনের অঙ্কের প্রয়োজন হয়, তার কথাও বলা হচ্ছে।—অনুবাদক।

পদার্থবিজ্ঞানীর যাঁর মন পরম্পরাগত দেশ কাল-এর ধারণাগুলিতে ভারাক্রান্ত নয়।

হিলবার্ট একবার বলেছিলেন; "আমাদের অংকের গটিনগেনে প্রতিটি রাস্তার ছেলেও চতুর্মাত্রিক জ্যামিতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের চেয়ে বেশি বোঝে। তথাপি আইনস্টাইনই কাজটা করতে পেরেছেন, গণিতজ্ঞরা নয়।"(১) এটা হিলবার্ট বুঝিয়েছেন এইভাবে যে, আইনস্টাইন "দেশ ও কাল এর দর্শন ও গণিত সম্পর্কে কিছুই শেখেন নি।"

পদার্থগত বাস্তবতার ধারণাতে যে একটা নতুন, পরম্পরা-বহির্ভূত সম্ভাব্য বহুমাত্রিক এবং অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি হতে পারে, এটা লোভাচেভস্কি, গাউস্ এবং রিম্যানের মনে হয়েছিল। তবে সেটা একটা পদার্থগত তত্ত্বের পর্যায়ে পৌঁছয় নি। বিকাশের পর্যায়ে গণিত থেকে যেন 'কার্যত' এক ধরনের পদার্থগত ধারণার 'উদ্ভব' হয়, তারা গণিতের মধ্যেই গায়েব হয়ে যায়, যেমন যে ইলেকট্রনেরা ফোটনদের নির্গত করে তাদের গায়েব করে নেয়। ঠিক তেমনি পদার্থবিজ্ঞানও 'কার্যত' গাণিতিক ভাবমূর্তির উৎসারণ ঘটায়, যেটা নতুন গাণিতিক স্কুলের বা ঘরানার ক্ষেত্রে যেন নতুন পথনির্দেশের নিশানা হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে গণিতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে পদার্থগত তত্ত্ব, যাকে চতুর্মাত্রিক জ্যামিতির সম্পর্কতে বাস্তব পদার্থগত অর্থ দেওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তার বিষয়মুখিতা, প্রপঞ্চবাদ-ভিত্তিক মর্মবস্তু নয়। লোরেনজ্-এর তত্ত্বের 'পরে ভিত্তি করে পোঁয়েকারে যখন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে তাঁর অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু উদ্ভাবনী দক্ষতার সাহায্যে গাণিতিক যন্ত্রের(২) বিকাশ সাধন করলেন, তখন আলোর গতিবেগের নিত্যতার চরিত্র ছিল প্রপঞ্চবাদ-ভিত্তিক; মিনকাউস্কি-র ধারণাগুলি যেমন পদার্থবিজ্ঞানে অথবা জ্যামিতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল, যেটা এসেছিল আলোর গতিবেগের নিত্যতার বিষয়মুখী চরিত্র এবং আইনস্টাইনের দ্বারা আবিষ্কৃত দেশ ও

১ Philip Frank, op. cit. p. 249.

২ mathematical apparatus বলতে নিশ্চয়ই এখানে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি বোঝানো হচ্ছে, না, বলা হচ্ছে যে গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে গণিতের সমস্যাগুলির সমাধান করা যায়।—অনুবাদক।

কাল-এর বিষয়মুখী অবিচ্ছেদ্যতা থেকে—এটা (অর্থাৎ, পৌয়েকার-এর তত্ত্ব—অনুবাদক) সেরকম প্রভাব বিস্তার করে নি।

মিনকাউস্কি দেখিয়েছেন যে, আলোর গতিবেগের নিত্যতার নীতিকে খাঁটি জ্যামিতিক চেহারা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। 'ঘটনা'র ধারণাকে তিনি নিয়ে এসেছেন যেন একটা বিশেষ দেশগত বিন্দুতে একটা বিশেষ মুহূর্তে একটা কণার স্থান নির্ধারণ করার তত্ত্বে। অতএব একটা 'ঘটনা'কে চারটি স্থানাঙ্ক দিয়ে একটি বিন্দু হিসাবে উপস্থিত করতে হয়: তিনটি দেশগত এবং আর একটি কালগত, যাদের বিভিন্ন হিসাবে মাপা হয়। মিনকাউস্কি তাকে বলেছেন **বিশ্ব-বিন্দু**। গতিকে দেখানো হচ্ছে কয়েকটি বিশ্ব-বিন্দুর সামগ্রিকতা দিয়ে, যাকে বলা হয় **বিশ্ব-লাইন**। সকল 'ঘটনা'র সামগ্রিকতা, অর্থাৎ, মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে সেটা বিশ্ব-বিন্দুগুলির চতুর্মাত্রিকতার সমগ্রতা—দেশ-কাল-এর চতুর্মাত্রা, যেটাকে মিনকাউস্কি 'বিশ্ব' বলে অভিহিত করেছেন।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মৌলিক সূত্রগুলিতে তেমনি গতির চতুর্মাত্রিক ধারণা পাওয়া যায়। তবে মিনকাউস্কি চাঁচাছোলা ভাবে 'বিশ্বে'র ধারণাকে এতো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন, যাতে তত্ত্বের অগ্রগমনে সুবিধা হয়েছে।

দেশ ও কাল-এর স্বতন্ত্রতার চলতি ধারণাগুলির পরিবর্তে চতুর্মাত্রিক দেশ-কাল-এর 'বিশ্ব' আমদানি করাতে নিউটোনীয় বলবিদ্যাতে 'একই ছাঁচের' নতুন ধরনের বলবিদ্যার স্থান দিতে হল, যেটা অনেক বেশি সমন্বয়পূর্ণ এবং সুসঙ্গত, যাতে অনেক বেশি 'অন্তর্নিহিত পূর্ণতার' এবং 'বাইরের থেকে অনুমোদনের' এবং 'ধ্রুপদী ক্ষেত্র'-এর অনেক কাছাকাছি পৌঁছায়।

এখন দেখা যাক, কী করে আপেক্ষিকতার যুক্তিসম্মত এবং ইতিহাসগত সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র নিউটোনীয় বলবিদ্যাকেই নয়, 'ধ্রুপদী আদর্শ'কেও আঘাত করতে চায়। এই আপেক্ষিকতার তত্ত্বজনিত গতিবিদ্যা, অর্থাৎ, আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মধ্যে বল, শক্তি ও ভর-এর প্রভাবে বস্তু-দেহগুলির যে ত্বরণবেগ সঞ্চারিত হয়, সেই উপপাদ্য থেকেও এসেছিল।

আপেক্ষিকতার মৌলিক প্রকল্পগুলি থেকে আইনস্টাইন গতিবেগ যোগ করার নতুন নিয়মের উদ্ভাবন করেছিলেন। মনে করা যাক, একজন লোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৫০,০০০ কিলোমিটার বেগে (দেড় লক্ষ অর্থাৎ, আলোর গতিবেগের অর্ধেক) একটি মহাকাশযানে চেপে যাচ্ছে। আরও একটি মহাকাশযান ঐ একই দ্রুতি নিয়ে প্রথমটির দিকে এগোচ্ছে। গতি-

বেগের হিসাবের ধ্রুপদী নিয়মানুসারে দুটি মহাকাশযানের আপেক্ষিক গতি হবে ১,৫০,০০০ + ১,৫০,০০০ = ৩,০০,০০০ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে, যেটা আলোর গতিবেগ। আইনস্টাইন নতুনভাবে গতিবেগ যোগ করার নিয়মের প্রকল্প পেশ করেছেন। তাতে যোগফল দাঁড়াবে ২,৪০,০০০ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। আইনস্টাইনের নিয়ম থেকে যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা হল, যে কোনো ছককেই, যা দিয়ে মাপজোক করা হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বস্তু আলোর গতিবেগের চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না। গতিশীল বস্তুদেহে আরও অধিক বল প্রয়োগ করা হলে গতিবেগ বাড়বে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাদের যুক্ত গতিবেগ আলোর গতিবেগের অপেক্ষা বেশি হবে না। গতিবেগ যখন আলোর দ্রুতির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে, বেশি বেশি বল প্রয়োগ করার ফলে যেটুকু পরিমাণে গতিবেগের বৃদ্ধি হবে, সেই পরিমাণটুকু ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসবে।

আইনস্টাইন দ্ব্যর্থহীনভাবে এই ধারণাকে গ্রহণ করলেন যে, আলোর গতিবেগের অপেক্ষা কোনো কিছুই দ্রুত দৌড়তে পারে না, আলোর গতিবেগের এই সীমিত চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ প্রকল্প ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ থেকে আসছে। আলোর অপেক্ষা গতি দ্রুততর হবে এ সম্পর্কে জনবোধ্যভাবে যা লেখা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ জোর দিয়ে সমালোচনা করেন। এ ছিল 'লুমেন' নামে একটা কল্পবিজ্ঞান কাহিনী, এটা লিখেছিলেন ফরাসি জ্যোতির্বিদ, ক্যামিইল ফ্ল্যামারিয়ঁ। তিনি তাঁর লুমেন-কে প্রতি সেকেণ্ডে ৪,০০,০০০ কিলোমিটার গতিতে, অর্থাৎ, আলোর গতিবেগের অপেক্ষা প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ কিলোমিটার বেশি বেগে দৌড় করান। তাহলে লুমেন আলোক-তরঙ্গদের ছাড়িয়ে যায় এবং তাহলে যারা তাদের উৎস থেকে অনেক অনেক আগে বেরিয়েছে তাদের দেখতে পায়। সে ওয়াটারলু-র যুদ্ধের শেষটা দেখতে পায় সেই যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বেই এবং মাঝখানে কামানের গোলাগুলি কামানের নলের মুখে ঢুকে যায়, মৃত ব্যক্তিরা জেগে ওঠে, লড়াইয়ে যোগ দেয় এবং এই ধরনের আরও কিছু।

১৯২০ সালের এপ্রিলে মসৎস্কভস্কি ফ্ল্যামারিয়ঁর গল্পটা আইনস্টাইনকে বলেন, তিনি এই গল্পে বর্ণিত ছবিটার কঠোর সমালোচনা করেন। মসৎস্কভস্কি ফ্ল্যামারিয়ঁর পক্ষে বলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, গল্পটা কেবল-

মাত্র কাল-এর আপেক্ষিক চরিত্রকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। আইনস্টাইনের নিম্নলিখিত জবাব তিনি উদ্ধৃত করেছেন।

"এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার ও উলট-পালট কল্পনা সময় বা কাল-এর আপেক্ষিকতা সম্পর্কে ঠিক ততখানিই প্রাসঙ্গিক (যেহেতু এটা নতুন বলবিদ্যা থেকে আসছে), যতটা আমাদের ধারণা যে কাল বা সময় তাড়াতাড়ি বা আস্তে কাটছে কি, না, সেটা আমাদের আনন্দ বা বেদনার বিষয়ীমুখী ইন্দ্রিয়-গত সংবেদনশীলতার 'পরে নির্ভর করে। এক্ষেত্রে অন্তত বিষয়ীমুখী ইন্দ্রিয়গত সংবেদনশীলতার আসল বা বাস্তব, যেটা লুমেন সম্পর্কে বললে অনেক বেশি বলা হয়, অস্তিত্ব একটা অর্থহীন সিদ্ধান্তের সূত্র বলে মনে হয়। লুমেনকে আলোর গতিবেগের অপেক্ষা দ্রুত দৌড় করানো হচ্ছে। এটা একেবারেই শুধু অসম্ভব নয়, এটা নিতান্তই অর্থহীন কারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোর গতিবেগ হচ্ছে একেবারে শেষ সীমানা (অর্থাৎ এর অপেক্ষা দ্রুত আর কিছু হতে পারে না)। ত্বরণ-বেগ যতই বেশি হোক এবং যত দীর্ঘ সময় ধরেই কাজ করুক না কেন, এই সীমানাকে কখনও অতিক্রম করতে পারে না। আমরা মনে করতে পারি, লুমেন-এর যেন ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে আর তাহলে তার বস্তুদেহও রয়েছে। কিন্তু আলোর গতি-বেগ থাকলে একটা বস্তুর ভর হবে অসীম বা অনন্ত এবং তার থেকে বেশি দ্রুতি তৈরি করার ধারণাটাই অসম্ভব ও অবাস্তব।(১) কেউ হয়তো তার চিন্তাব দ্বারা এমন অবাস্তব (বা অসম্ভব) জিনিস ভাবতে পারে, যেটা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে খণ্ডন করে কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিকে নয়।"(২)

মসৎস্কভস্কি কিন্তু আলোর গতিবেগের অপেক্ষা দ্রুততর গতিবগ কল্পনা করার ফ্ল্যামারিয়ঁার অধিকারকে সমর্থন করতেই থাকলেন। তিনি এই ধরনের একটা কাল্পনিক ধারণার প্রস্তাব করলেন। একটা আলোর শিখা প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ বার নিজের চারধারে চক্কর খেতে খেতে(৩) ১০০০ কিলোমিটার

---

১ Mass বা ভর হচ্ছে, গতির প্রতিবন্ধকতা করে যেটা—resistance to motion। তাহলে অসীম ভর হলে গতির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতাও অনন্ত বা অসীম হবে, অর্থাৎ আলোর গতিবেগের অপেক্ষা দ্রুত দৌড়নো সম্ভব নয়।—অনুবাদক।

২ A. Moszkowski, op. cit., S. 107-08

৩ যেমন লাইটহাউসে অথবা এয়ারপোর্টে আলোর সন্ধানী রশ্মি নিজের চারধারে চক্কর খায়।—অনুবাদক।

দূরে একটা আলোক রশ্মিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাহলে এই আলোর শিখার শীর্ষদেশটা উপরের আকাশে প্রতি সেকেণ্ডে ৬,০০,০০০ কিলোমিটার, অর্থাৎ আলোর গতিবেগের দ্বিগুণ বেগে দৌড়বে।

আইনস্টাইনের তত্ত্বকে নাকচ করার এই ধরনের অনেক প্রচেষ্টা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে বেশির ভাগই যথার্থই ভুলে যাওয়া গেছে। এখন যে উদাহরণ আমরা দিলাম, তাতেও আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে খণ্ডন করা যায় না। কারণ চক্কর খাচ্ছে যে-আলোর শিখা সেটা নিশ্চয়ই অপরিবর্তনীয় কোনো বস্তুকে হাজির করছে না। আমরা আলোর শিখাকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিয়ে ২০০০ কিলোমিটার তফাতে দুটি পর্দাকে আলোকিত করতে পারি। কিন্তু তারা যে আলোকিত হচ্ছে, সেটা এমন কোনো ঘটনা নয়, যার একটা হচ্ছে অন্যটার হেতু অথবা ফল। একটা ঘটনা, যেখানে পদার্থগত বস্তুর এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যেতে কম সময় লাগছে—সেটা আলোর উৎসতে কোনো ঘটনা ঘটার প্রভাবে হয় না।

আইনস্টাইনের মতে, যদি দুটি বিভিন্ন বিন্দুতে দুটি ঘটনা ঘটবার মধ্যে আলোর সেই স্থান অতিক্রম করতে যে সময় লাগে, তার চেয়ে কম লাগে, তাহলে বুঝতে হবে যে, এই দুটি ঘটনা ইতিহাসগতভাবে কোনো একটি বিশেষ ঘটনার অপরিবর্তনীয় পদার্থগত ব্যাপার নয়।

আপেক্ষিকতাকে অপরিবর্তনীয় ভৌত পদার্থের গতিবিধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটা তত্ত্ব হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে। এই ভৌত পদার্থগুলি হল সেইসব কণা যারা পরস্পরকে ধ্বংস করে না অথবা এক কণা থেকে অন্য কণা উৎপন্ন হয় না—তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থাকে এবং তারা পরস্পরের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে চলাফেরা করে। এই ধরনের কণাদের ইতিহাস নিয়ে যে ঘটনাবলী, সেগুলি বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন বিন্দুতে কণাদের স্থান নির্ধারণ করে। এই ধরনের স্থান নির্ধারণ করার অর্থ হল যে, একটা মাপবার দণ্ডের উলটো দিকে একটা বিশেষ খাঁজ কাটা স্থানে এই কণার অবস্থিতি (যার একটা দিক একটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার উৎসে রয়েছে) একটা বিশেষ মুহূর্তে, যেখানে বারবার ঘুরে-ফিরে (উদাহরণস্বরূপ, একটা ঘড়ির কাঁটার গতি) একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ক'রে কয়েকবার একটি চক্রকে সম্পূর্ণ করছে, যেখানে ঘটনা ঘটবার পরের সময়কে প্রাথমিক সময় (বা সেখান থেকে সময় গণনা শুরু করা হচ্ছে) বলে ধরা হয়।

অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তেমনি নতুন মুস্কিল দেখা দিতে লাগল, সব সময়েই একটি কণার এই ধরনের স্থান নির্ধারণকে একটি বিশেষ পদার্থগত অর্থ দেওয়া যায় না অথবা সেই কণার জীবনকালের একটি ঘটনা যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘটছে, তা বলা যায় না। ১৯৩০ সাল থেকে একটি একীভূত তত্ত্বের বিকাশ—যেটা আপেক্ষিকতা তত্ত্বের থেকে বেরিয়ে এসেছিল, এবং স্থানাঙ্ক ও ঘটনাবলীর সময়ের যে অনিশ্চয়তার কথা বলেছিল, সেটা তাত্ত্বিক পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা মৌলিক কাজ বলে মনে হয়।

এই সমস্যার অনুসন্ধানের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করতে হলে আইনস্টাইনের লেখাপত্রে ভর ও গতির ধারণাগুলির যে রূপান্তর ঘটেছে, সেগুলি আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে।

আলোর কাছাকাছি গতিবেগে পৌঁছতে পারলে বস্তুগুলি বাইরের থেকে প্রয়োগ-করা বলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে, তাতে গতিবেগ যত বাড়তে থাকে ত্বরণবেগ তার তুলনায় ক্রমশই অপেক্ষাকৃত ভাবে কমে যায়। যেমন গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর(১) ভর বৃদ্ধি পায়, শেষ অবধি গতিবেগ যখন আলোর গতিবেগের সমান হয়, তখন ভর হয়ে দাঁড়ায় অনন্ত বা অসীম। ভর ও গতিবেগের এই সম্পর্ক থেকে আইনস্টাইন শক্তি ও ভর-এর মধ্যে সম্পর্ক (বা সমীকরণ) বার করেন।

একটি বস্তু-দেহ যখন স্থির থাকে তখন তার একটা বিশিষ্ট ভর থাকে, যাকে বলা হয় **স্থিতাবস্থার ভর** (rest mass)। আইনস্টাইন সূত্রায়িত করলেন যে, একটা পদার্থের স্থিতাবস্থার ভর তার অভ্যন্তরীণ শক্তির আনুপাতিক হিসাবে হবে। এই শক্তি (যাকে এর্গস দিয়ে মাপা হয়) তার স্থিতাবস্থার (যাকে গ্রাম দিয়ে মাপা হয়) ভর-এর সঙ্গে আলোর গতিবেগের বর্গক্ষেত্রকে (প্রতি সেকেণ্ডে সেন্টিমিটার দিয়ে হিসাব করা হয়) গুণ করে যা দাঁড়ায় তার সমান।(২)এর ফল দাঁড়ায় একটা প্রকাণ্ড সংখ্যা, কারণ আলোর গতিবেগ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০০,০০০,০০০(৩×১০^{১০}) সেন্টিমিটার এবং তাহলে তার বর্গক্ষেত্র হল $(৩ \times ১০^{১০})^{২} = ৯ \times ১০^{২০}$ = ৯০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,

১ যে বস্তু ক্রমশই আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতিবেগ নিয়ে দৌড়চ্ছে।
—অনুবাদক।

২ $E = mc^2$, যেখানে E হচ্ছে শক্তি, m হচ্ছে ভর এবং c হচ্ছে আলোর গতিবেগ।—অনুবাদক।

যা থেকে বোঝা যায় ভর-এর একক সংখ্যাতে (ইউনিটে) কত প্রচণ্ড শক্তি নিহিত রয়েছে।

সকল পদার্থের‌ই স্থিতাবস্থার ভর থাকে না, তড়িৎ-চুম্বকীয় কণাগুলি—ফোটন অথবা আলোকণিকা—তাদের কোনো স্থিতাবস্থার ভর নেই ; যেহেতু আলো প্রতি সেকেণ্ডে ৩×১০^{১০} সেন্টিমিটার গতিবেগে যে কোনো নির্দেশক কাঠামোতেই প্রবহমান, সেহেতু ফোটন কোনো অবস্থাতেই স্থির থাকে না।

আগে যা বলা হয়েছে, একটা বস্তুর ভর তার গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে বেড়ে যায়। এটা হল **গতিশীল অবস্থার ভর** এবং এর সঙ্গে গতির শক্তির সম্পর্ক আছে। দেখা যাবে যে, প্রচলিত (বা সাধারণ) গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে একটা গতিশীল বস্তুর ভর ও অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধি এত সামান্য পরিমাণে হয় যে, সেটা হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

যে বিশাল সংখ্যা, যাতে কুড়িটা শূন্য ব্যবহার করতে হচ্ছে(১), যাতে এক সময়ে আপেক্ষিকতা যে কত দূরের ব্যাপার তার মাপ ছিল এবং সেজন্যে তার কোনো প্রয়োগ ছিল না,—আজকে মানুষের জীবনে তার প্রভাব পড়ছে। এমন একটা যুগের শুরু হচ্ছে, যাতে বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তির **সামগ্রিকতার** তুলনায় বেশ ভালো পরিমাণের শক্তিকে (এনার্জি) কাজে লাগানোর প্রস্তাব উঠেছে। পারমাণবিক রি-অ্যাকটর যন্ত্রে এই শক্তির হাজার ভাগের এক ভাগমাত্র মুক্ত হয়। কিন্তু প্রচলিত শক্তির উৎসগুলিতে সমগ্র শক্তির দশলক্ষ ভাগের মাত্র এক ভাগ নিয়ে কাজ করা হয়। আমাদের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে, বস্তুর অভ্যন্তরে যত শক্তি আছে তার প্রায় সবটাকে ব্যবহার করা। এটা এমন একটা প্রক্রিয়ার দ্বারা বুঝতে বা ধরতে পারা যায়, যাতে অভ্যন্তরীণ শক্তি (তথা স্থিতাবস্থার ভর) গতির শক্তিতে রূপান্তরিত হয় (এবং সেইমতো গতিশীল ভর-এ)। এই ধরনের রূপান্তরণে একটি কণা, যার স্থিতাবস্থার ভর আছে, সে এমন অন্য কণাতে রূপান্তরিত হবে, যার স্থিতাবস্থার ভর নেই। আমরা পরে দেখব যে, এই ধরনের রূপান্তরণের কথা আগেভাগেই বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল—যখন আপেক্ষিকতা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং পরে পরীক্ষার দ্বারা তাদের পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল। আমরা আরও দেখব এক ধরনের কণাদের অন্য ধরনের কণাতে

১ অর্থাৎ, একটা সংখ্যার পেছনে সাতটা শূন্য বসালে যদি এক কোটি হয়, তাহলে কোটির কোটির দশ লক্ষ, এই হিসাব দাঁড়ায়।—অনুবাদক।

রূপান্তরণ (একেবারে চেহারা বদল) শুধুমাত্র নিউটোনীয় জগতের চেহারাকেই নয়, পরন্তু 'ধ্রুপদী ধারণা'কেই অতিক্রম করে যায়—যাতে অপরিবর্তনীয় বস্তু-দেহগুলির গতিকে বিচার করা হয়। আইনস্টাইনের ধারণাগুলির এটাই পরিণতি। জগতের ধ্রুপদী ধারণাগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে প্রতিপাদ্যরূপে হাজির করতে গিয়ে সেগুলি আরও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রাগ ও জুরিখ

> কেপলার জীবনভর যে কাজ করেছিলেন, সেটা তখনই সম্ভব হয়েছিল—যখন যে মননশীল ঐতিহ্য নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন, তা থেকে বহুলাংশে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। এ থেকে শুধু গির্জার আধিপত্যভিত্তিক ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিষয়টিকেই ধরা হচ্ছে না, পরন্তু প্রকৃতির সাধারণ ধারণাগুলি এবং মহাবিশ্ব ও মানুষের পরিমণ্ডলের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা আছে, সেটা সমেত বিজ্ঞানে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ধারণাগুলির আপেক্ষিক গুরুত্বকেও ধরা হচ্ছে।
>
> আইনস্টাইন

মাইকেলসনের পরীক্ষার ফলে যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, লোরেন্‌জ্‌-এর প্রকল্পের মধ্যে যে আপাত কৃত্রিম চরিত্র ছিল এবং আইনস্টাইনের তত্ত্বে তাঁর যে নিখুঁত রূপ ও পূর্ণাঙ্গ সমাধান পাওয়া গিয়েছিল—এ সবই আইনস্টাইনকে একটা ব্যাপক বৈজ্ঞানিক মহলে দ্রুত পরিচিত করে তোলে। অন্তত একজন, ম্যাকস প্ল্যাংক মেনে নিলেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞানে একটি প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে, এমন ধরনের প্রতিভা যেটা শতাব্দীতে মাত্র একবারই দেখা যায়। তাঁর তত্ত্বের স্বীকৃতি, প্রচার এবং আরও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইনের খ্যাতি দ্রুত লয়ে বেড়ে গেল এবং শেষ

অবধি, সাধারণত যা হয়ে থাকে, যে দেশে তিনি বাস করতেন সেখানেও পৌঁছে গেল।

প্রস্তাব এল যে, আইনস্টাইনকে জুরিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অধ্যাপকের পদ দেওয়া হোক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে কাউকে অবশ্য আগে প্রিভাটডোৎজেন্ট(১) না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসার করা হয় না। কাজেই বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিভাটডোৎজেন্ট হবার জন্যে আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানানো হল (১) যাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি জুরিখ-এ প্রফেসার পদের যোগ্য হতে পারেন। প্রিভাটডোৎজেন্ট হচ্ছে এমন একজন শিক্ষক যিনি অতি অল্প মাইনেতে এমন সব বিষয়ে লেকচার দেবেন, যেটা পাঠ্যসূচির বাইরে। এই অবস্থার এটাই সুবিধা ছিল যে, তিনি বার্নের পেটেন্ট অফিসে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। আইনস্টাইন প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন, তবে খুব উৎসাহের সঙ্গে নয়। তিনি অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি পেটেন্ট অফিসে বরাবর কাজ করতে পারবেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবনা ছিল যে, লেকচারগুলি দিতে হলে তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটবে: পেটেন্ট অফিসের কাজটা সহজ ছিল বলে গবেষণার জন্যে তিনি যথেষ্ট সময় পেতেন।

১৯০৮-০৯ সালের শীতকালে আইনস্টাইন তাঁর কাজের সঙ্গে পেটেন্ট অফিসের কাজকে জড়িয়ে নিলেন। ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি প্রথম শিক্ষাজগতের সম্মান পেলেন যখন জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারি ডক্টরেট দিল এবং ক্যালভিন-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫০তম বার্ষিকী উৎসবে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাল। এই উৎসবে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা বলেছেন যে, আইনস্টাইনের খড়ের টুপি এবং আটপৌরে পোশাক—সেখানকার ফরাসি পণ্ডিতদের ফ্রক কোর্ট(২), ইংরাজ আচার্যদের মধ্যযুগীয় পোশাক-পরিচ্ছদের এবং সারা দুনিয়া থেকে আগত দু'শ প্রতিনিধির নানারকমের জমকালো পোশাকের মধ্যে একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিল।

ঐ একই বছরে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদটি খালি হল। এই পদের জন্যে মাত্র আর একজন প্রার্থী ছিলেন,

১ যেন প্রাইভেটভাবে কলেজের লেকচারার—অনুবাদক।
২ জমকালো উৎসবের কোট-প্যান্ট ইত্যাদি সুট্।—অনুবাদক।

ফ্রিডরিক্ অ্যাড্লার, যিনি ছিলেন জুরিখ্ পলিটেকনিকে আইনস্টাইনের সহপাঠী এবং তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিভাটডোৎজেন্ট। জুরিখ্ সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কাছে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। জুরিখ্-এর ক্যান্টনের(১) শিক্ষা-বোর্ডের বেশির ভাগ সভ্যই ছিলেন সোস্যাল-ডেমোক্রাট; কাজেই পদটি যখন খালি হল তখন তাঁরা অ্যাডলারকেই যোগ্যতম প্রার্থী বলে ঠিক করলেন। অ্যাডলার কিন্তু নিজে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, গবেষক হিসাবে তাঁর ক্ষমতা আইনস্টাইনের ক্ষমতার ধারে-কাছে যেতে পারে না; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মর্যাদা ও সাধারণ শিক্ষার স্তরকে উন্নত করতে যিনি অনেক কিছু করতে পারেন, সেরকম একজন মানুষকে পাওয়ার সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। অতএব জুরিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইন 'বিশেষ' অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হলেন।

'বিশেষ' পদটি ছিল পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপকের পদ থেকে নিচু স্তরের এবং আইনস্টাইনের আয় বার্ন শহরের থেকে খুব বেশি বাড়ল না। তাছাড়া জুরিখে বাস করার খরচ ছিল বেশি এবং মিলেভাকে শীগগিরই খরচ মেটাবার জন্যে বাড়িতে ছাত্র-বোর্ডার রাখার বন্দোবস্ত করতে হল। তা সত্ত্বেও আইনস্টাইন খুশি মনেই রইলেন। অনেক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল এবং তাদের মধ্যে ছিলেন মার্সেল গ্রস্‌মান, যিনি তাঁর ছাত্রজীবনের অনুরক্ত বন্ধু।

তাঁর ছাত্রদের কয়েকজনের স্মৃতিচারণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে আইনস্টাইনের একটা চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল বলবিদ্যা, তাপগতিবিদ্যা এবং তাপের গতি সম্পর্কে তত্ত্ব (kinetic theory of heat, ১৯০৯-১০), বিদ্যুৎশক্তি ও চৌম্বকত্ব এবং 'তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার কয়েকটি বিশেষভাবে নির্বাচিত বিষয়' (১৯১০-১১)।

হ্যানস্ ট্যানার ১৯০৯-১১ সালে আইনস্টাইনের লেকচারগুলিতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখছেন :

"খাটো পাৎলুন, ঘড়ির চেন লোহার শিকলি দিয়ে বাঁধা। এমন

---

১ সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান অনুসারে প্রতি বড় বড় শহরেই শাসনব্যবস্থা চালাবার জন্যে ক্যান্টন আছে (খানিকটা আমাদের করপোরেশনের মতন), তাদের হাতে কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অনেক বেশি অধিকার থাকে। —অনুবাদক।

আলুথালু পোশাকে আইনস্টাইন যখন প্রথম মঞ্চে উঠতেন, তখন আমাদের নতুন অধ্যাপক সম্পর্কে বেশ সন্দেহ দেখা দিত। তবে তাঁর লেকচার দেবার একেবারে বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা তিনি অতি সহজে আমাদের মন হরণ করে নিয়েছিলেন। একটা ভিজিটিং কার্ডের মতো এক টুকরো কাগজে তাঁর নোটগুলি লেখা থাকত এবং লেকচারে আলোচনার মতো পয়েন্টগুলিই তার মধ্যে থাকত। কাজেই আইনস্টাইনের লেকচারগুলি আসত সোজা তাঁর মাথা থেকে এবং আমরা তাঁর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাটা বুঝতে পারতাম। এটা (আইনস্টাইনের লেকচার) নিশ্চয়ই কয়েকটি নিভুর্ল কায়দায় সংযত ভাষণের চাইতে বেশি উৎসাহ ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করত, ঐ ধরনের নিভুর্ল পদ্ধতিমাফিক ভাষণ এমন কি আমাদের উত্তেজিত করত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা খানিকটা তিক্ততার সঙ্গে বুঝতে পারতাম শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কতটা তফাৎ। এখানে (অথাৎ, আইনস্টাইনের লেকচারে) আমরা নিজেরাই বুঝতে পারতাম বাঁধা সড়ক দিয়ে না গিয়ে কিভাবে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক ফল পাওয়া যায়। প্রতিটি লেকচারের পরে আমরা মনে করতাম যে, আমরা নিজেরাও যেন ঐরকম লেকচারই দিতে পারি।"(১)

আইনস্টাইনের শিক্ষা দেবার পদ্ধতি ও গবেষণার বৈশিষ্ট্য, এই সঙ্গে তাঁর ধারণাগুলির বিষয়বস্তু, 'স্বাভাবিক' বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেত। তাঁর বক্তৃতার পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত সুসংহতি থাকত। অবশ্য কয়েকটি ধরে-নেওয়া অনুমানের 'পরে ভিত্তি করে ঠাসাভাবে বাঁধা তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পদার্থগত বাস্তবতার 'পরে যে ধারণা গড়ে উঠেছে, সেটা যতই আপাতবিরোধী হোক না কেন, সেটা বিস্ময়ে হতবাক শ্রোতাদের সামনে স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণাগুলি থেকে আপাতবিরোধিতা যতই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয়ে ক্রমশ বেরিয়ে আসে, ততই শ্রোতাদের কাছে সেটা স্বাভাবিক ও 'স্বতঃপ্রতিভাত' পূর্ণতা বলে প্রতীয়মান হয়। আইনস্টাইনের লেকচারগুলি ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার প্রতি নিবদ্ধ ছিল, যদিও মূল ব্যাপারগুলি সংশোধিত হবার পরে বিষয়বস্তুকে কী ভাবে ব্যবহার করা

১ C. Seelig. op. cit., p.171.

হবে সেটা বদলাতে হল। ছাত্রদের সামনে এ একটা সুগঠিত ইমারতের কাঠামো ছিল না। এ যেন একটা বাড়ি তৈরি করার জায়গা, আর আইনস্টাইন পুরানো বস্তাপচা প্ল্যানের পরিবর্তে নতুন বাড়িটা কি রকম হবে তার ব্লুপ্রিন্ট নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলেন।(১)

ট্যানার লিখছেন:

"১৯০৯ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে আমার মনে হয় না, আমি আইনস্টাইনের একটা লেকচারও বাদ দিয়েছি। প্রত্যেকটাই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। আমার মনে পড়ে, আমাদের সামনে ধ্রুপদী বলবিদ্যা থেকে (অন্য শিক্ষকদের লেকচারেও আমরা উপস্থিত থাকতাম এবং আইনস্টাইন যেভাবে বিষয়বস্তুতে পৌঁছতেন তার সঙ্গে তফাৎ বুঝতে পারতাম) প্ল্যাংকের কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা পর্যন্ত নতুন ধারণাগুলি পেশ করা হতো এবং তা নিয়ে বেশ উত্তপ্ত আলোচনা চলত।"(২)

আর লেকচারগুলির মধ্যে ও পরে আইনস্টাইনের ধারণাগুলির প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আচরণের মিল থাকত। "কোনো বিষয় বুঝতে না পারলেই আমরা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম। সাহস আমাদের শীগগিরই বেড়ে গেল এবং বোকার মতো প্রশ্ন করতেও আর আমরা ভয় পেতাম না। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যে আটপৌরে সম্পর্কের (অর্থাৎ, যার মধ্যে আনুষ্ঠানিক কিছু ছিল না—অনুবাদক) সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা আরও বেড়ে গেল কারণ দুই লেকচারের মধ্যে বিরতির সময়ে আইনস্টাইন আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। তিনি তাঁর সহজসরল আবেগপ্রবণতা নিয়ে একজন ছাত্রের হাত ধরে কোনো বিষয় আলোচনা করতেন, যেমন কোনো বন্ধুর সঙ্গে করা যায়।"(৩)

প্রায়ই সাপ্তাহিক সন্ধ্যাকালীন পদার্থবিদ্যার কোলোকিয়াম-এর (আলোচনা সভা—অনুবাদক) পরে আইনস্টাইন জিজ্ঞাসা করতেন: "আমার

১ অর্থাৎ, পুরানো তত্ত্বকে বারবার পুনরাবৃত্তি না করে নতুন তত্ত্ব খাড়া করার জন্যে যা উপাদান দরকার—যেমন তার ভিত্তিভূমি কী হবে, কিভাবে যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে এগোতে হবে ইত্যাদি।—অনুবাদক।

২ C, Seelig, op, cit., p, 172.

৩ Ibid., S. 171.

সঙ্গে বারান্দার কাফেতে কে আসবে?" সেখানেও আলোচনা চলবে, চলতে চলতে সেটা অনেক সময় পদার্থবিদ্যা ও গণিত ছাড়িয়ে অন্য বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক প্রশ্নে চলে যাবে। একদিন সন্ধ্যার বেশ খানিকটা পরে আইনস্টাইন ট্যানার ও অন্য এক ছাত্রকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। প্ল্যাংকের একটা পেপার তাদের দিয়ে তিনি তার ভুল ধরতে বললেন, এর মধ্যে তিনি কফি করতে চলে গেলেন। কফি তৈরি হয়ে গেল বটে কিন্তু ছাত্ররা তখনও প্ল্যাংকের ভুল ধরতে পারে নি, আইনস্টাইন তখন তাদের সেটা দেখিয়ে দিলেন। সেটা ছিল, একটা খাঁটি গাণিতিক সমস্যা যাতে পদার্থগত সিদ্ধান্ত যা হবে তার কোনো হেরফের হবে না। এই সূত্রে আইনস্টাইন তাদের কাছে গাণিতিক পদ্ধতি ও পদার্থগত সত্য সম্পর্কে কোনো রকম পূর্বপ্রস্তুতি না নিয়েই উপস্থিত মতো এক চমৎকার লেকচার দিলেন।(১)

জুরিখে পলিটেকনিক-এর পুরানো বন্ধু, মার্সেল গ্রস্‌মান-এর সঙ্গে তিনি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন; এই বন্ধুত্বের ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ভালো কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। আইনস্টাইন প্রায়ই গ্রস্‌মান-এর সঙ্গে আলোচনা করতেন, গ্রস্‌মান তখন ব্যাপৃত ছিলেন অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সমস্যা নিয়ে।

আইনস্টাইন ফ্রেডরিক অ্যাড্‌লার-এর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতেন। তাঁরা একই বাড়িতে থাকতেন এবং প্রায় নিভৃতে কথা বলার জন্যে ছাদের চিলেকোঠার ঘরে হাজির হতেন। খুব সম্ভব তাঁদের মধ্যে কিছু উত্তপ্ত দার্শনিক আলোচনা হয়েছিল। কারণ অ্যাড্‌লার ছিলেন মাখ-এর দার্শনিক মতের অনুগামী এবং তিনি আইনস্টাইনের জগৎপ্রপঞ্চের বিষয়মুখী বাস্তবতার কথা স্বীকার করতেন না। মাখ-এর মতো অ্যাড্‌লারও আপেক্ষিকতার তত্ত্বের বিরোধিতা করতেন।

আইনস্টাইনের বন্ধুদের মধ্যে দুজন জুরিখ-এর অধ্যাপক ছিলেন: এমিল জুরখার, তিনি ছিলেন ক্রিমিন্যাল আইনের বিশেষজ্ঞ এবং আলফ্রেড স্টার্ন, তিনি ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। আইনস্টাইনেরই এটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিতের সঙ্গে সংস্রবহীন ব্যক্তিদের সঙ্গেও বৌদ্ধিক

১ Ibid., S. 173-74.

যোগাযোগ করতেন। আইনবিদ, ইতিহাসবিদ এবং পদার্থবিদদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে পছন্দ করতেন। আইনস্টাইনের মূল ধারণাগুলির চরিত্রের সঙ্গে এটার মিল ছিল। পদার্থবিদ্যার বিশেষ বিষয় নিয়ে গবেষণার স্তর থেকে তাঁর মন পদার্থগত বাস্তবতার মৌলিক সমস্যাগুলির স্তরে গিয়ে পৌঁছত এবং এই পথেই তিনি তাঁর সবচেয়ে বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন (তার মধ্যে কয়েকটিকে অবিলম্বে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে লাগানো যায়)। অনেকে আইনস্টাইনের এই ঝোঁককে বিজ্ঞান থেকে দার্শনিক ধারণাগুলির মধ্যে আশ্রয় নেওয়া বলে মনে করেছেন। এমনকি ভাল্টার নের্নস্ট-এর মতো এত তেজস্বী ও উদার মনের পণ্ডিতও মন্তব্য করেছেন যে, ব্রাউনীয় গতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের তত্ত্বের স্থান তাঁর আপেক্ষিকতার উপরে কারণ শেষোক্তটা (অর্থাৎ, আপেক্ষিকতার তত্ত্বটা—অনুবাদক) মোটেই পদার্থগত তত্ত্ব নয়, বরঞ্চ একে একটা দার্শনিক সাধারণীকরণ বলা যেতে পারে। এটা ছিল 'প্রাক্-পরমাণু' যুগের আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে একটা আদর্শ মূল্যায়ন।

আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি এবং ঔৎসুক্য এমন ধরনের ছিল, যার জন্যে তিনি এমন সব ব্যক্তির সঙ্গে বিজ্ঞানের অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন, যাঁরা পদার্থবিদ নন, এমনকি বিজ্ঞানীও নন। কারণ এই ধরনের মানুষরাই দেশ-কাল সম্পর্কে আরো সাধারণ প্রতিপাদ্যগুলিকে বুঝতে সক্ষম হয়; তারা এমন ধরনের 'ছেলেমানুষী' চিন্তা করতে পারে—যেটা পেশাদার ও ছক-বাঁধা বিচারের পাকাপোক্ত ও চিরাচরিত ধারণাজাত 'স্বতঃপ্রতিভাত' বিশ্বাসের দ্বারা কলুষিত হয় নি। আইনস্টাইনের কাছে এই ধরনের চিন্তা পদার্থগত ধারণাগুলিকে রূপায়িত করার পক্ষে যেন একটি পথের বাঁকের মতো ছিল (যেখান থেকে নতুনভাবে চিন্তা করা সম্ভব—অনুবাদক)।

ইতিহাসবিদ আলফ্রেড স্টার্ন-এর সঙ্গে আইনস্টাইনের আলাপ শুরু হয় ছাত্রজীবন থেকে। অনেক পরে, স্টার্ন-এর অশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষে আইনস্টাইন তাঁকে লিখেছিলেন : "যখন বিশৃঙ্খলভাবে মতামত এবং মূল্যবোধ পালটে যাচ্ছে, সে সময়ে আপনার মতন বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন এরকম লোক আমি আর দেখি নি।"(১)

আইনস্টাইনের আর একজন নিকট-বন্ধু ছিলেন বাষ্প-টারবাইন মেসিনের

১ C. Seelig, op. cit., p. 185.

বিশেষজ্ঞ লরেন্স স্টোডোলা। ১৯২৯ সালে স্টোডোলা সম্পর্কে আইনস্টাইনের বিবরণ শুধুমাত্র একজন বড় তাপ-ইন্‌জিনিয়ার সম্পর্কেই আমাদের ঔৎসুক্য জাগ্রত করে না, এর থেকে আইনস্টাইনের নিজের চরিত্রেরও আমরা একটা গভীর পরিচয় পাই। এই বিবরণের প্রায় সবটুকুই এখানে উদ্ধৃত করা হল :

"স্টোডোলা যদি রেনেসাঁসের(১) যুগে জন্মাতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই একজন বড় চিত্রকর অথবা ভাস্কর হতেন, কারণ তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ হচ্ছে জোরালো কল্পনাশক্তি এবং সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। গত একুশ বছরে এই ধরনের চরিত্র সাধারণত ইনজিনিয়ারিংয়ের দিকে ঝুঁকেছে। আমাদের প্রজন্মের সৃষ্টিশীল আকাঙ্ক্ষা এই দিকে প্রকাশ পেয়েছে এবং একজন অদীক্ষিত (অর্থাৎ এ ব্যাপারে যে কিছুই জানে না—অনুবাদক) মানুষ যা কখনও কল্পনা করতে পারে না, সুন্দরের জন্যে সেই আকুল আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে তৃপ্তি লাভ করেছে। ১৮৯২ থেকে ১৯২৯ অবধি একজন শিক্ষকরূপে তাঁর সফল কর্মক্ষেত্রে তিনি তাঁর ছাত্রদের 'পরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন, তাঁর ছাত্ররা সবসময়েই তাদের শিক্ষক ও তাঁর কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রচণ্ড উদ্দীপনা বোধ করত। শিক্ষকতা সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের (অর্থাৎ আইনস্টাইনের—অনুবাদক) অভিজ্ঞতা যখন একেবারে আনকোরা, তখন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের কোর্স (বা পাঠক্রম) পড়াতে গিয়ে লেকচারের (অর্থাৎ, আইনস্টাইনের—অনুবাদক) আনন্দ ও আতঙ্কের মধ্যে একটি আশ্চর্য ছবি লেকচার ঘরে ফুটে উঠল। ইনি হলেন স্টোডোলা, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যাতে প্রচণ্ডভাবে আগ্রহী মানুষ। এই বড় মানুষটির উপস্থিতিতে (লেকচার শোনার জন্যে—অনুবাদক) যে সশ্রদ্ধ ভয়ের উদ্রেক হয়েছিল, সেটা তাঁর সহৃদয় কথাবার্তা ও শুভেচ্ছা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে দূর হল। তাঁর বিনয় অভিভূত করে দেয়। তাঁর মনের জীবন্ত সতেজ প্রকাশ এবং তাঁর আশ্চর্য রকমের নম্র ব্যবহারকে চিত্তের প্রসাদগুণের প্রসন্নতার পাশাপাশি রেখে তুলনা করা যেতে পারে। জীবন্ত প্রাণীর কষ্ট তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিত, বিশেষ

(১) ইউরোপীয় রেনেসাঁসের শুরু হয়েছে মোটামুটি পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। তার অন্যতম প্রধান পুরুষ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে আমরা দেখি, একাধারে চিত্রকর ও বড় বৈজ্ঞানিক রূপে। এখানে আইনস্টাইন সেই রকম ইঙ্গিত করছেন।—অনুবাদক।

করে তাদের উপর মানুষের নিরর্থক ক্রূরতা তাঁকে অভিভূত করত। আমাদের কালের সকল রকমের সমস্যা নিয়ে তিনি ভাবনাচিন্তা করতেন। সব স্বাধীন চেতা মানুষের মতোই এই মানুষটিও ছিলেন নিঃসঙ্গ এবং জনসাধারণের প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধ ছিল খুব উন্নত। যে ভীতি মানুষের জীবনের উপর প্রভুত্ব করে এবং দুনিয়ার নানা ঘটনার মুখোমুখি হয়ে নিয়তির মতো যে ট্র্যাজেডী ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে মানুষের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে তিনি কষ্ট পেতেন। সাফল্য এবং বহুজনের ভালোবাসা তাঁর বিষাদগ্রস্ত সংবেদনশীল মনের কষ্টকে লাঘব করত না এবং তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। সঙ্গীতে প্রগাঢ় অনুরাগ এবং তাঁর দুই কন্যার প্রতি ভালোবাসা তাঁকে শান্তি দিত। তাদের মধ্যে একজন, হেলেনকে তিনি হারালেন। এই আশ্চর্য মানুষের মনোজগতের মহত্ত্বের প্রতিফলন দেখা গেল তাঁর গভীর শোকের মধ্যে।"(১)

প্লুটার্ক-এর উপযুক্ত চিত্রটি এখানে আঁকা হয়েছে। ব্রোঞ্জে খোদাই করা এ যেন আইনস্টাইনের নিজেরই প্রতিকৃতি। যে মানুষ নিজের সম্পর্কে কখনও চিন্তা করে না, সেই-ই অন্য যে মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগ আছে তার বৈশিষ্ট্যগুলি আঁকতে গিয়ে নিজের ছবিই এঁকে ফেলে।

১৯১০ সালের জুন মাসে আইনস্টাইনের পরিবারে একটি পুত্রসন্তান জন্মায়, নাম এডওয়ার্ড। বাবার মতোই তাকে দেখতে, একই ধরনের মুখচোখের চেহারা এবং বড় বড় পরিষ্কার চোখ দুটি; পরে সে বাবার মতোই সঙ্গীতপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯১০ সালের শেষ দিকে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ খালি হয়, প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। অস্ট্রিয়ার গভর্নমেন্টের ডিক্রী অনুসারে ১৮৯০-এর দশকে একে জার্মান ও চেক্, দুই ভাষার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাগ করা হয়, যদিও এর মধ্যে প্রথমোক্তটিই কর্তৃপক্ষের আনুকূল্য লাভ করত। হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশের অধীনে স্লাভীয় দেশগুলিতে জার্মানিকরণের নীতি চালু করার জন্যে এটা ছিল অন্যতম পদক্ষেপ।

আর্নস্ট মাখ ছিলেন তার প্রথম রেকটার এবং তিনি চলে যাবার পরেও তাঁর দার্শনিক মতামতেরই প্রাধান্য ছিল এখানে। তাছাড়া, তাঁর

১ C. Seelig., op. cit., S. 188-89.

অনুগামী ও ছাত্ররা প্রধান প্রধান পদ অলংকৃত করে ছিল এবং তাঁর মতামত সমর্থন ও প্রচার করতে যা করা দরকার তা করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম একজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন অ্যান্টন ল্যাম্‌পা, চেক্ দেশে তার জন্ম কিন্তু জার্মানিকরণের দৃঢ় সমর্থক। ধনী জার্মানদের বাড়ির দরওয়ানের ছেলে ল্যাম্‌পার পক্ষে তার নিজের পরিবারের অভাব ও হীনতর সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তার বাবার নিয়োগকর্তাদের অবস্থার তারতম্য বোঝার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছিল। কাজেই সে বুঝেছিল যে এটা তার উপযুক্ত স্থান নয়, তার স্থান হল প্রভু-শ্রেণীদের কাছে। প্রথমে জার্মান স্কুল শেষ করে পরে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করতে করতে সে কর্তৃত্বপদ পেল। জার্মান সংস্কৃতির প্রচারে এবং চেক্ সংস্কৃতির সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার কাজে সে উঠেপড়ে লাগল। প্রাগে একটা চালু কথা ছিল যে, কোনো পোস্টকার্ডে যদি 'পোস্টকার্ড' শব্দটা চেক্ ও জার্মান দুটি ভাষাতে লেখা থাকত, তাহলে ল্যাম্‌পা সেটা কিনতে অস্বীকার করত এবং রাগতভাবে শুধু জার্মান ভাষাতে লেখা পোস্টকার্ড'ই চাইত। আইনস্টাইনের কাছে জার্মানিকরণের যা কিছু বিরক্তিকরভাবে পরিত্যাজ্য তাই ছিল ল্যাম্‌পা।

ল্যাম্‌পা এবং জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের(১) অন্যান্য সরকারী ব্যক্তিরা ঠিক করল যে, আইনস্টাইনের মতো মর্যাদাসম্পন্ন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির পক্ষে বেশ ভালো হবে। মাখ-এর ছাত্র ও উৎসাহী সমর্থকরূপে ল্যাম্‌পা বোধ হয় ভেবেছিল যে, আইনস্টাইন মতামতের দিক থেকে তার সমগোত্রীয় হবেন। আগে যা বলা হয়েছে, মাখ যদিও আপেক্ষিকতার তত্ত্বের প্রত্যক্ষবাদমূলক ধারণার বিরোধী চরিত্রটা দ্রুত ধরতে পেরেছিলেন, তথাপি তাঁর মতো না হলেও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে কয়েকজন মনে করতেন যে, জগৎ-প্রপঞ্চের নিউটোনীয় ধারণাগুলির সম্পর্কে আইনস্টাইনের সমালোচনাতেই বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির বিষয়মুখিতা সম্পর্কে সংশয়বাদ প্রকাশ পেয়েছে। তা যাই হোক না কেন, ল্যাম্‌পা আইনস্টাইনকে একজন সম্ভাব্য প্রার্থী বলে নাম করল এবং এ ব্যাপারে আইনস্টাইনের গুণাগুণ কী আছে সে সম্পর্কে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় পদার্থবিদের মতামত জানতে চাইল। ম্যাক্স্ প্ল্যাংক জবাব দিলেন, "আইনস্টাইনের তত্ত্ব যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, যা আমি মনে করি

১ প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান অংশের।—অনুবাদক।

হবে, তাহলে তিনি বিংশ শতাব্দীর কোপারনিকাস্ বলে পরিগণিত হবেন।"

জুরিখের মতোই এই পদের জন্যে দুজন প্রার্থী ছিলেন এবং জুরিখের মতোই আইনস্টাইনের পালটা প্রার্থী আইনস্টাইনের পক্ষেই নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করলেন। তবে ফ্রিড্রিক্ অ্যাডলার যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করেছিলেন, এখানে তার উলটোটাই ছিল।

প্রথম প্রার্থী ছিলেন গুস্তাফ ইয়াওমান, তিনি ব্রনো টেক্নোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক ছিলেন, মতের দিক থেকে দৃঢ় মাখপন্থী এবং তাঁর আত্মম্ভরিতা ছিল খুব বেশি। ভিয়েনার কর্তৃপক্ষ তাঁকে অস্ট্রিয়ার নাগরিক বলে পছন্দ করত। কিন্তু ইয়াওমান এর আত্মম্ভরিতা ও স্পর্শকাতরতা তাঁদের হিসাবের মধ্যে ছিল না, কারণ যখন ইয়াওমান শুনলেন যে, প্রার্থীপদের জন্যে দরখাস্তকারীদের মধ্যে আইনস্টাইনের নাম অগ্রাধিকার পেয়েছে, তখন তিনি বেশ খানিকটা মেজাজ দেখিয়ে বললেন, "যে-বিশ্ববিদ্যালয় আসল মেধার দাম না দিয়ে আধুনিকতার পেছনে দৌড়য়, কোনো সম্পর্কই তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাখতে চান না।"

আইনস্টাইনকে পদটি দেওয়া হলে তিনি গ্রহণ করলেন, যদিও মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল। পরিচিত বাসস্থান ও পরিবেশ ছেড়ে দিয়ে নতুন দেশে বাস করা আইনস্টাইনের স্ত্রী মিলেভা-র পছন্দসই ছিল না। সুইজারল্যাণ্ড ও জুরিখে তাঁর বাক্যালাপ ও গানবাজনা চলত যে বন্ধুদের সঙ্গে, সেটা ছাড়ার বিশেষ ইচ্ছা আইনস্টাইনেরও ছিল না। তবুও একটা পুরোপুরি প্রফেসারের পদ, এ পর্যন্ত যতটা স্বাধীনতা তিনি ভোগ করেছেন, তার চেয়ে বেশি স্বাধীনতা তাকে দিল। ১৯১১ সালের শরৎকালে প্রাগে এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত হলেন।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী রাজত্বের (বা সাম্রাজ্যের*) অন্যতম একটা নিয়ম ছিল, কাউকে কোনো সরকারী পদ নিতে হলে তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী সেটা জানাতে হতো। সম্রাট ফ্রানৎস জোসেফ সুস্পষ্টভাবে দাবি করতেন যে, কেউ কোনো সরকারী পদে থাকলে তাকে কোনো স্বীকৃত গির্জার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

---

* ১৯১১ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে চেকোস্লোভাকিয়া অস্ট্রো-হাপসবার্গ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানি হেরে যাওয়ার পরে ভার্সাই সন্ধি চুক্তিতে (১৯১৯) চেকোস্লোভাকিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি পায়।—অনুবাদক।

খ্রিস্টধর্মে অবিশ্বাসীর পক্ষেও এই নিয়ম থেকে অব্যাহতি ছিল না এবং আইনস্টাইন যথারীতি নিজেকে 'মোজেসপন্থী' বলে লিখলেন।

আইনস্টাইন দেখতে পেলেন যে, প্রাগ শহর মিউনিক অথবা ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ডের অন্যান্য শহরগুলি থেকে একেবারে আলাদা; এই শহরগুলিকে তিনি ভালো করেই চিনতেন কিন্তু পুরানো প্রাগ শহরকে এবং তার চারধারের অনেকগুলি পাহাড় থেকে যে সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ত, তা তিনি ভালোবেসে ফেললেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টির (অধ্যাপনার বিষয়বস্তুর—অনুবাদক) নিয়ম ছিল, একজন নতুন সভ্যকে অন্যদের বাড়ি গিয়ে সামাজিক প্রথা হিসাবে দেখা-সাক্ষাৎ করে আলাপ-পরিচয় করা। এই ধরনের দেখা-সাক্ষাতের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় চল্লিশটি বাড়ি এবং এই উপলক্ষে আইনস্টাইন প্রাগ শহরের বিভিন্ন এলাকা দেখে নেবার সুযোগ পেলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে তিনি তাঁর সহকর্মীদের বাড়িগুলি কোথায়, কোন্ অঞ্চলে আছে তা ছকে নিয়ে পরপর তাদের বাড়ি যাওয়া শুরু করলেন। তাদের সঙ্গে নিয়মমাফিক পরিচয়াদি হল, তাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হল যথারীতি কিন্তু শীগগিরই বুঝতে পারলেন যে, এ একটা বিড়ম্বনা মাত্র। তাছাড়া শহরের যেসব অঞ্চল পর পর দেখে নেবার জন্যে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, সেগুলি কিন্তু তাঁর সহকর্মীদের যে পদমর্যাদা অনুসারে দেখা করা দরকার, তার সঙ্গে মিলল না। কয়েকজন অধ্যাপক সন্দেহ করতে লাগলেন যে, তাঁর অন্য কর্তাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার অভাব রয়েছে এবং একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে আমলাতান্ত্রিক রীতি এবং আনুষ্ঠানিকতা বিশেষ জোর দিয়ে পালন করা হয়, সেখানে এই ব্যাপারটা বিশেষ বিরূপতার সৃষ্টি করল।

যতগুলি দেখাসাক্ষাৎ করার প্রয়োজন ছিল, তা না করেই আইনস্টাইন হঠাৎ এটা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু শহর দেখার কাজটা চলতেই থাকল। প্রাগের মনোরম প্রাচীন বাড়িগুলি, তার টাউন হল্, গির্জা ও তার চূড়াগুলি এবং তারই পালটা পার্ক ও বাগানের সতেজ ও সবুজ গাছপালা তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসু মনকে তৃপ্তি দিত। ভল্টাভা নদীর দুই তীর দিয়ে তিনি হেঁটে বেড়াতেন, এই নদী শহরটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে এবং নদীর উপরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈরি কারলভ সেতুর চিরনতুন ও আশ্চর্য দৃশ্য তাঁর মনকে টানত। সেতু পার হয়ে তিনি নদীর ওপারে 'প্রাগ-ভেনিস' শহরে গিয়ে পৌঁছতেন,

যেখানে নদীর উপর ঝুঁকে-পড়া ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলি তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে তিনি হ্রাডকানি পাহাড়ে উঠে নতুন এক ধরনের স্থাপত্য-জগতে পৌঁছে যেতেন, যার মধ্যে চেক্ জনগণের হাজার বছরের শ্রম মূর্ত হয়ে রয়েছে। ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথ থেকে স্বচ্ছন্দভাবেই এই সুষমা বেরিয়ে এসেছে এবং মানুষের দ্বন্দ্বময় জগতের বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির প্রতীক রূপে এটা কাজ করছে। আইনস্টাইন হ্রাডকানি-তে দ্বাদশ শতাব্দীর সেন্ট জর্জের রোমান গির্জা দেখলেন এবং সেন্ট ভাইটাস ক্যাথিড্রাল-এর তোরণশ্রেণীর তলা দিয়ে যেতেন, যাতে কোনো মধ্যযুগীয় অতীন্দ্রিয়বাদী কুহেলিকার প্রকাশ নেই, রয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীর বলবিদ্যার পরিচয়। তারপর জ্লোতা উলিকা (বা সরণী—অনুবাদক) যেটা মধ্যযুগীয় প্রাগের কারুশিল্পীদের এলাকা ছিল, যেখানে গেলে সেইসকল লোকের বাড়ি ও পরিবেশ পার হয়ে যেতে হয়, যারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে রেনেসাঁসের পথ পরিষ্কার করে দিয়ে সেই নতুন জগতের ছবি সামনে তুলে ধরেছিল, যাতে যুক্তিসিদ্ধ 'ধ্রুপদী আদর্শ'কে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করা যায়। 'ধ্রুপদী আদর্শের' পূর্বসূরীদের অনেকের কথাই প্রাগে গেলে মনে পড়ে, কারণ সেখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর টাইন গির্জাতে রয়েছে টাইকো ব্রাহের(১) সমাধি। এই প্রাগেতেই রয়েছে সেই সকল পুঁথিপত্র যা তিনি (অর্থাৎ টাইকো ব্রাহে—অনুবাদক) জোহানেস্ কেপলারের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন; এতে গ্রহদের চলাফেরা সম্পর্কে তিনি যা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তা লিপিবদ্ধ ছিল। আইনস্টাইন সেই শহরের পাথর-বাঁধানো সড়ক দিয়ে

১ পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোপারনিকাস সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের কথা প্রথম ব্যক্ত করলেও তার তখন বিশেষ প্রচার হয় নি। গ্রহাদির পর্যবেক্ষণের ফলে এই রকমের মতের কাছাকাছি পৌঁছে গির্জার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে টাইকো ব্রাহেকে কিছুটা নির্যাতন সইতে হয়। কেপলার ব্রাহের পুঁথিপত্র আরও অনুধাবন করে গ্রহরা যে উপবৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে সে কথা বলেছিলেন, তবে সূর্যকে কেন্দ্র করে যে তারা উপবৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করছে তা বলেন নি। কিন্তু চক্রাকার নয়, উপবৃত্তাকার—গির্জার প্রচারিত জগতের এটা পরিপন্থী ছিল।

কেপলার-এর পরে এলেন গ্যালিলিও, যিনি কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের কথা বলতে গিয়ে নির্যাতিত হন ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে।—অনুবাদক।

হাঁটতেন, যেখানে জগতের ধ্রুপদী চেহারার ভিত্তি স্থাপনের জন্যে আবিষ্কার-গুলি করা হয়েছে।

প্রাগে আইনস্টাইনের নতুন বন্ধু যাঁরা হলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন ম্যাক্স ব্রড্; ইনি একজন তরুণ লেখক; নতুন মত ও আবিষ্কারের ইতিহাসে যে বড় মানুষগুলি খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি কাজ করতেন। ফিলিপ ফ্রাংক লিখছেন, যখন ব্রড্ তাঁর 'টাইকো ব্রাহে-র দায়মুক্তি' (The Redemption of Tycho Brahe) উপন্যাসটি নিয়ে কাজ করছিলেন, তখন কেপলার-এর চরিত্র-চিত্রণে আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্ব তাঁর 'পরে যে ছাপ ফেলেছিল, তাতে তিনি দারুণ প্রভাবান্বিত হন।(১) ব্রড্-এর হাতে কেপলার-এর চরিত্রায়ন কতখানি সত্যনিষ্ঠ হয়েছিল এটা বলা শক্ত কিন্তু ভালটার নের্নস্ট উপন্যাসটি পড়ার সময় আইনস্টাইনকে বলেন, "আপনিই এই মানুষ কেপলার।"

ব্রড-এর কেপলার জীবনের ভালোমন্দ জিনিসগুলি এবং পার্থিব ব্যাপার সম্বন্ধে উদাসীন। একমাত্র বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য খুঁজতেই কেপলারের আনন্দ এবং যে টাইকো ব্রাহে ক্যাথলিক ধর্মীয় গোঁড়ামীর সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার বিচারপদ্ধতিকে জুড়ে রাখতে চান, কেপলার তার বিরোধিতা করেন। "ক্যাথলিক মতাবলম্বী হও চাই, নাই হও" বলছেন কেপলার, "এখানে প্রকল্পটাই বিচার করে দেখা হচ্ছে, সম্রাটের অনুগ্রহ পেলে কি, না, সেটা নয়···আমাদের একমাত্র সত্যকে নিয়েই বিচার করতে হবে, আর কিছুকে নয়" এই মন্তব্য, আর তার সঙ্গে জাগতিক সুষমা সম্পর্কে বোধ, যেটা কেপলারের লেখাপত্রে এতভাবে বিধৃত রয়েছে, সেটাই কেপলারের ভাবমূর্তিকে আইনস্টাইনের চরিত্রের কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

এখানে আইনস্টাইনকে কেপলার ও গ্যালিলিও-র সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত হবে, যে তুলনার মধ্যে আইনস্টাইনের বিশ্ববীক্ষার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোকিত হয়ে ওঠে।

কেপলারের মতো 'মনের বলিষ্ঠ পেশল গঠন' খুব কম চিন্তাবিদেরই আছে, বিশেষ করে বলবিদ্যা ও গণিতের ক্ষেত্রে তাঁর যুগের আর কেউই সৌরজগতের পরিচিত কাঠামোর কারণগুলি কী হতে পারে, সেটা আবিষ্কার

১ Philipp Frank, op, cit., p. 107.

করতে এত বদ্ধপরিকর হন নি। আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি যার 'পরে রচিত হয়েছে তার প্রথম কঠিন প্রস্তরগুলি কেপলারের নিয়মগুলিতে রয়েছে, এমনকি ভিত্তিভূমিকে যদি নতুন করে সাজাতে হয় তাহলেও সেগুলিকে নড়ানো যাবে না। এরই উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিউটনের বলবিদ্যার পুরো সৌধটা।

তবুও গ্যালিলিওর তুলনায় কেপলার মানবজাতির জীবনে অনেক কম প্রভাব বিস্তার করেছেন। এর কারণ শুধু এই নয় যে, গ্যালিলিওর জাড্যের ধারণা নতুন বিজ্ঞানের কাছে চাবিকাঠির মতো কিংবা কেপলারের 'গ্রহদের সঙ্গীত'-এর(১) ধোঁয়াটে ধারণার তুলনায় গ্যালিলিওর ভাবধারার ঐক্য, সংহতি ও স্ফটিক-স্বচ্ছতা অনেক বেশি। বৈজ্ঞানিক রূপে কেপলার এককভাবে গবেষণা করার পক্ষপাতী। সন্দেহ নেই, এতে সম্ভাবনা ছিল যে, এর ফলাফল থেকে একটা আত্মিক ও বস্তুগত আলোড়ন ঘটবে, যেটা একটা দ্ব্যর্থহীন যান্ত্রিক জগৎপ্রপঞ্চের চেহারা, তার যুক্তিসম্মত সমালোচনা এবং তার থেকে অনু-সিদ্ধান্ত—এ সবই আশা করা যেতে পারত। ইতিমধ্যে প্রকৃতির নতুন ধারণার মধ্যে সামাজিক আলোড়ন(২) যেন প্যানডোরার বাকসের (৩) মধ্যে

---

১ Music of the Spheres—প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা অনেকে মনে করতেন যে, (যেমন পাইথাগোরাস) গ্রহদের নিজের চতুর্দিকে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণনের ফলে যেমন লাট্টু জোরে ঘুরলে বোঁ বোঁ করে আওয়াজ হয়, সেইরকম আওয়াজ হচ্ছে, যেটা নিশ্চয়ই প্রতিসাম্য ও সুষমাযুক্ত বলে সঙ্গীতের স্কেলে ফেলা যায়। এমনকি পাইথাগোরাস এইরকম একটা সঙ্গীতের স্কেল বা ঠাট তৈরি করেছিলেন, যেটা বহুলাংশে আমাদের দক্ষিণ ভারতের কনকাঙ্গী ঠাটের সঙ্গে মিলে যায়। কেপলার 'গ্রহদের এই সঙ্গীতে' বিশ্বাস করতেন। বলা বাহুল্য আধুনিক বিজ্ঞান এটিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছে।—অনুবাদক।

২ ও ৩ গ্রীক পুরাণ-কাহিনীতে গল্প আছে যে, প্যানডোরার বাকস খুলে (যেটা খোলা নিষিদ্ধ ছিল) এমন সব বস্তু বেরোয়, যাকে আর সামলে রাখা গেল না, সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। অনুরূপ গল্প আরব দেশের পুরাণে আছে—বোতলের ভূতকে ছেড়ে দেওয়াতে সেই ভূত যাদুকরকে (যে ছেড়ে দিয়েছিল) খেয়ে ফেলল।

আসলে রূপকের মাধ্যমে যেটা বলার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা হল—কোপার-নিকাস-এর সূর্য-কেন্দ্রিক মহাজগতের ধারণা থেকে প্রকৃতি সম্পর্কে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শুরু, কেপলার তাকে আরও সমৃদ্ধ করলেন—যখন

চাপা পড়েছিল, যদিও কেপলার সমাজ পরিবর্তনের জন্যে লড়তেন না এবং সামাজিক সংগ্রামের জন্যে কোনো পতাকা তিনি তুলে ধরেন নি।

গ্যালিলিও শুধুমাত্র একটা স্ফটিক-স্বচ্ছ জগতের চেহারার প্রবক্তা ছিলেন না, সেটার স্বীকৃতির জন্যেও লড়েছিলেন। কেবলমাত্র জগতের সত্যটাকে প্রচার করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, তাকে জগৎসমক্ষেও প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

প্যানডোরার বাক্স-এর মতো আপেক্ষিক তত্ত্বকে উপস্থিত করা কেপলার ও গ্যালিলিওর ধারণা ও মতামতগুলিকে এক করে নেওয়ার শামিল। আইনস্টাইনের বিশ্বজনীন আপেক্ষিকতা গ্যালিলিওর জাড্য এবং ধ্রুপদী আপেক্ষিকতার সঙ্গে তুলনীয়, বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব (আইনস্টাইনের—অনুবাদক) কেপলার-এর নিয়মগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ (বা সমগোত্রীয়)। বৈজ্ঞানিক মেজাজের দিক থেকে আইনস্টাইন কিন্তু কেপলার, গ্যালিলিও নন।

'টাইকো ব্রাহে-র দায়মুক্তি' সম্পর্কে বই লেখার ত্রিশ বছর পরে ম্যাকস ব্রড 'বন্দী গ্যালিলিও' নামে একটা বই প্রকাশ করেন, যেটা তিনি আইনস্টাইনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জুলাই ১৯৪৯ সালে ম্যাকস ব্রড আইনস্টাইনের কাছ থেকে একটা চিঠি পান যাতে অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে গ্যালিলিও যে-সংগ্রাম করেছিলেন, সে সম্পর্কে মতামত দেন।

প্রমাণ করলেন যে, গ্রহরা উপবৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করছে। গ্যালিলিও তার পরে ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে যখন কোপারনিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক মহাজগতের পুরো চেহারার ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন, তখন গ্যালিলিওকে ক্যাথলিক গির্জার কাছে সইতে হল নির্যাতন। কারণ পৃথিবী-কেন্দ্রিক মহাজগতের ধারণার পেছনে ক্যাথলিক ধর্মীয় অনুশাসন বেশ একটা চমৎকার ছাঁচে-ফেলা স্বর্গ, মর্ত ইত্যাদির ধারণা চালু করেছিল, যেটা গ্যালিলিওর সূর্যকেন্দ্রিক জগতের ধারণাতে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

কাজেই কেপলার-গ্যালিলিও-র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পেছনে একটা বিরাট সামাজিক আলোড়ন তথা বিপ্লবের শক্তি কাজ করে যাচ্ছিল। এই ধারণা একবার চালু হয়ে গেলে (যা নিউটনের বলবিদ্যাতে ভালো করেই করা হল) আর পুরানো ধর্মীয় অনুশাসনের নিগড়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা নিয়ম বজায় রাখা যায় না—যেটা বোতলের ভূতকে ছাড়া অথবা প্যানডোরার বাকসকে খোলার মতো ব্যাপার।—অনুবাদক।

আইনস্টাইন লিখছেন, "গ্যালিলিও সম্পর্কে আমার ধারণা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি আকুল আগ্রহে সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু আমার বুঝতে কষ্ট হয় যে, বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য নেই এরকম হাল্কা স্বভাবের মানুষদের কাছে সদ্য আবিষ্কৃত সত্যকে পৌঁছে দেবার জন্যে একজন পাকা মাথার মানুষকে অতগুলি বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। এ কাজটা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যার জন্যে তাঁর জীবনের শেষ কয় বছর নিয়োজিত করতে হল? বিনা কারণেই তিনি সিংহের গহ্বরে ঢুকেছিলেন এবং (এই সূর্যকেন্দ্রিক জগতের মতবাদকে নিয়ে —অনুবাদক) গির্জার কর্তৃপক্ষ এবং রাজনীতিবিদদের সঙ্গে লড়বার জন্যে কেনই-বা তিনি রোমে গেলেন।(১) গ্যালিলিওর মতো ঝানু ব্যক্তির যে অন্তরের স্বাতন্ত্র্য ছিল বলে আমার ধারণা, তার সঙ্গে এটা মেলে না। যে ভাবেই হোক, আমি মনে করি না আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে ধরে রাখার জন্যে আমি এ ধরনের কিছু করতে পারি। সত্য আমার অপেক্ষা অনেক বড় ও শক্তিশালী, অতএব রোজিনান্ত নামের ঘোড়ায় চেপে তরওয়াল ঘুরিয়ে তাকে রক্ষা করতে যাওয়াটা নিশ্চয়ই কুইকসটীয়(২) হতো।"(৩)

এই চিঠিতে অনেকগুলি চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একদিকে রয়েছে তথ্যের ও সত্যের আসল মর্মবস্তুর সঙ্গে মিলে যাবে বলে সত্যমেব জয়তে, এই বিশ্বাস। "হাল্কা স্বভাবের, বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য নেই এমন মানুষদের" বিরুদ্ধে সত্যকে দাঁড় করাতে হবে—বিজ্ঞানকে প্রভাবান্বিত করে এবং ইতিবাচক সামাজিক আদর্শের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে যে দ্বন্দ্বমূলক স্বার্থ, তার প্রকাশ সম্পর্কে আইনস্টাইনের প্রতিরোধ ছিল।' আসল

১ ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও ইতালির ভেনিসের রাজসভায় মান্যবর গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। কিন্তু স্বীয় মত প্রচারের জন্যে রোমে পোপের দরবারে হাজির হলে তাঁকে ইনকুইজিশনের দণ্ডাজ্ঞার সামনে পড়তে হয়।

—অনুবাদক।

২ C. Seelig, op. cit., S. 210.

৩ স্পেনীয় লেখক সারভানতিস্-এর 'ডন কুইকসট' নামে মহাকাহিনীতে বর্ণনা আছে কুইকসট রোজিনান্ত নামে এক বেতো-ঘোড়াতে চেপে, একটা ভাঙা বর্শা ঘুরিয়ে কল্পনা করে বেড়াত যে, মধ্যযুগের নাইটদের (বীরদের) মতো সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছে।—অনুবাদক।

কথাটা কিন্তু হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক কাজের জন্যে যা করা দরকার তা থেকে সামাজিক সংগ্রামকে বিযুক্ত করে রাখা। যুদ্ধের সম্ভাবনার এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যখন তীব্রতম সংগ্রাম চলছে, তখন আইনস্টাইন এই চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রাম, যদিও সেটা তাঁর যুক্তিবাদী মনোভাবের সঙ্গে জড়িত, যাতে মহাজাগতিক সুষমার আদর্শের প্রতি এবং 'অযৌক্তিকতার দানব' সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে—সেটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সংগ্রাম ছিল না। আইনস্টাইন জানতেন, সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যে লড়তে হবে কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের ন্যায্যতার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন বোধ করতেন না।

এজন্যেই গ্যালিলিওর উত্তপ্ত সামাজিক মানসিকতার চাইতে কেপলার-এর আত্মমগ্ন গবেষণা এবং সত্যকে অনুধ্যানের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গে আইনস্টাইনের মিল ছিল বেশি। কেপলারের চিঠিগুলি তিনি পড়েছিলেন এবং গ্রহদের গতির সম্পর্কে ধ্রুপদী রচনার মতোই এগুলিতে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তিনি লিখছেন, "কেপলারের চিঠিগুলিতে আমরা এমন একজন স্পর্শ-কাতর মানুষের মুখোমুখি হই, যিনি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির চরিত্র সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে নিজেকে নিয়োগ করেছেন—এ এমন একজন মানুষ যিনি ভেতরের ও বাইরের সকল বাধা সত্ত্বেও যে উচ্চ লক্ষ্য নিজের সামনে রেখেছিলেন, তাতে পৌঁছেছিলেন।"(১)

কার্যকারণ সম্পর্কের 'পরে ভিত্তি করে মহাবিশ্বের ছবি গড়বার জন্যে কেপলার যে উচ্চ লক্ষ্য ঠিক করেছিলেন সেটা 'ধ্রুপদী আদর্শে' পৌঁছবার পথে প্রথম পদক্ষেপ। এর জন্যে ভেতরের ও বাইরের কোন্ কোন্ বাধা তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছিল?

চালু যে ধারণা তখন ছিল তার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো কিছু বাইরের দিক থেকে ব্যাখ্যা করার অসুবিধা ছিল। এই অসুবিধার প্রভাব কেপলার ও গ্যালিলিওর 'পরে কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে দু'রকমের ছিল, যাতে প্রথম মানুষটি মতাদর্শগত আপস অথবা ভাবাদর্শগত সংগ্রাম-এর কোনোটাতেই আগ্রহবোধ করেন নি।

১ **Ideas and Opinions, p. 224.**

আইনস্টাইন লিখছেন, "তিনি যারির অথবা তাঁর সমসাময়িক যে সব মানুষ তাঁর জীবন ও কাজকে রূপ দিতে পারত কিন্তু যারা সেটা করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে নি—এর জন্যে তিনি নিস্ক্রিয়তা বা হতাশায় ভেঙে পড়েন নি। অথচ তিনি এমন একটা বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন, যা তাঁর কাছে, যিনি সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, বিপদস্বরূপ হতে পারত। কিন্তু কেপলার ছিলেন সেই ধরনের এমন একজন বিরল মানুষ, যিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে তার যা বিশ্বাস, খোলাখুলি তার পক্ষে অবস্থান না নিয়ে অন্যকিছু করতে পারতেন না। আবার তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন না যিনি ব্যক্তিগত বিতর্কে অকৃত্রিম আনন্দ লাভ করতেন, যেটা গ্যালিলিওর ক্ষেত্রে প্রায়শই ঘটত, যাঁর চোখা-চোখা বাক্যবাণগুলি আজও সন্ধানী পাঠককে আনন্দ দেয়। কেপলার যদিও ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান প্রোটেস্টান্ট তবুও গির্জার সব সিদ্ধান্ত যে তিনি মানতেন না, সে সম্পর্কে তাঁর কোনো লুকোচুরি ছিল না। এইজন্যে তাঁকে একজন নরমপন্থী ধর্মমতবিরোধী বলে গণ্য করা হতো এবং সেইভাবেই তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করা হতো।"(১)

সামাজিক ক্ষেত্রে লড়বার জন্যে তাঁর লড়াকু মেজাজ না থাকাতে কেপলারের পক্ষে নতুন বৈজ্ঞানিক মতগুলির পক্ষে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম চালানো সম্ভব ছিল না। আর এর জন্যে কেপলার নিজেই এমন কিছু ধারণার মধ্যে আটকে গিয়েছিলেন যেগুলি জগতের কার্যকারণ সম্পর্কজনিত চেহারা তৈরি করার পক্ষে একান্ত প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। কাজেই বাইরের দিক থেকে যে বাধাগুলি ছিল, সেগুলি অন্তরের ব্যাপার হয়ে গেল। এগুলিকে অবশ্য বহুলাংশে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল।

"একমাত্র একবার যখন তিনি বৌদ্ধিক ঐতিহ্য থেকে নিজেকে অনেকখানি মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তখনই কেপলারের জীবনের কাজটি করা সম্ভব হয়। এর দ্বারা কেবলমাত্র গির্জার কর্তৃত্ব বা অনুমতি অনুসারে যে ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলি আছে, সেগুলিই শুধু নয়, পরন্তু মহাবিশ্বের এবং মানবিক পরিমণ্ডলের চরিত্র এবং কতটুকু করা সম্ভব তার সীমানা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা তথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে, এ সবগুলিকেই বোঝানো হচ্ছে।"

১ **Ideas and Opinions, p. 225-26.**

আইনস্টাইন বলেছেন, কেপলারকে গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বপ্রাণবাদী (১) দৃষ্টিভঙ্গি এবং জগৎপ্রপঞ্চের বৈজ্ঞানিক মূর্তির বাইরে কোনো ধারণাকে নিয়ে কাজ করার ঝোঁককে ঝেড়ে ফেলতে হয়েছিল। তাঁকে "এটাও স্বীকার করতে হয়েছিল যে, অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে যুক্তিসম্মত গাণিতিক তত্ত্ব থেকেই যে সত্যে উপনীত হওয়া যেতে পারে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই এবং সেটা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অত্যন্ত নিভুর্ল পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই না-করে নিলে তার কোনো অর্থ হয় না। কেপলারের কাজের এই দার্শনিক দিক্-পরিবর্তন ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব ছিল না। তিনি এ কথা বলেন নি কিন্তু তাঁর চিঠিগুলিতে অন্তরের এই সংগ্রামের ছাপ রয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র (২) সংক্রান্ত তাঁর মন্তব্যগুলি সম্পর্কে পাঠককে সাবধান হতে হবে।"(৩)

কেপলারের যে সব অতীন্দ্রিয়বাদী ধারণা ছিল সেগুলি তাঁর কাজে ভেতর থেকে বাধার সৃষ্টি করত। সামাজিক সংগ্রাম থেকে নতুন বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির জন্যে কেপলার যেভাবে পশ্চাদপসরণ করতেন তাতে আইনস্টাইনের সহানুভূতি ছিল কিন্তু যেটা গ্যালিলিওর সঙ্গে মেলে না, তা হল কেপলারের ভেতরের অসুবিধা, যেটা তাকে বিশ্বের সুষমার কার্যকারণ-সম্পর্ক বুঝতে বাধা দিয়েছিল। মতাদর্শগত সংঘাতের ক্ষেত্রে গ্যালিলিও যে ধরনের কাজ করতেন তার সঙ্গে মতের মিল না থাকলেও আইনস্টাইন তার গুরুত্ব বুঝতেন। কেপলার যেমন নিজের অন্তরের জগতে ডুবে যেতেন এবং কোনো আপস করতে অপারগ ছিলেন, তেমনি জগৎপ্রপঞ্চের সুষমা ও কার্যকারণ-সম্পর্ক উপলব্ধি করার জন্যে যা কিছু বাধা তা থেকে গ্যালিলিওর অন্তরের সম্পূর্ণ মুক্তিবোধ (যেটা কেপলারের থেকে বেশি ছিল)—এটাই ছিল আইনস্টাইনের বৈশিষ্ট্য।

১ সর্বপ্রাণবাদী, অর্থাৎ সর্বভূতে প্রাণ বর্তমান রয়েছে, এটা ধরে নিয়ে কাজ করা।—অনুবাদক।

২ অ্যাসট্রলজি, অর্থাৎ মানুষের জীবনের 'পরে গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রেরা নাকি প্রভাব বিস্তার করে বলে যে মেকি বৈজ্ঞানিক মত— তার বিরুদ্ধে আইনস্টাইনের শ্লেষটি এখানে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত।—অনুবাদক।

৩ Ibid., p. 226.

আইনস্টাইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে আবার একবার সাঙ্গীতিক অর্থে 'সুষমা' (হারমনি) শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। বস্তুত বোর-এর কাজের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আইনস্টাইন নিজেই 'সাঙ্গীতিক দিক থেকে উচ্চতম রূপের' লক্ষণ বলে তার বর্ণনা দিয়েছেন; আর এই সংজ্ঞা অন্য যে কারুর অপেক্ষা তাঁর সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। বিশ্বের সুষমার অভিব্যক্তি, সামাজিক সুষমার স্বপ্ন, একটা শহরের স্থাপত্যে সুষমার চেহারা, শব্দের সুষমা (হারমনি*)—এই সব ক্ষেত্রেই আইনস্টাইনের মতন মানুষের কাছে এগুলির বিশেষ আবেদন ছিল। ক্যাথলিক ক্যাথিড্রালে (বড় গির্জাতে, যেটা বড় বড় শহরে থাকে—অনুবাদক) অর্গানের ভরাট মিষ্টি আওয়াজ, প্রটেস্টান্ট গির্জাগুলিতে একসঙ্গে অনেক বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতানিক শব্দ (কোরাল সঙ্গীত), ইহুদীদের শোকাবহ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, হুসাইটদের মন্ত্রোচ্চারণ বা স্তোত্রগাঁথার শব্দের অনুরণন, লোকগাথা এবং চেক্, রুশ ও জার্মান সঙ্গীত-স্রষ্টাদের রচিত গান বা বাজনা—এ সবেরই আইনস্টাইনের কাছে আবেদন ছিল।

প্রাগের সাধারণ অধ্যাপক মহলের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। আইনস্টাইন এঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং যে-পরিবেশে তাঁর বৈজ্ঞানিক, বৌদ্ধিক ও সাঙ্গীতিক রুচি তৃপ্তি পেত সেটার তিনি বিশেষ করে চর্চা করতেন।

তাঁর নিকটতম সহকর্মীদের মধ্যে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন, নাম জর্জ পিক্। পদার্থবিজ্ঞানে পিকের ঔৎসুক্য থেকে তাঁদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর হয়। আর্নস্ট মাখ যখন পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক, তখন পিক ছিলেন তাঁর সহকারী, সেই তরুণ বয়স থেকেই তাঁর পদার্থবিজ্ঞানে ঔৎসুক্য ছিল। ল্যামপা-র মতোই পঞ্চাশ বছর বয়সের এই অধ্যাপক মাখ-এর অনুগামী ছিলেন এবং দার্শনিক তর্কাতর্কিতে আইনস্টাইন তাঁকে এক অক্লান্ত বিরোধী পক্ষ হিসাবে দেখতেন। অধিকন্তু এই সময়ে আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের গাণিতিক চেহারা কী দাঁড়াবে এ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন এবং

* সঙ্গীতের পর্দাতে ষড়জ, গান্ধার, পঞ্চম একসঙ্গে বাজালে বা একটা কর্ড করে অর্থাৎ সা-গা-পা এইভাবে বাজালে যে সংধ্বনি পাওয়া যায়।—অনুবাদক।

পিক্-এর সঙ্গে গণিতের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যথেষ্ট মনের খোরাক পেতেন। এই পিক্-ই তাঁকে পরামর্শ দেন যে, রিকি ও লেভি-সিভিতা নামে দুই ইতালির গণিতজ্ঞের কাজ আইনস্টাইনের তত্ত্বের সমর্থনে লাগবে। পিক্ নিজেও ভালো বেহালা বাজাতেন এবং তাঁর মারফৎ আইনস্টাইনের বেশ কয়েকজন সঙ্গীত-রসিকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়, যাদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত গান-বাজনার জলসাতে অনেক সন্ধ্যা কাটাতেন। চেকোস্লোভাকিয়াকে জার্মানি অধিকার করার পরে এই পিক্ জার্মান নাৎসিদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মারা যান।

মরিস ভিন্টারনিৎস প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক এবং সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত,—আইনস্টাইন এঁর বাড়িতেও প্রায়ই যেতেন। অধ্যাপনার ও পড়াশুনার ক্ষেত্রে দু'জনের দুই জগৎ—কিন্তু তার জন্যে তাঁদের সাধারণ বিষয় ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাণবন্ত আলোচনা চালাতে অসুবিধা হতো না। ভিন্টারনিৎস-এর পাঁচটি হাসিখুশি ছেলেমেয়েকে তিনি খুব ভালোবাসতেন, তাদের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। প্রায়ই আইনস্টাইন তাঁর বেহালাটি সঙ্গে করে আনতেন আর ভিন্টারনিৎস-এর শ্যালিকা, নিজে সঙ্গীতের শিক্ষিকা, তাঁর সঙ্গে পিয়ানোতে সঙ্গত করতেন। এই মহিলাটি সামান্য মাত্র ভুলচুকও বরদাস্ত করতেন না এবং আইনস্টাইন প্রায়ই বলতেন যে, সামরিক বাহিনীর কঠোর সার্জেন্টের মতো সে নিয়মের কোনো রকম ব্যতিক্রম সহ্য করত না।

আইনস্টাইনের সরল ব্যবহার, সদয় মনোভাব, বন্ধুবাৎসল্য এবং নির্দোষ হাস্য-পরিহাস তাঁকে অনেক বন্ধু জোটাতে সাহায্য করেছিল। একটু আশ্চর্য মনে হলেও এই গুণগুলির জন্যে তাঁর কিছু শত্রুও জুটেছিল। বিদ্যার গর্ব না থাকাতে অনেকে মনে করত যে, শিক্ষা-জগতের পদের প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্য রয়েছে এবং এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর ও বাইরের কূপমণ্ডূক ধরনের (ফিলিস্টাইন) লোকদের বেশ আহত করত। আইনস্টাইনের সাদাসিধে আটপৌরে পোশাক-পরিচ্ছদকে ধরা হতো শিক্ষা-জগতের পদমর্যাদার প্রতি বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় বলে। ফিলিপ ফ্র্যাংক আইনস্টাইনের বিশ্ববিদ্যালয়ের পোশাক সম্বন্ধে একটা মজার গল্প শুনিয়েছেন।(১) একজন অস্ট্রিয়ান অধ্যাপকের পোশাকী সাজের মধ্যে ছিল পালক লাগানো একটা

১ Philipp Frank, op. cit., p. 125.

তিনকোণা টুপি, একটা কোট ও পাৎলুন, যাতে চওড়া সোনার জরির কাজ, কালো মোটা কাপড়ের ভারী গরম ওভারকোট এবং একটা তরোয়াল,—এ সবই তাঁকে কাজের ভার নেবার আগে শপথ গ্রহণ করার সময়ে কিংবা অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার সময়ে পরতে হতো। প্রাগে আইনস্টাইনের বদলে যখন ফ্র্যাংক অধ্যাপক নিযুক্ত হন তখন এই পোশাকটি তাঁর প্রাপ্য হয়। ফ্র্যাংকের স্ত্রী রাশিয়া থেকে পালিয়ে-আসা (১) কসাকদের পূর্বতন এক সেনাপতিকে কোটটি দিয়ে দিলেন, আর পোশাকের বাকিটা, তরোয়াল শুদ্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়েতেই রয়ে গেল ১৯৩৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়াতে নাৎসিদের আক্রমণের কাল পর্যন্ত—যখন নিশ্চয়ই তরোয়ালটা নাৎসিদের কোনো সৈনিক তার লুঠের মাল হিসাবে বাজেয়াপ্ত করেছিল।

আইনস্টাইন সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গেই মেলামেশা করতেন ও সবার প্রতি সদয় ছিলেন—এ কারণে অনেকে তাঁর উপর বিরক্ত হতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাক-উঁচু লোকেরা, আইনস্টাইন যে গবেষণাগারের পরিচারিকা এবং পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে সমান হৃদ্যতা নিয়ে কথা বলতেন, সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। কিন্তু তাঁর শত্রুরা সবচেয়ে বেশি যেটা অপছন্দ করত, সেটা হল তাঁর হাস্যকৌতুক। প্রথমত, সবসময়েই যে তাতে কিছু ঝাঁজ বা খোঁচা থাকত না, তা নয়; দ্বিতীয়ত, যে কোনো ঠাট্টা-তামাশাই যদি মাপাজোকা অধ্যাপক-সুলভ হাস্যপরিহাসের মাত্রা ছাড়িয়ে যেত তাহলে তার বেয়াড়া রসকষবর্জিত-হামবড়াই মনোভাবাপন্ন তথাকথিত অভিভাবকরা সবটাকে এমন সন্দেহের চোখে দেখত, -যাকে (সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রে) লেনিন বলেছেন শুচিবাইগ্রস্ত অবস্থা।

১৯১১ সালে আইনস্টাইন প্রথম সোলভে কংগ্রেসে(২) যোগ দিতে ব্রাসেল্‌সে যান। আর্নস্ট সোলভে ছিলেন একজন অতি সাধারণ বৈজ্ঞানিক, ভালো ইন্‌জিনিয়ার এবং বেলজিয়ামের ধনী ব্যবসায়ী; তিনি তাঁর কিছু উদ্ভট পদার্থগত তত্ত্বকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় পদার্থবিদদের জমায়েতের কাছে রিপোর্ট করার একটা ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কয়েকটি বেশ বড়

---

১ রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে কসাকদের অনেক সেনাপতি বিদেশে চলে যায়।—অনুবাদক।

২ পৃথিবীর বিখ্যাত প্রথম সারির বৈজ্ঞানিকদের কংগ্রেস।—অনুবাদক।

রাসায়নিক কারখানার মালিক এবং বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকরূপে প্রখ্যাত রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ ও পদার্থবিদ ভালটার নের্নস্ট-এর সঙ্গে তাঁর সামাজিক যোগাযোগ ছিল। তাঁরা দুজনে ঠিক ক'রে ব্রাসেল্‌সে কয়েকটি বিশেষ সমস্যা আলোচনা করার এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিতর্কমূলক বিষয়গুলি নিয়ে মত-বিনিময় করার জন্যে একটা সম্মেলন ডাকলেন। যে সকল বিজ্ঞানীকে ডাকা হবে নের্নস্ট তাঁদের একটা তালিকা তৈরি করলেন এবং সোলভে সম্মেলনের সর্ব খরচ বহন করতে রাজি হলেন ; এই খরচের মধ্যে ছিল তাদের আসা-যাওয়ার ও থাকার খরচ এবং তাছাড়া প্রত্যেককে এক হাজার ফ্রাংক করে পারিশ্রমিক দান।

১৯১১ সালের সোলভে কংগ্রেসে সামান্য কয়েকজন বিজ্ঞানী যোগ দেন, যার মধ্যে ছিলেন ইংলণ্ডের আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, ফ্রান্সের মারি স্কোলোড্‌স্কা-কুরী, অঁারি পোঁয়েকারে, জঁা পেরিন্‌ এবং পল্‌ লজভ্যাঁ, জার্মানির ম্যাকস্‌ প্ল্যাংক, ভালটার নের্নস্ট, হল্যাণ্ডের এইচ, এ, লোরেন্‌জ, অস্ট্রিয়া থেকে আইনস্টাইন ও ফ্রানৎস্‌ হাসেনোরল্‌। সোলভে এক সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী বক্তৃতাতে তাঁর তত্ত্বের একটা সারাংশ উপস্থিত করলেন। সুখের বিষয়, সোলভে যে একজন মেধাবী নন, একথা স্বচ্ছন্দচিত্তে তিনি মেনে নিলেন এবং এর পরে কয়েক বছর ধরে তিনি এইরকম সম্মেলন ডেকেছিলেন, যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে পদার্থবিদদের একটা নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ জমায়েত হতো।

১৯১১ সালের সোলভে কংগ্রেসে আপেক্ষিকতা একটা বেশ জীবন্ত আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। জুরিখে তাঁর বন্ধু ডঃ হাইন্‌রিখ্‌ জাঙ্গারকে আইনস্টাইন লিখেছেন যে, আপেক্ষিকতার আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি করা যায় নি। তিনি বিশেষভাবে মনে করতেন যে, বেশ দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণকার্য করা সত্ত্বেও পদার্থবিজ্ঞানের আসল অবস্থা সম্পর্কে পোঁয়েকারে-এর খুব সাধারণ ধারণা ছিল।

তা সত্ত্বেও আইনস্টাইন এই কংগ্রেসের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। জাঙ্গারকে লেখা চিঠিতে লোরেন্‌জ্‌ সম্পর্কে বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন : "লোরেন্‌জ্‌ বুদ্ধি ও কৌশলের একটা আশ্চর্য সমন্বয়। যেন শিল্পের একটা জীবন্ত সৃষ্টি। আমার মতে বর্তমান সকল তত্ত্ববিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান।"(১)

১ Helle Zeit, S. 43.

এর পরে ১৯২৮ সালে লোরেন্‌জ্‌-এর সমাধিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আইনস্টাইন তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন : "একেবারে খুঁটিনাটি বিষয়টুকু পর্যন্ত তিনি তাঁর জীবনকে একটা চমৎকার শিল্পকর্মরূপে তৈরি করেছেন। তাঁর মধ্যে দয়া ও মহানুভবতার কোনো কমতি ছিল না এবং জনগণ ও মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে নিশ্চিত ও অনুভূতিলব্ধ বোধের সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতার মনোভাব মিলিয়ে যে ক্ষেত্রেই তিনি যান না কেন, সেখানে তিনি নেতা হয়ে উঠতেন। সবাই সানন্দে তাঁকে অনুসরণ করত কারণ তারা বুঝতে পারত যে, তিনি কেবল সেবা করতেই চান, আধিপত্য করতে নয়।"(১)

আইনস্টাইনের মতোই লোরেন্‌জ্‌ নিজেকে 'ব্যক্তিকসীমা-বহির্ভূত' ক্ষেত্রে নিয়োজিত করতেন। নতুন আবিষ্কারগুলি যখন ধ্রুপদী পদার্থ-বিদদের উৎখাত করল, লোরেন্‌জ মন্তব্য করেছিলেন যে, পুরাতন স্তম্ভগুলি ভেঙ্গে যাবার পূর্বে কেন তাঁর মৃত্যু হল না। এটা শুধুমাত্র ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার প্রতিই তাঁর শোকবার্তা জ্ঞাপন ছিল না। অতীতের মূল্যবোধ সম্পর্কে লোরেন্‌জ-এর কোনো আক্ষেপ তত গভীর ছিল না এবং নতুন ধারণাগুলিকে তিনি এর পরেই গ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তাঁর যে ধারণা হয় সে সম্পর্কে অনুভূতির গভীরতা কত বেশি সেটা লক্ষ্য করা বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার। একজন মানুষ যাঁর কাছে জীবন সম্পর্কে মনোভাব কী হবে তার ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞান(২), তিনি নিশ্চয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরুষ।

বিজ্ঞান সম্পর্কে আইনস্টাইনের মনোভাবও গভীর অনুভূতিপূর্ণ ছিল, কিন্তু যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হতো যে, বিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন জীবন-মৃত্যুর অর্থ নিয়ে চিন্তা করতে তাঁকে নিয়োজিত করেছে কি না, তাহলে বোধ হয় তিনি জবাব দিতেন যে, এই ধরনের চিন্তা কখনও তাঁর মাথায় আসে না। এটাই অন্তত এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আইনস্টাইনের কাছে 'ব্যক্তিকসীমা-বহির্ভূত' ব্যাপারটা তাঁর সমগ্র সত্তাকে শুধুমাত্র জুড়েই ছিল না, এটা তাঁর চিন্তাকে এমন একটা উচ্চমার্গে নিয়ে যেত, যেখানে নিজের জীবন-মৃত্যুর কোনো তাৎপর্য তাঁর কাছে থাকত না।

---

১ Ideas and Opinions, p. 73.

২ অর্থাৎ, জীবনটাকে যিনি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে থাকেন।

—অনুবাদক।

সোলভে কংগ্রেসের এক বছর পরে আইনস্টাইন প্রাগ ছেড়ে জুরিখে ফিরে এলেন, যেখানে বারো বছর পূর্বে যে পলিটেকনিক থেকে তিনি স্নাতক হয়েছিলেন, সেখানে তাঁকে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ার (অর্থাৎ প্রধান অধ্যাপকের পদ) দেওয়া হল। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ক্যান্টনের(১) একটি প্রতিষ্ঠান, যার থেকে শিক্ষাজগতের ফেডারাল(২) প্রতিষ্ঠান এই পলিটেকনিক, অনেক উচ্চস্তরের ছিল। সুইজারল্যাণ্ডের ফেডারাল গভর্নমেণ্টের প্রচেষ্টাতে এই পলিটেকনিক ইউরোপের উচ্চ শিক্ষার অন্যতম অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ছিল, যেখানে পদার্থবিজ্ঞান এবং গাণিতিক বিষয়গুলিতে শিক্ষার মান ছিল বিশেষ উন্নত। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, অধ্যাপকের চেয়ারের স্বাতন্ত্র্য(৩) এবং জুরিখের মধুর স্মৃতিগুলি হয়তো আইনস্টাইনের কাছে একেবারে চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না কিন্তু মিলেভার কাছে তার মূল্য ছিল অনেক বেশি, তিনি অনেক দিন ধরেই জুরিখে ফিরে যেতে চাইছিলেন।

প্রাগ ছাড়ার সময়ে সরকারীভাবে কাজের জন্যে শিক্ষা দপ্তরের ভিয়েনা অফিসে যে ইস্তফা-পত্র দেওয়ার দরকার ছিল, সেটা দিতে আইনস্টাইন ভুলে যান, যেটা নিয়ে তাঁদের কিছুটা মাথাব্যথা হয়েছিল। কয়েক বছর পরে এটা শুনে আইনস্টাইন তৎক্ষণাৎ নির্দিষ্ট নিয়মমতো কাগজপত্র দাখিল করেন।

পলিটেকনিক ছাড়াও জুরিখের বিভিন্ন মহল আইনস্টাইনের আসার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। পুরানো বন্ধুরা এবং বিশেষ করে মার্শাল গ্রসমান বিশেষভাবে পুনর্মিলনের আশা করছিলেন। আইনস্টাইনও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে চাইছিলেন, যাঁদের সাহায্য তিনি সব সময়েই চাইতেন। দুই বন্ধু স্মরণ করলেন যে, বারো বছরেরও কিছু বেশি দিন আগে গ্রসমান আইনস্টাইনকে অংকের লেকচারে যোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা যে নেই, সেটা বুঝিয়েছিলেন। এখন এই অবহেলার ফল আইনস্টাইন ভালো করেই

১ জুরিখের করপোরেশন বলা যেতে পারে, যদিও সুইজারল্যাণ্ডের এই ক্যান্টনগুলিতে স্বায়ত্তশাসন ছিল বেশি মাত্রায়।--অনুবাদক।

২ অর্থাৎ, এই পলিটেকনিকটি সারা সুইজারল্যাণ্ডের ফেডারাল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল।—অনুবাদক।

৩ অর্থাৎ, তার উপরে খবরদারি করার আর কোনো কর্তৃত্ব নেই।
—অনুবাদক।

পাচ্ছিলেন বলে তাঁর বেশ খানিকটা ভাবনা ছিল। এখন তাঁর গণিত-বিভাগের সাহায্যের দরকার ছিল সবচেয়ে বেশি। সরলরেখার ও সমতলের বক্রতা নিয়ে এখন তাঁদের মাথাব্যথা। প্রাগেতে পিক এমন সব জ্যামিতিক ধারণার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যেগুলি আইনস্টাইনকে তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যাতে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে তার সমাধানে সাহায্য করবে। কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট ছিল না। প্রয়োজন ছিল বক্রতার ধারণাকে কেবলমাত্র সরলরেখা ও সমতলের ক্ষেত্রে নয়, ত্রিমাত্রিক দেশ ও চতুর্মাত্রিক দেশ-কাল সম্পর্কে প্রয়োগ করার। যদিও কয়েকটি পদার্থগত সমস্যার জন্যে গাণিতিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টা বেছে নেওয়া হবে এই সমস্যা ছিল, তবুও জ্যামিতিক ধারণার গভীরতা ও তাকে পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্যে সামগ্রিক ও পদ্ধতিগতভাবে গণিতকে বোঝার প্রয়োজন ছিল।

নতুন পদার্থগত সমস্যাগুলিকে সমাধান করার জন্যে যে-গাণিতিক পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে, গ্রসমান ও আইনস্টাইন বিস্তারিতভাবে তার আলোচনা করেন। তারপর গ্রসমান একাই অংকের খুঁটিনাটিগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। তাঁদের ছাত্রজীবনের মতোই পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে মাঝে-মাঝে তর্কাতর্কি হতো। এসময়ে গ্রসমান 'প্রতিশোধের' ফলাফল ভালো করেই উপভোগ করতেন। সময় এসে গিয়েছিল পদার্থবিজ্ঞানে গাণিতিক বিভাগের কাজকে প্রয়োগ করার— যে কাজটা গোড়ার দিকে করা হয়েছিল গণিতের 'কার্যকরী' বিভাগের কাজ-কর্মকে শুধু মানিয়ে নেওয়ার ও তাদের আরো সমৃদ্ধ করার জন্যে। এখন থেকে গণিতের যে-কোনো বিভাগ, সেটার কাজকর্ম আপাতদৃষ্টিতে যতই পরোক্ষ বলে মনে হোক না কেন, যে কোনো মুহূর্তে 'কার্যকরী' বিভাগ হবার আশা করতে পারত এবং পদার্থবিজ্ঞানে কোনো বিভাগের কাজকে সীমায়িত করার ব্যাপারটা গৃহীত হয়ে যাওয়াতে কোনো গবেষককে তার নতুন পদার্থগত তত্ত্বগুলিকে বিকশিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না নিয়েই কাজ করতে হতো।

গ্রসমানের সঙ্গে আইনস্টাইনের আলোচনাতে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যের সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার প্রতিফলন ছিল। আমরা যেমন জানি গণিতের বিবর্তনে যে কালপর্বে গণিতকে আধা-গবেষণা-

মূলক বিজ্ঞান বলে গণ্য করা হতো(১) তা থেকে গণিত যখন পদার্থবিজ্ঞান থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং সেইভাবে গাণিতিক প্রতিপাদ্যগুলির প্রথামতো উৎস বা পূর্ব-থেকে ধরে নেওয়া সিদ্ধান্ত রয়েছে বলে মোহের সৃষ্টি করল, —আইনস্টাইন তা থেকে এই কালপর্বকে পৃথক করে দেখেছেন। তৃতীয় কালপর্বে প্রাথমিক অভিজ্ঞতামূলক ধারণাগুলিতে না ফিরে গিয়েই গণিত পদার্থগত পরীক্ষার অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল, যার উদ্দেশ্য ছিল, গাণিতিক নির্মাণপদ্ধতির বাস্তবতার প্রশ্নের জবাব দেবার ব্যবস্থা করা। এর পদার্থগত অর্থ তখনই পরিষ্কার হবে যখন আমরা সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে পৌঁছব—যাতে দেশ ও কালের জ্যামিতিক চেহারার পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশ ও কালের পদার্থগত প্রক্রিয়াগুলিকে ধরা হয়—এই সমস্যাগুলিই আইনস্টাইন ও গ্রসমান জুরিখে আলোচনা করেছিলেন।

১৯১২-১৩ সালের শীতকালীন শিক্ষাপর্বে আইনস্টাইন জুরিখ পলিটেক-নিকে লেকচার দিয়েছিলেন বিশ্লেষক গণিত এবং তাপগতিশীলতা সম্পর্কে, গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে প্রবহমানতার বলবিদ্যা এবং তাপশক্তির গতিশীল তত্ত্ব সম্পর্কে এবং ১৯১৩-১৪ সালের শীতকালীন অধিবেশনে বিদ্যুৎ ও চৌম্বকত্ব এবং জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কে। প্রতি সপ্তাহে এ ছাড়া তিনি আলোচনা-চক্র (colloquiums) চালাতেন। ম্যাক্‌স্ ফন লুউ ১৯১২ সালে 'বিশেষ' অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। তিনি এই সম্পর্কে বলেছেন:

"প্রতি সপ্তাহে আইনস্টাইন যে আলোচনা-চক্র চালাতেন তাতে পদার্থবিজ্ঞানের নতুন বইগুলি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করা হতো। যদিও পলিটেকনিকে এই অধিবেশন বসত, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ কিছু ছাত্র ও শিক্ষক এতে যোগ দিতেন···আলোচনা-চক্রের পরে যার ইচ্ছে তার সঙ্গেই আইনস্টাইন ক্রোনেন্‌ হেলার রেস্টুরেন্টে ডিনার খেতে যেতেন···আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল আপেক্ষিকতার তত্ত্ব···১৯১৩ সালের গ্রীষ্মকালে বেশ প্রাণবন্ত আলোচনা হতো, যে সময়ে বেশ মেজাজী মানুষ পল এরেন্‌ফেস্ট জুরিখে এসেছিলেন। আমি এখনও যেন দেখতে পাই, একদল পদার্থবিদের

১ অর্থাৎ, যার সবকিছু শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যাচ্ছে, কোনো আগে থেকে ঠিক-করা তত্ত্বের বিচার বা পদ্ধতি যাতে কাজ করে না।

—অনুবাদক।

মধ্যে আইনস্টাইন ও এরেন্‌ফেস্ট জুরিখবার্গে চড়ছেন এবং এরেন্‌ফেস্ট চড়া গলায় বলছেন : এবার বুঝতে পারলাম।"(১)

এরেন্‌ফেস্টের সঙ্গে আইনস্টাইনের বন্ধুত্ব, যেটা প্রায় বিশ বছর বজায় ছিল এবং ১৯৩৩ সালে এরেন্‌ফেস্টের শোচনীয় মৃত্যুতে যার সমাপ্তি, আইনস্টাইনের যথেষ্ট উপকারে এসেছিল। এরেন্‌ফেস্ট ছিলেন মেধাবী তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবী প্রজন্মের মানুষ। একজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ এবং বিনয়ী, নম্র ও দয়ালু মানুষ ছিলেন তিনি। আইনস্টাইনের নিকটতম বন্ধু হিসেবে তিনি বোধ হয় ইউরোপের অন্য সব পদার্থবিদের অপেক্ষা তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন।

১৯১৩ সালের শরৎকালে ভিয়েনাতে আইনস্টাইন বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দেন ; সেখানে তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের একটা সহজবোধ্য রূপরেখা পেশ করেন। এই তত্ত্বটি (আপেক্ষিকতা) তখনও পূর্ণতা লাভ করে নি এবং আইনস্টাইন আলোচনার জন্যে এর সাধারণ দিকটিই শুধু উপস্থিত করেন। সেগুলি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে আরও বিশদ পরিচয় ঘটিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে হাজির করা হয়।

ভিয়েনাতে তাঁর তত্ত্বকে আইনস্টাইন মহাকর্ষ সম্পর্কে এক নতুন তত্ত্বরূপে পেশ করেন। বিদ্যুতের তত্ত্বের বিকাশের সঙ্গে তুলনা করে তিনি মহাকর্ষের তত্ত্বকে হাজির করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যুৎ সম্পর্কে যেটুকু জানা ছিল তা হল এই যে, বিদ্যুতের আধান (চার্জ) হিসাবে অস্তিত্ব রয়েছে, যাতে সে কোনো বস্তুকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করার ক্ষেত্রে তার থেকে সেই বস্তুর আনুপাতিকভাবে বিপরীত বর্গমূলের দূরত্বে বাড়ে বা কমে। মহাকর্ষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এর থেকে বেশি কিছু নয় এবং আমরা বস্তুদেহের আকর্ষণ বিকর্ষণের কথাই কেবলমাত্র জানি। তবুও ১৫০ বছর ধরে বিদ্যুৎ সম্পর্কে বিজ্ঞান বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের এবং তার দোলন-চরিত্র সম্পর্কে ধারণাটিকে প্রসারিত করেছে। স্পষ্টই সময় এসেছে যখন মহাকর্ষের তত্ত্ব সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা করা যেতে পারে। আইনস্টাইনের প্রস্তাব হচ্ছে যে, মহাকর্ষকে দেশ-এর এক রকমের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখতে হবে, দেশ-এর জ্যামিতিক ধর্ম যেন এই মহাকর্ষ।

১ C. Seelig, op. cit., S. 132.

৭৫ বছরের বৃদ্ধ মাখ দারুণ পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন এবং ভিয়েনা শহরের উপকণ্ঠে বাস করছিলেন, আইনস্টাইন এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে দেখা-করেন। ঘরে ঢুকে আইনস্টাইন দেখলেন, একজন বৃদ্ধ মানুষ, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া পাকা দাড়িতে মুখমণ্ডল ভর্তি আর মুখে কিছুটা ভালোমানুষি, কিছুটা চতুরতার ছাপ রয়েছে, ফ্রাংক যাকে বলেছেন যেন স্লাভ কৃষকের মতো দেখতে।(১) বারনার্ড কোহেনের(২) সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আইনস্টাইন-এর মাখ-এর সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা স্মরণ করেছেন: অন্যতম যে প্রধান বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল তা হল অণু ও পরমাণুদের নিয়ে।

পরে আমরা যখন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে আলোচনা করব, তখন আরও ভালো করে এই মতবাদ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই বছরগুলিতে যে তীব্র বৌদ্ধিক আলোচনা হয়েছিল, তা আমরা বুঝতে পারব। সেই সময়ে যাঁরাই আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা এই ধারণা নিয়ে আসতেন যে তাঁর মনটা সম্পূর্ণ বিভোর হয়ে রয়েছে, যেটা এমন কি হাল্কা বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা এবং খাবার সময়েও বজায় থাকত। আর ঠিক এই সময়েই আইনস্টাইনের পারিবারিক জীবনও একটা সমাপ্তির দিকে চলেছিল, যাতে মিলেভার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছিন্নতা বেড়েই যাচ্ছিল।

১ Ph. Frank, op. cit., p. 131.

২ B. Cohen, "An Interview with Einstein", Scientific American, Vol. 193, Noৎ 1, July, 1955. pp. 69-73.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বার্লিন

মনের শান্তি যাতে বরাবরের মতো বজায় থাকে এবং প্রশান্ত চিত্তে আমি যাতে ধ্যান-মগ্ন হতে পারি তার প্রতি আমার আকর্ষণের কথা, শান্তির জন্যে আমার সহজাত অনুরাগ ও আবেগ এবং এমন কিছু পেশায় নিজেকে জড়িয়ে রাখা যার সঙ্গে যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নেই, তার কথা আমি বলছি।

নুমা পমপিলাস

(প্লুটার্ক, 'সমান্তরাল জীবন')।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারের ফলে যে বিপ্লব সাধিত হয় তা অনেকাংশে অর্ধ শতাব্দী পরে পরমাণু থেকে যে বিপ্লব এল তারই পূর্বসূরী-স্বরূপ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শিল্পের জন্যে ব্যবহৃত ইন্‌জিনিয়ারিং-এর নতুন শাখাগুলিতে, যেমন রেডিও ও এক্স-রে ইন্‌জিনিয়ারিং, বিদ্যুৎপ্রবাহের চরিত্রকে বদলাবার জন্যে বৈদ্যুতিক টিউবে বায়ুশূন্য অবস্থার সৃষ্টি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল পদার্থগত পরীক্ষা চালানো। বৃহৎ বৈদ্যুতিক ইন্‌জিনিয়ারিং-এর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রথম বুঝতে পারল যে, পদার্থবিদ্যার জন্যে গবেষণাগার স্থাপন করার সুবিধা কী, যাতে তার ফলাফলগুলির সম্ভাব্য প্রয়োগ কী হবে সে সম্পর্কে আগে থেকে কোনো কিছু নির্ধারণ করতে না পারলেও গবেষণার জন্যে তাদের কাজকে ব্যবহার করার পথ খোলা থাকবে। বস্তুত, প্রায়ই হঠাৎ যে সকল অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া যেত সেগুলি আগে থেকে পরিকল্পনা-মাফিক যা পাওয়া যেত তার থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। যে কাজ করা হবে বলে (গবেষণার

কাজ—অনুবাদক) আগে থেকে একেবারে ঠিক করে নেওয়া হয়, সেটা থেকে কোনো রকমেই বিচ্যুতি হবে না—এই ধরনের কড়াকড়ি বজায় থাকলে নতুন সূত্রগুলির ভিত্তিতে আবিষ্কারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। যেমন, এই ধরনের বিবেচনা থেকেই জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি প্রখ্যাত বিদ্যুৎ-পদার্থবিদ চার্লস স্টাইনমেজ্‌কে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের গবেষণাগারের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত ক'রে তাঁকে যা খুশি করার অধিকার দিয়েছিল ; এটা করতে একমাত্র শর্ত ছিল যে, ফলাফল যা পাওয়া যাবে, তা প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত যা-ই হোক না কেন, সেটা কোম্পানির অধিকারে থাকবে। ক্রমশই বেশি সংখ্যায় নতুন নতুন ইন্‌স্টিটিউট গড়ে উঠতে লাগল, যাতে তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে প্রযুক্তির উন্নতির জন্যে নতুন নতুন সূত্র উদ্ভাবিত হতে থাকল। অবস্থা ও ঐতিহ্য অনুসারে এই ইন্‌স্টিটিউটগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, উচ্চতর কারিগরি স্কুলের গবেষণাগার, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অকাদেমির ও সোসাইটির অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি গবেষণাগারের উপর নির্ভর করে কাজ করতে লাগল।

বিভিন্ন দেশের গভর্নমেণ্ট সেই সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে টাকা ঢালতে লাগল, যাদের তাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে সন্দেহাতীত কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এমন ফল পাওয়া সম্ভব, যেটাকে প্রয়োগ করা যায়। তখন গ্রেট বৃটেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। জার্মান সাম্রাজ্য তা থেকে তাকে বঞ্চিত করে এমন একটা 'সশস্ত্রবাহিনী' তৈরি করতে চায় যাতে দুনিয়ার বাজারকে (বিশেষ করে যেসব দেশে ঔপনিবেশিক শোষণ চালানো যায়—অনুবাদক), কাঁচামালের উৎসকে এবং টাকা লগ্নী করার ক্ষেত্রগুলিকে কুক্ষিগত করার কাজে নামা যায় এবং এটা করতে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বুঝেছিল যে, শিল্পে ও সামরিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে হবে।

জার্মানির লগ্নীপুঁজিবাদী গোষ্ঠীরা জার্মান সম্রাটের সোসাইটি ও ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন করার ইচ্ছাতে বেশ সাড়া দিল, যেগুলির নামকরণ হবে রাজার নামানুসারেই। কাইজার ভিলহেলম্‌ গেজেলসাফ্‌ট-এ ব্যাংক ও শিল্পের মালিকরা একত্র হয়ে রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটগুলি গড়ে তুলবে। তার সভ্যদের খেতাব দেওয়া হল 'সেনেটার' এবং তাদের চমৎকার একটি পোষাক পরবার অধিকার দেওয়া হল এবং কখনও কখনও তাদের সম্রাটের

সঙ্গে প্রাতরাশ খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করা হতো। সম্রাটের রাজভক্ত প্রজাদের মধ্যে কে এই প্রলোভনের শিকার না হবে?

কাইজার ভিলহেলম্ ইন্‌স্টিটিউটে থাকবেন সবচেয়ে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা, এইভাবেই তাকে ভাবা হয়েছিল; তাঁদের সবাইকে মোটা মাইনে দেওয়া হবে। ছাত্র পড়াবার কোনো দায়িত্ব তাঁদের থাকবে না এবং ইচ্ছামতো ব্যক্তিগতভাবে যে-কোনো গবেষণা তাঁরা চালাতে পারবেন। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, এই ধরনের অনুসন্ধানের ফলাফল বাস্তবিকই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে। ম্যাকস্ প্ল্যাংক ও ভালটার নের্নস্ট-এর 'পরে ইন্‌স্টিটিউট এর বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করার দায়িত্ব দেওয়া হল।

কোয়ান্টা-র(১) তত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা পদার্থবিদ ম্যাকস্ প্ল্যাংক তীক্ষ্ণ অনুভূতির সঙ্গে বিরাট বৈজ্ঞানিক ব্যাপ্তি নিয়ে আপেক্ষিকতাবাদের অন্তর্নিহিত সুষমা ও সৌন্দর্যের শুধুই একজন প্রথম সমঝদার ছিলেন তাই নয়, তিনি বুঝেছিলেন অথবা অনুভব করেছিলেন (বলা শক্ত তিনি যুক্তি বা অনুভব, কিসের দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন) যে বহু বছর ধরে আইনস্টাইনের তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রধান পথ-নির্দেশক হবে, যাতে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রে এমন অভাবিত ফল পাওয়া যাবে যা বিশেষ মূল্যবান। বিদ্বৎমহলে প্ল্যাংকের বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক কর্তৃত্ব ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী; আইনস্টাইন লম্বা, রোগা, কিছুটা নিজেকে আলাদা করে রাখা মানুষটিকে খুবই পছন্দ করতেন। এই মানুষটি যখনই পিয়ানো বাজাতে বসতেন অথবা কোনো একটি সুন্দর প্রবন্ধ (পেপার) লিখতে বসতেন, যাতে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর রোম্যান্টিক একাগ্রতা প্রকাশ পেত, তখনই ফুটে উঠত তাঁর রোম্যান্টিকধর্মী প্রকৃতি।

সরকারী মহলেও প্ল্যাংকের যথেষ্ট খাতির ছিল। তাঁর বংশগত আভিজাত্য, প্রচলিত প্রথায় তাঁর আস্থা, চালচলনে বিশিষ্টতা এবং তাঁর সৈনিক-জনোচিত চালচলনের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক সমাজের কাছে আবেদন ছিল।

১ কোয়ান্টা—আক্ষরিক অনুবাদে কণীয় বলা যেতে পারে কিন্তু আলোর চরিত্রে কণীয় এবং তরঙ্গ-ধর্মিতা দুই-ই পাওয়া যায়। এজন্য আমরা এখানে মূল লাতিন কোয়ান্টা শব্দটাই ব্যবহার করলাম।—অনুবাদক।

অন্যদিকে ভাল্‌টার নের্নস্ট বুর্জোয়াদের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত এই রসায়নবিদ, যেমন ছিলেন প্রচণ্ড সক্রিয়, তেমনি ছিলেন শক্তিধর, তেমনি সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল যেন তাঁর জন্মগত; আবার গভীর ও মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন তিনি।

প্ল্যাংক ও নের্নস্ট ব্যক্তিগতভাবে আইনস্টাইনের কাছে এই প্রস্তাবটি নিয়ে এলেন: তিনি পদার্থবিদ্যার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টর এবং প্রাশিয়ান বিজ্ঞান অকাদেমির সভ্য হবেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবেন তিনি, তবে ছাত্রদের কাছে কয়েকটি মাত্র বক্তৃতা দিতে হবে, যেটা তিনি নিজেই প্ল্যান করবেন। অন্য কোনো দায়দায়িত্ব তাঁর থাকবে না এবং পছন্দমতো সমস্যাগুলি বেছে নিয়ে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে তাঁর কোনো বাধা থাকবে না। এই সঙ্গেই অন্যান্য ইন্‌স্টিটিউট ও সোসাইটির কাজে যোগ দিতেও তিনি পারবেন।

আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে আপেক্ষিকতা-বাদের সাধারণীকরণের জন্যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করতে পারবেন। তাছাড়া প্ল্যাংক ও নের্নস্ট দেখিয়ে দিলেন যে, বার্লিনে বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় পদার্থবিদ ও গণিতজ্ঞের সংস্পর্শেও তিনি আসতে পারবেন। আইনস্টাইন যখন টিপ্পনী কাটলেন যে, প্রফেসার লজভ্যার মতে দুনিয়াতে মাত্র বারোজন লোক আপেক্ষিকতাবাদ যথার্থভাবে বোঝে, তখন নের্নস্ট তাতে জবাব দিলেন যে, তার মধ্যে আটজন বাস করে বার্লিনে। তবুও আইনস্টাইন ইতস্তত করছিলেন। জুরিখের সহনশীল, ঢিলেঢালা পরিবেশ ছেড়ে জার্মানির জঙ্গী নাক-উঁচু সরকারী ব্যবস্থাতে যাওয়ার ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগছিল না। তিনি জানতেন, বিদ্বৎমহলের যতই সুন্দর ও আলাদা আশ্রয়স্থল থাক না কেন, এটা থেকে পার পাবার উপায় নেই।

কথাবার্তায় অস্থায়ীভাবে একটা চুক্তি হল। ব্যাপারটা ভেবে দেখার জন্যে আইনস্টাইন আরও কিছু সময় চাইলেন। তাঁরা রাজি হলেন যে, প্ল্যাংক ও নের্নস্ট পুনরায় জুরিখে ফিরে আসবেন শেষ জবাব পাবার জন্যে। নিজের প্রতি সততা সত্ত্বেও তিনি একটা ছোট্ট রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারলেন না: লাল গোলাপের তোড়া নিয়ে যদি তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন তাহলে বুঝতে হবে প্রস্তাব গৃহীত হল, আর সাদা গোলাপের তোড়া হলে বুঝতে হবে, প্রস্তাব নাকচ করা হচ্ছে।

ঐ দুটি মানুষ যখন আবার জুরিখ স্টেশনে ফিরে এলেন তখন দেখা গেল, আইনস্টাইন তাঁদের অভ্যর্থনা করতে লাল গোলাপের তোড়া নিয়ে এসেছেন।

মিলেভা জুরিখে রয়ে গেলেন। তাঁদের বিচ্ছেদ তখন আসন্ন এবং বার্লিনের জন্যে আইনস্টাইন একাই রওনা হলেন।

বার্লিনে আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক মহলের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান ব্যবস্থাটা ছিল প্রতি সপ্তাহে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে সেমিনার করা, সেটা জার্মানি ত্যাগের পূর্বপর্যন্ত বরাবর তিনি করেছিলেন। সেমিনারে যোগদানকারী অনেকে অচিরেই তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু হয়ে উঠলেন। নের্নস্ট ও প্ল্যাংক ছাড়া, ছিলেন ম্যাকস্ ফন লুয়ে, যিনি ১৯১২ সালে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে কেলাসে রশ্মির বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেছেন—যেটা বস্তুর গঠনতন্ত্রের নতুন ধারণার অন্যতম প্রধান একটি ভিত্তিস্তম্ভ বলা যেতে পারে। লুয়ে অনেকগুলি তাত্ত্বিক বইয়ের লেখক ছিলেন, যার মধ্যে আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে একটি বেশ বিশ্লেষণমূলক লেখা ছিল। গুস্তাফ হার্জ, জেমস্ ফ্রাংক এবং এরউইন সোডিঙ্গার-এর মতো বিখ্যাত পদার্থবিদরাও সেমিনারে যোগ দিতেন, শেষ জনের অবশ্য তখনও নামডাক হয় নি (১৯২৪-২৬ সালে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভিত্তি যখন স্থাপিত হয় তখন এঁর নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটবে)। একটা সময়ে লিসা মাইটনার সেমিনারে যোগ দিতেন, এই ভদ্রমহিলা ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে ইউরেনিয়ামের বিভাজন-প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে সারা দুনিয়াতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এই সেমিনারে আগেকার দিনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই এটা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের স্মৃতিতে আইনস্টাইন উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। এটা শুধু তাঁর বক্তব্যের গভীরতা ও প্রাঞ্জলতার জন্যে নয়। আইনস্টাইনের আন্তরিক আড়ম্বরহীন ব্যবহার, তাঁর সহকর্মীদের ধারণাগুলিকে সহজে ধরতে পারা (যেটা প্রতিভার সত্যিকারের লক্ষণ)—এইসব জমায়েতগুলিকে একটা জ্যোতির্ময় ঔজ্জ্বল্য এনে দিত। অন্যদিকে এই নতুন সভ্যটি সরকারী সভায় প্রায় যেতেনই না, যার মধ্যে প্রাশিয়ান বিজ্ঞান অকাদেমিও ছিল। তিনি প্রায়ই অকাদেমির সভা নিয়ে বিদ্রূপ করতেন (এবং সাধারণত তাঁর হাস্যপরিহাসে তেমন কোনো খোঁচা যে থাকত না, তা নয়)। এইসব সভায় সভ্যরা আলোচনার সময়ে একটা

বিশেষ কোনো খুঁটিনাটি কিন্তু তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সম্মানজনক গাম্ভীর্য বজায় রাখতে গিয়ে ঝিমোতেন এবং সেখানে বিজ্ঞান থেকে বহুদূরের যে সমস্যাগুলি তা নিয়ে এমন লোকেরা গরম বক্তৃতা দিতেন যাঁরা বিজ্ঞানকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে বিজ্ঞানের কাছে তাঁদের ঋণ অনেক বেশি।

আইনস্টাইন পদমর্যাদার জন্যে আদবকায়দা ও কেতাদুরস্ত ভাবভঙ্গিকে একেবারে অপছন্দ করতেন। ১৯১৪ সালের মে মাসে তিনি এডলফ হুরভিৎসকে জুরিখে লিখেছিলেন: "যা আশঙ্কা করেছিলাম তার পরিবর্তে জীবনযাত্রাটা এখানে তত খারাপ নয়, তবে আমার নিস্তরঙ্গ জীবনকে যা ব্যাহত করে তা হল এটাই যে, আমাকে নানা ধরনের অর্থহীন ব্যাপারের জন্যে খোপদুরস্ত করার চেষ্টা চলছে, যেমন কী ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরলে পরে কেউ যাতে আমাকে মনে না করে যে, আমি সমাজের একেবারে নিচুস্তর থেকে এসেছি।"(১)

বার্লিনে আইনস্টাইনের গোড়ার দিকের জীবনযাত্রা নতুন মানুষদের সঙ্গলাভ করে বন্ধুত্ব পাকা করতে কেটে গেল; একই সময়ে তিনি তাঁর শত্রুদের লক্ষ্য করলেন না। তাঁর মন তখন ব্যাপৃত রয়েছে ত্বরণবেগের আপেক্ষিকতা, অভিকর্ষ এবং দেশগত ঘটনাবলীর উপরে দেশ-এর জ্যামিতিক ধর্মের (property) কী প্রভাব পড়বে,—এই সকল সমস্যা নিয়ে। এদের সম্পর্কে চিন্তা করা থেকে তিনি কখনও বিরত হতেন না।

ফিলিপ ফ্রাংক স্মরণ করেছেন, একবার আইনস্টাইনের কাছে গিয়ে তাঁরা দুজনে ঠিক করলেন যে, পটস্ডাম-এর নভোবস্তুবিদ্যা (astrophysical) সম্পর্কে যে মানমন্দির আছে, সেখানে তাঁরা যাবেন। পটস্ডাম-এর একটা সেতুর উপরে তাঁরা একসঙ্গে হয়ে যাবেন বলে ঠিক করা হল, কিন্তু ফ্রাংকের বার্লিনে অনেক কিছু কাজ থাকায় আশঙ্কা ছিল যে, সাক্ষাৎকারের জায়গাতে পৌঁছতে হয়তো তাঁর সামান্য কিছু দেরি হতে পারে। "আহা, তাতে কোনো হেরফের হবে না," বললেন আইনস্টাইন, "আমি সেতুর উপরে অপেক্ষা করবো।" ফ্রাংক আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, তিনি হয়তো আইনস্টাইনের অনেকটা সময় নিরর্থক নষ্ট করে দেবেন। উত্তরে আইনস্টাইন বললেন, "আরে না, না, তা কেন হবে। আমি যে ধরনের কাজ করছি সেটা যে-

১ C. Seelig, op. cit., p. 247.

কোনো জায়গাতেই করা যায়। যে সমস্যাগুলি নিয়ে আমি চিন্তা করছি, সেটা বাড়িতে বসেই যদি করতে পারি তো পটস্‌ডাম সেতুর উপরে দাঁড়িয়ে থেকে কেন করতে পারব না ?" ফ্রাংক আরও বলেছেন যে, আইনস্টাইনের চিন্তাধারা একটা অবিরাম স্রোতের মতো বয়ে চলত। কোনো বিশাল গভীর নদীর স্রোতের মধ্যে একটা ছোটো পাথরের টুকরো ফেলে দিলে যেমন সামান্য একটু বাধার সৃষ্টি হয়, তেমনি আইনস্টাইনের বহতা চিন্তাস্রোতের মধ্যে যে-কোনা কথাবার্তা সামান্য একটু আলোড়নের সৃষ্টি করত কিন্তু তার স্রোতোধারার গতিকে প্রভাবিত করতে পারত না।(১) এ থেকেই বোঝা যায়, কেন আইনস্টাইনের মনের বিরামহীন তীব্র ক্রিয়া তাঁর মনের সহজ বন্ধুতাকে কখনও ক্ষুণ্ণ করে নি।

অন্যদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে আইনস্টাইন যে সব সময়েই রাজি তাতে অনেক সময়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতো। একবার তিনি শুনলেন যে, বার্লিনে তাঁর অন্যতম একজন সহকর্মী বেশ নাম-করা শারীরবিদ্যাবিদ অধ্যাপক স্টামফ তাঁর সঙ্গে মহাকাশ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে উৎসুক। আইনস্টাইন মনে করলেন, পারস্পরিক ঔৎসুক্যজনিত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। সকালের দিকে তাঁকে পাওয়া যাবে আশা করে তিনি ঐ অধ্যাপকের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। যখন তিনি পৌঁছলেন, বাড়ির পরিচারিকা জানাল যে, হের গেহেইমরাত তখন বাড়িতে নেই এবং আইনস্টাইন কোনো খবর তাঁকে দেবার জন্যে দিতে চান কি, না ? আইনস্টাইন বললেন, পরে বেলা হলে তিনি ফিরে আসবেন, ইতিমধ্যে পার্কে একটু বেড়াবেন। বেলা দুটোতে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তাঁকে বলা হল যে, হের গেহেইমরাত দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে ঘুমুচ্ছেন, কারণ তাঁকে বলা হয় নি যে, আইনস্টাইন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আবার ফিরে আসবেন। "কুছ পরোয়া নেই," বললেন আইনস্টাইন, "আমি আবার আসব।" বেলা ৪-টার সময় যখন তিনি এলেন তখন হের গেহেইমরাত-এর সঙ্গে দেখা হল। "দেখছো," আইনস্টাইন বললেন পরিচারিকাকে, "ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের শেষ অবধি জয় হয়।" স্টামফ-রা বিখ্যাত আইনস্টাইনকে দেখে বিশেষ আনন্দিত হলেন এবং তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, কথাবার্তাটা সাধারণ সৌজন্যমূলক হবে যাতে বিষয়বস্তুর

১ Ph. Frank, op. cit., pp. 147-148.

আলোচনা করার জন্যে পরে একটা দিন আনুষ্ঠানিকভাবে ধার্য করা যায়। আইনস্টাইন কিন্তু সোজা মহাকাশের সমস্যা নিয়ে কথা পাড়লেন। বেচারী স্টামফ্-এর বিশদ কোনো পদার্থগত বা গাণিতিক জ্ঞান ছিল না, তিনি আলোচনার বিশেষ কিছু বুঝলেন না এবং সামান্য একটু হাঁ-হুঁ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না। প্রায় চল্লিশ মিনিট এইভাবে কথাবার্তা চালাবার পরে আইনস্টাইন হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে, এতাবৎ তিনি নিজের সঙ্গেই কথা চালাচ্ছেন এবং তার দেখা-সাক্ষাৎ করাটা বেশ দীর্ঘ সময় ধরে হয়েছে। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে তিনি দ্রুত চলে গেলেন।

এই ধরনের ঘটনাতে অবশ্য আইনস্টাইনের মনের শান্তি কখনও বিঘ্নিত হতো না। তাঁর নিজস্ব অধ্যাপকীয় পরিমণ্ডলেও তিনি কিছুটা ঔৎসুক্যের অথবা বোঝবার ক্ষমতার অভাব দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। যে লোকেরা আসলে তাঁকে বিরক্ত করত তারা হল সেই ধরনের মানুষ যারা আগ্রাসী মনোভাবসম্পন্ন রাষ্ট্রের সব রকম মতলব হাসিল করার জন্যেই জন্মেছে। এরাই ছিল 'প্রাশিয়ান মেজাজের' বাহক, এদের তিনি তাঁর ছোটবেলায় মিউনিখে থাকার সময় থেকেই ভালো করে জানতেন। এক সময়ে তিনি বলেছিলেন: "এই ধরনের একেবারে ঠাণ্ডা সোনালি-চুলওয়ালা(১) লোকেদের সংস্পর্শে এলে আমার বড় অস্বস্তি হয়, অন্যদের সম্পর্কে মনের দিক থেকে কোনো কিছু বোঝার তাদের ক্ষমতা নেই। সবকিছু তাদের একেবারে বিশদ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।" ঘটনাবলী দ্রুত সেইদিকে যাচ্ছিল, যাতে এই 'ঠাণ্ডা সোনালি চুলওয়ালা লোকেরা'ই সামনের সারিতে এসে পড়ছিল। আইনস্টাইনের বার্লিনে বসবাস শুরু করার এক বছরের মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেল।

'দুনিয়াকে যে-ভাবে আমি দেখি' বইয়েতে আইনস্টাইন যুদ্ধ ও সমরবাদ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছেন: "একটা মানুষ ব্যাণ্ডের সঙ্গে তালে তালে পা মিলিয়ে মার্চ করতে পারে, এতেই তার প্রতি আমার যথেষ্ট ঘৃণার উদ্রেক হয়। তার বড় মস্তিষ্কটা তাকে ভুলক্রমে দেওয়া হয়েছে, অরক্ষিত মেরুদণ্ডটি-ই তার একমাত্র প্রয়োজন। সভ্যতার এই দুষ্ট ক্ষতকে যত

১ cool blond people—blond বলতে শনের মতো ঈষৎ সোনালি রংয়ের চুল, সাধারণত উত্তর ইউরোপের যেসব দেশ খুব বেশি ঠাণ্ডা, সেখানে দেখা যায় এবং এদের মেজাজও বরফের মতোই ঠাণ্ডা, সহজে তারা যেন উত্তেজিত হয় না অথচ ভেতরে ভেতরে অনেক সময় প্যাঁচ কষে।—অনুবাদক।

তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করে দিতে হবে। হুকুম-মাফিক বীরত্ব দেখানো, বোধজ্ঞানহীন হিংসা এবং দেশপ্রেমের নামে যত ঘৃণ্যকারজনক আবোল-তাবোল ব্যাপার—তীব্র আবেগের সঙ্গে আমি এগুলিকে ঘৃণা করি। যুদ্ধ কতটা নোংরা ও ঘৃণ্য আমার কাছে! এই ধরনের জঘন্য ব্যাপারে যোগ দেওয়ার চেয়ে আমাকে যেন টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেলা হয়। মানবজাতি সম্পর্কে আমার ধারণা যথেষ্ট উঁচু বলেই আমি মনে করি। এই ভূত বহুদিন আগেই দূর হয়ে যেত, যদি বিভিন্ন দেশের জনগণের সুস্থ মনোভাবকে নিয়মিতভাবে স্কুল ও পত্রপত্রিকা মারফৎ ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থের জন্যে দূষিত করে তোলা না হতো।"(১)

জুলাই, ১৯১৪ সালে বার্লিনের রাস্তা দিয়ে সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে যেতে শুরু করে এবং জার্মান সম্রাট কাইজার ও জার্মান সামরিক দপ্তর, রাইশ্‌স্‌ভেয়ার-এর সমর্থনে লোকেরা পথের ধারে ভীড় করে সোৎসাহে সেই কুচকাওয়াজ দেখত।(২)

বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদের সমর্থকদের বাধ্য হয়ে গা-ঢাকা দিতে হল। আইনস্টাইনের কাছে এ একটা রাতের দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে দাঁড়াল। তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, বিদ্বৎমহলে বর্বর জাতিদম্ভী মনোভাবে সবকিছু বিষাক্ত হয়ে গেছে। শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধী নাগরিকরা, যাদের বিশ্বসংস্কৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, তারা এখন হঠাৎ সামরিক সঙ্গীতে আনন্দ পেতে শুরু করল এবং রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে খতম করার কথা বলতে লাগল আর হাজার হাজার মানুষের নিহত হওয়ার খবর আনন্দের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করতে লাগল। বিষাক্ত গোঁড়া মনোভাব নিয়ে জার্মানির ঐতিহাসিক লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লেখা শুরু হল, লেসিং ও শিলারের লেখাগুলি বইয়ের টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলা হল। ওসটভাল্ড বলতে শুরু করলেন যে, হোহেনৎসোলারন সাম্রাজ্যের পদানত হয়ে থাকাটা ইউরোপের মহত্তম কাজ এবং জার্মান বুদ্ধিজীবীদের এমন একটা ইস্তাহারে সই দিলেন, যেটার মধ্যে জার্মান জাতীয়তাবাদের কয়েকটি জঘন্য

১ Ideas and Opinions, pp. 10-11.

২ অর্থাৎ যে যুদ্ধ পররাজ্য গ্রাস এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের জন্য ছিল, তার সমর্থনে জার্মান জনগণের জাতিদম্ভী মনোভাবকে জাগ্রত করা হতে লাগল—অনুবাদক।

দিকের প্রকাশ ঘটেছিল। অন্যরা, প্ল্যাংক তাঁদের মধ্যে একজন, একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কেবলমাত্র কিছুটা অসংলগ্নভাবে জার্মানির 'বৈধ দাবিগুলি' নিয়ে নিচু গলায় কিছু কথা বললেন। আইনস্টাইনের পক্ষে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে অবাধ ও সহৃদয় সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হল না। কিন্তু তিনি একেবারে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র পদার্থগত সমস্যার মধ্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারলেন না। মাত্র কয়েকজন নিকট-বন্ধু ছাড়া তিনি এমন কাউকে জানতেন না, যে তাঁর আদর্শ এবং মুক্তি ও আন্তর্জাতিক সংহতির প্রতি আনুগত্য বজায় রাখত। যে সকল যুদ্ধবিরোধী বিপ্লবী গোষ্ঠী কাজ করছিল তাদের কাজ তাঁর থেকে অনেক দূরে ছিল, তবে তাঁর মতন মতের লোকদের সঙ্গে শীগগিরই তাঁর যোগাযোগ ঘটল। ফরাসি লেখক র্‍ঁ্যমা র‍ঁল্যা এবং কয়েকজন বিজ্ঞানী ও লেখক তাঁর পাশে জড়ো হলেন।

মার্চ, ১৯১৫ সালে রঁলাকে লেখা একটা চিঠিতে তিনি নিজেকে রঁলার যুদ্ধবিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইলেন। আইনস্টাইন লিখলেন, ইউরোপে তিন শতাব্দী ধরে তীব্র ঐকান্তিকতার সঙ্গে সাংস্কৃতিক কাজকর্ম করার পরে ধর্মীয় উন্মাদনার পরিবর্তে এখন জাতীয় উন্মাদনা দেখা দিয়েছে। . তিনি আরও বললেন, কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এমন ব্যবহার করছেন যেন তাঁদের মস্তিষ্কটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যুক্তিবাদের যথার্থ প্রবক্তারূপে, অতগুলি বৈজ্ঞানিকের যুক্তির বদলে পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করাটা আইনস্টাইনের কাছে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে চরম ট্রাজেডী বলে মনে হল।

১৯১৫ সালের শরৎকালে আইনস্টাইন সুইজারল্যাণ্ড যাবার ব্যবস্থা করতে পারলেন, সেখানে মিলেভার সঙ্গে তাঁর ছেলেরা বাস করছিল। ছেলেদের তিনি বিশেষ করে দেখতে চেয়েছিলেন। ভেভেয়-তে আইনস্টাইন র‍ঁ্যমা র‍ঁলার সঙ্গে দেখা করলেন; র‍ঁলা তাঁকে জানালেন, সকল যুদ্ধরত দেশেই যুদ্ধবিরোধী লোকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী কাজ করছে। আইনস্টাইনকে রঁলা যথেষ্ট প্রভাবিত করলেন এবং যে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী চরম জাতীয়তাবাদের দুষ্ট প্রকাশের বিরোধী—আইনস্টাইন নিজেকে তাদের সমগোত্রীয় বলে মনে করতে শুরু করলেন। জার্মানিতেও অনুরূপ মনোভাবের 'মানুষ আইনস্টাইন খুঁজে পেলেন।

যুদ্ধ তখন চলছে এবং বিজ্ঞানী-মহলকে জাতীয়তাবাদী আবেগে বিষাক্ত করে তুলছে। যেমন, জার্মান পদার্থবিদদের একটি গোষ্ঠী এক সারকুলার দিল, যাতে তারা তাদের সহকর্মীদের প্রায় আদেশ ছিল যে, ইংরাজ পদার্থবিদদের লেখা থেকে যেন কোনো উদ্‌ধৃতি না দেওয়া হয়। তারা জোর দিয়ে বলতে চাইল যে জার্মান বিজ্ঞানেও বিশেষভাবে গভীরতা রয়েছে এবং ইংরাজ ও ফরাসিদের তত্ত্বের ভাসা-ভাসা চরিত্রের তুলনায় তাতে অনেক বেশি খুঁটিয়ে দেখানো হয়। এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী হামবড়াই মনোভাব আইনস্টাইনকে সেই সকল লোকের সঙ্গলাভে আগ্রহী করে তুলল—যাঁদের যুক্তি ও বিবেক অতখানি বিকৃত হয় নি। তিনি তাঁর বাবার খুড়তুতো ভাই রুডলফ আইনস্টাইনের বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করলেন, রুডলফ তাঁর কন্যা এলসার সঙ্গে বার্লিনে বাস করতেন। এলসা ছিল অ্যালবার্টে'র (আইনস্টাইনের) ছেলেবেলার বান্ধবী। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরে দুই কন্যা নিয়ে এলসা বার্লিনে এসেছিলেন। বেশ আকর্ষণীয় চেহারা, মধুর স্বভাবের, হাস্যপরিহাসপ্রিয় এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপারে আইনস্টাইনের স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। ১৯১৯ এ বিবাহ বিচ্ছেদের পরে আইনস্টাইন এলসাকে বিবাহ করেন।

১৯১৭ সালে অনেক বৈজ্ঞানিকের সামনে এমন সব সমস্যার উদ্ভব হল যেগুলির তাঁরা ইতিপূর্বে কখনও সম্মুখীন হন নি। তাঁরা কোন্ পক্ষে দাঁড়াবেন, নতুন যে-সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব হল তার সম্পর্কে তাদের মনোভাব কী, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা কী ভাবেন?

ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক স্তরভেদ ঘটছিল, সময়টা ছিল এমন যখন পরিষ্কার করে বলতে হবে তাদের অবস্থান কী এবং কোথায়। আইনস্টাইন রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা যুক্তি ও বিজ্ঞানের 'পরে প্রতিষ্ঠিত যে নতুন সমাজ গড়ে উঠছে তাকে স্বাগত জানালেন। লেনিনকে তিনি চিত্রিত করলেন এমন একজন মানুষ রূপে "যিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছেন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন···তাঁর মতো মানুষ মানব-সমাজের বিবেকের অভিভাবকস্বরূপ এবং তাঁদের দ্বারাই সেটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।"(১)

---

১. C. Seelig, op. cit., S. 319.

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ

> ১৯১৯ সালে আইনস্টাইনের নয় বছরের ছেলে এডওয়ার্ড তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল: "বাবা, তুমি এত বিখ্যাত হলে কী করে? আইনস্টাইন হেসে ফেলেছিলেন, তারপর জবাব দিলেন বেশ গম্ভীরভাবেই: "আরে বেটা, দেখ, একটা অন্ধ ছারপোকা যখন একটা গোলাকার কিছুর বাঁকা পিঠ বেয়ে উপর দিকে উঠতে আরম্ভ করে, সে কিন্তু লক্ষ্য করে না যে তার পথটা বাঁকা। আমার খুব ভাগ্য ভালো যে, সেটা আমার নজরে এসেছিল।"

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে আইনস্টাইনের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল আরও একটা সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করা। আমরা আগেই এটা দেখেছি, যেসব কাঠামো, অনুরূপ অন্যান্য কাঠামোর তুলনায় সমগতি নিয়ে সরল রেখা ধরে চলছে, আইনস্টাইন তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানোকে কৃত্রিম বলে মনে করতেন। যে সকল নির্দেশক কাঠামোকে (রেফারেন্স সিস্টেম) তিনি তুলনামূলক ভাবে উল্লেখ করতেন, তাতে সমতার সঙ্গে সরল রেখা ধরে যে গতি সৃষ্টি হয় সেখানকার যান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি সবসময়েই একই দিকে কাজ করে এবং ঐ কাঠামোর গতির 'পরে নির্ভর করে না; পরন্তু ত্বরণবেগযুক্ত গতিশীল কাঠামোতে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি অন্যভাবে ঘটে থাকে, সেটা নির্ভর করে ত্বরণবেগ কতটুকু তার 'পরে। ত্বরণবেগ জাড্যজনিত বলের সৃষ্টি করে যাকে বল-এর প্রতিক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এবং যা থেকে বোঝা যায় যে, কাঠামোটা গতিশীল, আর তাহলে

ঐ ধরনের গতিকে পরম (absolute) বলে ধরতে হয়। এই কারণে গ্যালিলিও-নিউটনের আপেক্ষিকতার সূত্রটি কেবলমাত্র সরলরেখা ধরে ধাবমান কাঠামোগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ঘোষণা করতে চায় যে, জাড্যের কাঠামো-গুলিতে সব রকমের পদার্থগত প্রক্রিয়া একইভাবে ঘটে থাকে। আমরা দেখব এই ধরনের বক্তব্য জাড্যজনিত কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ত্বরণবেগ প্রক্রিয়াগুলির সমধর্মী প্রবাহকে ব্যাহত ক'রে তার পরম বা অনপেক্ষ চরিত্রের প্রমাণ দেয়। ত্বরণবেগ-চালিত কাঠামোতে এমন অবস্থা ঘটবে বলে কি মনে করা যায়, যেটা আপেক্ষিকতার সূত্রকে লঙ্ঘন করবে না, অর্থাৎ গতির পরম মানদণ্ড হাজির করবে না ? সকল রকমের আপেক্ষিকতার সূত্র, যা যে-কোনো জাড্যযুক্ত কাঠামোর পক্ষেই প্রযোজ্য, তাকে কি ত্বরণবেগ-চালিত কাঠামোগুলিতেও প্রসারিত করা যায় ?

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পরিচিত একটি নিয়মের দ্বারা এর ইতিবাচক জবাব দেওয়া হয়েছিল।

সব বস্তু-দেহেরই জাড্য রয়েছে এবং সেগুলি বল-এর দ্বারা প্রভাবান্বিত ক্ষেত্রের ক্রিয়াকে বাধা দিয়ে থাকে।(১) সেই বস্তু-দেহের প্রতিরোধ কী পরিমাণের হবে, সেটাই হচ্ছে তার জাড্যজনিত ভর (inertial mass)। তা ছাড়া সমস্ত বস্তু-দেহই বলের ক্ষেত্রে সাড়াপ্রবণ। যেমন ধরা যাক, বিদ্যুৎশক্তি-প্রভাবিত বস্তু-দেহ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে সাড়া দিয়ে থাকে (বা তাদের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—অনুবাদক) এবং বৈদ্যুতিক শক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ তাদের 'পরে নানা মাত্রাতে কাজ করে। যে পরিমাণে তারা 'সাড়া' দেয়, সেটাই তাদের বস্তু-দেহের বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ বা চার্জ। বৈদ্যুতিক শক্তির ক্ষেত্রে বস্তুর 'সাড়া' দেওয়াটা যেন তাদের নিজস্ব সম্পদের মতো, অর্থাৎ সেটা হল একটা চার্জ, যেটা তাদের ভর-এর 'পরে নির্ভর করে না। একটা বস্তু-দেহের বিপুল পরিমাণ ভর থাকতে পারে এবং তার বৈদ্যুতিক শক্তি

১ যেমন, একটা স্থাণু বস্তুকে নড়াতে বা স্থানচ্যুত করতে হলে বল (force) প্রয়োগ করতে হয়, কারণ ঐ বস্তু-দেহটি মাধ্যাকর্ষণের বলের ক্ষেত্রের (gravitational field) মধ্যে রয়েছে। কতটা পরিমাণে বল প্রয়োগ করলে তবে তাকে স্থানচ্যুত করা যাবে, সেটা নির্ভর করে ঐ বস্তু-দেহের ভরের (mass) উপর। —অনুবাদক।

হতে পারে সামান্য, আবার এর বিপরীতও হতে পারে। বস্তুত কোনো বস্তুর ভর থাকলে তার যে বৈদ্যুতিক শক্তি থাকতেই হবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই।

তবে এমন সব ক্ষেত্র পাওয়া যায়, যেখানে একটি বস্তু কতখানি 'সাড়া' দেবে সেটা নির্ভর করে তার ভরের অনুপাতের উপর। এই ক্ষেত্রগুলি মহাকর্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে। সমস্ত পদার্থগত বস্তুরই অন্য বস্তুর মহাকর্ষ-জনিত বল থেকে উদ্ভূত আকর্ষণের মধ্যে পড়তে হয়। প্রতিটি অবস্থাতেই একটি মহাকর্ষের ক্ষেত্রের মধ্যে একটি বস্তু-দেহের 'সাড়া' (তার 'মহাকর্ষের চার্জ' বা 'মহাকর্ষের ভর') সেই বস্তুর ঐ ক্ষেত্রকে কতটুকু বাধা দিচ্ছে তার অনুপাতে ঘটে থাকে, অর্থাৎ তার জাড্যজনিত ভর অনুসারে হয়ে থাকে। একটা বস্তু-দেহের ভর যত বেশি হবে (সোজা কথায় যত ভারী হবে—অনুবাদক) তত তার গতিবেগকে বদলানো শক্ত হবে ; কিন্তু জাড্যজনিত ভর যত বেশি হবে, তত সে বেশি ভারী হবে এবং ততই তার অন্য বস্তুর কাছে পৌঁছে যাবার ঝোঁক বাড়বে। এর ফলে বস্তু-দেহগুলির গোড়াতে যতই জাড্যজনিত ভর থাকুক না কেন, একটা নির্দিষ্ট মহাকর্ষের ক্ষেত্রে একই ত্বরণবেগের অভিজ্ঞতা হবে এবং ভূপৃষ্ঠের নিকটে সে একই উচ্চতা থেকে একই দ্রুতি নিয়ে ভূপৃষ্ঠের উপরে পতিত হবে (অবশ্যই বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণজনিত বাধাকে এখানে হিসাবের মধ্যে ধরা হচ্ছে না)।

যখন অনেকগুলি বস্তু-দেহ নিয়ে গঠিত কাঠামোকে ত্বরণবেগের দ্বারা চালিত করা হয় তখন বস্তু-দেহগুলি তাদের জাড্যজনিত ভরের অনুপাতে সেই ত্বরণবেগকে বাধা দেয়। এই বাধা বা প্রতিরোধ ত্বরণবেগ যে-দিকে ধাবিত হচ্ছে তার উলটো দিকে চাপের সৃষ্টি করে। এই চাপ অথবা গতির উলটো দিকের ত্বরণবেগকে একটা ট্রেনের যাত্রীরা তখনই অনুভব করতে পারে, যখন ট্রেনটির দ্রুতি বাড়তে থাকে। একে বলা হয় জাড্যজনিত বল, যেটা একটা বস্তু-দেহের জাড্যজনিত ভরের অনুপাতে হয়ে থাকে। যে পর্যন্ত এই দুই ভর পরস্পরের আনুপাতিক থাকে, সেই পর্যন্ত আমাদের কাঠামোতে ঐ সব বস্তু-দেহের ত্বরণবেগ যে কী করে সঞ্চারিত হল তা আমরা নির্ধারণ করতে পারি না : আমরা ধরতে পারি না এটা কিভাবে ঘটছে—কাঠামোটার ত্বরণবেগ বাড়বার জন্যে, না মহাকর্ষের ক্ষেত্রজনিত কারণে ?

আইনস্টাইন এই দুই বলের সমতা বোঝাবার জন্যে একটা চিত্র (বা উপমা)

ব্যবহার করেছেন, যাতে ত্বরণবেগের দ্বারা চালিত একটা লিফটে চড়েছে যে মানুষ, যেখানে মহাকর্ষের ক্ষেত্র অনুপস্থিত এবং অন্য একজন মানুষ যে ঐ মহাকর্ষের ক্ষেত্রে নিজে স্থির হয়ে রয়েছে। এখানে লিফটটি হল নিউটনের বালতির পালটা উপমা, যাতে ত্বরণবেগের অনপেক্ষ গতিকে বোঝানো হয়েছিল।

মনে করা যাক, আইনস্টাইন বলছেন, কোনো মহাকর্ষের ক্ষেত্রে, একটা লিফট নিশ্চল হয়ে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর মহাকর্ষের আওতায় (বা ক্ষেত্রে) গতিহীন হয়ে রয়েছে। সেই লিফটের ভেতরে যে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তার পায়ের তলার জমি তার পা দুখানিকে উপর দিকে যেন ঠেলা মারছে। এখন ধরা যাক, মহাকর্ষের ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে গেল এবং লিফটটিকে যে-দিকে টানা হচ্ছিল তার উলটো দিকে ত্বরণবেগ নিয়ে সেটা চালিত হতে লাগল। কী ঘটবে তাহলে ? কেন, ঐ লিফটের মধ্যে যে মানুষ রয়েছে তার অবস্থার কিছুই হেরফের হবে না। ত্বরণবেগের জাড্যজনিত বল তার পা দুখানিকে লিফটের মেঝের 'পরে ঠিক আগেরই মতো জোরে চেপে ধরে থাকবে, একটা ওজনকে ধরে রাখতে যেমন একটা দড়িকে টান-টান করে রাখতে হয়, সেই রকম আর কি। ঐ মানুষটির পক্ষে কোনো উপায়েই এটা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় যে, এই ব্যাপারগুলি ত্বরণবেগের জন্যে, না মহাকর্ষের জন্যে ঘটছে। এটাই হল **আইনস্টাইনের ত্বরণবেগ এবং মহাকর্ষের সমতার সূত্র**। এ থেকে তাহলে দাঁড়াল এই যে, যেহেতু ত্বরণবেগ এবং মহাকর্ষকে কোনো উপায়েই তফাৎ করে দেখা সম্ভব নয়, অতএব ত্বরণবেগ-সঞ্জাত গতির লক্ষণ কী হবে তা বোঝাবার কোনো চূড়ান্ত মাপকাঠি নেই।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদকে ত্বরণবেগজনিত গতির 'পরে প্রয়োগ করার জন্যে এটা দেখানো প্রয়োজন ছিল যে, কেবলমাত্র গতির গতিশীল প্রভাবকেই নয় পরন্তু দৃশ্যগত ঘটনাবলীকেও মহাকর্ষের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে হবে। মনে করা যাক, আমাদের লিফটের দেওয়ালে একটা ছেঁদা রয়েছে। যদি লিফটটা ত্বরণবেগ নিয়ে চলে, তাহলে দেওয়ালের ছেঁদার মধ্যে দিয়ে একটা আলোর রশ্মি উলটো দিকের দেওয়ালের মেঝে থেকে ঠিক একই উচ্চতাতে যে আঘাত করা উচিত ছিল সেখানে আঘাত করবে না এবং মনে হবে যেন আলোর রশ্মিটি মেঝের দিকে বেঁকে যাচ্ছে (কারণ যে সময়ের মধ্যে সে অন্য দিকের দেওয়ালে পৌঁছবে ততক্ষণে লিফটটা আরও উপরে উঠে যাবে)।

যদি কেবিনটা একটা মহাকর্ষের ক্ষেত্রে স্থির হয়ে থাকে তাহলে আলোর রশ্মির 'পরে নিশ্চয়ই কোনো প্রভাব পড়ে না, আলোর রশ্মি নিশ্চয়ই এক দেওয়ালের ছেঁদার ঠিক উলটো দিকেই পড়বে এবং তার দ্বারা ত্বরণবেগ ও মহাকর্ষের পদার্থগত প্রভাবের প্রভেদটা পরিষ্কার চোখে পড়বে; আর তাহলে ত্বরণবেগের অনপেক্ষ চরিত্রও বোঝা যাবে।

অবশ্যই এটাই হবে যদি আলোর কোনো ওজন না থাকে। কিন্তু আলো যেহেতু গতিশীল, কাজেই তার গতির ভর আছে, যেটা মহাকর্ষের ক্ষেত্রের দ্বারা আকর্ষিত হয়। তাহলে বোঝা গেল যে, মহাকর্ষের বলের প্রভাবে আলোতে একটা ত্বরণবেগ সঞ্চারিত হয়। এটা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মৌলিক অনুমানের একটা বিপরীত ধারণা। আইনস্টাইন এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং তিনি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদকে (এবং আলোর গতিবেগ যে সব সময়ে সমান থাকবে, সেই সূত্রকে) এমন বিষয়ে সীমাবদ্ধ করেছিলেন, যাতে মহাকর্ষের বলকে হিসাবের মধ্যে গণ্য না করলেও চলে। আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে এখন তাহলে সকল রকমের গতিশীল কাঠামোতে প্রয়োগ করা যায়। আলোর 'ওজন' আছে (অর্থাৎ গতিশীলতাতে ভর) এবং তার ফলে মহাকর্ষের ক্ষেত্রে আলোর রশ্মিগুলি বেঁকে যাবে—এই সিদ্ধান্তকে তাহলে এখন প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করে নেওয়া সম্ভব এবং আমরা দেখব সেটাই করা হল।

ঠিক এই সময়েই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের 'বাইরের থেকে সঠিক বলে প্রতিপন্ন' হওয়াটা এবং 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার' মধ্যে একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। জাড্যজনিত ও অভিকর্ষের ভর-এর আনুপাতিক দিক থেকে যে উপপাদ্য ধরা হয়েছিল—এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্যগুলি তা থেকে পাওয়া গেল। ধ্রুপদী বলবিদ্যাতে এই অনুপাত মহাকর্ষের ক্ষেত্রের কাছে এমন একটা ব্যাপার হয়ে গেল যাকে বোঝানো গেল না। একে অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে) দেখা যায় না। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এই অনুপাতকে একটা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নিয়মের কাঠামোর মধ্যে, মহাবিশ্বের ঐক্যবদ্ধ কার্যকারণ সম্পর্কের ছকের মধ্যে নিয়ে এল। কাজেই জগৎপ্রপঞ্চের চেহারাটা 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার' কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এর 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'র ক্ষেত্রে আরও একটি অবদান হল যে জাড্যের কাঠামোর উপর থেকে

আপেক্ষিকতার বাধা অপসারণ, যেটা 'ধ্রুপদী আদর্শের' দিক থেকে পূর্ব থেকে ধরে নেওয়া সিদ্ধান্ত স্বরূপ বলে মনে হয়েছিল।

'বাইরের থেকে সঠিক বলে প্রতিপন্ন' করাটা প্রথম তত্ত্বের দিক থেকে দেখা গেল এবং পরে আলোর গতিপথ বেঁকে যাওয়ার নতুন তথ্য থেকে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হল। কাজেই আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রকে ত্বরণবেগের কাঠামোর মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল। অন্যভাবে বলতে হলে, এই সাধারণীকরণ ধ্রুপদী আপেক্ষিকতার সূত্রকে যে প্রভাবান্বিত করল তা নয়, পরন্তু প্রভাবিত করল আইনস্টাইনের ১৯০৫-এর তত্ত্বকে এবং আপাতবিরোধী দেশ-কাল সম্পর্ককে সকল ধরনের গতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হল।

বৃহৎ দেশগত পরিধিতে ত্বরণবেগের আপেক্ষিকতা সমতার সূত্র থেকে সরাসরি চলে আসে না। আমাদের দুটো লিফটের উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক, প্রথম কেবিনের ছাদ থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দুটো ভারী জিনিস ঝোলানো আছে। অভিকর্ষের বল পৃথিবী-কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে রেখেছে এবং সেখানেই তারা পরস্পরকে ছেদ করেছে। কাজেই ঠিক করে বলতে হলে দড়ি দুটোকে সমান্তরাল বলা চলে না।(১) কিন্তু ত্বরণবেগের দ্বারা চালিত লিফটে আমরা দেখব যে জাড্যজনিত বল দুটি দড়িকে একেবারে ঠিক-ঠিক সমান্তরাল করে রেখেছে। ছোট কেবিনে এই তফাতটা চোখে পড়ার নয়, তবুও এটা বৃহৎ দেশগত পরিধিতে অভিকর্ষ ও ত্বরণবেগের সমতাকে চ্যালেঞ্জ করার পক্ষে যথেষ্ট।

আইনস্টাইন অভিকর্ষকে দেশ-কাল-এর বক্রতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এই মুস্কিলের আসান করলেন। মনে করা যাক, একটা স্থানাঙ্ক-কাঠামোতে (কো-অর্ডিনেট সিস্টেম) কোনো বস্তু-দেহ যে পথ ধরে চলে সেটা একটা অক্ষাংশের সঙ্গে মিলে যায় এবং অন্য অক্ষাংশের সঙ্গে সময় (বা কাল) কী হারে প্রবহমান, সেটাকে ধরা যায়। যদি বস্তু-দেহটি কোনো বলের প্রভাবে গতিশীল না হয়ে থাকে তাহলে ঐ ধরনের দেশ-কাল-এর রেখাচিত্রটি(২) একটা সরলরেখা দিয়ে চিনে নেওয়া সম্ভব হবে; যদি সেটা

১ গণিতে বলা হয়, সমান্তরাল দুটি সরলরেখার মিলন বা ছেদ হয় না, তাদের অসীম অবধি বিস্তৃত করতে হবে।—অনুবাদক।

২ বা ছককে, যেটা প্রায় এঁকে দেখানো যেতে পারে।—অনুবাদক।

ত্বরণবেগ নিয়ে চালিত হয় তাহলে রেখাচিত্রটি বক্র লাইনের হবে। যদি সকল বস্তুর বিশ্ব-লাইন, যার মধ্যে আলোর কণাগুলিকেও ধরতে হবে, অভিকর্ষের ক্ষেত্রে বাঁকা হয়ে থাকে, যদি সকল বিশ্ব-লাইনই(১) বক্রতাসম্পন্ন হয়, তাহলে আমরা দেশ-কালের সবটাকে বক্র বলতে পারি।

এর অর্থটা পরিষ্কার হবে যদি আমরা দ্বিমাত্রিক দেশ এর বক্রতাকে আলোচনার জন্যে ধরি, একটা সমতলকে আমরা এখানে দ্বিমাত্রিক দেশ বলে ধরছি। ধরা যাক, একটা সমতলে আমরা কয়েকটা ত্রিভুজ আঁকছি এবং তাদের কোণগুলির যোগফলকে মাপছি। আমরা দেখলাম যে, একটা অঞ্চলে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল ১৮০° ডিগ্রি হল না; তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, সেখানে দেশটি ইউক্লিডীয়(১) না হয়ে অন্য চরিত্রের হয়েছে। সমতলের গাত্রটা বেঁকেচুরে গেছে এইভাবে ভেবে নিলে এটাকে মানসচক্ষে বুঝে নেওয়া যায়। নিজের কাছে ত্রিমাত্রিক দেশ-এর বক্রতা অথবা চতুর্মাত্রিক দেশ-কালের ছবিকে বুঝে নেওয়া অত সোজা নয়। সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় যদি সকল বিশ্ব-লাইনকে দেশ-কালের বক্রতা রূপে বাঁকিয়ে নেওয়া যায়। যেহেতু মহাকর্ষ সকল চতুর্মাত্রিক বিশ্ব-লাইনকে কোনো রকম বাদ না দিয়ে বাঁকিয়ে দেয়, তাই আমরা মহাকর্ষকে দেশ-কাল-এর বক্রতা রূপে ধরে নিতে পারি। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ঠিক এটাই করে থাকে এবং কোনো ভর-এর একক ইউনিটের 'পরে দেশ-এর একটা বিশেষ বিন্দুতে এবং একটা বিশেষ মুহূর্তে (অর্থাৎ কাল-এর একটা নির্দিষ্ট মাত্রাতে—অনুবাদক) মহাকর্ষের কী প্রভাব পড়ছে, সেটাকে নির্ধারণ করার অর্থ হল সেই বিশেষ বিন্দুতে (দেশ-এর মাত্রা), সেই বিশেষ মুহূর্তে (কাল-এর মাত্রা) দেশ-কাল-এর বক্রতা কী দাঁড়াচ্ছে তা স্থির করা। যদি দেশ-কাল একটা বিশেষ অঞ্চলে বক্র না হয় (মহাকর্ষ যেখানে অনন্ত অবধি

১ ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সবকিছুই একটা সমতলের উপরে এঁকে করা হয়েছে; যেমন একটা ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল হল ১৮০° ডিগ্রি। কিন্তু এই ত্রিভুজকে যদি একটা মণ্ডলের (sphere) বাইরের বাঁকা গাত্রে আঁকা যায়, তাহলে সেই ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল ১৮০° ডিগ্রির বেশি দাঁড়াবে আর ভেতরের দিকে আঁকা ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল ১৮০° ডিগ্রির চেয়ে কম হবে। মণ্ডলের দেশ-কে তাহলে আমরা অ-ইউক্লিডীয় বলব।—অনুবাদক।

বিস্তৃত) তাহলে সেখানে একটা কণার বিশ্ব-লাইন সরলরেখাতে পড়ে এবং সেটা সমভাবে গতিতে রূপান্তরিত হবে। যদি মহাকর্ষের ক্ষেত্র কাজ করে যায় (দেশ-কাল যেখানে বক্র), তাহলে কণার বিশ্ব-লাইনও বাঁকা হবে।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ মহাবিশ্বের নতুন ধারণার সৃষ্টি করেছে, একটা নতুন মহাজাগতিক জ্ঞান আমাদের সামনে এনেছে। বিভিন্ন বস্তু-দেহের মহাকর্ষের ক্ষেত্রকে আইনস্টাইন সেই সকল বস্তু-দেহের চারধারের অঞ্চলে দেশ-কাল-এর বক্রতা বলে মনে করতেন। পৃথিবীতে যে-সকল বস্তু রয়েছে তাদের বক্রতার বিশেষ কোনো চেহারা আমাদের নজরে পড়ে না। দেশ-কালকে বক্র করে পৃথিবী চাঁদকে ত্বরণবেগ নিয়ে চলতে বাধ্য করে। সূর্যের দ্বারা দেশ-কাল বেঁকেচুরে যায় বলে গ্রহদের বিশ্ব-লাইনগুলি বেঁকে যায়। এই অবস্থায় তাহলে আমরা ধরে নিই না কেন যে, দেশ-ই বক্র?

দেশ-এর সাধারণ বক্রতাকে একটা বক্র দ্বিমাত্রিক দেশ-এর সঙ্গে, যেমন পৃথিবী পৃষ্ঠের সঙ্গে, তুলনা করে বোঝা যায়। আমরা আমাদের চারপাশের পাহাড়, পর্বত ও উপত্যকার বক্রতাগুলিকে ভালো করেই জানি। আমরা সারা পৃথিবীর বক্রতাকেও জানি, আমরা জানি যে, এই দ্বিমাত্রিক দেশ আসলে একটা মণ্ডলাকৃতি তল। আচ্ছা, এবারে চতুর্মাত্রিক দেশ-কাল, অর্থাৎ সকল বস্তুর বিশ্ব-লাইনগুলির সমগ্রতা নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমরা জানি, মহাকর্ষের কেন্দ্রস্থলের কাছে বিশ্ব-লাইনগুলি বেঁকে যায়। তাহলে আমরা যদি মহাবিশ্বের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করতে শুরু করি তাহলে গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতির মহাকর্ষের ক্ষেত্রে আমাদের পথরেখা বেঁকে যাবে। একটা গ্রহ ছোট একটা বাঁকের সৃষ্টি করে, যেখানে একটা নক্ষত্র অনেক বড় বক্রতার সৃষ্টি করবে। আন্তঃনক্ষত্র জগতের (intergalactic)* অঞ্চলে মহাকর্ষের বল অতি সামান্য এবং বিশ্ব-লাইন সরলরেখা হয়ে যাবে।

আমাদের সৌরমণ্ডলের সূর্য সহ নয়টি গ্রহ নিয়ে যে সৌরজগৎ, তেমনি আমাদের সূর্যের মতো বহু কোটি নক্ষত্র (বা সূর্য) নিয়ে বিরাট চাকার মতো গোলাকার রয়েছে একটি গ্যালাকসি বা নক্ষত্র-জগৎ। আবার এই রকমের বহু গ্যালাকসি বা নক্ষত্র-জগৎ নিয়ে গঠিত হয়েছে মহাবিশ্ব (universe)। সূর্য থেকে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী আমাদের প্রতিবেশী নক্ষত্রের দূরত্ব চার আলোকবর্ষ। আলো যেখানে প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বা ১,৮৬,০০০ মাইল দৌড়য়, সেখানে আলো এক বছরে যতদূর যাবে তাঁকে আমরা এক আলোকবর্ষ বলছি।

এই সূত্রে একটা চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন আমাদের সামনে হাজির হয়। দেশ-কাল যদি বক্রই হবে তাহলে নীতিগতভাবে এটা কি বলা যেতে পারে যে, চতুর্মাত্রিক দেশকালগত মহাবিশ্বের এক স্থান থেকে যাত্রা করে আমরা আবার সেইখানে প্রত্যাবর্তন করতে পারি, যেমন পৃথিবীতে সম্ভব ? আইনস্টাইন বলছেন, না। কারণ, যদি একই বিশ্ব-পয়েন্টে ফিরতে পারার অর্থ দাঁড়ায়, যেন আমরা নববর্ষের প্রথম মুহূর্তে যাত্রা শুরু করলাম, যেটি বিংশ শতাব্দীর কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরের একেবারে প্রথম মুহূর্ত, তারপর আমরা মহাবিশ্ব পরিক্রমা করলাম এবং বেশ কয়েক কোটি বছর পরে ঠিক আগের সেই ভৌগোলিক পয়েন্টটিতে এবং বিংশ শতাব্দীর নববর্ষের ঠিক সেই প্রথম মুহূর্তটিতে প্রত্যাবর্তন করলাম। এটা অসম্ভব এবং এমন একটা দেশ-কালগত বক্রতা যেটা একটা বিশ্ব-লাইনকে যেন নিজেকেই নিজে গুটিয়ে নিতে পারবে বিশ্বপয়েন্টের ঠিক সেই একই বিন্দুতে, এরকম হতে পারে না।

আইনস্টাইন সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে মহাকাশ (বা দেশ) বক্র, কাল (বা সময়) নয়। অতএব ভৌগোলিক একটা স্থান থেকে সর্বাপেক্ষা হ্রস্বপথ ধরে মহাবিশ্ব পরিক্রমা করে এলে যে কেউ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশগত চক্রবৎ পথ ঘুরে বহু বছর পরে, হয়তো-বা ১,০০,০০,০০,০০০ অথবা তার চেয়েও বেশি বছর পরে সে একই স্থানে ফিরে আসবে। কাজেই বিশ্ব-দেশ সসীম (যে অর্থে একটা দ্বিমাত্রিক পৃথিবীর গাত্র সসীম) কিন্তু কাল অনন্ত। একটা দ্বিমাত্রিক দেশের উপমা হল একটা বক্রতল বা পৃষ্ঠদেশ এবং একই দিকে সসীম এবং অন্যদিকে ঋজু ও অসীম, একটা সিলিণ্ডার-এর মতো।

আমরা যদি একটা সিলিণ্ডারের **চারধারে** হ্রস্বতম সরলরেখা টানি, তাহলে সেটা হবে সরল বা সোজা এবং অনন্ত। এই উপমা ধরে এগিয়ে গেলে

এই রকমের কয়েক আলোকবর্ষ অন্তর-অন্তর মোটামুটি ১৫০০ কোটি নক্ষত্র (বা সূর্য) নিয়ে আমাদের গ্যালাকসি বা নক্ষত্রজগৎ। তেমনি কিন্তু এক গ্যালাকসি বা নক্ষত্রজগৎ থেকে প্রতিবেশী অন্য নক্ষত্র-জগতের দূরত্ব প্রায় ১০ লক্ষ আলোকবর্ষ। কাজেই আন্তঃনক্ষত্রজগতের প্রদেশে, যার মধ্যবর্তী দূরত্ব ন্যূনপক্ষে ১০ লক্ষ আলোকবর্ষ, সেখানে মহাকর্ষের টান অতি সামান্য অনুভূত হবে, কাজেই বিশ্ব-লাইন সরলরেখার পর্যায়ে দাঁড়াচ্ছে।

—অনুবাদক।

আইনস্টাইনের প্রতিপাদ্য দাঁড়ায় দেশ বক্র এবং কাল বক্র নয় (ঋজু)—একে বলা যেতে পারে সিলিণ্ডারধর্মী বিশ্ব-প্রকল্প।

১৯২২ সালে এ. এ ফ্রিডমান বললেন যে, বিশ্ব-দেশ-এর বক্রতা কাল-এর সঙ্গে বদলে যায়। মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে বলে যে প্রকল্পটি ছিল সেটা যেন জ্যোতির্বিদ্যাগত পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পর্যায়ে এসে পৌঁছল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আপেক্ষিকতাবাদের সত্যাসত্য নির্ধারণ

পদার্থগুলি কি বহুদূরের আলোর 'পরে কাজ করে না এবং তাদের ক্রিয়ার দ্বারা তার রশ্মিগুলি কি বেঁকে যায় না?

নিউটন

আলোর যে মহাকর্ষজনিত ভর আছে এবং তাহলে একটা ভারী বস্তুদেহের পাশ দিয়ে গেলে তার মহাকর্ষের ক্ষেত্রে যে আলোর রশ্মি বেঁকে যাবে—এ প্রশ্নটা নিউটন তাঁর 'অপটিকস্' বইয়েতে যেভাবে উপস্থিত করেছেন এবং শেষ কথা হিসাবে যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন, এ দুইয়ের মধ্যে মিল আছে। তবে উপমাটা নেহাতই ভাসা-ভাসা। নিউটন ভেবেছিলেন যে, আলোর বিচ্ছুরণকে আলো যেভাবে বস্তুদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে থাকে তার দ্বারা বোঝানো যাবে, এই বিকর্ষণের মাত্রাটা তার ভরের 'পরে নির্ভর করে না। আলোর কণীয় চরিত্র সম্পর্কে নিউটনের তত্ত্ব—যেটা একাদশ পরিচ্ছেদে শিরোনাম হিসাবে লেখা হয়েছে, সেটা আইনস্টাইনের ধারণার কাছাকাছি আসে: ফোটন তত্ত্ব(১) নিউটনের এক ধরনের মতামতকে পুনরুজ্জীবিত করার মতো বিষয় বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু একটা বক্র দেশ-এর মধ্যে দিয়ে রশ্মিগুলি বেঁকে যাওয়ার কোনো নজির এর পূর্বে আর নেই, প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতেও তার কোনো সূত্র মেলে না। সেদিক থেকে ল্য ভেরিয়েরের নেপচুন গ্রহকে খুঁজে বার করার এবং মেনডেলিয়েভের মৌল পদার্থদের পর্যাবৃত্ত সারণীতে যে অনাবিষ্কৃত

১ ফোটন বা আলোকণার তত্ত্ব।—অনুবাদক।

মৌল পদার্থের হদিশ ছিল, তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই দুটি ক্ষেত্রেই পরীক্ষাভিত্তিক প্রমাণ পাওয়ার আগেই তত্ত্বগত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।(১) আইনস্টাইনের কাছে ঠিক এই ধরনের আবিষ্কারগুলি থেকে অবিসংবাদীভাবে সমকালীন প্রত্যক্ষবাদ সমেত সর্বপ্রকার মন্ময়গত ভাববাদিতার (solipsism) বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া হল(২)। তাতে একটা মহাকর্ষের ক্ষেত্রে আলোর রশ্মি বেঁকে যাওয়ার ধারণাটা থেকে আইনস্টাইনের 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার' এবং 'বাইরের থেকে প্রমাণ' পাবার চমৎকার দৃষ্টান্তটি আমরা দেখি। এই ধারণাটা মোটামুটি এইভাবে গড়ে উঠেছে।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ পরম নির্দেশক কাঠামো হিসাবে ইথারকে এবং কালের নির্দেশক কাঠামো থেকে স্বাধীন পরম কালের অস্তিত্বকে বরবাদ করে দিয়েছিল। দূরের কোনো কিছুর 'পরে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার নিউটনীয় ধারণাকে বরবাদ করাতে অনপেক্ষভাবে একই সঙ্গে কয়েকটি ঘটনা ঘটলে স্থিতিশীল ইথারের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ব্যবস্থার গতিবেগ আপেক্ষিকভাবে হিসাবের মধ্যে নিতে হবে,—এই

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুজন জ্যোতির্বিদ, ফ্রান্সের লেভেরিয়েরে এবং ইংলণ্ডের জন এডামস্ ইউরেনাস গ্রহের কক্ষপথের বিচ্যুতির গরমিল হিসাব করে বলে দিয়েছিলেন যে, ইউরেনাসের পরে, অর্থাৎ সূর্য থেকে আরও দূরত্বে আরও একটি গ্রহ রয়েছে, যে মহাকর্ষে ইউরেনাসের কক্ষপথের বিচ্যুতি ঘটাচ্ছে।

ইংলণ্ডের জন এডামস্ তখন কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র; তাঁর হিসাব অনুসারে ব্যাপারটা ভালো করে অনুসন্ধান করার পূর্বেই লেভেরিয়েরে-এর হিসাব মতো ইউরেনাস থেকে আরও দূরে ঐ গ্রহের অনুসন্ধান করাতে তার সন্ধান পাওয়া গেল এবং তার নামকরণও হল নেপচুন। কিন্তু এডামসের ভাগ্যে এই সম্মান ঠিক জোটে নি।

রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক মেনডেলিয়েভ বিভিন্ন মৌল পদার্থের (সর্বসাকুল্যে ৯২টি) পারমাণবিক ভর অনুসারে তাদের একটা পর্যাবৃত্ত সারণীতে (periodic table) সাজিয়ে ফেলেন; এই সারণীতে কয়েকটি স্থান ফাঁক থাকে, অর্থাৎ সেখানে যে মৌল পদার্থ থাকার কথা, সেটা তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু একমাত্র তত্ত্বগত বিচারের সাহায্যে মেনডেলিয়েভ বলে দিয়েছিলেন যে, ঐ ফাঁকগুলিতে এই ধরনের মৌল পদার্থ থাকতেই হবে এবং পরে সেটা ঠিক-ঠিক মিলেও গেছে।—অনুবাদক।

'Reply to Criticisms' in Philosopher-Scientist, pp. 665-82.

সব ধারণার ভিত্তি ধ্বসে গেল। তবে একটা অনন্তব্যাপী স্থিতিশীল ইথারের ধারণাকে হটিয়ে দেওয়ার ফলে অসীম শূন্য দেশ এসে গেল, যেটা প্রত্যক্ষ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে নিতে হবে—শূন্য দেশ-এ ত্বরণবেগ চালিত গতি জাড্যজনিত গতিশীল বলের ধারণাকে নিয়ে আসে। এতে বিভিন্ন বস্তু-দেহের বিভিন্ন গতিবেগ ও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার 'পরে ভিত্তি করে যে চিত্রটি পাওয়া যায়, সেটা জগৎপ্রপঞ্চের 'ধ্রুপদী আদর্শের' পরিপন্থী। পদার্থগত বাস্তবতার কার্যকারণ সম্পর্কীয় সুষমাকে লঙ্ঘন করে যে-অনপেক্ষ গতি, আইনস্টাইন তাকে নানাভাবে ও উপায়ে বাতিল করে দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখলেন এর একটা উপায় হল বস্তু-দেহগুলির মহাকর্ষজনিত ও জাড্যজনিত ভরের মধ্যে যে মিল রয়েছে, তাকে যদি দূর করা যায়; এই মিলের কোনো কার্যকারণ সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা দেওয়া যেত না। কিন্তু এই পথ ধরে গেলে আলোর মহাকর্ষজনিত ভরের কথা স্বীকার করতে হয়। এই ধরনের ভর আছে—এই অনুমান করার ক্ষেত্রে আইনস্টাইন কোনো পরীক্ষাগত প্রমাণের দ্বারা চালিত হন নি। সমগ্র অভিজ্ঞতাকে ধরে নেওয়ার সাধারণ ধারণা থেকে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে আলাদা; শেষোক্তটিকে যদিও সাধারণ প্রতিপাদ্য থেকে টানা হয়েছে, কিন্তু মাইকেলসন্-এর পরীক্ষার দ্বারাই তাকে গড়ে তোলা হয়েছে।

দুটি তত্ত্বের দু'রকমের প্রভাব এ থেকে বোঝা যায়। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ জানা তথ্যগুলির ব্যাখ্যা করেছে এবং আগেকার ধারণাগুলির তুলনায় তার সাফল্য নির্ভর করেছে তার প্রতিপাদ্যগুলি কতটা 'সাধারণীকৃত' এবং 'প্রকৃতিগত' হয়েছে তার উপর। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের 'বাইরের থেকে সমর্থনের' ভিত্তি এসেছে একটা জানা তথ্য থেকে যাকে কিছুতেই হটানো যায় না। এর বিপরীতে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ শুরু করেছে মহান এবং অলঙ্ঘনীয় 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা' থেকে এবং এখানে আশ্চর্যভাবে পর্যবেক্ষণের 'বাইরে থেকে' সমর্থন মিলেছে। এই পর্যবেক্ষণের ফলে, অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মধ্যে জগৎপ্রপঞ্চের যে সুষমা আছে এবং সেটা যে জ্ঞেয়—এই যুক্তিসম্মত ভাবনা থেকে বাস্তবতার ধারণাকে একটা বিশ্বাসযোগ্য পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে প্রখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিদ

স্যার আর্থার এডিংটন আলোর মহাকর্ষজনিত ভর আছে কি, না, সেটা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করার একটা উপায় বার করলেন। আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এর গুরুত্ব যে কত বেশি তা বলে শেষ করা যায় না। আইনস্টাইনের ধারণাগুলিকে বিকশিত ও জনপ্রিয় করার অন্যতম সক্রিয় সমর্থক ছিলেন এডিংটন। এই সূত্রে একটা বেশ মজার কাহিনী বলা হয়ে থাকে। একবার এডিংটনের এক সহকর্মী মন্তব্য করেছিলেন, মাত্র তিনজন লোক আপেক্ষিকতা বোঝে, তার মধ্যে এডিংটন একজন। এডিংটনের মুখে একটু বেদনার ছাপ দেখতে পেয়ে সহকর্মী-পদার্থবিদ বললেন: "প্রফেসার এডিংটন, আপনার কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই, আপনি অতি-মাত্রায় বিনয়ী।" এডিংটন জবাব দিলেন, "না, আমি কুণ্ঠিত নই, কেবল একটু অবাক হচ্ছি ভেবে যে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে।"

এডিংটনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেউ কেউ বলেন, অতি বেশিমাত্রায় বৈজ্ঞানিক কল্পনা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা ছিল। সময়কালে এই গুণগুলি জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লাগল—যা নাকি আপেক্ষিকতার ভাগ্য নির্ধারণে গভীর প্রভাব ফেলে।

আলোর যদি মহাকর্ষজনিত ভর থাকে, অর্থাৎ ওজন থাকে, তাহলে একটা ভারী বস্তুদেহের পাশ দিয়ে আলোর রশ্মি যাবার সময় নিশ্চয়ই সেই বস্তু-দেহের দিকে বেঁকে যাবে; ঠিক যেমন একটা কামানের গোলা পৃথিবীর জমির দিকে বেঁকে গিয়ে (পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে নিশ্চয়ই—অনুবাদক) শেষ অবধি পৃথিবীর মাটিতে পড়ে। একটা আলোর রশ্মি অবশ্য পৃথিবীতে পড়ে যাবে না, কারণ আইনস্টাইনের মহাকর্ষের তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবীর দিকে পথরেখাটা বেঁকে যাওয়া ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, প্রতি সেকেণ্ডে ১০ মিটারের বেশি নয় (অর্থাৎ, ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে)*। একটা ভারী বস্তুদেহের পাশ দিয়ে যাবার সময় এই বেঁকে যাওয়াটা অনেক বেশি; যেমন, সূর্যের পাশ দিয়ে গেলে পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাবার তুলনায় ২৭ গুণ বেশি হবে। কাজেই যদি কোনো বেশি দূরের নক্ষত্র থেকে আলোর রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছবার পূর্বে সূর্যের পাশ দিয়ে যায় তাহলে সেটা বেঁকে যাবে;

---

* আলো প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার দৌড়য়। তাহলে ৩ লক্ষ কিলোমিটারে মাত্র ১০ মিটার, অর্থাৎ, ৩ কোটির এক ভাগ মাত্র।
—অনুবাদক।

এবং একটা ফটোগ্রাফের প্লেটে ঐ নক্ষত্রের ছবিটা—যখন সূর্যের পাশ দিয়ে আলো যাচ্ছে না, তার থেকে যখন আলো যাচ্ছে,—এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ হবে। কিন্তু সূর্য যখন আকাশে থাকে (অর্থাৎ, যখন দিনের বেলা, সন্ধ্যাবেলা বা রাত্রিকালে, যখন অন্য নক্ষত্র দেখা যায় তখন নয়—অনুবাদক) তখন অতি অল্প নক্ষত্রকেই দেখা সম্ভব, বিশেষ করে সেই নক্ষত্রগুলি যদি সূর্যের আলোকোজ্জ্বল পরিধির কাছে থাকে। কিন্তু সেই ধরনের নক্ষত্রগুলি, যাদের রশ্মি সূর্যের একেবারে খুব নিকট দিয়ে চলে যাচ্ছে, সূর্যগ্রহণের সময় নিশ্চয়ই তাদের ছবি তোলা যাবে। (এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে গ্রহণের সময় সূর্যকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে থাকতে হবে)। ২৯শে মে, ১৯১৯ সালে এই ধরনের সূর্যগ্রহণ (১) হওয়ার সময় এডিংটন ঠিক করলেন, পৃথিবীর সেই সকল অঞ্চলে অভিযান পাঠাতে হবে যেখান থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক হল দুটি অভিযান পাঠানো হবে, একটি গিনি উপসাগরের প্রিন্‌সিপি বলে একটি দ্বীপে, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের নিকটেই, অন্যটি ব্রাজিলের সোব্রাল গ্রামে।

ব্রিটিশ অভিযানটি যখন ব্রাজিলে পৌঁছায় তখন ব্রাজিলের একটি পত্রিকাতে টিপ্পনি কাটা হল, যেটা যুদ্ধোত্তর অবস্থার মনোভাবের বেশ ভালো পরিচায়ক বলা যেতে পারে: "একটা জার্মান তত্ত্ব প্রমাণ করার চেষ্ট না করে অভিযানের সভ্যরা, যাঁরা ঊর্ধ্বলোকের ব্যাপারটা ভালো করেই জানেন, বরঞ্চ খরাক্লিষ্ট দেশে বৃষ্টি কি করে নামানো যায়, সেটা নিয়ে চেষ্টা করলে পারতেন।"(২)

প্রিন্‌সিপি দ্বীপে বৃষ্টি নামল, এডিংটন নিজে এতে যোগ দিয়েছিলেন। গ্রহণের দিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন এবং মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের করোনা বা কিরীট (৩) প্রায় দেখাই যায় না। কোনো নক্ষত্রও দেখা যাচ্ছিল না।

১ অর্থাৎ পূর্ণগ্রাস হবে এবং সূর্যের কাছে অর্থাৎ চোখের দৃষ্টির লাইনে কোনো নক্ষত্র থাকবে।—অনুবাদক।

২ Ph. Frank, op. cit., p. 170.

৩ সূর্যকে সাধারণভাবে বৃহৎ এক জ্বলন্ত ভাণ্ডের মতো দেখতে হলেও সূর্যদেহের অনেক স্তরভাগ আছে। কেন্দ্রে তাপমাত্রা ২ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কিন্তু কিরীট বা ছটামণ্ডলে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত অনেক কম, ১০,০০০ থেকে ৬,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

পূর্ণগ্রাস গ্রহণ শেষ হবার সামান্য কিছু আগে কিন্তু মেঘ সরে গেল এবং সূর্য-কিরীটির কাছে নক্ষত্রদের ছবি তোলা সম্ভব হল।

এর সঙ্গে ছয় মাস পরে তোলা ছবির প্লেটগুলির তুলনা করা হল, অর্থাৎ, ছয় মাস পরে সূর্য যখন দূরে সরে গেছে ; (১) এবং তখন আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে নক্ষত্রের ছবিগুলি যেমন সরে যাবে বলেছিলেন, সেই রকমই দেখা গেল।(২)

ব্রাজিলের সোব্রালের উপরের আকাশে কোনো মেঘ ছিল না এবং অনেক ছবি তোলা হয়েছিল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণমূলক (বা প্রধান) ছবিগুলির সঙ্গে যখন প্লেটগুলিকে মিলিয়ে দেখা হল তখন জ্যোতির্বিদরা হতাশ হলেন : আগে থেকে যা হবে বলা হয়েছিল তার সঙ্গে এর মিল নেই এবং আফ্রিকার অভিযানের সঙ্গেও নয়। কারণ হচ্ছে, সূর্যের উত্তাপে যন্ত্রগুলি গরম হয়ে গিয়েছিল যাতে ছবিগুলির বিকৃতি ঘটেছে। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই আইনস্টাইনকে এডিংটনের পরীক্ষার ফলাফল জানানো হল। লোরেনজ তাঁকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে আপেক্ষিকতাবাদ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মাকে একটা পোস্টকার্ড লিখলেন আইনস্টাইন : "ভালো খবর পেয়েছি আজ ! এইচ-এ লোরেনজ টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে যে, ইংরাজদের একটা অভিযান সূর্যের পাশ দিয়ে আলোর রশ্মি বেঁকে যাওয়া" প্রমাণ করেছে। কিন্তু মনে হয়, আইনস্টাইন যেন নিজের চেয়ে মায়ের সন্তোষ-বিধানের জন্যে বেশি ব্যগ্র ছিলেন। তিনি নিজে এডিংটনের অভিযানের সিদ্ধান্ত কী হবে তার জন্যে মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না।

লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি এবং রয়েল অ্যাসট্রনমিক্যাল সোসাইটির যুক্ত

এত উত্তাপে সূর্যদেহে কঠিন, জলীয় বা বায়বীয় কিছুই নেই, সেটা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা—প্লাজমা রূপে গঠিত।—অনুবাদক।

১ আসলে নিশ্চয়ই সূর্য নয়, ছয় মাস পরে পৃথিবীই সূর্য-প্রদক্ষিণের উলটো দিকে সরে যাচ্ছে, তবে পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে মনে হবে যেন সূর্যই সরে যাচ্ছে।—অনুবাদক।

২ এখানেও আসলে নক্ষত্রটা নিশ্চয়ই সরে যাচ্ছে না। নক্ষত্র থেকে যে আলো পৃথিবীতে পৌঁছচ্ছে, সেটা সূর্যের প্রচণ্ড মহাকর্ষের ক্ষেত্র পার হতে গিয়ে বেঁকে যাচ্ছে।—অনুবাদক।

অধিবেশনে এডিংটন তাঁর অভিযানের ফলাফলের রিপোর্ট দিলেন। রয়্যাল সোস্যাইটির প্রেসিডেন্ট জে. জে. টমসন অধিবেশনের উদ্বোধন করে বললেন : "এটাতে শুধু দূরের একটা দ্বীপের আবিষ্কার হল না, নতুন বৈজ্ঞানিক ধারণার একটা মহাদেশ খুলে গেল। নিউটন তাঁর সূত্রগুলি রূপায়িত করার পরে এটাই মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে মহত্তম আবিষ্কার।"(১)

এডিংটনের রিপোর্ট ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মন্তব্য সারা দুনিয়ার বহু পত্রিকার শিরোনাম হয়ে প্রকাশিত হল। লোকেরা বুঝল, বিজ্ঞানে একটা বিরাট কিছু ঘটে গেছে। 'মহাকাশের বক্রতা' 'মহাকাশ সসীম', 'আলোর রশ্মি বেঁকে যায়'—এই ধরনের কথাবার্তা লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল, যদিও অতি অল্প লোকেই তার যথার্থ অর্থ কী তা বুঝতে সক্ষম হল।(২) জে. জে. টমসন নিজেই বললেন : "আমাকে এটা মেনে নিতেই হবে যে, এ পর্যন্ত কেউই পরিষ্কার ভাষায় আইনস্টাইনের তত্ত্ব আসলে যে কী তা বুঝিয়ে বলতে পারে নি।"(৩) তিনি জোর দিয়েই বলে গেলেন যে, অনেক বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্বের আসল অর্থকে সরলভাবে বুঝিয়ে বলতে যে অপারগ সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। চালু ধারণা এবং প্রায়শ যেটা ধরে নেওয়া হয়, তার বিরুদ্ধে এটা যাচ্ছে বলে একে না বুঝতে পারাটা এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটা যুক্তি হিসাবে খাড়া করা হয়। মহাবিশ্ব যে সসীম এই ধারণার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে নানা আপত্তি উঠল।

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, মহাকাশ শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং গতিশীল বস্তু ও আলোক রশ্মির বেঁধে দেওয়া পথরেখার ব্যাসার্ধ একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার —এই ধারণাগুলির মধ্যে প্রভেদটা পরিষ্কার বোঝা গেল না। একটি আমেরিকান পত্রিকা, ঠিক তার যথার্থ বৈশিষ্ট্য নিয়েই দাবি করল যে, ন্যায়শাস্ত্র ও সত্তাতত্ত্বের (ontology অর্থাৎ বাস্তব জগৎপ্রপঞ্চের মৌলিক ধারণাগুলির) নীতিগুলিকে পদার্থগত ধারণাগুলির বদলের 'পরে নির্ভর করলে

১ Ph. Frank, op. cit., p. 173.

২ প্রসঙ্গত, ঐ সময়কার কলকাতার স্টেটসম্যান কাগজ খুললে দেখা যাবে যে, স্টেটসম্যান তখনকার দুই তরুণ অধ্যাপক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল।
—অনুবাদক।

৩ Philip Frank, op. cit.. p. 174.

চলবে না। সেই পত্রিকাতে লেখা হল ; "এ থেকে বোঝা যাচ্ছে না, কেন আমাদের জ্যোতির্বিদরা এই রকম চিন্তা করেন বলে মনে হয় যে, ন্যায়শাস্ত্র ও সত্তাতত্ত্ব জ্যোতির্বিদদের পরিবর্তনশীল মতের 'পরে নির্ভর করবে। জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের বহু পূর্বেই অনুমানমূলক চিন্তার যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল। গণিত-বিদ ও পদার্থবিদদের কাছে মানানসই যেটা (sense of proportion), সেটা অনেক বেশি কার্যকর কিন্তু ভয় হচ্ছে যে, ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদরা তাঁদের নিজেদের কাজের ক্ষেত্রের যতটা গুরুত্ব আছে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।"(১)

'তাঁদের ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্ব আছে তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ' বলে বিজ্ঞানী দের যে ধারণা সেটা নতুন কিছু নয়। গোঁড়া ব্যক্তিরা সবসময়েই চাইবে যে, মহাবিশ্ব সম্পর্কে তাদের **মৌলিক** ধারণাগুলি (তাদের তথাকথিত সত্তাতত্ত্ব) জ্ঞানের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটার ফলে যেন বদল না হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে কোপারনিকাস-এর বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ওসিঅ্যানডার এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালির ইনকুইজিশন-এর(২) প্রধান বেলারমিন গ্যালিলিওর কাছে লেখা এক চিঠিতে জ্যোতির্বিদদের সাবধান করে দিয়ে-ছিলেন, যাতে তারা জ্যোতির্বিদ্যার নতুন ধারণাগুলির প্রায়োগিক ব্যবহারের দিকটার দিকেই মাত্র নজর রাখে এবং সেই সকল আবিষ্কারের কোনো গুরুত্ব অস্তিত্ববাদিতার দিক থেকে না দিয়ে যেন জগৎপ্রপঞ্চের চেহারাকে খাটো করে না দেখে, অথবা এরকম যেন মনে না-করে যে, তাদের আবিষ্কারই একমাত্র সত্য। বিংশ শতাব্দীর গোঁড়া মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা 'সাধারণ বুদ্ধিতে কী বলে', 'স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য' ইত্যাদির দোহাই পাড়লেন জনগণের মতামতের কাছে। কিন্তু জনগণের মতামত মোটেই ঐক্যবদ্ধ ছিল না। সাধারণ মানুষ মহাকাশের বক্রতা বুঝতে পারত না কিন্তু তার জন্যে আইনস্টাইনকে দোষারোপ না করে নিজেকেই দোষ দিত। কিন্তু অন্যদিকে ম্যাস মিডিয়া বা গণ-প্রচার মাধ্যমগুলি প্রায়শই এই রায় দিত যে, আইনস্টাইনের মহাকর্ষে'র ও বিমূর্ত জ্যামিতির তত্ত্বের আলোড়নকারী সিদ্ধান্তগুলি সম্যক বুঝতে পদার্থবিজ্ঞান ও

১ Ibid., p. 142.

২ ক্যাথলিক চার্চের অন্তর্ভুক্ত এক ধরনের সেনসর করার মতো সংগঠন, যারা ঠিক করে দিত কোন্ বই বা কোন্ মতবাদ চার্চের তথা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে গ্রহণীয় আর কোন্টা নয়।—অনুবাদক।

গণিতের যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাঁর নতুন তত্ত্বগুলির জনপ্রিয় ব্যাখ্যা যে তখনও করা হয় নি এবং নতুন তত্ত্বকে বুঝতে যে সাহস এবং বিজ্ঞানের চিন্তাতে কতদূর যেতে হয়, তার জন্যে আইনস্টাইনই দায়ী। 'স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত' হওয়ার পক্ষভুক্তরা বিশেষভাবেই নতুন ধারণাগুলির ব্যাপক স্বীকৃতিতে বিশেষভাবে হতাশ হয়েছিল। সাধারণ মানুষ আপেক্ষিকতাবাদ বোঝার দাবি নিশ্চয়ই করতে পারে না কিন্তু তার প্রসার কত বেশি এবং এই তত্ত্ব কতটা সাহসী সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। আপাতদৃষ্টিতে স্বয়ংপ্রতিভাত সিদ্ধান্তগুলি যে আলোচিত হচ্ছে(১) তার একটা তাৎপর্য তাঁর কাছে ছিল। পেছনের দিকে তাকিয়ে কী হয়েছিল তার যদি মূল্যায়ন করা যায়, তাহলে আপেক্ষিকতাবাদ ও তার সৃষ্টিকর্তা যে ব্যাপক ও তীব্র ঔৎসুক্য জাগরিত করেছিল, তাতে আমাদের শতাব্দীর যে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন আমরা দেখেছি, তার লক্ষণ এতে পাওয়া যায়। অতএব ১৯২০-এর দশকের বৈশিষ্ট্য কী, সে সম্পর্কে আরও বিশদভাবে বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে।

১ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বলে বিনা প্রমাণে কেউ মেনে নিচ্ছে না। —অনুবাদক।

বিংশতি পরিচ্ছেদ

খ্যাতি

কয়েকজন শারীরবৃত্তবিদ মনে করেন, যখন একজন মানুষের মস্তিষ্ক প্রসারিত হয় তখন তার হৃৎপিণ্ডের নিশ্চয়ই সঙ্কোচন ঘটে। কি ভুল ধারণা! বরঞ্চ মানুষের আপাতদৃষ্টিতে আত্মম্ভরিতা যাতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে যেন পুষে রাখা হয়, তাদের হৃদয়ে জনগণের ভাগ্য এবং নিয়মগুলি, মানবিক অনুভূতি-গুলির সর্বাপেক্ষা মহত্তম দিকগুলিতে সকল মানুষের প্রতি একটা মাতৃসুলভ মনোভাব কি থাকে না?

বালজাক

খ্যাতির জন্যে ত্যাগস্বীকারের দরকার হয়-এবং কেউ যদি খ্যাতির পেছনে দৌড়চ্ছে বলে, তাহলে আইন-স্টাইনের ভূমিকা সেখানে শিকারীর নয়, তিনি নিজেই শিকার হয়েছেন (১)

মসৎসৃকভস্কি

১৯২০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে আইনস্টাইনের খ্যাতি যে-কোনো জীবিত বৈজ্ঞানিকের চেয়ে বেশি ছিল। লিওপোল্ড এনফেল্ড তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক নভেল "কোয়েস্ট"-এ (অনুসন্ধান) ১৯১৯ সালের অভিযানে

১ অর্থাৎ খ্যাতির জন্যে আইনস্টাইন কখনও লালায়িত হন নি, উলটে খ্যাতিই তাঁকে তাড়া করে চলেছে।—অনুবাদক।

Postkarte

Frau

Pauline Einstein

Sanatorium Rosenau

Luzern (Schweiz)

Abs. A. Einstein
Haberlandstr. 5
Berlin

Ich wünsche Dir von Herzen gute Tage. Sei innig gegrüsst von Deinem Albert

Grüsse an die Schwester, Frau Dann mit ihrem Sohne, Maja, Pauli und Frl. Doktor. Nächstes Mal ausführlicher!

Liebe Mutter!

Heute eine freudige Nachricht. H. A. Lorentz hat mir telegraphiert, dass die englischen Expeditionen die Lichtablenkung an der Sonne wirklich bewiesen haben. Maja schreibt mir leider, dass Du nicht nur viel Schmerzen hast, sondern dass Du Dir auch noch trübe Gedanken machst. Wie gern würde ich Dir wieder Gesellschaft leisten, dass Du nicht dem hässlichen Grübeln überlassen wärest! Aber eine Weile werde ich doch hier bleiben müssen und arbeiten. Auch nach Holland werde ich für einige Tage fahren, um mich Ehrenfest dankbar zu erweisen, obwohl der Zeitverlust recht schmerzlich ist.

মায়ের কাছে চিঠি ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সমর্থিত হবার পরে আইনস্টাইনের খ্যাতি এত বেড়ে গেল কী করে তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন :

"যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। জনগণ হিংসা, হানাহানি ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে ক্লান্ত। যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চ, বোমা এবং হত্যা লোকের মনকে একেবারে বিষিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ সম্পর্কে বই তখন একেবারেই বিক্রি হয় না। সবাই শান্তির নতুন দিগন্তের জন্যে ব্যগ্র এবং যুদ্ধকে ভুলে যেতে চায়। সেই সময়ে এমন একটা কিছু ঘটল যা তাদের মনে সাড়া জাগিয়ে তুলল : কবর আর রক্ত-মাখা পৃথিবী থেকে মানুষের দৃষ্টি পড়ল উপরের নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে। বিমূর্ত চিন্তা মানুষের মনকে দুঃখে-ভরা হতাশার বাস্তবতা থেকে নিয়ে গেল বহু দূরে। সূর্যগ্রহণের রহস্য আর তাকে ভেদকারী মানুষের মন কী ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারে অজানার জন্যে আকুতিতে ভরা রোমান্টিক দৃশ্যপট, সূর্যগ্রহণের অবাক-করা ইশারা, বাঁকা আলোর রশ্মির কাল্পনিক ছবি—এ সবই গুরুভার বাস্তব জীবন থেকে অনেক দূরে।"(১)

এই ধরনের উপলব্ধি একটা সচেতন অথবা অনেক সময়ে আইনস্টাইনের তত্ত্বের এবং সমগ্রভাবে নতুন পদার্থবিদ্যার একটা প্রায় অনুভূতিপ্রবণ মনোভাব জাগিয়ে তুলত। তারায় ভরা আকাশ শুধু মানুষের মনকে হতাশাব্যঞ্জক বাস্তবতা থেকে আরও খানিকটা দূরে নিয়ে যেত। তাদের মনের অভিযান পৃথিবীতে জয়ের স্বাক্ষর এনে দিল, যে-জয় থেকে শুধুমাত্র মহাবিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধিই হবে না, আরও কিছু বেশি অর্জিত হবে। এটা জনগণের নতুন জীবনযাত্রার তাৎপর্যব্যঞ্জক হতে পারে। বিজ্ঞান 'স্বতঃ-প্রতিভাত সত্য' থেকে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে এবং নিশ্চয়ই সে নতুন দেশে গিয়ে হাজির হবে। সেখানে কী সম্পদ লুকোনো আছে তা এখনও অনাবিষ্কৃত কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, নতুন ধারণাগুলি নতুন প্রকৌশলের জন্ম দেবে। মানুষের উৎপাদিকা শক্তি অনেক বেশি পরিমাণে বাড়বে, এই ধরনের একটা অস্পষ্ট আশা থাকা ছাড়াও আরও বেশি সুস্পষ্ট মত ছিল যে, বিজ্ঞানকে শান্তির জন্যে ব্যবহার করতে হবে। বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ না-করে তাকে শান্তির ও কল্যাণকর্মের জন্যে ব্যবহার করতে হবে—এই ধরনের একটা সংগ্রাম মানুষ আশা করছিল, এ এমন একটা সংগ্রাম যেটা চল্লিশ বছর পরে চূড়ান্ত

১ L. Infeld, op. cit., p. 289.

পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তারা আশা করছিল যে, বিজ্ঞান জাতিদম্ভ এবং প্রতিক্রিয়ার হামবড়াই ভাবকে দূর করে দেবে, যেটা এতাবৎ যুদ্ধের ঘনঘটা তৈরি করতেই কাজে লেগেছে। যে প্রজন্ম আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে এত উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেছিল এবং সেটা সত্য বলে প্রমাণিত হবার পরে চরম জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় যারা লক্ষ্য করেছে, যেমন ড্রেফুস-এর ব্যাপার ইত্যাদি—তারা জানত এ থেকে কতদূর অবধি যাওয়া যায়। জনগণ জানত যে, বিজ্ঞান মূলত আন্তর্জাতিক চরিত্রের এবং একেবারে গোড়া থেকেই জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধের বিরোধী। এন্‌ফেল্‌ড যেমন লিখেছেন, "আরও একটা কারণ ছিল, বোধ হয় তার গুরুত্ব আরও বেশি: একটা নতুন ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন এবং ইংরাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাকে পরীক্ষা করে সমর্থন করেছেন। বিবদমান দুই দেশের বৈজ্ঞানিকরা পুনরায় একজোটে কাজ করতে এগিয়ে এলেন। একটা নতুন যুগের প্রারম্ভ বলে যেন মনে হল। জনগণের শান্তির জন্যে আকাঙ্ক্ষাই আমার মনে হয়, আইনস্টাইনের ক্রমবর্ধমান খ্যাতির আসল কারণ।"(১)

নিশ্চয়ই অনেকে বলবেন যে, জাতিদম্ভী চক্রীরা আইনস্টাইনকে নানাভাবে উত্যক্ত করছিল, সেটা অনেকেই জানত। এটার জন্যেও আপেক্ষিকতার তত্ত্বের এবং তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি লোকের আগ্রহ জেগেছিল।

ইতিমধ্যেই সেই সময়কার বছরগুলিতে আর একটা দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র ছিল, যদিও সেটা আপাতদৃষ্টিতে এত স্পষ্ট না হলেও তার গুরুত্ব কিছু কম ছিল না। এর দার্শনিক মনোবৃত্তি ছিল বৌদ্ধিকতার বিরোধী যা অতীন্দ্রিয় রহস্যোদ্ঘাটনের তুলনায় মানুষের বুদ্ধি যে খাটো ও দুর্বল, সেটাই বলত। এই দর্শন তখনও অবশ্য নুরেমবার্গের প্যারেড গ্রাউণ্ডে(২) দেখা দেয় নি, তখনও প্রায় এক দশক দেরি আছে, অল্প লোকই এই বৌদ্ধিকতা-বিরোধী মনোভাব যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তা বুঝতে পেরেছিল।

যুক্তিবাদী মনোভাবের বাতাবরণে যুদ্ধের আগুন স্তিমিত হচ্ছিল কিন্তু

---

১ L. Enfeld, op. cit., p. 289.

২ ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিটলার ও ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় আসার পরে জার্মানির নুরেমবার্গ শহরে প্রায়ই প্রচণ্ড জাঁকজমকের সঙ্গে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করে বুদ্ধিবিরোধী ফ্যাসিস্ত দর্শন প্রচার করা হতো।—অনুবাদক।

রহস্যবাদিতা তাতে আরও ইন্ধন যোগাচ্ছিল। আপেক্ষিকতা না বুঝেও লোকে অনুভব করতে পারছিল যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে এই তত্ত্বে। এই তত্ত্বকে এতটা উৎসাহজনক সমর্থন দেবার একটা প্রধান কারণ ছিল বৈপ্লবিক সামাজিক ধারণাগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক, নিশ্চয়ই সামাজিক আন্দোলনের 'পরে তার নির্ভরতার জন্যে নয়। প্রকৃতির বস্তুবাদী নিয়মগুলির প্রতিফলন হচ্ছে আপেক্ষিকতা এবং এই অর্থে এটা সমাজ-বিকাশের থেকে স্বতন্ত্র (অর্থাৎ, সমাজের বিকাশের 'পরে নির্ভরশীল নয়)। কিন্তু প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতোই এটা প্রকৃতির নিয়মগুলির কাছাকাছি মাত্র। কতটা কাছাকাছি, কী চেহারা নিয়ে এই তত্ত্বকে রূপায়িত করা হবে, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব কী—এ সবই বিজ্ঞানকে একটা ইতিহাসের প্রক্রিয়ারূপে চিত্রিত করে থাকে এবং যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঐ তত্ত্বের সম্পর্ক যতই দূরের হোক না কেন, তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই তার ব্যাখ্যা করতে হবে।

এঙ্গেলস যখন নিউটনের বলবিদ্যা থেকে ফরাসি বিপ্লব অবধি ইতিহাসের কারণগুলির এবং তার ফলাফলগুলির ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখন তিনি লুক্কায়িত ও পরোক্ষ হলেও অবিসংবাদী ঐতিহাসিক যে যোগসূত্রগুলি আছে তাদের আলোচনা করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিকরা যখন 'বিপ্লবের বীজগণিত' খুঁজে বার করেন প্রুশিয়ান রাজতন্ত্রের পক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষিত দার্শনিকের(১) মধ্যে, তখন যোগসূত্রটা অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে সেটা অনস্বীকার্য।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞান ও বিপ্লবের মধ্যে সম্পর্ক আগের মতো পরোক্ষ এবং দূরাগত হওয়ার পরিবর্তে ইতিহাসের গতি দ্রুত হয়ে গেল। বিপ্লব অব্যাহতভাবে চলতে লাগল এবং বিপ্লবী ধারণার 'পরে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির প্রভাব একেবারে সরাসরি এসে ধাক্কা দিল। একমাত্র অত্যন্ত বিশেষ ধরনের ক্ষেত্রে পণ্ডিতরা না বুঝেই বিপ্লবী সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, অথবা এ সম্বন্ধে সংগ্রামী সামাজিক শক্তিগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকলেন। ব্যাপক যুগান্তকারী সাধারণীকরণের মতাদর্শগত অর্থ বা ব্যাখ্যা না থেকে পারে না, যদিও সেটা

১ অর্থাৎ, হেগেলের ডায়ালেকটিকসের মধ্যে।—অনুবাদক

আপাতদৃষ্টিতে সহজে চোখে না পড়লেও শেষ অবধি বিজ্ঞানীরা এবং জনসাধারণ সেটা অনুভব করেছিলেন। বিপ্লবের শত্রুরাও সেটা অনুভব করেছিল। এডিংটনের অভিযানের পরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক লিখলেন :

"গত কয়েক বছর ধরে সারা দুনিয়া জুড়ে একটা অশান্তি চলছে, সেটা মানসিক ও পদার্থগত ক্ষেত্রেও বটে। মনে হয় খুব সম্ভব যুদ্ধ, বলশেভিকদের অভ্যুত্থান, এইগুলিই গভীর মানসিক অশান্তির কারণ। এই অশান্তির প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি আমরা শাসন করার বহু পরীক্ষিত পদ্ধতিগুলিকে কোনো মৌলিক সংস্কার ও অপরীক্ষিত একস্পেরিমেন্টের দ্বারা বরবাদ করে দেওয়ার প্রচেষ্টাতে; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঠিক একই অশান্তির মনোভাব অনুপ্রবেশ করেছে। অনেক মানুষ আছে যারা, পদ্ধতিগত অনুমান এবং মহাবিশ্বের উদ্ভট স্বপ্নের জন্যে সুপরীক্ষিত তত্ত্বের উপরে গড়ে ওঠা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক অগ্রগতির পুরো কাঠামোটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে রাজি আছে।"(১)

শীঘ্রই আপেক্ষিকতাবাদের উপরে সরাসরি আক্রমণ শুরু হয়ে গেল : প্রধানত জার্মানি থেকেই এটা শুরু হল। প্রথমে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা এই নতুন তত্ত্বকে 'যথার্থ জার্মান' বৌদ্ধিক পরাকাষ্ঠার নিদর্শন বলে সাধুবাদ করেছিল। একই সময়ে গ্রেট বৃটেনে বহু লোক এই তত্ত্বের সঙ্গে জার্মানির যে কোনো সম্পর্ক আছে সেটাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যাগত পর্যবেক্ষণের ফলাফল যদি অন্য রকমের হতো তাহলে, আইনস্টাইন যেমন একবার মন্তব্য করেছিলেন, জনগণের মনোভাব অন্য রকমের হতো। ২৮শে নভেম্বর, ১৯১৯-এ লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকাতে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

"পাঠকদের অবগতির জন্যে আপেক্ষিকতার সূত্রের এই আর একটি প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে : আজ জার্মানিতে আমাকে একজন 'জার্মান পণ্ডিত' এবং ইংলণ্ডে একজন 'সুইস ইহুদী' বলা হচ্ছে। যদি আমাকে কালো দাগে দেগে দিতেই হয় তাহলে জার্মানদের কাছে আমি হবো 'সুইস ইহুদী' এবং ইংলণ্ডের কাছে হবো 'জার্মান পণ্ডিত'। (২)

---

১ Ph. Frank, op, cit., p. 176.

২ Ideas and Opinions, p. 232.

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও আইনস্টাইন শীঘ্রই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়ে কালো দাগে চিহ্নিত হতে লাগলেন এবং সেইমতো জার্মানরা তাঁকে 'সুইস ইহুদী' বলে দেখতে লাগল এবং এই তত্ত্বটা তাদের জাতীয় গর্বকে চরিতার্থ করতে পারল না। জার্মানিতে শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা তখন দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা দেশে নানা রকমের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ে উঠছে। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'ডের টারমার' একটা প্রবন্ধ লিখল, যার শিরোনাম হচ্ছে: 'বলশেভিকবাদী পদার্থবিদ্যা', যাতে অংশত বলা হল: "—প্রফেসার আইনস্টাইন, যাঁকে নতুন কোপারনিকাস বলে জাহির করা হচ্ছে, তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রয়েছেন। তবুও বেশি বাক্য ব্যয় না করে সোজাসুজি বলে দেওয়াই ভালো যে, আমরা এতে একটা কুখ্যাত বৈজ্ঞানিক নোংরামির আশ্রয় নিচ্ছি, যেটা সকল রাজনৈতিক কালপর্বের সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্ত ছবির সঙ্গে বেশ ভালো করেই খাপ খায়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা যদি মার্কসের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাদের দোষারোপ করা যায় না, যেখানে কিনা জার্মান প্রফেসাররা আইনস্টাইনের দ্বারা বিপথে চালিত হচ্ছেন।"(১)

জনৈক পল ভেইল্যাণ্ড আইনস্টাইন ও তাঁর তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে একটা বিশেষ সংগঠন গড়ে তুললেন। ভেইল্যাণ্ড মিটিং ডেকে প্রথমে সেখানে আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ চালাতেন, তারপর সেই একই মঞ্চে নতুন তত্ত্বকে খণ্ডন করার জন্যে পদার্থবিদ ও দার্শনিকদের কাজে লাগাতেন। প্রায় একই সময়ে একজন প্রখ্যাত পরীক্ষাকারী(২), ফিলিপ লেনার্ডও আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে আমক্রণে যোগ দিলেন। আপেক্ষিকতাবাদের তীব্র বিরোধী তিনি এবং একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী (তিনি এমনকি এমপিয়ার-কে* জার্মান পদার্থবিদের নামে বদলে দিয়েছিলেন)। লেনার্ডের উক্তিতে একদিকে যেমন মাইকেলসনের

১ Ideas and Opinions, p. 196.

২ অর্থাৎ, তাত্ত্বিক নন কিন্তু কোনো তত্ত্ব প্রমাণ করতে গবেষণাগারে খুব ভালো পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন।—অনুবাদক।

* ফরাসি পদার্থবিদ, এমপিয়ার বিদ্যুৎ-তরঙ্গের এক ধরনের মাপ আবিষ্কার করেন বলে এমপিয়ারের নামে এটা প্রচলিত আছে।—অনুবাদক।

পরীক্ষাগুলির ফলাফলকে ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছিল, তেমনি তিনি আইনস্টাইনকে শারীরিকভাবে মোকাবেলা করার (অর্থাৎ, ঘুরিয়ে বলা যে তাকে প্রহার করা হোক—অনুবাদক) কথাও বলতেন। পরে তিনি গতিশীল বস্তুগুলির ভর যে বদলাতে পারে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটা 'খাঁটি জার্মান' ধারণা বার করার জন্যেও চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ অবধি এই আবিষ্কারের জন্যে মেধাবী তাত্ত্বিক এফ হ্যাসেন্‌হোরল-কে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, যিনি যুদ্ধে মারা যান।

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব রাজনৈতিক সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল বলে তার খ্যাতি আরও বেড়ে গেল। তা হলেও আপেক্ষিকতা নিয়ে এত ব্যাপক ঔৎসুক্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার মর্মবস্তু এবং তার উদ্দেশ্যকে অবহেলা করা যায় না। এই তত্ত্বের একেবারে গোড়াতে রয়েছে 'ধ্রুপদী আদর্শের' সঙ্গে সংযোগ। জগৎটা যে বস্তুদেহগুলির সমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠেছে তিন শতাব্দীর মধ্যে সেই ধারণাটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেল। এখন দূরের বস্তুর উপরে প্রতিক্রিয়া, পরম দেশ এবং ইথার এমন একটা ব্যাপার, যার পটভূমিতে সব কিছু হিসাব করতে হবে, যেটা নাকি জগতের চিত্র আসল যা হওয়া উচিত তারই পরিপন্থী ছিল—এই ধরনের দ্বৈত ধারণা থেকে যে ছবি গড়ে ওঠে, তাকে বরবাদ করা হল। তবে সেটা করতে গিয়ে যে মূল্য দিতে হল সেটা হচ্ছে, গতিবেগকে যোগ করার যে ধ্রুপদী নিয়ম থাকে তাকে বাতিল করতে গিয়ে যে সংকটের উৎপত্তি হয়, সেটা। কাজেই আপেক্ষিকতা মানুষের মনে পদার্থগত বাস্তবতার যে সংকটময় ধারণা জোর করে এনে দিল—সেটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য, অলঙ্ঘনীয় এবং পরীক্ষাগতভাবে প্রমাণিত। এ থেকে একটা 'সংকটময় যুক্তিবাদ' দেখা দিল। এটা মহাবিশ্বের সুষমার একটা ধারণা যা নাকি প্রচলিত 'স্বতঃপ্রতিভাত' সত্যকে খণ্ডন করে সহজ সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ধারণাগুলির এই জটিলতা (যা আপেক্ষিকতাবাদের মর্মবস্তু হয়ে দেখা দেয়, তথা সেটা আইনস্টাইনের বিশ্ববীক্ষাও বটে) ক্রমশ আপেক্ষিকতার সঙ্গে পরিচিত সংকীর্ণ একটা মহল ছাড়িয়ে আরও ব্যাপকতর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল. এই তত্ত্ব থেকে সাধারণ যে ধারণা হল তা হচ্ছে বুদ্ধির জয় এবং জগতের সুষমা ও প্রকৃতির বিষয়মুখী চরিত্র ; এই ধারণাগুলি সেই লোকদের কাছে সমাদর পেল যারা এমন একটা যুগে বাস করছিল—যখন বুদ্ধি ও সুষমা ইতিহাসের এক চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে

রহস্যবাদ ও বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটা শীঘ্রই একটা ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল ; তত্ত্ব সম্পর্কে ঔৎসুক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল সামাজিক মূল্য (অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে এর প্রবক্তাদের বাধ্য করল জনসমক্ষে বিবৃতি দিতে) এবং সেটা আবার তার জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে তুলল। জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণ থেকে তত্ত্বের সত্যাসত্য প্রমাণিত হওয়া ছাড়াও এ সম্পর্কে লোকের যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদিত হল (যদিও তত্ত্বটি আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী বলে মনে হয়) তার কারণ আইনস্টাইনের নিজস্ব মনোভাব, তাঁর এই সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, পর্যবেক্ষণ করে তাঁর তত্ত্ব সত্য বলে প্রমাণিত না-হয়ে পারে না। একজন বিজ্ঞানীর জ্ঞান-তত্ত্বের দিক থেকে যে ধারণাই থাক না কেন, তিনি অজ্ঞেয়বাদিতা (সেটা ঘটনাসংক্রান্ত মামুলি ধরনের অথবা পূর্ব থেকে অনুমানগত সিদ্ধান্ত) থেকে সরে আসতে বাধ্য, যখন তিনি কোনো পরীক্ষার দ্বারা তাঁর তত্ত্ব যাচাই হবে কি, না, তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর ধারণাগুলির সত্যাসত্য সম্পর্কে তিনি নিজে কতখানি আস্থাবান তার 'পরে অনেকখানি নির্ভর করে। কোনো স্তরে জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্নিহিত কাঠামোকে যে জানা যায়, সে সম্পর্কে শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত, অবচেতন ধারণা থাকলেই চলবে না। আইনস্টাইনের স্থির বিশ্বাস যে, পর্যবেক্ষণের দ্বারা তাঁর তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যাবে, সেটা কেবলমাত্র তাঁর হিসাবনিকাশ করার গাণিতিক যন্ত্রের নির্ভুলতা থেকেই আসে নি। পরন্তু একটা সচেতন, নিশ্চিত স্থির বিশ্বাস থেকে এসেছে যে, জগৎপ্রপঞ্চকে জানা যায়। সূর্যগ্রহণ থেকে তোলা ছবিগুলি যখন আইনস্টাইনকে দেখানো হল তখন তিনি বললেন, ছবি হিসাবে সেগুলি চমৎকার। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব যে তা থেকে সমর্থিত হয়েছে এটা তাঁর কাছে বিশেষ কোনো ব্যাপার ছিল না, কারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব যে সত্য, সে সম্পর্কে তিনি একেবারে নিশ্চিত ছিলেন। কেউ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, যদি ফলাফলটা নেতিবাচক হতো তাহলে কী ঘটত, তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন : "আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত অবাক হয়ে যেতাম।"

এটা জোর করে বলা দরকার, আইনস্টাইন বিজ্ঞানী বলে ভুল করতে পারেন না, এ ধরনের কোনো ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি নিজের মননশক্তির সাফল্য সম্পর্কে তারিফ করার লোক ছিলেন না। আসলে জগৎপ্রপঞ্চকে জানা যায় এবং সেখানে একটা সুষমার অস্তিত্ব রয়েছে,

সেই বিশ্বাসই তাঁর এই মনোভাবের কারণ ছিল। যদি জগৎপ্রপঞ্চের চেহারাটা পরীক্ষাগতভাবে যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে মিলে যায় ('বাইরের থেকে সমর্থন') এবং যতদূর সম্ভব সেটা যদি ইচ্ছামতো অনুমানের 'পরে নির্ভর না করে, ('অন্তর্নিহিত পূর্ণতা') তাহলে সেটা বিষয়গত বাস্তবতার বেশ কাছাকাছি পৌঁছবে। তাঁর ক্ষেত্রে বিশ্ব জ্ঞেয় এবং তাতে সুষমা আছে, এটা একজন প্রতিভাবানের স্বভাবসুলভ অন্বিষ্ট বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এটা আইনস্টাইনের বিজ্ঞান সম্পর্কে মনোভাবকেও, তাঁর নিজের কাজ ও সামাজিক কাজকর্মকেও প্রভাবান্বিত করল।

আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস তাঁর নৈতিক দর্শনের 'পরেও একটা নিশ্চিত প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর চিন্তায় মননশক্তি ও নৈতিক বোধের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। একমাত্র এমন একজন মানুষ যে 'ব্যক্তিক-সীমা বহির্ভূত' ব্যাপারে ডুবে রয়েছে এবং নিজের সম্পর্কে উদাসীন (অতএব অন্যদের সম্পর্কে সজাগ), সেই এই ধরনের বিমূর্ত ধারণাকে এতোটা বিস্ময়কর সহজভাবে চিন্তা করতে পারে, পরীক্ষা বাদ দিয়ে আপনা-আপনি কোনো যুক্তিকে খাড়া করে (বা নির্মাণ করে), অভিজ্ঞতাকে 'খাঁটি বর্ণনার' ঘটনা সংক্রান্ত সীমানার মধ্যে না নিয়ে গিয়ে, তাদের নাড়াচাড়া করতে পারে। আইনস্টাইনের 'পরে হঠাৎ যে অতখানি খ্যাতির বোঝা চাপল, তাতে মানুষের ভাগ্য নিয়ে বিজ্ঞানীর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে একটা ধারণা আমাদের সামনে এল। চূড়ান্ত অর্থে মানুষের ব্যাপারে বিজ্ঞান যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং যেটা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য, তাঁর খ্যাতি ছিল তারই পরিচায়ক।

'সকল মানুষের প্রতি মাতৃসুলভ মনোভাব', যেটা বালজাক্ উদ্‌ধৃত অংশের শিরোনামে বলেছেন, সেটা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটার ফলে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে ঐ মনোভাব মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্যে একটা সচেতন দায়িত্ববোধে রূপান্তরিত হল। যে কেউ আইনস্টাইনকে যুগের প্রতিষ্ঠাতা বলতে পারেন, যদিও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে লোকের সামনে দাঁড়ানোর চেয়ে আইনস্টাইনের কাছে বিজাতীয় আর কিছু হতে পারে না এবং যেভাবেই হোক না কেন, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক প্রগতির প্রকৃতিতে কোনো প্রতিষ্ঠাতার স্থান নেই। তথাপি তিনিই প্রথম আবিষ্কার করলেন যে,

শক্তি হচ্ছে আলোর গতিবেগের বর্গমূলকে ভর দিয়ে গুণ করার সমান(১) এবং তিনি অন্য বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা অনেক আগে বুঝলেন যে, বিজ্ঞানকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে হলে পণ্ডিতদের সামাজিক শক্তিগুলির সংগ্রামে যোগ দিতে হবে, অন্তত যেগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সরাসরি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাজে লাগে, তার স্বার্থে। আইনস্টাইন মতাদর্শের সংগ্রামে যোগ দিলেন, যদিও একেবারে নির্ধারক ক্ষেত্রে নয়, সেটা তাঁর কাছ থেকে দূরেই ছিল। কিন্তু যে আদর্শের জন্যে তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার বিশেষ গুরুত্ব ছিল ; সেটা হল বুদ্ধিজীবীদের আগ্রাসী জাতিদম্ভীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমবেত করা। যদিও অনেক সময় অবস্থার বিশ্লেষণে তাঁর ভুল ছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ লোকদের মধ্যেই স্থান নিয়েছিলেন। যুদ্ধ ও জাতিদম্ভী মনোভাবকে ঠিক কোন্ শক্তিগুলি মোকাবেলা করতে পারবে এ সম্পর্কে তাঁর কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁর শান্তিবাদী মনোভাবের মধ্যে অস্পষ্টতা ছিল। ১৯২০ সালে বার্লিনে একবার তিনি তাঁর সঙ্গে কয়েকজন সাক্ষাৎকারীকে বললেন :

"আমার শান্তিবাদী (প্যাসিফিস্ট) মনোভাব অনুভূতিসঞ্জাত, এ এমন একটা মনোভাব যা মানুষকে হত্যা করাটা ঘৃণাকারজনক বলে মনে করে। আমার মনোভাব কোনো বৌদ্ধিক তত্ত্বের 'পরে প্রতিষ্ঠিত নয়, তার ভিত্তি হচ্ছে যেকোনো ধরনের ক্রূরতার প্রতি ঘৃণা ও অনীহা। এই ধরনের চিন্তাকে আমি যুক্তি দিয়ে খাড়া করতে পারি কিন্তু তাহলে সেটা আগে থেকে সিদ্ধান্ত করে নিয়ে চিন্তা করা হয়ে যাবে।"(২)

লীগ অফ নেশনস বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্যে একটা কমিশন তৈরি করল কিন্তু তারা ঠিক কী কাজ করবে সেটা ধোঁয়াটে রয়ে গেল। ১৯২২ সালে আইনস্টাইনকে যখন সেই কমিশনে কাজ করতে বলা হল, তিনি এই চিঠিটি লিখে জবাব দিলেন :

"যদিও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, এই কমিশন কী কাজ করতে পারে সে সম্পর্কে আমার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই, তবুও এর আদেশ মানাটা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। কারণ আজকের দিনে

১ আইনস্টাইনের ফরমুলা হল $E=mc^2$, যেখানে E হল শক্তি, m হল ভর এবং c হল আলোকের গতিবেগ।—অনুবাদক।

২ Ph. Frank, Op. cit., p. 189.

কারুরই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাজে সাহায্য করতে অস্বীকার করা উচিত নয়।"(১)

কমিশনে আইনস্টাইন এমন ধরনের মনোভাবের সম্মুখীন হতে লাগলেন যাতে তিনি ক্রমশ যেকোনো ধরনের ক্রূরতার প্রতি অনুভূতিসঞ্জাত বিরূপতা থেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা পরিষ্কার ফ্রন্টের মধ্যে অবস্থান নিলেন। এক বছর পরে রুড় (Ruhr) অঞ্চল দখল করার বিরুদ্ধে(২) লীগ অফ্ নেশনস্-এর অবস্থানে হতাশ হয়ে তিনি কমিশন থেকে ইস্তফা দিলেন। তিনি শেষ অবধি আসল অবস্থাটা দেখে বুঝতে পারলেন যে, অনুভূতিপ্রবণ শান্তিকামী মনোভাব নিয়ে যুদ্ধের শক্তিদের রোধ করা যাবে না। ১৯২৩ সালে তিনি লিখলেন: "আমি এখন নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে, লীগ্ অফ নেশন্স্-এর ঃই কাজ করার জন্যে শক্তি বা সদিচ্ছা, কোনোটাই নেই। যে ·কোনো ভাবেই হোক একান্ত শান্তিকামী মনোভাবের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমার লীগ-এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।"

একটি 'শান্তিবাদী' (প্যাসিফিস্ট) পত্রিকাতে তাঁর কী করা উচিত সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ভাষায় তিনি বললেন:

"আমি এটা করলাম কারণ লীগ অফ নেশনস্-এর কাজকর্ম থেকে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, যতই ক্রূর হোক না কেন, আজকের শক্তিগোষ্ঠী যদি কোনো কাজ করতে প্রতিশ্রুত হয়, তাহলে সেটা যে কাজই হোক না কেন, লীগের তার বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নেবার ক্ষমতা নেই। আমি চলে এলাম, কারণ লীগ অফ নেশনস্ আজ যেভাবে কাজ করছে তাতে সে কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠনের আদর্শ তো ধরে নেই-ই, বরঞ্চ সেই ধরনের আদর্শের ক্ষতিসাধন করছে।"(৩)

এ থেকে বোঝা যায়, অনুভূতিসঞ্জাত শান্তিকামী মনোভাব থেকে তিনি

১ Ibid., p. 289.

২ জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে রুড় (Ruhr) অঞ্চল কয়লা ও লোহার খনি দিয়ে ভর্তি। খানিকটা যেমন পশ্চিমবাংলা ও বিহারের সীমান্তে আসানসোল, রানীগঞ্জের মতন। এই রুড় অঞ্চল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ফ্রান্সের কাছে যায় কিন্তু হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতায় আসার পরে জার্মানি আবার জোর করে রুড় অঞ্চলকে জার্মানিতে নিয়ে নেয়।—অনুবাদক।

৩ Ph. Frank, op. cit., 190.

পরিষ্কার ভেঙ্গে বেরিয়ে এলেন। আইনস্টাইন যেভাবে দেখেছিলেন, লীগ অফ নেশনস-এর কেবলমাত্র সদিচ্ছা থাকলেই চলবে না, শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দিলে তার বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা থাকা চাই। দুটোর কোনোটাই তার ছিল না।

অন্যদিকে, সমমতাবলম্বী লোকেরা, বিশেষ করে মারি কুরী-স্কোলোডস্কা তাঁকে প্রভাবান্বিত করতে পারলেন যে, লীগ-এর চৌহদ্দির মধ্যে বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন করা সম্ভব। এই ধরনের সহযোগিতা লোকেদের জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। আইনস্টাইনও ভাবতেন যে, বিজ্ঞান গোঁড়া জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে লোকেদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে, কাজেই এটা তাঁর কাছে যুক্তিসম্মত বলে মনে হতো। তাছাড়া, নিছক নেতিবাচক মনোভাব তাঁর কাছে গ্রহণীয় ছিল না।

তিনি লিখেছেন: "প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতিনিধিরা যে বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তার সর্বজনীন চরিত্র এবং আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ফলে একটা আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে ওঠে, যেটা তাঁদের শান্তিকামী (প্যাসিফিস্ট, কোনোক্রমেই যুদ্ধ করবো না) লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়···সাংস্কৃতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ঐতিহ্য হচ্ছে একটা শক্তি যে মানুষের মনের সামনে অনেক বেশি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি খুলে দেয় এবং সেটা একটা শক্তিশালী প্রভাব হবে, কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গি সারা বিশ্ব ব্যেপে রয়েছে; এই ঐতিহ্য মানুষকে তার অর্থহীন জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে বেশ খানিকটা সরিয়ে আনে।"(১)

১৯২৩ সালের ঘটনাগুলিতে এই ধরনের মনোভাব যে, বিজ্ঞান পৃথিবীতে শান্তির জন্যে নতুন একটা শক্তি হিসাবে অবদান রাখতে পারে—আইনস্টাইনের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সেটা একটা পরিচয়। তিনি বিজ্ঞানের প্রতি পুরোপুরি অনুরক্ত রইলেন কিন্তু গোঁয়ার লোকেদের আক্রমণের থেকে আশ্রয় পাবার স্থল হিসাবে বিজ্ঞানকে আর দেখলেন না, উলটে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটা প্রধান হাতিয়াররূপে বিজ্ঞানকে তিনি দেখতে লাগলেন।

বৌদ্ধিক সহযোগিতার জন্যে কমিশনের পরের কাজগুলি করতে গিয়ে

১ Ibid., p. 191.

আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন যে, বিজ্ঞানীদের সংহতি তখনই একটা শক্তি হয়ে দাঁড়াবে, যদি সেটা সামরিক আগ্রাসন এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে আরও শক্তি সঞ্চয় করে। ১৯২৫ সালে ইতালির ফ্যাসিস্তরা মুসোলিনীর গভর্নমেন্টের বিচারমন্ত্রীকে এই কমিশনে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করল। মারি কুরী ঘোষণা করলেন যে, স্বতন্ত্র মতাবলম্বী বুদ্ধিজীবীদের দলের মধ্যে একজন মন্ত্রীকে গ্রহণ করা যায় না। আইনস্টাইনও একই মতামত দিলেন এবং আরও যোগ করলেন যে, একজন স্বৈরতান্ত্রিক গভর্নমেন্টের মন্ত্রী উপযুক্ত প্রতিনিধি হতে পারেন না।

কমিশনের কয়েকজন সভ্য অবশ্য আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, তাহলে ইতালি হয়ত লীগ অফ নেশনস থেকে পদত্যাগ করবে; এ থেকে আইনস্টাইনের ভালো করেই একটা বাস্তব শিক্ষা লাভ হল যে যুদ্ধকে প্রতিরোধ না করে যদি গা সইয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সেটা যুদ্ধ ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপসপন্থী মনোভাবের শামিল হয়ে দাঁড়াবে।

আনতোনিয়া ভ্যালেন্তাঁ, যিনি আইনস্টাইন ও তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে ১৯২০ এর দশকে প্রায়ই দেখা করতেন, তাঁর 'ল্য দ্রামে দ্য অ্যালবার্ট আইনস্টাইন' বইয়ে জেনিভাতে বৌদ্ধিক সহযোগিতার কমিশনের একটা অধিবেশনের কথা লিখেছেন। তখন বন্ধুবর্গ, বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য ও সঙ্গীত তাঁর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

"এক সন্ধ্যায়, একটা বিশেষ ক্লান্তিকর অধিবেশনের পরে তিনি মাদাম কুরীর সঙ্গে বসে আছেন জেনিভা হ্রদের এক বেঞ্চে—আইনস্টাইন ও মারি কুরী দুজনেই চিন্তাগ্রস্তভাবে চুপচাপ বসে একটা প্রদীপের শিখা জলে কিরকম কাঁপছে সেটা দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁরা আবার কথাবার্তা শুরু করলেন, আগেকার চুপচাপ মেজাজের কোনো চিহ্নই তখন তাঁদের মধ্যে নেই। "আলোতে প্রতিবিম্বটা ঠিক এখানে কেন ভেঙ্গে যাচ্ছে, অন্য জায়গাতে নয়" জিজ্ঞাসা করলেন আইনস্টাইন···মারি কুরীর শুকনো গলার আওয়াজে আইনস্টাইনের চিন্তাশীল মনোভাব প্রতিফলিত হয়ে বেশ মেজাজী শব্দের সাড়া পাওয়া গেল। কথাবার্তাটা তারপর ফরমুলা, সংখ্যা এবং পদার্থবিদ্যার নিয়মের দিকে চলে গেল।"(১)

১ A. Vallentin, Le drame d'Albert Einstein, Paris, 1957. p I04.

আনতোনিয়া ভ্যালেতোঁ লিখছেন যে, বৌদ্ধিক সহযোগিতা-কমিশনের কাজে আইনস্টাইন যখন সবচেয়ে হতাশ হয়ে পড়তেন (অর্থাৎ, কিছু হচ্ছে না বলে একেবারে হতাশ হবার মতো অবস্থা—অনুবাদক) তখন তিনি আশ্রয় খুঁজতেন বেদনাদায়ক বাস্তবতার অনুভূতি থেকে সঙ্গীতের রূপকের জগতে।

একদিন কমিশনের সভ্যরা লেকের তীরে একটা রেস্টুরেন্টে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। তাঁরা নিজেদের মত-পার্থক্যকে এড়িয়ে গিয়েই আলোচনা করছিলেন, কারণ তাঁরা তীব্রভাবে বুঝেছিলেন যে, সেগুলি বৈজ্ঞানিক মত-পার্থক্য নয়।

রেস্টুরেন্টের অর্কেস্ট্রার আওয়াজ এবং পেয়ালা-প্লেটের ঠুনঠুনি তাঁদের কথাবার্তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গীতটা আইনস্টাইনকে তাঁর পারিপার্শ্বিক থেকে এবং সারাদিনে যা ঘটেছে তা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি স্টেজে চলে গেলেন, বেহালা-বাদকের কাছে বেহালাটি চাইলেন এবং বাজাতে শুরু করলেন।

"তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল, ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল, প্রশান্ত মুখশ্রী দেখা গেল এবং মনে হল তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন, পারিপার্শ্বিককে ভুলে গেছেন এবং শ্রোতাদের চোখগুলি যে তাঁর দিকেই ফেরানো রয়েছে, সম্পর্কে কোনো হুঁস নেই। এতাবৎ সহযোগীদের সঙ্গে যে তিক্ততা গড়ে উঠেছিল তা যেন ধুয়ে-মুছে ফেলছিলেন।"

আইনস্টাইনের বন্ধুরা যখন দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁকে ডাকলেন, তখন কুণ্ঠাভরে একটু মৃদু হেসে বেহালাটি ফেরত দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

এই ঘটনা থেকে মনে হতে পারে যে, দৈনন্দিন বাস্তবতা ও সংগ্রাম থেকে তিনি যেন পালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। তা কিন্তু নয়। আইনস্টাইনের কাছে সঙ্গীত হচ্ছে বিশ্ব-সুষমার বাণী-মূর্তি, যেমন বিজ্ঞান তাঁর কাছে পদার্থ-জাগতিক বাস্তবতার নিয়মগুলির অভিব্যক্তি। এ সবই তাহলে সামাজিকভাবে বেসুরো মনোভাবকে দূর করার পরিবর্তে তাঁকে আরও বেশি করে প্রকট করে তোলে এবং কিছু করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। আর আমরা দেখছি যে, বিশের ও তিরিশের দশকে 'যুদ্ধ কোনো রকমেই করবো না'—এই রকমের শান্তিকামী (প্যাসিফিস্ট) মনোভাব থেকে আইনস্টাইন সামরিক বিকারগ্রস্ততা, জাতিদম্ভ এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

১৯২০-এর দশকে আইনস্টাইনের বার্লিনের বাড়িটি বিভিন্ন ধরনের

মানুষদের একটা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল নানারকম পেশা, স্বার্থ ও মতামতসম্পন্ন লোকজন। এরা পদার্থগত, গাণিতিক, দার্শনিক, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে তাঁর কাছে ভীড় করত। এই অবাধ জনস্রোত আরও বেড়ে যেত অজস্র পর্যটকদের দ্বারা, আইনস্টাইন তখন বার্লিনের অন্যতম প্রধান একটা দর্শনীয় বস্তু এবং তাঁর ৫ নম্বর হাবেরলাণ্ডস্ট্রাস্ পর্যটকদের অবশ্য আকর্ষণীয় ক্ষেত্র। এই ধরনের আসা-যাওয়া থেকে কিছু কিছু বন্ধুত্ব গড়ে উঠত। যারা এই সময়ে তাঁকে দেখতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে আইনস্টাইন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছে, যা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে আমরা তাঁর মতামতের ভেতরটা জানতে পারি। আইনস্টাইনের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক দিক বরাবর ছিল এবং অনেক সময় কোনো ছাত্র হয়তো সামান্য কোনো কিছু সুবিধা আদায় করতে এসেছে, অথচ সেই মুহূর্তের ঝোঁকে তিনি তাকে কোনো নতুন এবং এতাবৎ অপ্রকাশিত কোনো ধারণা বলে দিলেন। এই ধরনের বহু ধারণা আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক পেপার ও চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে। যে লোকেরা তাঁকে জানত তাদের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মূল্য পাওয়া যাবে তাঁর জীবনযাত্রা, অভ্যাস ও যেভাবে তিনি কাপড়চোপড় পরে জনসমক্ষে হাজির হতেন তার মধ্যে এবং সেগুলি আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং আগামী বহু বছর ধরে তারা তাই থাকবে। এই ধরনের কিছু স্মৃতিচারণকে এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। এখন যখন আমরা আইনস্টাইনের বিশ্ববীক্ষার, চিন্তার ও অভ্যাসের প্রধান দিকগুলি জানি, তখন এই খুঁটিনাটিগুলি দিয়ে আমাদের একটা সামগ্রিক চিত্র তৈরি করতে হবে। তারা নিশ্চয়ই মানুষটির অন্তরের ছবিকে আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে না, যেভাবে আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে, জগৎপ্রপঞ্চের ছবিটার সকল খুঁটিনাটি বিষয়গুলি আসলে তার মূল সূত্রগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আইনস্টাইন এমন একজন মানুষ যাঁর ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন ব্যাপারগুলি পশ্চাদপটে পড়ে রয়েছে এবং মূল 'ব্যক্তিক-সীমা বহির্ভূত' মর্মবস্তুর প্রতি যারা নির্ভরশীল—সেই দিক থেকে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তিনি ছিলেন প্রবক্তা তার একটা দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি নিজে এবং সেটা তিনি 'আত্মজীবনীমূলক নোটস্'-এ লিখে গেছেন।

এলসা আইনস্টাইন তাঁর স্বামীর অভ্যাস অনুযায়ী যে পারিবারিক

আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন, সে সম্পর্কে যথেষ্ট বাড়িয়ে বলা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর স্ত্রী ও অন্যদের মধ্যে কোনো বাধার প্রাচীর খাড়া করার চেষ্টা করেন নি এবং তিনি মোটেই খুঁতখুঁতে ছিলেন না। তাঁর বুদ্ধি, সামাজিকতা, সৌখিনতা এবং অন্যদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ৫ নং হাবেরলাণ্ডস্ট্রাসে আইনস্টাইনের বাড়িতে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল, যেটা আইনস্টাইনের অন্য লোকদের প্রতি সংঘাতমূলক কিন্তু অভ্যন্তরীণ সুষমাময় ঔৎসুক্যকে এবং নিজেকে নিভৃতে আলাদা করে কাজ করার ইচ্ছাকে ব্যাহত করত না।

আইনস্টাইনের বাড়ি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যাক। তাঁর বাড়ির মালিক রাশিয়ার বাসিন্দা, তিনি বহুদিন ধরে আইনস্টাইনকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে তাঁর জীবনের স্বপ্ন যেন সার্থক হয়েছিল বলে মনে করতেন। আইনস্টাইন নয় ঘরের একটা ফ্ল্যাটে তাঁর স্ত্রী, প্রথম পক্ষের দুই কন্যা ইলসে ও মারগো এবং কিছুদিনের জন্যে তাঁর মা-ও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। হারমান আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরে পলিন কিছুদিন অন্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থাকতেন, পরে বার্লিনে আসেন এবং ১৯২০ সালে মারা যান।

পশ্চিম বার্লিনের অপেক্ষাকৃত একটা নতুন অংশে বাড়িটা ছিল, এলাকা-টাকে প্রায়ই বলা হতো বাভারিয়ার পাড়া কারণ তার রাস্তাগুলির নামকরণ বাভারিয়ার কয়েকটি স্থানের নামে হয়েছে। চওড়া রাস্তা, ভালো করে পাতা-ছাঁটা গাছগুলি এবং নতুন নতুন বাড়িগুলি বড়লোকদের কাছে জনপ্রিয় ছিল। বার্লিনের হাজার হাজার অন্যান্য বাড়ির মতোই ছিল আইনস্টাইনের বাড়ি। একটা ছোট স্কোয়ারের সামনে সেন্ট জর্জের স্ট্যাচু ও তার ড্রাগনটা ছিল তার একেবারে মাঝখানে।

আসবাবপত্র একেবারে সাদাসিধে, দেয়ালেতে রঙীন নকসা-করা কাগজ লাগানো, পরিবারবর্গের কিছু ছবি, ফ্রেডারিক দি গ্রেটের দু'টো কুকুর নিয়ে ছবি এবং এক কোণে একটা পিয়ানো—শহরের অন্যান্য অনেক বাড়ির মতোই সাজানো। একমাত্র লাইব্রেরীতে ঢুকলে বুঝতে পারা যেত মালিকের আসল কাজটা কী। কেউ যদি তাঁর বাড়ির আসবাবপত্র দেখে গৃহকর্তার ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন পাবার চেষ্টা করত তাহলে তাকে হতাশ হতেই হতো, যদি না সে প্রফেসারের পড়বার ঘরে ঢুকতে পারত। বারান্দার এক কোণে, সারা বাড়ি থেকে আলাদা করে রাখা একটা ছোটো ঘরে যেতে হতো সিঁড়ি বেয়ে।

এটাই আইনস্টাইনের পড়বার ঘর। জানলার ধারে একটা গোল টেবিলে লাল ও সাদা কাগজপত্র ও পুস্তিকাতে ভর্তি এবং স্তূপীকৃত তামাকের ছাই। বেতের দুটো চেয়ার, একটা কৌচ এবং দেয়ালের তাকটি বৈজ্ঞানিক বই ও পত্রপত্রিকা এবং দুটো মোটা বাইবেল দিয়ে ভর্তি। একটা তাকে একটা ছোট স্ট্যাচু রয়েছে, মাথা ভর্তি চুল নিয়ে এক বৃদ্ধ ইহুদী। আইনস্টাইনের মাথার চুলগুলি দ্রুত পাতলা হয়ে যাচ্ছিল এবং এলসা তাঁকে পরামর্শ দিতেন অনেক করে পেঁয়াজ খেতে, তাতে নাকি চুল শক্ত হয়। আইনস্টাইন পরামর্শটা মেনে নিয়েছিলেন, তাঁর আগের পক্ষের কন্যা মারগো স্ট্যাচুটা করেছিল এবং তাতে নাম লিখে দিয়েছিল 'রাবি জোয়িবেল' (জার্মান ভাষায় জোয়িবেল-এর অর্থ হল পেঁয়াজ)। তিনি আইনস্টাইনকে বলতেন, "পেঁয়াজ খেয়ে একজন মানুষ এক মাথা চুল এবং কোমর পর্যন্ত দাড়ি গজাতে পারে।" ছোট্ট স্ট্যাচুটা আইনস্টাইনের খুব প্রিয় ছিল।

সারা পরিবারে সরল বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সঙ্গে যে মিষ্টি হাসিতামাশা বয়ে যেত, এই স্ট্যাচুটাকে তার প্রতীক বলা যেতে পারে, সেটা ঐ ফ্ল্যাটের অন্য ভাড়াটেদের পরিত্যক্ত জিনিসপত্রের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল। আইনস্টাইনের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না, তিনি সহজেই অন্য লোকের পছন্দ করা জিনিস মেনে নিতে পারতেন। তাঁর ডেস্কে নিউটনের একটা প্রতিমূর্তি ছিল এবং তার পরেই ছিল একটা ছোটো টেলিসকোপ। কোনো সাক্ষাৎকারী যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করত তিনি টেলিসকোপটি কখনও ব্যবহার করেন কি, না, তাহলে তিনি জবাব দিতেন, "না, বন্ধু, আমি কখনও তারার দিকে চেয়ে দেখি না। এর আগে যে মুদী এখানে বাস করত এটা তার। খেলনার মতো আমি এটাকে রেখে দিয়েছি।" যদি জিজ্ঞাসা করা হতো নিজের যন্ত্রপাতি কোথায় রাখেন তিনি, একটু হেসে কপালে টোকা দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। একজন সাক্ষাৎকারী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁর গবেষণাগারটি কোথায়, তিনি নিজের ফাউন্টেন পেনটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

সাধারণত বেলা ৭-টাতে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতেন। স্নানের আলখাল্লা ও চটি পরে পিয়ানোতে বসে সামান্য একটু সুর ভাঁজতে থাকতেন। তখন তাঁর স্ত্রী ডেকে বলতেন, "তৈরি রয়েছে, এলবেরটেল; আর তিনি সোজা স্নানের ঘরে যেতেন কিন্তু প্রায়ই দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে যেতেন, তখন সে কাজটা

তাড়াতাড়ি করে দিতেন তাঁর স্ত্রী এলসা। প্রাতরাশ শেষ করে পাইপ ধরিয়ে পড়বার ঘরে চলে যেতেন আইনস্টাইন।

লোকেরা প্রায়ই তাঁকে জিজ্ঞাসা করত, কত ঘণ্টা তিনি কাজ করেন। এর জবাব তিনি দিতে পারতেন না, কারণ প্রধান কাজটা তাঁর কাছে ছিল চিন্তা করা। অনেক সময় কোনো বন্ধুকে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন; "দিনের মধ্যে কত ঘণ্টা কাজ করো?" বন্ধু যখন জবাব দিতো: "তা আট নয় ঘণ্টা", "তিনি তখন একটু কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে (যেন একটু হালছাড়ার ভাব করে আর কি—অনুবাদক) বলতেন, "আমি অতক্ষণ কাজ করতে পারি না। মেরেকেটে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ আমি করতে পারি না। কি করব আমি খুব পরিশ্রমী নই।"

আইনস্টাইন নিশ্চিন্তে পড়ার ঘরে চলে গেলে এলসা চিঠিপত্র খুলতে বসতেন। সারা দুনিয়া থেকে চিঠি আসত সবরকমের ভাষাতে—শত শত চিঠি, যা ডাকপিয়ন ঝুড়ি করে পৌঁছে দিত; চিঠিগুলি আসত বৈজ্ঞানিকদের, রাষ্ট্রনীতিবিদদের, জনসাধারণের এবং জনকল্যাণ-বিভাগের নেতাদের কাছ থেকে, শ্রমিকরা লিখত আর লিখত বেকার ও ছাত্ররা। অজস্র লোক সাহায্যের জন্যে লিখত অথবা উপদেশ চাইত এবং নানাভাবে সেবা করতে চাইত। একজন তরুণী মহাকাশের ভাবনা ভাববার কাজ করতে চেয়েছিল। আবিষ্কারকরা তাদের নতুন মেসিনের কথা লিখত, বাপমায়েরা ছেলের নাম অ্যালবার্ট রেখেছে বলে আইনস্টাইনকে জানাত, একজন সিগারেট ব্যবসায়ী তার তৈরি নতুন সিগারেটের নাম 'আপেক্ষিকতা' রেখে তাঁকে চিঠি দিয়েছিল।

এলসা চিঠিগুলি বেছে দিতেন। অনেকগুলির কোনো জবাব দেওয়া হতো না, অনেকগুলি এলসা নিজেই জবাব দিতেন, আর বাকিগুলি আইনস্টাইনকে দেখাতেন। এই কাজে দিনের অনেকখানি সময় কেটে যেতো, এমন-কি অনেক সময় এটা সন্ধ্যা পর্যন্ত চলত।

এলসা অনেক বাছাবাছি করলেও আইনস্টাইনের কাছে চিঠিপত্রের ব্যাপারটা বরাবরই বিরক্তির ব্যাপার ছিল। ১৯২০ সালে তিনি অনুযোগ করেছেন: "আমি কখনও 'না' বলতে পারি নি। এখন অজস্র পত্রিকার প্রবন্ধে এবং চিঠি লিখে আমাকে অনুযোগ ও নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে, আমার কাছে দাবি জানানো হচ্ছে; আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখি যে নরকের আগুনে আমি দগ্ধাচ্ছি

এবং আমার ডাকপিয়ন হচ্ছে শয়তান, যে চিৎকার করে আমাকে ডাকছে, নতুন চিঠিপত্রগুলি আমার মাথা তাক করে ছুঁড়ে মারছে কারণ এর আগের চিঠিগুলির আমি কোনো জবাব দিই নি। আর এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আমার মায়ের অসুখের ব্যাপারটা, আর 'খ্যাতির কালপর্ব', অর্থাৎ, মাথামুণ্ডু নেই এমন ধরনের অজস্র মিটিং। এ সবের একেবারে সরাসরি প্রতিফলন হলে একটা মানুষের যে-অবস্থা হয়, আমি তারই একটা বস্তার মতন হয়ে দাঁড়িয়েছি।"(১)

অন্য আর এক অবস্থায় আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন: "ডাকপিয়নটা আমার পয়লা নম্বরের শত্রু। তার হাত থেকে আমার কোনোরকমেই নিস্তার নেই।"(২)

আইনস্টাইনের বিলাসব্যসন ছিল নৌকাতে পাল তুলে পাড়ি জমানো। তিনি বলতেন, একটা পালতোলা নৌকাতে তাঁকে ডেকে বিরক্ত করবার ভয় নেই। অন্য কোনো খেলাধুলা তাঁর পছন্দ ছিল না। "শারীরিক পরিশ্রম আমার পছন্দ নয়", বলতেন তিনি, "বড্ড কুঁড়ে আমি, এই পালতোলা নৌকাই আমার সবচেয়ে পছন্দ।"(৩)

জামাকাপড়ের দিকে আইনস্টাইনের কখনই কোনো নজর ছিল না। সাধারণত একটা ব্রাউন চামড়ার জ্যাকেট (আমরা যাকে কোট বলি—অনুবাদক) পরতেন, এলসা এটা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। শীতের দিনে এ ছাড়া একটা ছাই রংয়ের ইংরেজদের পশমের সোয়েটার পরতেন, এটাও ছিল এলসার উপহার। আনুষ্ঠানিক ডিনারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হলে একটা পুরানো স্টাইলের কালো স্যুট পরতেন, খুব বিশেষ ব্যাপার না থাকলে ডিনার জ্যাকেট পরা তাঁর ধাতে সইত না এবং সেটা করতে হলে সারা পরিবারকে একযোগে অনুরোধ করতে হতো। আইনস্টাইনের অন্যান্য জীবনযাত্রার অভ্যাস এবং বলবার ও চিন্তা করার ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর সম্পর্কে লিখিত অন্যান্য অনেক স্মৃতিচারণায়।

ডাঃ মরিজ কাটজেনস্টাইন ছিলেন একজন শল্য চিকিৎসক, আইনস্টাইন-পরিবারের চিকিৎসাদি করতেন এবং বার্লিনে আইনস্টাইন তাঁকে নিকটতম

১ C. Seelig, op. cit., S. 272.
২ Ibid., S. 282.
৩ Ibid., S. 283.

বন্ধু বলে জানতেন। তিনি লিখেছেন, জার্মানির রাজধানী বার্লিনের চতুর্দিকে যে বেশ কয়েকটি হ্রদ আছে তাতে পালতুলে তাঁরা নৌকা চালাতেন। কাটজেন-স্টাইন লিখেছেন, আইনস্টাইনের চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল হাস্যকৌতুক করার ক্ষমতা এবং যথেষ্ট কল্পনাশক্তিও তাঁর ছিল। "উত্তর জার্মানির লোকেদের মতো মোটেই নয়, যারা সবসময়েই কর্তব্যের ভারে ক্লান্ত, ইতালিয়রা যাদের ঠাট্টা করে বলত 'bestia seriosa"'(১)(চিনির বলদ আর-কি—অনুবাদক।)।

আইনস্টাইনের আর এক বন্ধু, রুডলফ এহ্‌রেমান, তিনিও ডাক্তার এবং বার্লিনের উপকণ্ঠে যেতে আইস্টাইনের সঙ্গী হতেন। তিনি এই ধরনের পেশাগত বর্ণনা দিয়েছেন:

"সমসাময়িক অনেক লোকই জানত তাঁর দেবতার মতো টানাটানা চোখগুলি যা তিনি হাসলে যেন নেচে উঠত এবং কী আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি জগৎকে দেখতেন। চেহারার কাঠামোর দিক থেকে তিনি খুব প্রাধান্য পেতেন না। সাধারণ উচ্চতার চেয়ে একটু বেশি লম্বা, সাদা চামড়া ছিল তাঁর, আর ছিল বেশ সুগঠিত পেশল দেহ···ওষুধ খাওয়া তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না, তবে ডাক্তারদের তিনি পছন্দ করতেন···ডাক্তাররা অতি সহজে নানারকমের সামাজিক স্তরের লোকেদের সংস্পর্শে আসতে পারে। এজন্যে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে তিনি ভালবাসতেন। ডাক্তারদের সাহচর্যে তিনি নিজের ঔৎসুক্যের মিল খুঁজে পেতেন কারণ আইনস্টাইন তাঁর নিজের যোগ্যতা-বলেই আরও স্বাস্থ্যকর ও ভালো মনুষ্যজাতি চাইতেন।"(২)

বার্লিনে আইনস্টাইনের আরও একজন প্রায়ই সঙ্গী হতেন, ইমান্যুয়েল লাসকার, এক সময়ে তিনি দাবা খেলার চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। লাসকার স্মৃতিকথা লিখে যান নি, কিন্তু বন্ধু লাসকার-এর সম্পর্কে আইনস্টাইনের কয়েকটি মন্তব্য থেকে আমরা আইনস্টাইনের নিজের চরিত্র বুঝতে পারি।

আইনস্টাইন লিখেছেন, "যতরকমের মানুষের সঙ্গে আমি মিশেছি, লাসকার তাদের মধ্যে অন্যতম সেরা আকর্ষণীয় লোক। মানবজাতিকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, সেগুলি সম্পর্কে ঔৎসুক্য নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে এতটা চিন্তার স্বাতন্ত্র্য আমি খুব কম দেখেছি। দাবা আমি খেলি না এবং ঐ খেলাতে বুদ্ধির কতটা দৌড় আছে সেটা আমার

১ Helle Zeit, S. 46.
২ Ibid., S. 59.

পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়। ঐ খেলাতে যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব আছে সেটা আমার অপছন্দ।"(১)

একটা তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকারোক্তি। আইনস্টাইন দাবা খেলাকে একটা বৌদ্ধিক কাজ (বা একসারসাইজ) বলে মনে করতেন, কিন্তু তাঁর নিজের চিন্তাধারা এমন সমস্যাগুলি নিয়ে ব্যাপৃত থাকত যা সত্যকে আবিষ্কার করেই একমাত্র সমাধান করা যায়, অপর পক্ষকে পরাস্ত করে নয়। আইনস্টাইনের মনের গঠন ছিল গভীরভাবে সত্তাতত্ত্ববাদী কাঠামোতে বাঁধা এবং এমন ধরনের চিন্তা যা স্পিনোজাসুলভ যুক্তিবাদী লক্ষ্যতে উপনীত হবার চেষ্টা না ক'রে (যেটা কিনা পদার্থগত বাস্তবতার একটা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা) একমাত্র নিজের মধ্যেই লক্ষ্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করে—সেই চিন্তা-পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না। আইনস্টাইনের দর্শন তাঁকে কোনোরকমের প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে বিমুখ করেছিল অথবা মানসিকতা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এমন কিছুর প্রকাশ তিনি গ্রহণ করতে অপারগ ছিলেন, যা 'নেহাৎই' ব্যক্তিগত।

আর একজন ব্যক্তি লিওপোল্ড ইনফেলড তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন; সেগুলি এ বইয়েতে আমরা উদ্ধৃত করেছি। ১৯২০ সালে ইনফেলড-এর সঙ্গে আইনস্টাইনের প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি ক্র্যাকাও-তে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। প্ল্যাংক, লাওয়ে এবং আইনস্টাইনের কাছে ইনফেলড-এর পড়াশুনা শেষ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পোলাণ্ডের অধিবাসীদের, বিশেষ করে ইহুদীদের, তখনকার দিনের প্রাশিয়ার সরকারপক্ষ সুনজরে দেখত না। সব দরজাই তাঁর কাছে বন্ধ মনে হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সাহস করে তিনি সোজা আইনস্টাইনের কাছে আবেদন করা ঠিক করলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন।

"কুণ্ঠিত, গভীর আবেগ নিয়ে ছুটির মেজাজে বিরাট একজন বৈজ্ঞানিককে দেখতে যাচ্ছি, এইরকম একটা মানসিকতা নিয়ে ৫নং হাবেরলাণ্ডস্ট্রাসের আইনস্টাইনের ফ্ল্যাটের দরজার বেল টিপলাম। ভারী আসবাবপত্র দিয়ে ভর্তি একটা ছোট্ট বসবার ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, মিসেস আইনস্টাইনকে আমার আসার কারণ বললাম। তিনি একটু মাপ চেয়ে নিলেন, বললেন একটু অপেক্ষা করতে হবে কারণ চীনের শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তখন তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। অপেক্ষা করতে লাগলাম, আমার মনে তখন বেশ

১ C. Seelig, op. cit., S. 331.

উত্তেজনা। …আইনস্টাইন তাঁর পড়বার ঘরের দরজা খুলে চীনা ভদ্রলোকটিকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করলেন এবং আমাকে ঢুকতে বললেন। আইনস্টাইনের পরনে সকালের কোট এবং দাগ-দেওয়া পাৎলুন যার একটা প্রয়োজনীয় বোতাম নেই। ছবিতে ও পত্রিকাতে তখন যা দেখতে পাওয়া যেত সেইরকম সুপরিচিত মুখমণ্ডল। কিন্তু কোনো ছবিতেই তাঁর চোখের দীপ্তি ধরা পড়ত না।

বলবার জন্যে যা ঠিক করে রেখেছিলাম, সব ভুলে গেলাম। একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে আইনস্টাইন একটা সিগারেট দিলেন। বার্লিনে আসার পরে এই প্রথম বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দেখলাম। সংক্ষেপে আমার কথাটা বললাম। মনোযোগ দিয়ে তিনি শুনলেন।

"শিক্ষামন্ত্রকের দপ্তরে চিঠি দিয়ে সুপারিশ করতে আমার খুবই ভালো লাগবে। কিন্তু আমার সইয়ের কোনো দাম তাদের কাছে নেই।"

"কেন?"

"কারণ আমি এ ধরনের সুপারিশ করেছি" এবং এবারে একটু গলা নামিয়ে যেন চুপি চুপি বললেন যাতে আমি কথাটা আর কাউকে না বলি—"তারা ইহুদী-বিদ্বেষী।"

হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণ ভাবলেন তিনি।

"তুমি যে একজন পদার্থবিদ তাতে অবশ্য ব্যাপারটা একটু সুবিধা হয়েছে। আমি প্রফেসার প্ল্যাংককে একটু লিখে দিচ্ছি, তিনি সুপারিশ করলে ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে ভালো হবে।"

"লেখার জন্যে কাগজ খুঁজতে শুরু করলেন তিনি, যেটা তাঁর সামনের ডেস্কে ছিল। লজ্জা করল সেটা তাঁকে দেখিয়ে দিতে। শেষ পর্যন্ত তিনি সেটা খুঁজে পেলেন এবং কয়েকটি কথা লিখলেন। পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে আমার সামান্য মাত্র জ্ঞান আছে কি, না, সেটা পরখ না করেই তিনি এটা করলেন।"(১)

আইনস্টাইনের কাছে বার্লিনে যাঁরা আসতেন তার মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মচারীরাও ছিলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের পিপলস কমিশার গ্রিগরি চিচেরিন তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন এবং তাঁদের কথাবার্তাতে

১ L. Infeld, op. cit., pp. 91-92.

বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে প্রচুর তথ্য ও ধারণা আইনস্টাইন পেয়েছিলেন। শিক্ষাদপ্তরের পিপল্‌স কমিশার এ. ভি লুনাচারস্কি-র সঙ্গে কথাবার্তা বলে সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্পর্কে আইনস্টাইন প্রচুর সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছিলেন; লুনাচারস্কি পরে মস্কোর একটা পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'মহৎ মনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার'। এই প্রবন্ধ থেকে বেশ কিছুটা উদ্ধৃতি দিলে, আশা করি পাঠক আপত্তি করবেন না।

লুনাচারস্কির লেখাটা শুরু হয়েছে এই ঘটনা দিয়ে। এক সময়ে ইউজেনিয়া ডিকসন নামে এক পাগল মহিলা ছিল। সে প্যারিসে সোভিয়েতের রাষ্ট্রদূত ক্রাসিনকে হত্যার চেষ্টায় কুখ্যাত হয়; সে এই চেষ্টা করেছিল একটা রিভলবার দিয়ে, যেটা ছোঁড়া তো যেতই না, এমন কি তাতে গুলিও ভরা ছিল না। এক সময়ে সে লুনাচারস্কি-র পেছনে দৌড়েছিল এই বলে যে, পূর্বতন জার সরকারের মন্ত্রী মিলিউকভ নাকি তার সন্তানের পিতা (সন্তানটির কিন্তু কোনো অস্তিত্ব ছিল না) এবং মিলিউকভ নাকি সন্তানটিকে হত্যা করিয়েছিলেন, যাতে একটা নতুন বিইলিস বিচার করা সম্ভব হয়, জারের প্ররোচক-এজেন্ট এজেফ নাকি তার আর একজন সন্তানের পিতা (এই সন্তানেরও কোনো অস্তিত্ব নেই) এবং শেষ অবধি এজেফই নাকি আইনস্টাইন নাম নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে এবং একজন পদার্থবিদ বলে নিজেকে জাহির করছে।

এর পরে লুনাচারস্কি যখন আইনস্টাইনদের সঙ্গে বার্লিনে দেখা করেন তখন এলসা গল্পটির পরের ঘটনাবলীর বর্ণনা দেন। ইউজেনিয়া ডিকসন আইনস্টাইনকে একটা চিঠি লিখে তাঁর মুখোস খুলে দেবার ভয় দেখায়। এর পরে পরে প্যারিস ও বার্লিনের মধ্যের বিভিন্ন রেলস্টেশন থেকে কয়েকটি ভীতিপ্রদর্শক চিঠি আসতে থাকে, শেষ অবধি একদিন এই হতভাগ্য বিকৃতমস্তিষ্ক মহিলা হাবেরলাণ্ডস্ট্রাসের বাড়ির দরজার বেল টেপে এবং দাবি করে যে তাঁকে এজেফ-আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হোক। আইনস্টাইনকে চাক্ষুষ দেখে সে চিৎকার করে বলে, তাঁর সত্যিই ভুল হয়েছে এবং তিনি এজেফ নন। তা সত্ত্বেও সে আইনস্টাইনকে তার সন্তানের তথাকথিত পিতা বলে স্বীকৃতি জানাতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে যাতে তার পাগলা গারদে যাওয়াটা বন্ধ করা সম্ভব হয় এবং কিছু টাকাও সে চায়। বার্লিনের পুলিস সব ব্যাপারটা হাতে নেয় এবং একজন কর্মচারী বোকার মতো এলসাকে বলে ফেলে যে, এঁদের মধ্যে যোগসাজস যে একেবারে নেই তা না-ও হতে পারে।

লুনাচারস্কির এই বর্ণনা, এরেনফেস্টের কথাবার্তা থেকে নেওয়া সেলিগ-এর বিবরণের সঙ্গে প্রায় পুরো মিলে যায়।(১)

১৯২৫ সালের শুরুতে এরেনফেস্ট লাইপজিগ রেল স্টেশনে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন; তিনি বার্লিন থেকে সকালের ট্রেনে আসছিলেন। আইনস্টাইন এলেন কিন্তু সন্ধ্যাবেলা। এরেনফেস্টকে তিনি বললেন যে, তাঁকে জেলে গিয়ে একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল, যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই অজুহাতে যে সে আইনস্টাইনকে এজেফ মনে করে খুন করতে চেয়েছিল। মারগো-র সঙ্গে দরজায় তার দেখা হয় এবং এটা তার পরিষ্কার মনে হয়েছিল যে আইনস্টাইনের ফ্ল্যাটে যাচ্ছে যে মহিলাটি, তার মাথাটি খারাপ। রাস্তার টেলিফোন থেকে মারগো তার মাকে ডেকে সেকথা জানিয়ে দেয় এবং শেষ অবধি তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আইনস্টাইন যখন মহিলাটির সঙ্গে দেখা করতে যান তখন সে ঘোষণা করে যে, তিনি এজেফ নন ('আপনার নাকটা অনেক ছোট')। আইনস্টাইন তাঁর প্রভাব বিস্তার করে তাকে মুক্ত করে দেন এবং কয়েকটি জিনিস তার অনুরোধে তাকে কিনে দেন। এলসা যেভাবে লুনাচারস্কির কাছে এবং এরেনফেস্ট যেভাবে আইনস্টাইনের কাছে বর্ণনা করেছিলেন, সারা ঘটনাটা ততটা সরল ও কৌতুকজনক নাও হতে পারে। আইনস্টাইনকে হত্যার জন্যে গুরুতর প্রয়াসের কথা লিখেছেন গারবেডিয়ান :

"রাজনৈতিক ব্যাপারে আইনস্টাইনের কাজকর্ম তাঁর অনেক নতুন বন্ধু এবং কিছু বিশেষ শত্রু তৈরি করেছিল। শেষোক্তদের মধ্যে একজন ওটো-র (বাড়ির প্রধান পরিচারক) তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। একদিন মাদাম মারি (নামটা এর কাছাকাছি) এরগুয়েসা-ডিকসন, তিনি একজন আমেরিকানের রুশী বিধবা, বার্লিনের আইনস্টাইনের ঘরে ঢুকিয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁর মনে খুন করার মতলব ছিল এবং সেটা তিনি করতেন তাঁর টুপির পিনকে সূচাগ্র ছুরির মতো ব্যবহার করে। প্রচণ্ড আস্ফালন করে ভয় দেখিয়ে তিনি আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন, বিজ্ঞানীর স্ত্রী ঐ আক্রমণকারীকে নিরস্ত্র করে দিলেন, যেকোনো বিপদ থেকে তিনি তাঁর প্রিয় স্বামীকে রক্ষার জন্যে সব সময়েই তৎপর থাকতেন; এর পর শ্রীমতি

১ C. Seelig, op. cit., S. 307-08.

আইনস্টাইন পুলিশ ডাকলেন। সেটা এত দক্ষতার সঙ্গে শান্তভাবে করলেন যে, অনেকদিন পরে আইনস্টাইন তাঁর জীবনের 'পরে যে হামলা হয়েছিল, সেটা জানতে পারেন।(১)

এবারে লুনাচারস্কি-র প্রবন্ধে ফিরে আসা যাক। এই ঘটনার সূত্রপাত করার তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল, আইনস্টাইনের একটা লিপি-চিত্র উপস্থিত করা। লুনাচারস্কি লিখছেন, আইনস্টাইনের উপস্থিতি মাত্রই অন্যদের মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করত (যাকে তিনি বলেছেন, "একটা গভীর সহানুভূতি, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা")।

আইনস্টাইনের চোখের পাওয়ার বেশি থাকাতে শুধু কাছের জিনিসই তিনি দেখতে পেতেন, যেটা তাঁকে স্বপ্নালু করে তুলত, যেন বহু পূর্বেই তিনি তাঁর দৃষ্টির বৃহদাংশকে তাঁর নিজের অন্তরের চিন্তার প্রতি নিবদ্ধ করেছেন এবং সেখানেই রেখে দিয়েছেন। যে-কোনো লোকের মনে হতো যে, আইনস্টাইনের দৃষ্টি সবসময়েই তাঁর চিন্তা ও গণিতের মাপজোকের উপর যেন নিবদ্ধ। এজন্যেই তাঁর চোখে সবসময়ে ঐ ধরনের স্বপ্নালু, এমন-কি একটা বিষণ্ণ ভাব থাকত। তা সত্ত্বেও দলে পড়লে আইনস্টাইন বেশ হাসিখুশি হতে পারতেন। ভালো ঠাট্টা-তামাসা তিনি উপভোগ করতেন এবং দুলে দুলে ছোট ছেলেদের মতো হাসির ঝরণায় ভেঙ্গে পড়তেন, যেটা সাময়িক ভাবে তাঁর চোখদুটিকে বাচ্চা ছেলেদের মতো করে দিত। চোখে-পড়ার মতো তাঁর সরলতা এত আকর্ষণীয় যে, কারুর মনে হতো যেন তাঁকে জড়িয়ে অথবা তার হাত চেপে ধরেন অথবা তাকে পিঠ চাপড়ে দেন, যাতে কিন্তু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর কোনো অভাব হবে না। একজন মহান মানুষের প্রতি মিষ্টি প্রীতির ভাব দেখাবার এটা একটু আলাদা ধরনের মনোভাব, যার সঙ্গে কিন্তু মিশে আছে এমন সরলতা এবং অবাধ শ্রদ্ধা যাকে রক্ষা করার দরকার হয় না।"

এলসা সম্পর্কে লুনাচারস্কি লিখেছেন :

"তিনি তখন আর তরুণী নন, ঘন কাঁচাপাকা চুল, কিন্তু বেশ সুন্দরী এবং শান্ত সৌন্দর্য তাঁর সর্বাঙ্গে, যেটা কেবলমাত্র দৈহিক নয়। তাঁর

---

১ H. G. Garbedian, Albert Einstein. Maker of Universes, Funk and Wagnall, New York, 1939, p. 199.

মহান স্বামীকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, সবসময়েই জীবনের কঠোরতা থেকে তাঁকে রক্ষা করতে তিনি উৎসুক এবং যাতে তাঁর মহান ধারণাগুলি পরিপক্ক হয়ে ওঠে, এর জন্যে তাঁর মনের শান্তি রক্ষা করতে তিনি সদাব্যস্ত ; একাধারে সহকর্মী, স্ত্রী এবং মাতা রূপে তিনি তাঁকে দেখে থাকেন যেন একটা বড়ো হওয়া খোকার মতো ।”

একবিংশতি পরিচ্ছেদ

ভ্রমণ

> যে আদর্শগুলি আমার পথকে আলোকিত করেছে এবং সময়ে সময়ে আমাকে খুশি মনে জীবনের সঙ্গে পাল্লা লড়তে নতুন সাহস যুগিয়েছে, সেগুলি হল দয়া, সৌন্দর্য ও সত্য। সমমনোভাবাপন্ন লোকেদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ না হলে, বিষয়মুখী জগতের সঙ্গে সাযুজ্য না ঘটলে, যেটা শিল্প ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বরাবরের মতো পাওয়া যায় না, জীবনটা আমার কাছে শূন্য মনে হোত।
>
> আইনস্টাইন

আগেই বলা হয়েছে. সূর্যকেন্দ্রিক জগতের ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণিত করার জন্যে আইনস্টাইন গ্যালিলিও-র কঠোর প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানান নি। তাঁর নিজের মত সম্পর্কে তিনি সত্যের প্রত্যয় সৃষ্টির ক্ষমতার উপরই আস্থা স্থাপন করতেন এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কোনো পণ্ডিতের প্রচেষ্টার দরকার নেই বলে মনে করতেন। এই সঙ্গেই তিনি মনে করতেন যে, সমমতাবলম্বী লোকেদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে জীবনটা ফাঁকা হয়ে যাবে। এই দুই মনোভাবের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। আইনস্টাইন কখনও জগৎপ্রপঞ্চ সম্পর্কে তাঁর ধারণার ও তাঁর মৌলিক সূত্রগুলির সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন না। তাঁর কাছে এটা (অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ—অনুবাদক) ছিল সরল ও জ্ঞানের দ্বারা আয়ত্তযোগ্য বিষয়, কারণ সেটা ছিল প্রকৃতির স্বভাবজাত এবং সুষমান্বিত—তার অনেকরকম জটিল হিসাব ও পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও তাঁর মননশীলতার কাছে এই সুষমাময় জগৎ-

প্রপঞ্চের 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'র একটা আবেদন ছিল। আইনস্টাইন সব সময়েই তাঁর কাজকে চরম ন্যায়সঙ্গত ও গাণিতিক চমৎকারিতার মধ্যে নিয়ে যেতেন। তিনি বহু বছর ব্যয় করেছেন জটিল গাণিতিক নির্মাণকার্যে এবং তিনি এগুলির বিতর্কমূলক চরিত্র ও সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলির দুর্বোধ্যতা বুঝতে পারতেন। কিন্তু সেগুলি জটিল,বিতর্কমূলক এবং রহস্যময় চরিত্রের হওয়া সত্ত্বেও আইনস্টাইনের তাত্ত্বিক নির্মাণকার্যের মধ্যে ছিল সরল এবং পরিষ্কার সূত্রগুলি, যার ফলে সেগুলিকে বেশ সাধারণভাবে জটিলতা বাদ দিয়ে সোজা ও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা চলত। এই সূত্রগুলিকে জনগণের কাছে প্রকাশ করতেই হতো এবং তাদের অন্তর্নিহিত সুষমা এবং বিশ্বাস-যোগ্যতা বাকি কাজটুকু করে দেবে বলে তিনি মনে করতেন।

বিশের দশকে আইনস্টাইন বিশেষ করে এই ধরনেব সরল, পরিষ্কার এবং অখণ্ডনীয় বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলিকে আরও বিকশিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। প্রতিশোধ নেবার বিষাক্ত ধারণা, মতাদর্শের দিক থেকে দেউলিয়াপনা এবং লীগ অফ্ নেশন্‌সের অসহায়তা, বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিত্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আগ্রাসী গুণ্ডামীর মনোভাব জাগ্রত করে আক্রমণ চালানো – এ সবই ছিল জীবনের বাস্তবতা, যা থেকে বিজ্ঞানের সামাজিক ফলাফলের ধারণাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

প্রতিক্রিয়ার বিরোধিতা করতেই হবে কিন্তু গণিতের মাপজোকের দ্বারা নয়, পদার্থগত তত্ত্বের যুক্তিসম্মত মনোভাবকে জাগ্রত করে এবং বিশ্বের সুষমার সর্বাঙ্গীণ চেহারাকে সামনে এনে। এই ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে আইনস্টাইন সমমতাবলম্বী লোক খুঁজে পেলেন, যাদের আত্মীয়তা তাঁর কাম্য ছিল। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ পদার্থবিজ্ঞানের পত্রিকা মারফত হতে পারে না।

১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে, গ্যালিলিও রোমে গিয়েছিলেন সূর্যকেন্দ্রিক জগতের ধারণা এবং ধ্রুপদী আপেক্ষিকতার সূত্রকে সমর্থন করে কার্ডিনালদের জমায়েতের সামনে বলতে। ১৯২০-এর দশকে আইনস্টাইন জগৎপ্রপঞ্চের নতুন চেহারাকে মানব জাতির যৌথ বুদ্ধিমত্তার কাছে উপস্থিত করার জন্যে অনেক দেশ সফর করেন।

এটা লক্ষ্য করা দরকার যে, আইনস্টাইনের বিরোধীরা তাঁর শ্রোতৃবর্গের

সংখ্যাবৃদ্ধিতে বিরক্ত হতো। জার্মানিতে 'আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে গণপ্রস্তাব' নামে একটা পুস্তিকা প্রকাশিত হল যাতে লেখক লিখছেন :

"বৈজ্ঞানিক মহলে আপেক্ষিকতাবাদের ভ্রান্ত চরিত্রটা যত ধরা পড়ল, আইনস্টাইন তত বেশি করে জনগণের কাছে গেলেন এবং নিজেকে ও তাঁর তত্ত্বকে যতটা সম্ভব জনগণের সামনে তুলে ধরা যায়, তা করলেন।"(১)

বিশের দশকের গোড়ার দিকে আইনস্টাইন হল্যাণ্ড, চেকোস্লোভ্যাকিয়া এবং অস্ট্রিয়াতে গেলেন, আমেরিকাতে পাড়ি দিলেন, পথে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে নামলেন এবং শেষ অবধি একটা দীর্ঘ যাত্রায় জাপান, প্যালেস্টাইন ও স্পেনে গেলেন।

হল্যাণ্ডের লিডেন শহরে আইনস্টাইন 'ইথার ও আপেক্ষিকতাবাদ' সম্পর্কে পনের শত শ্রোতার সামনে বক্তৃতা করলেন। পদার্থবিজ্ঞানের মূল নীতিগুলি সম্পর্কে এ ছিল একটা সহজবোধ্য বক্তৃতা এবং তাঁর নিজের পেশার বাইরে সমমনোভাবাপন্ন লোকেদের কাছে একটা আবেদন ছিল এর বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে আগাগোড়া ছড়িয়ে ছিল মহাবিশ্বের যৌক্তিক ছকের ধারণা—যে ধারণার সামাজিক অনুরণকে শত্রু-বন্ধু নির্বিশেষে সকলেই তারিফ করেছে। শত্রুরা আইনস্টাইনের মতামত সম্পর্কে এইভাবে লিখেছে :

"বহুদিন ধরে আমাদের এই চাঞ্চল্যকর তথ্যটি বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে, ইথারকে বরবাদ করা গেছে ; আর এখন আইনস্টাইন নিজেই সেটা পুনঃপ্রবর্তন করছেন ; এই লোকটাকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত নয়, সে নিজেই নিজের কথার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ করে।"(২)

আইনস্টাইনের অনুগামীদের উৎসাহ এবং আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ, লিডেন লেকচারের পরে তাঁর শ্রোতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রমাণ করে দিল যে, বিষয়বস্তুটা পদার্থবিদ্যাতে আবদ্ধ নয়, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এটা ছিল সর্বোপরি যুক্তিসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ববীক্ষার জন্যে সংগ্রাম।

লিডেন লেকচারে আইনস্টাইন ইথারের ধারণাকে ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখাবার চেষ্টা করেন। পদার্থগত বাস্তবতা সম্পর্কে একটা ঐক্যবদ্ধ ছবি তৈরি করার জন্যে ইথারের ধারণাকে চালু করা হয়। বিভিন্ন বল

১ Ph. Frank, op. cit., 205.
২ Ph. Frank, op. cit., 205.

প্রয়োগের ফলে বস্তুগুলি তাদের গতিশীল অবস্থা লাভ করে—তার সঙ্গে দূরের বস্তুর প্রতি ক্রিয়ার ধারণা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কাজেই প্রয়োজন ছিল এমন একটি মাধ্যম (মিডিয়াম) খাড়া করা যার ক্রিয়াতে বিভিন্ন বস্তু পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হবে। এর পরে এল আলোক-তরঙ্গের তত্ত্ব, যাতে এমন একটা মাধ্যম দরকার যেখানে যান্ত্রিক কম্পনগুলি তরঙ্গের আকারে প্রবহমান হতে পারে এবং আলোক-বিজ্ঞানের ঘটনাবলীর জন্যে তাদের দায়ী করা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আলোক বিজ্ঞানের পরীক্ষাগুলি দেখিয়ে দিয়েছিল যে, মাধ্যম বস্তুর গতির সঙ্গে যোগ দেয় না এবং সমস্ত বস্তুই ইথারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে চলাফেরা করে। কিন্তু তারপরে মাইকেলসনের পরীক্ষাতে একটা গতিশীল বস্তুর মধ্যে আলোর বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন গতিবেগ ইথারের মাধ্যমে যাওয়া-আসা করাটা খুঁজে পাওয়া গেল না। এই ভিত্তিতে বিশেষ আপেক্ষিকতা-বাদ এই সূত্র উপস্থিত করল যে, ইথারের তুলনায় গতির যে কোনো পদার্থগত অর্থ হয় না, কারণ কোনো উপায়েই তাকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ কিন্তু পদার্থগত ধারণা দিয়ে ইথারকে আংশিকভাবে পুনর্বাসন করল। বিশেষ আয়তনযুক্ত বস্তুদেহগুলি—যা মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের উৎস স্বরূপ—দেশগত স্থানাঙ্কের পরিবর্তন সাধন করে থাকে, যাকে আমরা পদার্থের ধর্ম বলে থাকি। কিন্তু দেশ-এর যদি নিশ্চিতভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য পদার্থগত ধর্ম থেকে থাকে—তাহলে আমরা তাকে বস্তুগত মাধ্যম বলে অভিহিত করতে পারি, এমন-কি তাকে আমরা 'ইথার'ও বলতে পারি। কেবলমাত্র এই 'ইথার'-এর ধ্রুপদী ধর্ম থাকবে না, যাতে পদার্থগত বস্তু-দেহগুলি ইথারের তুলনায় গমনাগমন করতে পারে অথবা ইথারের উপরে গতিশীল বস্তু-দেহের সাহায্যে ইথারকে চলাচল করানো যেতে পারে। এইভাবে ইথারের ধারণাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আইনস্টাইন জোর দিয়ে বললেন যে, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে যেহেতু দেশ-এর পদার্থগত ধর্ম রয়েছে, সেহেতু এই অর্থে ইথারেরও অস্তিত্ব রয়েছে বলা যেতে পারে।

ইথারের ধারণা কিন্তু টিকল না এবং পণ্ডিতরা মহাকর্ষের ক্ষেত্রের জন্যে দেশ-এর ধর্মের পরিবর্তন হচ্ছে, এটা বলাই সঙ্গত মনে করলেন।

আইনস্টাইন ১৯২০ সালে লিডেন শহরে প্রথম যাওয়ার পর আরও কয়েকবার সেখানে যান। এই শহরে লোরেন্‌জ্‌ বাস করতেন, আইনস্টাইনের কাছে তিনি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। আর এখানে থাকতেন পল

এরেন্‌ফেস্ট, যার সাহচর্যও তাঁর কাম্য ছিল। এরেনফেস্টের দরজা সব সময়েই আইনস্টাইনের জন্যে উন্মুক্ত থাকত এবং এরেনফেস্ট ও তাঁর রুশী স্ত্রী তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ এরেনফেস্ট আইনস্টাইন ও এলসার প্রাণের বন্ধু ছিলেন। ১৯২৩ সালে এরেনফেস্ট লোরেন্‌জ-এর পরিবর্তে লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন এবং আইনস্টাইনকে অধ্যাপক হিসাবে নিয়মিত চাকরিতে যোগ না দিয়ে প্রফেসার হতে বললেন। আইনস্টাইন বার্লিন ও লিডেন-এর মধ্যে যাতায়াত শুরু করলেন, তিনি সবসময়েই এরেনফেস্টের বাড়িতে উঠতেন আর তাঁর পছন্দসই খাবার তাঁকে দেওয়া হতো। আইন-স্টাইন এরেনফেস্টের বাড়িতে ঢুকেই বেশ ফুর্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠতেন: "একটা বেহালা, একটা বিছানা, একটা ডেস্ক ও একটা চেয়ার ছাড়া একজন মানুষের আর কী লাগে?"

লিডেন লেকচারের পরের বছরে প্রাগের ইউরেনিয়া নামে একটা বৈজ্ঞানিক সমিতি আইনস্টাইনকে লেকচার দিতে আমন্ত্রণ জানাল। প্রাগে ফিলিপ ফ্র্যাংক ও তাঁর স্ত্রীর আতিথ্য তিনি গ্রহণ করলেন। প্রাগে কোনো আলাদা ঘর পাওয়া দুষ্কর ছিল এবং ফ্র্যাংক-দম্পতি পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাগারের অফিসে বাস করতেন, এই ঘরটিই ছিল এক সময়ে আইনস্টাইনের অফিস। এর ফলে এক গাদা সাংবাদিককে এড়িয়ে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আইনস্টাইন ও ফ্র্যাংক চেক্‌ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করার পর কয়েকটি কাফেতে ঘুরে বেড়ালেন। যে শহরের পথে পথে এক সময় তিনি কত হেঁটে বেড়িয়েছেন—তার জীবনযাত্রাকে আরও কাছ থেকে দেখবার জন্যে আইনস্টাইন এটাই চেয়েছিলেন।

ইউরেনিয়া সমিতির একেবারে জনাকীর্ণ হল ঘরে সন্ধ্যাবেলা আইনস্টাইন লেকচার দিলেন। লেকচারের পরে কয়েকজন অতিথি এলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে একটা সান্ধ্য সভায় মিলিত হতে। সেখানে কয়েকটা বক্তৃতা হল। আইনস্টাইন তাঁর বক্তৃতার সময়ে বললেন, "বোধ হয় আরও চমৎকার ও বোধগম্য হবে যদি বক্তৃতা না করে আমি বেহালাতে আপনাদের কিছু বাজিয়ে শোনাই।" মোৎসার্টের সোনাটা তিনি তাঁর সহজ, একেবারে সঠিক আর সেই কারণেই যেন দ্বিগুণ আবেদনমুক্ত, এইভাবে বাজালেন।"(১)

---

১ Ph. Frank. op. cit., p. 210.

প্রাগ থেকে আইনস্টাইন গেলেন ভিয়েনা, সেখানে তিন হাজার লোক বসতে পারে এমন এক বিরাট কনসার্ট হলে বক্তৃতা দিলেন।

ভিয়েনাতে ফ্রিডরিক অ্যাডলারের চাঞ্চল্যকর ঘটনাটির কথা তাঁকে বলা হল; অ্যাডলার যুদ্ধের সময় একটা সৌখিন হোটেলে অস্ট্রিয়ার গভর্নমেন্টের প্রধানকে ডিনারের সময়ে গুলি করে মেরেছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সম্রাট তাঁর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা মকুব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এই ধারণাটা চালু করা হয় যে, অ্যাডলার যখন খুন করেছিলেন তখন তাঁর মানসিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ ছিল না। এই ধারণাটার সমর্থন মিলল বেশ একটু অন্যভাবে। মাখকে অনুসরণ করে অ্যাডলার আপেক্ষিকতাবাদের বিরোধিতা করেছিলেন এবং জেলে থাকার সময়ে তিনি তাঁর বিশ্বাস অনুসারে একটা লেখাতে আইনস্টাইনের মতামতের বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি দিয়েছিলেন। বিচারালয় থেকে মানসিক রোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে এবং পদার্থবিদদের কাছে পাণ্ডুলিপিটা পাঠানো হল—যাঁরা ঠিক করে দেবেন যে, লেখক মানসিক দিক থেকে ব্যাধিগ্রস্ত কিনা। এই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন ছিলেন ফিলিপ ফ্র্যাংক। তিনি লিখেছেন, বিশেষজ্ঞরা, বিশেষ করে পদার্থবিদরা, খুবই মুস্কিলের মধ্যে পড়ে গেলেন। অ্যাডলারকে মানসিক দিক থেকে ব্যাধিগ্রস্ত বলতে পারলে নিশ্চয়ই তাঁর দণ্ডাজ্ঞা অনেকখানি হ্রাস হয়ে যাবে। অন্যদিকে এটা লেখকের পক্ষে দারুণ অপমানজনকও বটে কারণ তিনি মনে করছেন তিনি বিজ্ঞানে একটা চমৎকার কাজ করেছেন।(১)

ভিয়েনাতে আইনস্টাইন বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ফেলিক্স এরেনহাফট-এর সঙ্গে থাকতেন। দুজনের মধ্যে তর্ক লেগেই ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও আর সম্ভবত সেই কারণেই আইনস্টাইন তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করতে পছন্দ করতেন। এরেনহাফট-এর স্ত্রী ছিলেন অস্ট্রিয়াতে নারী শিক্ষার একজন বিশিষ্ট সংগঠক। তিনি চাইতেন, আইনস্টাইন লেকচারে বেশ ভালো পোশাক পরিচ্ছদ পরে যান এবং আইনস্টাইন যে দু'জোড়া পাতলুন এনেছিলেন তার মধ্যে একটাকে তিনি ধোপার কাছে ইস্ত্রি করতে পাঠালেন। আইনস্টাইন কিন্তু ইস্ত্রি না-করা অন্য পাতলুনটা পরেই লেকচার দিতে গেলেন।

১ Ph. Frank, op. cit., p. 212.

১৯২১ সালেই তিনি ইহুদী আন্দোলনের নেতা চেম ভাইজমান-এর সঙ্গে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে যাবার নিমন্ত্রণ পেলেন। প্যালেস্টাইনে একটা ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্যে টাকা তোলাই ছিল ঐ সফরের উদ্দেশ্য। নিউ ইয়র্ক বন্দরে পৌঁছলে বিরাট জনতা আইনস্টাইনকে সংবর্ধনা জানায়। জাহাজটা সবে ঘাটে ভিড়েছে এমন সময় একদল সাংবাদিক জাহাজে উঠে পড়ে আইনস্টাইন, তাঁর স্ত্রী ও ভাইজমানকে ঘিরে ফেলে। সাক্ষাৎকার দেবার ঝামেলা পোহাতে অনিচ্ছুক আইনস্টাইনকে প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয়। যখন কয়েকটি বাক্যে আপেক্ষিকতাবাদ তাঁকে ব্যাখ্যা করতে বলা হল, তখন তিনি বললেন, "যদি আমার জবাবটাকে খুব গুরুত্ব না দিয়ে কিছুটা ঠাট্টার ভাবে নাও তাহলে আমি এইভাবে বলতে পারি। আগে ভাবা হতো যে, যদি সব বস্তু মহাবিশ্ব থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে কেবলমাত্র দেশ ও কাল থাকবে। আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে কিন্তু দেশ ও কাল ও বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে যাবে।"(১)

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল একথা সত্য কিনা যে দুনিয়াতে মাত্র বারো জন লোক আপেক্ষিকতা বোঝে। এরকম কিছু বলেছেন বলে আইনস্টাইন অস্বীকার করলেন। আসলে এই উক্তিটি করেছিলেন লজভ্যা, আপেক্ষিকতাবাদ তখন প্রথম রূপায়িত হচ্ছে, তখনই তিনি কি এটা বলেছিলেন। আইন-স্টাইন মনে করতেন তত্ত্বটির চর্চা করেছে এমন যে কোনো পদার্থবিদই সহজেই এটা বুঝতে পারে এবং বার্লিনে তাঁর সব ছাত্রই এটা বুঝতে পেরেছিল।

মিসেস আইনস্টাইনকেও প্রশ্ন করা হল: তিনি কি তত্ত্বটা বোঝেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন: "আরে না, যদিও সে আমাকে অনেকবার এটা বুঝিয়ে দিয়েছে, তবে আমার সুখশান্তির জন্যে এটা বোঝার কোনো দরকার নেই।"(২)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বক্তৃতা। সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এবং বহুদিন ধরে আপেক্ষিকতাবাদের এটাই ছিল আদর্শ ব্যাখ্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার সময় লর্ড হলডেনের আমন্ত্রণে তিনি লণ্ডনে যান এবং কিংস কলেজে বক্তৃতা করেন।

১ **Ph. Frank, op. cit., pp. 217-18.**
২ **Ibid., P. 218.**

হল-এর বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলী আইনস্টাইনকে একটু নির্লিপ্তভাবে অভ্যর্থনা জানান : তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হতে পারেন কিন্তু জার্মান তো বটে। এই প্রথম হাততালি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হল না। বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ভূমিকা, বিজ্ঞানীদের মধ্যে সংযোগ, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ইংরেজ জনসাধারণের ভূমিকা এবং আইজাক নিউটনের কথা তিনি বললেন। তাঁর ইংরেজ সহকর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি বললেন, তাঁদের অবদান ছাড়া তিনি বোধ হয় তাঁর তত্ত্বের সবচেয়ে মূল্যবান প্রমাণ পেতেন না। বক্তৃতায় বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটা কর্মসূচী উপস্থিত করা হয়েছিল। কিন্তু যাঁরা উপস্থিত ছিলেন শুধু তাঁরাই নয়, এমন কি সমগ্র ইংরেজ বৈজ্ঞানিক মহলও তাতে আন্দোলিত হল। আইনস্টাইনের চিন্তা জনগণের মধ্যে সাড়া তুলল এবং তাঁর ধারণার সামাজিক প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল।

লণ্ডনে আইনস্টাইনরা লর্ড হলডেনের অতিথি ছিলেন। হলডেনের প্রাসাদে তাঁদের যে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, সেটা তাঁদের বার্লিনের গোটা বাড়ির চাইতেও বড়। আইনস্টাইনের বিব্রত ভাবটা একেবারে ঘাবড়ে যাবার পর্যায়ে এসে গেল যখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর জন্যে একজন চাপরাশী নিযুক্ত হয়েছে। চোগাচাপকান-পরা এই চাপরাশীকে দেখে তিনি চুপিচুপি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন : "এলসা, তোমার কি মনে হয় আমরা যদি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি তাহলে তারা তা করতে দেবে?" জানালাতে ভারী পরদা-ঝোলানো বিরাট শোবার ঘরে তাঁরা ঘুমোলেন। পরের দিন অভ্যাসমতো খুব সকালে আইনস্টাইন উঠে পড়ে বৃথাই টানাটানি করে পর্দাগুলি খোলার চেষ্টা করলেন। তাঁর পেছনে তাঁর স্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন "এলবার্টেল, ঐ চাপরাশীটাকে এগুলি খোলার জন্যে ডাকো না কেন?" "আরে না", জবাব দিলেন তিনি,"আমার ওকে ভয় করে।" শেষ অবধি দুজনের চেষ্টায় পর্দাগুলি সরানো গেল এবং নিচে হল ঘরে গেলেন প্রাতরাশের জন্যে। সেইদিন সন্ধ্যা-বেলা বিখ্যাত অতিথির জন্যে একটি ডিনার পার্টি দেওয়া হয়েছিল। অতিথি-দের মধ্যে ছিলেন ক্যানটারবেরীর আর্চবিশপ। তিনি জানতে চাইছিলেন, আপেক্ষিকতার প্রভাব ধর্মের 'পরে পড়বে কি না এবং আইনস্টাইনকে সরাসরি সেটা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আশ্বস্ত হলেন যখন আইনস্টাইন সংক্ষেপে এবং একেবারে যথাযথ জবাব দিয়ে বললেন, "না, কিছুই না।"

১৯২১ সালের জুন মাসে তিনি বার্লিনে ফিরে এলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই যে সামাজিক ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তাতে ইন্ধন যোগালো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে তাঁর সংবর্ধনা। জার্মানিতে তখন প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা মাথা চাড়া দিচ্ছে।

১৯২২ সালের জুন মাসে জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভাল্টার রাথেনাউকে, যিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, খুন করা হয়। তাঁকে সমাধিস্থ করার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস বাতিল করে দেওয়া হল। একমাত্র হাইডেলবার্গে ফিলিপ লেনার্ড তাঁর রাজনৈতিক সমর্থকদের নিয়মিত লেকচারে যোগ দিতে আহ্বান করলেন। শ্রমিকদের একটা গ্রুপ লেনার্ডকে লেকচারের ঘর থেকে বের করে দিল। আইনস্টাইনের ও আপেক্ষিকতাবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণটা গণতন্ত্র, শান্তি ও প্রগতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর আক্রমণের অঙ্গীভূত হয়ে গেল। লেনার্ড বিকারগ্রস্ত রুগীর মতো জাতিবিদ্বেষ প্রকাশ করে (অর্থাৎ জার্মান জাতীয়তার বিরোধী বলে —অনুবাদক) আপেক্ষিকতাবাদের বিরুদ্ধে কয়েকটা আক্রমণ চালালেন। জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাস-সৃষ্টিকারী সংগঠনগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে ঘৃণ্য যুক্তিবাদী চিন্তার জয় দেখতে পেলেন। শ্রমিকরা ও অন্যান্য গণতন্ত্রকামী বুদ্ধিজীবীরা একে (অর্থাৎ আপেক্ষিকতাবাদকে—অনুবাদক) প্রতিক্রিয়া-বিরোধী শক্তি হিসাবে দেখলেন। ১৯১৯-২০ সালে জনগণ যেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুভব করেছিল, এবারে আইনস্টাইন ও আপেক্ষিকতাবাদকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক ঝড় উঠল, তাতে সেটা সমর্থিত হল।

আইনস্টাইনের সফরের পরে মতাদর্শগত প্রভেদটা আরও বৃদ্ধি পেল ও স্পষ্টতর হল। ১৯২২ সালের মার্চে আইনস্টাইন কলেজ দ্য ফ্রান্সের আমন্ত্রণে ফরাসি দেশে গেলেন, এই আমন্ত্রণটা এসেছিল পল লজভ্যাঁর কাছ থেকে। লজভ্যাঁ ও আরও একজন ফরাসি পদার্থবিদ চার্লস নরডমান, যিনি ফ্রান্সে আইনস্টাইনের ধারণাগুলি প্রচারের কাজে অনেক কিছু করেছিলেন, আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করলেন।

লজভ্যাঁ ও নরডমানকে জানানো হয়েছিল যে, জাতীয়তাবাদী ও রাজতন্ত্রীরা রেল স্টেশনে আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। এজন্যে তাঁরা আইনস্টাইনকে পাশের একটা পথ দিয়ে শহরে

নিয়ে যাওয়ার ঠিক করলেন। কিন্তু আসলে দেখা গেল স্টেশনের বাইরে যে জনতার ভিড় হয়েছিল, সেটা ছিল লজভাঁর ছেলের নেতৃত্বে ছাত্রদের একটা জমায়েত, যারা এসেছিল আইনস্টাইনকে স্বাগত জানাতে এবং কোনো বিরোধী মিছিল তারা করতে দিত না।

৩১শে মার্চ, শুক্রবার বিকাল ৫টাতে সীমিত সংখ্যক বিজ্ঞানী ও সামান্য কিছু ছাত্র কলেজ দ্য ফ্রান্স-এর সবচেয়ে বড় হল ঘরে আইনস্টাইনের ভাষণ শুনতে জমায়েত হয়েছিলেন। অনেকে অবাক হয়েছিলেন যে, 'সারা প্যারিস' কেন ভেঙ্গে পড়ে নি। কিন্তু লজভ্যাঁ বিশেষ করে বেছে বেছে সভার প্রবেশপত্র শুধু তাঁদেরই দিয়েছিলেন, যাঁদের ঐ বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

আইনস্টাইন তাঁর বক্তৃতায় আপেক্ষিকতার ধ্রুপদী সূত্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ-গতিবিদ্যার সূত্রের যে সংঘাত, তার কথা বললেন। বিদ্যুৎগতিবিদ্যা এই প্রশ্নটিকে সামনে এনেছিল : আপেক্ষিকতার সূত্র এবং এই ধারণা যে, কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সমতাযুক্ত সরল রেখাবদ্ধ গতি যে পদার্থগত প্রভাব বিস্তার করে সেটা কি আলোর ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? আলোর গতির যে কোনো হেরফের হয় না, সেটা যে সমান থাকে, তা থেকে তাহলে আলোক-প্রক্রিয়াগুলিকে যখন আমরা হিসাবের মধ্যে নিয়ে থাকি তখন তার গতির আপেক্ষিক চরিত্র বজায় থাকবে: আলোর গতিবেগ জাড্যের গতির সঙ্গে বদল হয় না এবং নিজস্ব কোনো অন্তর্নিহিত গতির প্রকাশ আমরা পাই না। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার এই মৌলিক সূত্রের বিষয়মুখী চরিত্রটা দেখিয়ে দিলেন। যেসব গণিতজ্ঞ ফরমুলা মুখস্থ করেছেন কিন্তু আপেক্ষিকতার মর্ম বুঝতে পারেন নি তাঁদের সম্বন্ধে বললেন: "তাঁদের ভুল এটাই যে তাঁরা কেবলমাত্র বাইরের আঙ্গিকগত সম্পর্কটাই দেখেন কিন্তু পদার্থগত বাস্তবতা যা গাণিতিক প্রতীকের সঙ্গে মিলে যায়, তাকে দেখার চেষ্টা করেন না।" পদার্থগত বাস্তবতা বলতে আইনস্টাইন বোঝাতে চেয়েছেন সেই সব প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণভিত্তিক যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত যা থেকে অনুমানমূলক ধারণাগুলিকে যাচাই করে দেখা সম্ভব। এটা যে নীতিগতভাবে সম্ভব, সেটা বাইরের বিষয়গত পদার্থতত্ত্বের বাস্তবতার অস্তিত্ব থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে— এই বাস্তবতাই মনোজাগতিক অনুভূতির কারণ। মনোজাগতিক অনুভূতির সঙ্গে অনুমানমূলক সৃষ্টির সংযোগই হল প্রথমোক্তটির বিষয়গত মূল্যের প্রমাণ।

দেশগত দূরত্ব এমন একটা ধারণা যার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের অবশ্যই সম্বন্ধ থাকতে হবে। কিন্তু একটা পদার্থগত বস্তু কত দূরে যেতে পারে তা থেকে এই সম্বন্ধ স্থির করা যায়। যেহেতু কোনো পদার্থগত বস্তু অনন্ত গতিবেগ নিয়ে চলতে পারে না, তাই মনের 'পরে ছাপগুলির সঙ্গে এর সম্বন্ধ বুঝতে হলে এমন একটা ধারণা আনতে হবে যাতে দেশগত দূরত্ব ও কালের ব্যবধানকে একসঙ্গে সংযুক্ত করা যায়। এই ধরনের ধারণার পদার্থগত অর্থ আছে, 'একসঙ্গে একই সময়ে' দেশগত দূরত্ব বাস্তব জগতে ঘটতে পারে না, তার বদলে দেখা যায় দেশ-কালগত বিচ্ছিন্নতা।

৩রা এপ্রিল, বিজ্ঞানীদের একটা ঘনিষ্ঠ মহলের আলোচনা বসল কলেজ স্থ্য ফ্রান্স-এর পদার্থবিজ্ঞানের হল ঘরে। আইনস্টাইন সেখানে দুটি আলাদা ঘড়িকে, যারা পারস্পরিকভাবে গতিশীল দুটি আলাদা কাঠামোর মধ্যে রয়েছে, একই সময়ে মেলানো অসম্ভব, সেই কথা বললেন। তাঁর প্রধান বিরোধী ছিলেন একজন খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ পল পেঁলেভ; তিনি আইনস্টাইনের প্রতিভার উল্লেখ করলেন অতি উৎসাহের সঙ্গে, কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের মৌল বক্তব্যকে আক্রমণ করলেন। তিনি এমন উদাহরণ দিলেন যা ঐ তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে যায়। তাঁর উদাহরণের মধ্যে ত্বরণবেগের কথা যেভাবে পরোক্ষ আকারে প্রকাশ পেয়েছিল—আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন যে, সেটা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে পড়ে না।

তিন দিন পরে, ৬ই এপ্রিল, আইনস্টাইন কান্ট-এর দর্শন সম্পর্কে তাঁর মতামতের ব্যাখ্যা দিলেন সোরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ফরাসি দার্শনিক সমিতির এক সভাতে। দার্শনিক আঁরি বার্গসেঁা-র সঙ্গে তাঁর আলোচনা জমে গেল। বার্গসেঁা একটা বিশেষ 'মনোগত' স্বজ্ঞালব্ধ কালের ধারণার কথা বললেন। যখন এমিল মেয়েরসন আইনস্টাইনকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাখ-এর দর্শন সম্পর্কে তাঁর মতামত কী, আইনস্টাইন তার জবাবে বললেন, মাখ একজন "অতি সাধারণ দার্শনিক।"(১)

ফরাসি অকাদেমিতে আইনস্টাইন বক্তৃতা করেন নি। তাঁর নাম অনেক 'অবিস্মরণীয়' ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ মুক্তি, শান্তি ও

১ **Bulletin de la Societe Francaise de philosophie. Seance du 6 Avril 1922, P. 92 ; E. Meyerson. La deduction relativiste. Paris, 1925. p. 62.**

সামাজিক প্রগতির সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর নাম অতিরিক্ত জড়িয়ে গিয়েছিল। অকাদেমির অন্যান্য সভ্য আপেক্ষিকতাবাদকে পুঁথিগত ধ্রুপদী বিজ্ঞানের বিরোধী বলে মনে করতেন। আইনস্টাইন যেমন বলেছিলেন, "আঠার বছর বয়স অবধি তারা যা শিক্ষা করেছে সেটাই অভিজ্ঞতা বলে মনে করে। পরে যা কিছু শুনেছে তা সবটাই জল্পনা ও তত্ত্ব।"(১)

প্রতিক্রিয়াশীল বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক মতামতের প্রতি যে-মানুষদের আনুগত্য থাকে (আর সাধারণত, এই দুই মনোভাব একই সঙ্গে মিলে যায়), তারা নানা রকমের আনুষ্ঠানিক অজুহাত খাড়া করে। কেউ কেউ বললেন আইনস্টাইন যেহেতু অকাদেমির সভ্য নন তাই তিনি সভ্যদের মধ্যে আসন গ্রহণ করতে পারেন না এবং তাহলে তাঁকে শ্রোতাদের মধ্যে বসতে হবে। তিরিশ জন সভ্য বলে বসলেন যে, আইনস্টাইন এলে তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন। এই সব ছোটোখাটো নোংরা ব্যাপার আইনস্টাইনের কানে পৌঁছল; তাঁর বন্ধুরা যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর অবস্থা ও যন্ত্রণার মধ্যে না পড়েন, তার জন্যে তিনি নিজেই অকাদেমির অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন।

ফিলিপ ফ্র্যাংক লিখেছেন, "আইনস্টাইন জার্মান ব'লে যারা তাঁর সংবর্ধনার বিরোধিতা করছিল, ঠিক তারাই আবার জার্মানিতে নাৎসীরা ক্ষমতা দখল করার পরে জার্মানির সঙ্গে 'সহযোগিতা'র সবচেয়ে বড় প্রবক্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ফরাসি 'দেশপ্রেমিক'রা-ই ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পরাজয় এবং ইয়োরোপীয় মহাদেশের উপর জার্মান প্রভুত্বের জন্যে দায়ী।"(২)

আইনস্টাইন জার্মানিতে ফিরেই আবার বাইরে গেলেন। জাপান থেকে বারবার আমন্ত্রণ আসতে লাগল, সেখানে তাঁর লেকচারের ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে প্রস্তুতি চলছিল। ১৯২২ সালের শরৎকালে আইনস্টাইন মার্সাই তে পৌঁছে একটা জাপানী জাহাজে পূর্বদিকে যাত্রা করলেন, ভূমধ্য-সাগর এবং ভারত মহাসাগর পার হয়ে, পথে তাঁরা কলম্বো, সিঙ্গাপুর এবং সাংহাইতে নামলেন। প্রত্যেক জায়গাতেই আইনস্টাইনের উপস্থিতিতে ব্যাপক সংখ্যায় লোক সাড়া দিল।

নভেম্বরের শেষে আইনস্টাইন কোবে পৌঁছলেন, সেখানেও বিরাট জনতার

১ Ph. Frank. op. cit., p. 238.
২ Ph. Frank, op. cit., 239.

ভিড় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। বক্তৃতা, সভা, অভ্যর্থনা ও এখানে-ওখানে বেড়ানো পরপর চলল, সব ব্যাপারটা বেশ খানিকটা মুস্কিলের ব্যাপার ছিল, কারণ তাঁর প্রতিটি কথাই তর্জমা করতে হচ্ছিল। তাঁর বক্তৃতায় শত শত লোক ধৈর্য সহকারে অপরিচিত জার্মান ভাষা শুনল এবং তারপর শুনল সেই জাপানী বিজ্ঞানীর কথা—যিনি সেটা তর্জমা করেছিলেন। তর্জমা দিয়ে প্রথম বক্তৃতায় সময় লাগল চার ঘণ্টা। যে লোকেরা তাঁর বক্তৃতা অতক্ষণ ধ'রে শুনেছিল তাদের সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতি জাগল, ফলে পরের বক্তৃতাটা তিনি দিলেন আড়াই ঘণ্টা ধরে। কিন্তু জাপানী চরিত্র তিনি বুঝতে পারেন নি। তাঁর জাপানী সঙ্গীরা তাঁকে বুঝিয়ে দিল যে, বক্তৃতা ছোট করে দেওয়াতে শ্রোতারা সেটাকে খানিকটা গুরুত্বহীন বলে মনে করেছে।

জাপানে থাকার সময়েই আইনস্টাইন খবর পেলেন যে, তিনি রুশ বিজ্ঞান অকাদেমির সভ্য মনোনীত হয়েছেন। জোফে, লাজারেভ ও স্টেক্লভ যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে অংশত বলা ছিল: "......পদার্থবিদ্যাতে গত পনের বছরে যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে সেটা প্রধানত তাঁর ভাবধারাগুলির জন্যেই।"

প্রতিটি শহরেই নতুন ধরনের অভ্যর্থনা হতে লাগল, সভা ও তাঁকে নানা-রকমের উপহার প্রদান এক ধরনের জটিল অনুষ্ঠানে পরিণত হল। অন্যান্য উপহারের মধ্যে তাঁকে চার খণ্ডের 'চা সম্পর্কে বিশ্বকোষ' দেওয়া হল, যাতে চা-পান অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

আইনস্টাইনের মনে জাপান প্রবল ছাপ ফেলল। সোলোভিনকে তিনি লিখলেন, "জাপান আশ্চর্য দেশ। অত্যন্ত মার্জিত রুচির লোক এরা, সব ব্যাপারে প্রচুর ঔৎসুক্য আছে, শিল্পবোধ বেশ সূক্ষ্ম এবং সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে রয়েছে বৌদ্ধিক কিছুটা ছেলেমানুষী ভাব। ছবির মতো একটা দেশে অতি মার্জিত রুচিসম্পন্ন লোক এরা।"(১)

জাপানী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটা সভায় আইনস্টাইন তাদের বললেন, তারা যেন মনে রাখে যে-জ্ঞান তারা স্কুলে 'অর্জন' করছে, সেটা পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া, এই জ্ঞানের সঙ্গে তাদের নিজেদের জ্ঞান যোগ করতে হবে এবং যা একদিন আবার আন্তরিকভাবে তাদের নিজের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে

১ Solovine, p. 45.

দিতে হবে, কারণ এইভাবে আমরা মরজগতের মানুষ পাকাপাকি যা তৈরি করি তার দ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারি। (১)

বেশ কয়েক সপ্তাহ থাকার পর অনেক লোকের শুভকামনা ও কিছু উপহার সামগ্রী নিয়ে আইনস্টাইন ও এলসা জাপান ছেড়ে প্যালেস্টাইন গেলেন। ব্রিটেনের হাই কমিশনার স্যার হারবার্ট সামুয়েল তাঁর নিজের বাড়িতে থাকার জন্যে তাঁদের আমন্ত্রণ করলেন এবং শহরে তাদের গাইডের মতো কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এখানেও আইনস্টাইনকে প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলি সব মেনে নিতে হল। কারণ হাই কমিশনার যখন বাড়ি ছেড়ে বেরোবেন তখন একটি তোপ দেগে অভ্যর্থনা জানাতে হবে এবং রাস্তা দিয়ে গেলে সশস্ত্র ঘোড়সওয়াররা সঙ্গে সঙ্গে যাবে। সব রকমের অভ্যর্থনার সভাতে, ডিনার ও লাঞ্চেও একটা আনুষ্ঠানিক রীতি মেনে চলতে হতো। এ সব কিছুই কিছুটা শ্লেষাত্মক কৌতুকের সঙ্গে আইনস্টাইন মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এলসা বড় বিরক্ত হতেন।

"আমি একজন সাধারণ গৃহকর্ত্রী মাত্র," এলসা তাঁর স্বামীর কাছে একদিন অনুযোগ করলেন, "এইসব বেয়াড়া জাঁকজমক আমি থোড়াই কেয়ার করি।"

"লক্ষ্মীটি, ধৈর্য ধরো", তাঁকে ঠাণ্ডা করার জন্যে উত্তর দিলেন আইনস্টাইন, "আমরা শীগগিরই বাড়ি যাচ্ছি।"

"তোমার পক্ষে ধৈর্য ধরা অনেক সোজা। বিখ্যাত লোক তুমি। আদব-কায়দার ব্যাপারে তোমার কোনো ভুলচুক হলে অথবা নিজের খেয়ালখুশি মতো চললে, লোকে তোমাকে দুষবে না। কিন্তু খবরের কাগজ সব সময়েই আমাকে নিয়ে পড়েছে। আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বলে তারা বলেছে যে ভুল-ক্রমে প্লেটে রাখা স্যালাডের বদলে আমি ফুলের সবুজ পাতাগুলি খেয়েছি।"(২) নানারকম অজুহাত দেখিয়ে এলসা অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দেওয়া এড়িয়ে যেতেন।

আইনস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তেল আভিভ ও অন্যান্য শহরে বক্তৃতা দিলেন। সর্বত্রই তিনি এক বিরাট সাড়াপ্রবণ শ্রোতৃবর্গ পেলেন, যাদের কাছে

১ H. G. Garbedian, op. cit., P. 218.

২ H.B. Freeman, The Story of Albert Einstein. Random House, New York, 1958, p. 128.

তাঁর বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতামত তিনি প্রকাশ করতে পারলেন।

১৯২৩ সালের মার্চে পালেস্টাইন থেকে ত'ারা গেলেন মার্স'াইতে, সেখান থেকে স্পেনের মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন তিনি এবং কয়েকটি শহরে গেলেন। স্পেনে অল্পদিন থেকে তাঁরা বার্লিনে ফিরে এলেন।

১৯২৩ সালের জুলাইয়ে সুইডেনে গিয়ে আইনস্টাইন নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করলেন। ১৯২২ সালের নভেম্বরে প্রাচ্য দেশে যাত্রার প্রাক্কালেই এটা ত'াকে দেওয়া হয়েছিল। স্ক্যানডিনেভিয়ান বিজ্ঞানীদের কাছে গোটেবর্গে তিনি বক্তৃতা দিলেন, সেখানে সুইডেনের রাজাও উপস্থিত ছিলেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে নোবেল প্রাইজটা আইনস্টাইনের প্রাপ্য কিন্তু সুইডিশ অকাদেমির য'ারা ব্যাপারটাকে দেখছিলেন, তাঁরা এ ব্যাপারে ঠিক সিদ্ধান্ত করতে পারছিলেন না; আপেক্ষিকতাবাদের অনেক শত্রু ছিল। সাধারণত নোবেল কমিটি প্রাইজ দেয় এমন ব্যাপারে যার আবিষ্কারের একটা প্রায়োগিক দিক আছে। আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে প্রাইজ দিলে যে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত দেখা দেবে, লেনার্ড ও ত'ার মতো লোকেদের তরফ থেকে যে-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে—তাকে তাঁরা ভয় করতেন। অতএব প্রাইজ দেবার জন্যে লিখিত বিবৃতিতে সাধারণভাবে বলা হল, "আলোক-বৈদ্যুতিক (photo-electric) নিয়মের আবিষ্কার ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ত'ার কাজের জন্যে আইনস্টাইনকে প্রাইজ দেওয়া হল।"(১)

লেনার্ড অবশ্য তৎক্ষণাৎ সুইডিশ অকাদেমিতে পত্র লিখে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

নোবেল প্রাইজের সঙ্গে অর্থেক যে প্রিমিয়াম দেওয়া হয় সেটা তিনি মিলেভাকে দিলেন আর বাকিটা দাতব্য কার্যে ব্যয় করলেন।

জার্মানিতে ফিরে আইনস্টাইন আগের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে বৈজ্ঞানিক সমস্যা সম্পর্কে জনবোধ্য বক্তৃতা করতেন, যেগুলিতে বহু জনসমাগম হতো। দাতব্য কাজের জন্যে গানবাজনার জলসাতেও তিনি নিজে যোগ দিতে আরম্ভ করলেন। একবার মধ্য জার্মানির একটা শহরের এইরকম এক জলসাতে

১ Ph. Frank. op. cit., p. 245.

যোগ দেবার জন্যে গেলেন। একজন তরুণ অনভিজ্ঞ লেখককে পাঠানো হয়েছে জলসার রিপোর্ট করার জন্যে।

"কে এই আইনস্টাইন যে আজ রাত্রের জলসাতে বেহালা বাজাচ্ছেন?"—লেখকটি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর পার্শ্ববর্তীনী মহিলাকে।

"হায় ভগবান, আপনি জানেন না? উনিই হলেন বিখ্যাত আইনস্টাইন।"

"আরে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইতো বটে," তাড়াতাড়ি লিখতে ব্যস্ত রিপোর্টারটি বললেন।

পরের দিনের কাগজে সবিস্তারে লেখা বার হল 'প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের' বাজনার বিবরণ দিয়ে, তাতে তাঁকে আখ্যায়িত করা হল সঙ্গীত জগতের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে—যিনি বেহালা বাজানোতে কারুর চেয়ে কম যান না।

হাবেরলাণ্ডস্ট্রাসের বাড়িতে হাসির ধুম পড়ে গেল এবং সকলের চেয়ে বেশি হাসলেন আইনস্টাইন। রিপোর্টের কাটিংটা কেটে রেখে দিলেন এবং সেটা সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়াতেন আর পরিচিতদের দেখিয়ে বলতেন:

"তোমরা মনে করো আমি একজন বৈজ্ঞানিক, বটে! আমি একজন বিখ্যাত বেহালা বাজিয়ে, সেটাই আমি।"(১)

সুইজারল্যাণ্ডের ডেভস শহরে অনেকবার গেলেন তিনি, সেখানে অসুস্থ ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিলেন। ১৯২৭ সালে এইরকম একবার যাবার সময়ে নিজেই রুগী হয়ে গেলেন। শেষের দিকে তিনি ভারী নৌকোতে দাঁড় বওয়া শুরু করেছিলেন, ফলে হৃৎপিণ্ডের স্ফীতি ঘটে। ডেভস-এর হোটেলে এক কুলিকে তিনি নিজের ব্যাগটা বইতে না দিয়ে সেটা নিজেই ধরে উপরে নিয়ে গেলেন। পরিশ্রমটা অতিরিক্ত হয়ে গেল এবং আইনস্টাইন হৃৎপিণ্ডের গোলমালে কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। এলসা ঠিক করলেন, যদি তাঁর স্বামীর কাজ চালিয়ে যেতে হয় তাহলে কাউকে না কাউকে তাঁর কাজে সাহায্য করা উচিত। হেলেন ডুকাসের নাম প্রস্তাবিত হল এবং এই ভদ্রমহিলা শেষদিন অবধি আইনস্টাইনের সেক্রেটারি হয়ে কাজ করেছেন।

১৯২৯ সাল। আইনস্টাইনের পঞ্চাশত্তম জন্মদিন তখন আসন্ন, দিনটা যত এগিয়ে আসতে লাগল, রিপোর্টাররা ততই আইনস্টাইনকে ঘিরে ধরল। জন্মদিনের কয়েকদিন আগে বার্লিনের কাছে একটা ছোট কুটিরে তিনি

১ H. B. Freeman, op. cit., pp. 124-25.

পালালেন। কেবলমাত্র তাঁর পরিবারবর্গ উৎসবে যোগ দিল। আইনস্টাইনের পরণে ছিল তাঁর সাধারণ বেশ, আরামদায়ক পুরানো ঝোলা পাৎলুন ও সোয়েটার। মিসেস আইনস্টাইন ও তাঁর মেয়েরা ছুটির ডিনার নিয়ে এল, তাতে ছিল আইনস্টাইনের প্রিয় মাসরুম্ (ব্যাঙের ছাতা), জেফিলত মাছ, সেদ্ধ করা সবজি, স্যালাড, ফল এবং কেক। কফি ও পানীয় বারণ ছিল কারণ আইনস্টাইন তখনও অসুখ থেকে সেরে ওঠেন নি, কিন্তু এলসা যখন তাঁকে ধূমপান করতে বারণ করলেন তখন তিনি বেঁকে বসলেন এবং মাঝে মাঝে দু'একবার পাইপে টান দিলেন। যতবারই এলসা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কটা পাইপ টানলে আজ?" সোজা তিনি জবাব দিলেন, "মাত্র একবার।"

বার্লিনের মিউনিসিপাল কাউন্সিল ঠিক করল যে, আইনস্টাইনের পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে একটা গ্রামের বাড়ি (বার্লিনের উপকণ্ঠে) দেবে। কিন্তু অফিসাররা ব্যাপারটাকে নিয়ে দারুণ গাফিলতি দেখাল। দু'দুবার তারা এমন জমি তাঁকে দেবার প্রস্তাব করল, যেটা মিউনিসিপালিটির দখলে নেই। শেষ পর্যন্ত তারা আইনস্টাইনকে বলল তিনি যেন নিজেই এক খণ্ড জমি বেছে নেন। এলসা কাপুথ গ্রামে এই রকমের এক খণ্ড জমি ঠিক করলেন, কাপুথ গ্রামটি বার্লিনের উপকণ্ঠ পটস্‌ডাম-এর কাছেই। চুক্তিপত্র মালিকদের সঙ্গে সই করা হয়ে গেল এবং একজন স্থপতি ও রাজমিস্ত্রি নিয়োগ করা হল। ইতিমধ্যে জমির প্লটটা কেনবার জন্যে মিউনিসিপাল কাউন্সিলের সামনে যে প্রস্তাব এসেছিল, তাতে মিউনিসিপালিটির জার্মান জাতীয়তাবাদী সভ্যরা বাধা দিল। ব্যাপারটা স্থগিত হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ক্রমশ বেশ একটা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে চলে গেল; শেষ পর্যন্ত আইনস্টাইনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবং তিনি এই দানটি গ্রহণ করতে অসম্মত হলেন। মিউনিসিপাল কাউন্সিলকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বললেন, "প্রিয় মিঃ মেয়র, মানুষের জীবন দীর্ঘস্থায়ী নয়, অথচ কর্তৃপক্ষ বড্ড ধীরে ধীরে কাজ করেন। কাজেই আমার মনে হয়, আপনাদের কাজের ধারার সঙ্গে তাল রেখে চলার মতো আমার জীবন দীর্ঘ নয়। আপনাদের সহৃদয় ইচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ জানাই। এখন কিন্তু আবার জন্মদিন অনেকদিন গত হয়েছে এবং আমি আপনাদের দান ফেরত দিচ্ছি।"(১)

১ Philipp Frank, op. cit., p. 269.

কিন্তু বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং আইনস্টাইনকে শেষ অবধি বাড়ি ও জমি দুইয়েরই দাম দিতে হল নিজের টাকা দিয়ে।(১)

এই প্রসঙ্গে মিসেস আইনস্টাইন ফিলিপ ফ্র্যাংক-এর কাছে মন্তব্য করেছেন, "এইভাবে না চাইলেও, আমরা নিজেদের জন্যে চমৎকার একটা বাড়ি পেয়েছি, জলের ধারেই বনভূমির কাছে। তবে আমাদের বেশির ভাগ সঞ্চিত অর্থ খরচ হয়ে গেছে। এখন আর আমাদের টাকা নেই, তবে জমি ও সম্পত্তি রয়েছে। এতে অবশ্য অনেক বেশি নিরাপত্তা বোধ করি।"(২)

কাপুথ নামের শান্ত গ্রামটি একটি ছোট পাহাড়ের উপরে, চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে বনভূমি। গ্রামের বাইরে আইনস্টাইনের বাড়ি লেক হ্যাভেল থেকে সাত মিনিটের পথ। নোঙর বাঁধা থাকে সেই লেকে আইনস্টাইনের ছোট

১ প্রসঙ্গত, ১৯৩০ সালে বার্লিনের উপকণ্ঠে আইনস্টাইনের এই কাপুথ গ্রামের বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের বিখ্যাত কথোপকথন সাহিত্যের একটি অপূর্ব উপাদান। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই সময়ের কিছু আগেই ১৯২৭ সালে ব্রাসেলস শহরে যখন 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগ' গড়ে ওঠে যাতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যোগ দেয় এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের সম্পাদক হিসেবে উক্ত লীগ-এর প্রেসিডিয়াম-এর সভ্য নিযুক্ত হন, তখন চীনের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মহীয়সী নেত্রী মাদাম সুন-ইয়াৎ-সেন-এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন উক্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগ-এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে নির্বাচিত হন। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ অবধি নিপীড়িত ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ ও জাতিগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনে আইনস্টাইনের সমর্থন ও অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

আরও বিশেষ করে আমরা স্মরণ করবো যে, ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ বিখ্যাত (বা কুখ্যাত) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাতে যখন জার্মানি থেকে সদ্য-প্রত্যাগত তরুণ কমিউনিস্ট ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী গ্রেপ্তার হন, তখন অনতিবিলম্বে তাঁর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পত্র লেখেন আইনস্টাইন। এর দু' বছর পরে, ইউরোপ থেকে গুপ্তভাবে এসেছিলেন এম্. এন রায়, তিনিও ভারতে পরে ১৯৩২ সাল নাগাদ গ্রেপ্তার হলে আইনস্টাইন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

২ Ibid., p. 270.

পাল-তোলা নৌকো 'টামলার'। ভারী শান্ত গ্রাম্য পরিবেশ, টাটকা বাতাসে ভর্তি।

পাসাডেনা-র কালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ১৯৩০ সালে আইনস্টাইনকে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানানো হল। তিনি আশা করেছিলেন যে, এবারে অন্তত নিজেকে নিছক বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখতে পারবেন। বিশ দশকের শেষের দিকে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে নতুন যা ঘটেছে, তা নিয়ে বলার অনেক কিছু ছিল।(১)

কিন্তু নিউ ইয়র্ক বন্দর থেকেই কিছু উলটো-পালটা ব্যাপার শুরু হয়ে গেল, অন্তত আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে সেটা ঘটল। জাহাজটা সবে বন্দরে পৌঁছেছে, এমন সময় শখানেক রিপোর্টার জাহাজে উঠে পড়ল। কিন্তু কিছু জানবার পূর্বেই একজন রিপোর্টারের সঙ্গে এক ঘণ্টা সাক্ষাৎকার হবে বলে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। অন্যরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করতে শুরু করল: "একটা বাক্যে আপেক্ষিকতাবাদ বোঝাতে পারেন?" "আপনার বেহালা কোথায়?" "শান্তির ক্ষেত্রে ধর্মের কি কোনো অবদান আছে?" ("এখনও নয়", জবাব দিলেন আইনস্টাইন)। "মানুষের ভবিষ্যৎ কী হবে বলে আপনি মনে করেন?" এই রকমের আরও অনেক কিছু। ফটোগ্রাফাররাও সময় নষ্ট করে নি এবং পরের দিন খবরের কাগজে দেখা গেল

১ প্রসঙ্গত, আমরা এই সূত্রে স্মরণ করতে পারি যে ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আইনস্টাইনকে দেড় পাতার পত্রে পদার্থবিজ্ঞানের মৌল কণার চরিত্রের একটা দিক সম্পর্কে যে-চিঠি লেখেন, ব্যাপারটার সবটাই গাণিতিক এবং পরিসংখ্যানগত, আইনস্টাইন তৎক্ষণাৎ সেটাকে সাদরে গ্রহণ করে তাঁর সম্পাদিত পদার্থবিজ্ঞানের পত্রিকা Annalen der Physik-এ ছাপিয়ে পরের প্রবন্ধে তাকে আরও প্রসারিত করেন।

তখনও অপেক্ষাকৃত অখ্যাত সত্যেন বসুকে দু'বছরের জন্যে বার্লিনে পাঠানো হয় এবং বিখ্যাত বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান গড়ে ওঠে। যে কণাগুলি বসু-পরিসংখ্যান মেনে চলে তাদের নাম দেওয়া হয় 'বোসন' কণা—যেমন অন্য আর এক ধরনের কণাকে ইতালির এনরিকো ফের্মি আবিষ্কার করাতে নাম দেওয়া হয় 'ফের্মিয়ান' কণা।

পরমাণু বিজ্ঞানের একেবারে মূলে রয়েছে এই বোসন এবং ফের্মিয়ান কণা।—অনুবাদক।

কিছুটা ম্লান-কুণ্ঠিত এক ভদ্রলোক, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কাঁচা-পাকা চুল, গায়ে একটা কালো ওভার কোট, যিনি স্পষ্টতই ক্যামেরাকে এড়াবার চেষ্টা করছেন। নিউ ইয়র্কে তাঁর পাঁচদিন থাকার সময়ে অজস্র বক্তৃতা, অভ্যর্থনা সাক্ষাৎকার আর শহর দেখা চলল।

কালিফোর্নিয়া যাবার প্রাক্কালে আইনস্টাইন হাডসন নদীর ধারে রিভারসাইড গির্জাতে গেলেন। সেই গির্জার প্রবেশ পথের দু'ধারে সকল যুগের সকল জাতির বিরাট পণ্ডিতদের স্ট্যাচুগুলি রয়েছে। ছয় শত স্ট্যাচুর মধ্যে মাত্র একজন জীবিত ব্যক্তির স্ট্যাচু ছিল—তিনি হলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। এই চিন্তা তাঁকে বেশ ভারাক্রান্ত করেছিল এবং নিজের খ্যাতি সম্পর্কে সাধারণত তাঁর কিছুটা শ্লেষাত্মক মনোভাব এবারে কাজ করে নি।

পাসাডেনাতেও নানা রকমের অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতাদি হল; তবে বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট, আলোচনা সভা (কলোকিয়াম) এবং ঘরোয়া মিটিংগুলি অনেক হওয়াতে সেটা পুষিয়ে গেল। এখানে অনিবার্য শহর দেখার ব্যাপারটাও নিউ ইয়র্কের মতো অতটা চাপ সৃষ্টি করে নি। অ্যারিজনাতে আইনস্টাইন আমেরিকার আদিম অধিবাসী, রেড ইণ্ডিয়ানদের গোষ্ঠী দেখতে গেলেন। তারা তাঁকে 'সর্দার মহান আপেক্ষিক' এই নাম দিয়ে তাদের গোষ্ঠীর সভ্য করে নিল এবং তাদের একপ্রস্থ পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার দিল।

মাউণ্ট উইলসন অবজারভেটারিতে আইনস্টাইনকে বিরাট টেলিস্কোপটি দেখানো হল। "এত বড় যন্ত্রের কী প্রয়োজন", মিসেস আইনস্টাইন জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাবিশ্বের চেহারা নির্ধারণ করতে", উত্তর দিলেন ডিরেক্টার, "এই কথা বলছো," পাল্টা জবাব দিলেন মিসেস আইনস্টাইন, "আমার স্বামী তো একটা পুরোনো খামের উলটো পিঠেই এটা করে থাকেন।"

পরের বছর পাসাডেনাতে ফিরে আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯৩১ সালের বসন্তকালে আইনস্টাইন আমেরিকা ছাড়লেন। অনেক স্মারক জিনিসপত্র সঙ্গে নিলেন তিনি, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের পোশাকটিও, হাওয়াই দ্বীপের ঝুড়ি এবং অ্যারিজনা থেকে এক টুকরো শিলীভূত কাঠ। গুয়ারনারি বেহালা তাঁকে দিতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি নিতে রাজি হন নি। "বেহালার একমাত্র সত্যিকারের ওস্তাদই এটা বাজাতে পারে,"—এটাই ছিল তাঁর মন্তব্য।

১৯৩১ সালের শেষদিকে আইনস্টাইন আবার পাসাডেনাতে গেলেন।

শীতকালটা তিনি পদার্থবিদদের সঙ্গে কাটালেন, ১৯৩২ সালে বার্লিনে ফিরে এলেন এবং শরৎকালে আবার পাসাডেনাতে গেলেন।

আইনস্টাইনের পাসাডেনাতে তৃতীয়বারের যাওয়াটা নিয়ে তাঁর আমেরিকার বন্ধুমহলে কিছুটা অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। এর আগে যতবার তিনি গেছেন তাঁর পাসপোর্ট ও ভিসা-সংক্রান্ত যা কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আমেরিকান দূতাবাস থেকে করা হয়েছে। এইবারে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন না এবং আইনস্টাইনের কাগজপত্র একজন কর্মচারীর কাছে এল, তিনি আইনস্টাইনকে ডেকে তাঁর আমেরিকা যাওয়ার কারণ এবং তাঁর রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে প্রশ্নাদি করতে আরম্ভ করলেন। আইনস্টাইন রুষ্ট হলেন। তাই যদি হয় তাহলে তিনি আদপেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন না এবং দূতাবাস ত্যাগ করলেন। বার্লিনের আমেরিকান কূটনৈতিক মহলে একটা আলোড়ন শুরু হল। সারারাত্রি ধরে বার্লিন ও ওয়াশিংটনের মধ্যে টেলিফোনে কথাবার্তা চলল। শেষ অবধি পরের দিন সকালে বিশেষ একজন দূতের মাধ্যমে আইনস্টাইনকে তাঁর পাসপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হল।

দূতাবাসের কর্মচারীদের এতটা জেদাজেদী খুব সম্ভব একটা চিঠির জন্যে, যেটার কপি দূতাবাসে পৌঁছেছিল। একটি আমেরিকান মহিলা সংগঠন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনস্টাইনের যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাদের অভিযোগ ছিল যে, তিনি একজন শান্তিকামী (প্যাসিফিস্ট) এবং কমিউনিজমে বিশ্বাস করেন। সারা ব্যাপারটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং আইনস্টাইন অনেকগুলি টেলিগ্রাম পেলেন যাতে মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারীর বিবেচনাহীন কাজকে এবং ঐ দেশ-প্রেমিকাদের চিঠিকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিতে বলা হয়েছিল। এলসাও তাঁকে ব্যাপারটা উপেক্ষা করতেই বলেছিলেন, তা না হলে হয়ত ঐ কর্মচারীর চাকরীটি খতম হয়ে যেত। শেষের এই ভাবনা মাথায় আসাতে আইনস্টাইন নরম হলেন এবং পরের দিন আমেরিকা যাত্রা করলেন। তবে আমেরিকার দেশপ্রেমিকাদের কাছে একটা চিঠি লেখার লোভ তিনি ছাড়তে পারলেন না।

"এ পর্যন্ত সুন্দরী মহিলাদের কাছ থেকে এত দৃঢ়তার সঙ্গে আমি প্রত্যাখ্যাত হই নি ; আর যদি বা সেটা হয়ে থাকি, একই সঙ্গে এত জনের কাছ থেকে তো নয়ই।

"কিন্তু তারা কি একেবারে ঠিক কথাই বলে নি, এই সদাজাগ্রত নারীরা? সত্যই তো তাদের দরোজা এমন একজন লোকের কাছে কেন খুলে দেওয়া হবে, যে পাকা ঝানু ধনিকদের ততটাই ক্ষুধা ও উৎসাহের সঙ্গে ভক্ষণ করে থাকে, যেভাবে অতীত যুগে ক্রেটা দ্বীপের মিনাটাররা (১) কচি-কচি গ্রীক তরুণীদের ধরে টপাটপ গিলে ফেলতো; আর তদুপরি এ সেই রকমের লোক যে-কিনা এতই নিচু প্রকৃতির যে সে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যে-যুদ্ধ হবেই সেটা করা ছাড়া আর সব রকমের যুদ্ধ বরবাদ করতে চায়। অতএব আপনারা আপনাদের বুদ্ধিমতী দেশপ্রেমিক নারীদের কথায় কান দিন এবং মনে রাখবেন যে, রোমের বিরাট রাজধানী, একবার তার বিশ্বস্ত রাজহংসীদের প্যাঁকপ্যাঁকানিতে রক্ষা পেয়েছিল।"(২)

১ এক ধরনের আধা-মানুষ, আধা-দানব, পৌরাণিক জীব।—অনুবাদক

২ Ideas and Opinions, p. 7.

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ

জার্মানিতে নাৎসীদের রাজত্ব

যখন জীবন রক্ষার সময় আসে, তখন আমাদের পালটা আঘাত করতে হয়।

আইনস্টাইন (১৯৩৩)

অষ্টাদশ শতাব্দীর বড়ো বড়ো যুক্তিবাদীরা প্রকৃতির বিষয়মুখী যুক্তি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেটা তাঁরা বস্তুর সর্বজনীন কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে প্রকৃতির ঘটনাবলীর যে নিশ্চয়তা (determinism) আছে, তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা আরও বেশি দূর এগিয়ে গিয়ে দাবি করেছিলেন যে, মানুষের ব্যবহারিক কাজকর্মকে চালাতে ন্যায় ও যুক্তির প্রয়োজন, কাজেই তার জন্যে যা করা হবে সেটা হবে ন্যায়সঙ্গত ও বিচারবুদ্ধি-সম্মত। তাঁরা অযৌক্তিকতার পুরো ব্যাপারটাকে, গোঁড়ামীর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, তাদের অসহিষ্ণুতা এবং তাদের ন্যায় ও যুক্তির বিরুদ্ধে পুড়িয়ে মারার অথবা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিয়েই যেন ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হতে পারে—এই পুরো পদ্ধতিটার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিলেন।

১৯৩০-এর দশকে অযুক্তিবাদের দানবটা পুরোপুরিভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এর লক্ষ্য ছিল যুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ। হিটলারের কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল, বিজ্ঞানের বিষয়মুখী ও যুক্তিসম্মত মানদণ্ডকে একেবারে বরবাদ করা। পরীক্ষা করে কোনো কিছু নির্ধারণ করা এবং সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মনের বা ভাবনার দিক থেকে নির্মাণ করার কাজ করলে বিজ্ঞানের চলবে না; তাকে সর্বাধিনায়কের ইচ্ছাকে এবং তিনি যা মানদণ্ড ঠিক করে দেবেন সেটাই একমাত্র কোনো কিছু ঠিক করার মাপকাঠি হিসেবে মেনে নিতে হবে। এই ধরনের একটা অপরিহার্য

মানদণ্ড ছিল কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণার পেছনে কী জাতিগত (racial) পটভূমি রয়েছে তা দেখা। কেবলমাত্র তাত্ত্বিক চিন্তার সবটা এই মানদণ্ডের পুরো চাহিদাটা মেটাতে পারত না। নাৎসী শিক্ষা মন্ত্রী বারনার্ড রুস্ট ঘোষণা করেছিলেন : "জাতীয় সমাজতন্ত্র (ন্যাশনাল সোস্যালিজম*) বিজ্ঞানের শত্রু নয়, শুধুমাত্র তত্ত্বের শত্রু।"(১)

আপেক্ষিকতার সুস্পষ্ট যুক্তিবাদিতা, যেটা পদার্থগত মহাবিশ্বের বিষয়মুখী বাস্তবতার 'পরে নির্ভর করে রয়েছে, নাৎসী (হিটলারের ন্যাশনাল সোস্যালিজমকে অনেক সময়ে ছোট কথায় নাৎসী বলা হতো—অনুবাদক) গোঁড়ামীর নিশ্চয়ই বিপক্ষে যায়।

আইনস্টাইন ও আপেক্ষিকতার বিরুদ্ধে লেনার্ড ও স্টারক-এর আক্রমণ যে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল তার জন্যে তাঁরা পালটা প্রতিশোধ নিতে দেরি করলেন না। ১৯৩৩ সালে লেনার্ড 'ফলকিস্ বেওবাচার' (Volkische Beobachter) পত্রিকাতে লিখলেন :

"প্রকৃতিকে অনুশীলনের ক্ষেত্রে ইহুদীচক্রের সবচেয়ে বিপদজনক প্রভাবের দৃষ্টান্ত হল হের আইনস্টাইনের মতবাদ, যাতে তিনি কিছু প্রাচীন জ্ঞান এবং কয়েকটি ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত মিলিয়ে গণিতের সাহায্যে একটা জোড়াতালি দেওয়া তত্ত্ব হাজির করেছেন। এই তত্ত্ব এখন ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে, প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত যে-কোনো ব্যাপারের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে। এমন কি যেসব বৈজ্ঞানিক অন্যত্র বেশ কাজের মতো কাজ করেছেন তাঁরাও আপেক্ষিকতাবাদকে জার্মানিতে একটা স্থান করে নিতে সাহায্য করছেন.—এই অপবাদ থেকে তাঁরা মুক্তি পাবেন না, কারণ তাঁরা দেখেন নি অথবা দেখতে চান নি যে, এই তত্ত্ব কতটা ভ্রান্ত, বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বহির্ভূত এবং এই ইহুদীকে তাঁরা ভাল জার্মান বলে মনে করেছেন।"(২)

দু'বছর পরে পদার্থবিদ্যার নতুন ইনস্টিটিউট-এর উদ্বোধন উপলক্ষে লেনার্ড বললেন :

* হিটলারী ফ্যাসিবাদ শ্রমিকশ্রেণীকে ধোঁকা দেবার জন্যে 'সমাজতন্ত্র' বা 'সোস্যালিজম' শব্দটি ব্যবহার করে, তার সঙ্গে আবার 'জাতীয়' বা 'ন্যাশনাল' বিশেষণটিও থাকে।

১ Ph. Frank, op. cit., p. 281.

২ Ph. Frank, op. cit., pp. 279-80.

"বিজ্ঞানে এশীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে এই ইনস্টিটিউট যেন একটা লড়াইয়ের নিশান হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের ফুরার (সর্বাধিনায়ক—অনুবাদক) রাজনীতি ও জাতীয় অর্থনীতি থেকে মার্কসবাদ বলে পরিচিত ঐ মনোভাবকে উচ্ছেদ করেছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আইনস্টাইনকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করাতে এটা এখনও চলে আসছে। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, একজন ইহুদীর অনুগামী হওয়াটা বৌদ্ধিক দিক থেকে একজন জার্মানের পক্ষে শোভা পায় না। প্রকৃতি-বিজ্ঞান, তাকে যথার্থ সেই নামে ডাকতে হলে, পুরোপুরি আর্যদের(১) থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং জার্মানদের আজ নিজেদের অজানার পথে পাড়ি দিতে হবে।"(২)

একটা তত্ত্বের জাতিগত ত্রুটি আছে কি, না, তার প্রমাণ খুঁজতে হবে সেই তত্ত্বের প্রবক্তার জাতিগত উৎপত্তির মধ্যে, তার 'বিমূর্ত চরিত্রের' মধ্যে : অর্থাৎ মনের 'পরে যে-ছাপ পড়ছে তা দিয়ে নয়, 'আর্য-পদার্থবিদ্যা' বলতে যা যা হওয়া উচিত বলে তারা মনে করত, তাই দিয়ে। তা সত্ত্বেও, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নাৎসীদের ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজটা করা হল কোনো ধোঁয়াটে বিবেচনার দ্বারা নয়, তারা বিশেষ করে বিচার করল বিজ্ঞানীদের পিতা বা পিতামহদের জাতিগত উৎপত্তি বা পটভূমি কী ছিল এবং তাঁরা তাঁদের অপেক্ষা জাতিগতভাবে নিম্ন স্তরের সহকর্মীদের সঙ্গে কতটা মিশতেন, তাই দিয়ে। যখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ছেঁটে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন দেখা দিল তখন আইনস্টাইন হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর ও গুপ্তচর বিভাগের পুলিশের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে, ১৯৩০ সাল থেকে আইনস্টাইন কালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির 'অতিথি'-অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের বসন্তকালে, হিনডেনবুর্গ যখন জার্মানির প্রেসিডেন্ট রূপে নির্বাচিত হলেন, আইনস্টাইন তখন বার্লিনে ফিরলেন। কাপুথের গ্রামের

১ Aryan বা আর্য বলতে হিটলারের অনুগামীরা যে জাতিদম্ভ ও আগ্রাসী মনোভাব প্রচার করত তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের আর্য-অভিযানের তত্ত্বকে এক করে দেখা ভুল হবে। আসলে হিটলার 'আর্য' শব্দটার বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছিল ইহুদী বিদ্বেষ এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী মনোভাবকে সদম্ভে প্রচার করার উদ্দেশ্যে।—অনুবাদক।

২ Ibid., p. 280.

বাড়িতে বন্ধুরা সাম্প্রতিক খবর নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন : ব্রুনিং পদত্যাগ করেছেন, প্যাপেন চান্‌সেলার নিযুক্ত হয়েছেন, সাইচলাইসার বেশ প্রাধান্য পেয়েছেন। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন যে, দেশের ধনকুবেররা হিটলারের ক্ষমতায় আসার ব্যবস্থা করছে। ১৯৩২ সালের শরৎকালে তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কালিফোর্নিয়া চলে গেলেন, যেখানে তাঁদের আর একটা শীতকাল কাটাবার কথা। কাপুথ ছেড়ে যখন যাচ্ছেন, স্ত্রীকে বললেন :

"আমাদের গ্রামের বাড়িটা এবার ছাড়বার আগে ভালো করে সব কিছু দেখে নাও।"

"কেন," তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"আর কখনও দেখতে পাবে না।"

হিটলার যখন ক্ষমতায় এল, আইনস্টাইন তখন কালিফোর্নিয়াতে। ১৯৩২-৩৩ সালের শীতকালে যখন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক ও পণ্ডিতকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আইনস্টাইন পাসাডেনা থেকে নিউ ইয়র্কে গেলেন এবং জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। রাষ্ট্রদূত আইনস্টাইনকে বলল জার্মানিতে ফিরতে তাঁর ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, সেখানে নতুন গভর্নমেন্ট সকলের প্রতিই সুবিচার করবে। তিনি নির্দোষ হলে তাঁর কিছুই হবে না। আইনস্টাইন কিন্তু বলেই দিলেন যে, যতদিন নাৎসীদের রাজত্ব জার্মানিতে চলবে, তিনি সেখানে ফিরবেন না। সরকারী কথাবার্তাটা শেষ হয়ে যাবার পরে রাষ্ট্রদূত তাঁকে আলাদা নিভৃতে বলল, "হের প্রফেসার, এবারে আমরা যখন সমানে-সমানে দুই মানুষের মধ্যে কথা বলছি, তখন এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে, আপনি ঠিক কাজই করছেন।"(১)

১৯৩৩ সালের বসন্তকালে আইনস্টাইন ইউরোপে ফিরে এলেন এবং বেলজিয়ামের সমুদ্রের ধারে, অসটেণ্ড থেকে খুব দূরে নয় (অর্থাৎ, ইংলণ্ডের উপকূলের ইংলিশ চ্যানেলের উলটো দিকে—অনুবাদক), ল্য কক্‌ সুর মের গ্রামে বাস করতে শুরু করলেন।

বেলজিয়ামের রাণী এলিজাবেথ এবং সমগ্র বেলজিয়াম-রাজপরিবারের আইনস্টাইনের তত্ত্বের সম্পর্কে ঔৎসুক্য ছিল এবং তার সৃষ্টিকর্তাকে তারা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত। অত কাছের জার্মান সীমান্তের ওপার থেকে

১ Ph. Frank, op. cit., pp. 281-282.

আইনস্টাইনের জীবনের উপর যাতে হামলা না হয় তার জন্যে বেলজিয়াম রাজপরিবার ও সরকার সবরকমের ব্যবস্থা করল। ঠিক হল যে, দিন-রাত্রি তাঁর জন্যে দেহরক্ষী থাকবে। ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকালে ফিলিপ ফ্র্যাংক অস্‌টেণ্ডের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ঠিক করলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। তিনি ল্য কক্‌ গেলেন এবং বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আইনস্টাইন কোথায় থাকেন তারা জানে কিনা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট আদেশ দিয়েছিলেন যে, আইনস্টাইনের বাড়ি কোথায় তা যেন তারা কাউকে না বলে এবং ফ্র্যাংকের খোঁজাখুঁজিতে দেহ-রক্ষীরা আরও সতর্ক হয়ে গেল। তিনি যখন শেষ অবধি মিসেস আইন-স্টাইনের দেখা পেলেন তখন দেখা গেল তিনি রীতিমতো ভীত ও সন্ত্রস্ত, কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল আইনস্টাইনকে খুন করার জন্যে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই ধরনের সতর্কতা যতই বিরক্তিকর হোক না কেন, তার দরকার ছিল। জার্মানি বেশ নিকটে এবং যেসব বিজ্ঞানীর তালিকা নাৎসী চরদের কাছে ছিল (প্রয়োজন মতো তাদের খুন করা হবে বলে) সেই তালিকাতে তাঁর নাম ছিল একেবারে প্রথম সারিতে; তবে তাঁর নিকটতম বন্ধুরা তাঁকে দেখাশোনা করার জন্যে যথাসাধ্য করেছিলেন।

ল্য কক্‌-এ সমুদ্রের তীরে ছোট্ট একটা বাড়িতে তাঁরা থাকতেন, সেখানে ছিলেন মিসেস আইনস্টাইন এবং তাঁর প্রথম পক্ষের কন্যা মারগো ও সেক্রেটারি হেলেন ডুকাস্‌। জার্মানি থেকে পালাবার আগে মারগো ফরাসি দূতাবাসের মারফত আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত কাগজপত্র এবং বইয়ের একটা বড় অংশকে বিদেশে সরাতে পেরেছিল।

অ্যান্‌তোনিয়া ভ্যাঁলেত্যাঁ ল্য কক্‌-এ ১৯৩৩ সালের বসন্তকালে গিয়ে-ছিলেন। তাঁর বইয়েতে তিনি লিখেছেন:

"সেবারে বসন্ত আসতে দেরি হচ্ছিল। ধূসর শীতের আকাশ মনকে বেশ দমিয়ে দেয়। রূপোর মতো বালির চরগুলি(১) দেখাচ্ছিল যেন হাওয়াতে

১ ইংলিশ চ্যানেলের দু'ধারে অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও খানিকটা বেলজিয়ামের উপকূলে সাদা খড়ির মতো ছোট পাহাড়ের স্তূপ আছে, যাকে রূপোর মতো দেখাচ্ছে।—অনুবাদক।

ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সীসের রংয়ের মতো কিছুটা কালো ধূসর সমুদ্র তীরে আছড়ে পড়ছে—ছোট্ট বাড়িটাতে পায়ের আওয়াজ, ডিসের ঝনঝনানি, টাইপরাইটারের খটখটে শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে।"

তাঁর স্বাভাবিক মেজাজেই তিনি আইনস্টাইনকে দেখতে পেলেন। নিজের বৈজ্ঞানিক চিন্তাতে বরাবরের মতো মগ্ন এবং তাঁর বিপক্ষদের তিনি পুরানো স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকমিশ্রিত করুণার সঙ্গে দেখছেন। "যখন তিনি হাসতেন, তখন মনে হতো যেন একটা বড় গাছ তার পাতাগুলিকে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে।" ভ্যাঁলেতাঁ এলসাকে জার্মানিতে প্রকাশিত একটা বড়ো ছবির এলবাম দেখালেন যাতে নাৎসী রাজত্বের বিপক্ষে যারা তাদের ছবিগুলি রয়েছে। প্রথম পাতাতেই রয়েছে আইনস্টাইনের ছবি, তলায় তাঁর কতগুলি 'অপরাধ'—তার একটা তালিকা শুরু হচ্ছে আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে। তালিকার শেষে একটি নোট রয়েছে: 'এখনও পর্যন্ত একে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো যায় নি।"(১)

যে-কোনো সময়েই যে-কোনো রকমের প্ররোচনা আসবে বলে এলসার সর্বদা ভয় ছিল। তিনি ফ্র্যাংককে বললেন, সম্প্রতি নাৎসীদের ঝটিকা-বাহিনীর একজন, যে নাকি এখন কাজ ছেড়ে দিয়েছে, এসে বেশ খানিকটা জরুরিভাবে দাবি করল যে, আইনস্টাইনের সঙ্গে তার দেখা করতেই হবে। সেই মানুষটার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, আইনস্টাইন নাকি নাৎসী রাজত্ব থেকে পলাতক হয়ে যারা বিদেশে আছে, তাদের কোনো সংগঠনের নেতা এবং সে মোটা টাকায় তাঁকে কিছু গুপ্ত দলিলপত্র বিক্রী করতে চায়।(২) নানা ধরনের অস্বস্তিকর চমকে-দেওয়া ব্যাপার ঘটতে পারে, যার মধ্যে আইনস্টাইনকে গুম করে দেওয়া বা খুন করাটাও নিশ্চয়ই নাৎসীদের প্ল্যানের মধ্যে ছিল বলেই ধরতে হবে।(৩)

ফ্র্যাংকের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সময় আইনস্টাইন বললেন যে, তাঁর বার্লিনের পরিবেশ ছেড়ে দিয়ে তিনি খানিকটা মানসিক মুক্তির স্বাদও পাচ্ছেন। মিসেস আইনস্টাইন অবশ্য এই ধরনের বক্তব্য ঠিক মানতেন না, তিনি বলতেন, বার্লিনে আইনস্টাইন অনেক ভাল সময় কাটিয়েছেন এবং

১ A. Vallentin, op. cit., pp. 178-79.
২ Ibid., p. 161.
৩ Ph. Frank, op. cit., p. 292.

সেখানকার বিশিষ্ট পদার্থবিদদের জমায়েতে তিনি বিশেষ সন্তোষ লাভ করতেন। "হ্যাঁ," বললেন আইনস্টাইন, "নিছক বিজ্ঞানের দিক থেকে বার্লিনের জীবনযাত্রা নিশ্চয়ই খুব ভালো ছিল। তবু সব সময়েই মনে হতো যেন কিছু আমাকে চেপে ধরছে এবং আমার সব সময়েই একটা আশংকা হত যে, শেষটা সুখের হবে না।"(১)

ইতিমধ্যে আইনস্টাইন প্রাশিয়ান অকাদেমি থেকে ইস্তফা দিলেন। তিনি জানতেন যে, নাৎসীরা তাঁকে শেষ অবধি বহিষ্কার করেই ছাড়বে। তাতে অনেক জার্মান বৈজ্ঞানিক, ম্যাকস্ প্ল্যাংক তার মধ্যে একজন, খুব অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়বেন। আইনস্টাইনের বহিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে নিশ্চয়ই তাঁদের দণ্ড পাবার অবস্থা হতে পারে। আর যদি তাঁরা বহিষ্কারটা মেনে নেন তাহলে সেটা তাঁদের অসম্মানজনক অবস্থায় এনে ফেলবে। তাঁর বন্ধুদের এই ধরনের পরীক্ষা থেকে বাঁচাবার জন্যে আইনস্টাইন অকাদেমিকে লিখে জানালেন যে, বর্তমান গভর্নমেন্টের অধীনে তাঁর পক্ষে প্রাশিয়ান রাষ্ট্রের সেবা করা আর সম্ভব হচ্ছে না, কাজেই তিনি পদত্যাগ করছেন।

গোড়াতে অকাদেমি বেশ খানিকটা ইতস্তত করছিল কী করা যায়। নের্নস্ট ঘোষণা করলেন, ভলতেয়ার, ড'এলেমবের এবং ম্যপেরিতুয়ি যে অকাদেমির সভ্য ছিলেন বলে গর্ব করা হয়, সেখানে কাউকে কেবলমাত্র জার্মান জাতীয় মনোভাবাপন্ন হলেই তবে সভ্য করা হবে, এরকম হতে পারে না। কিন্তু নাৎসীদের চাপে পড়ে শেষ অবধি, অকাদেমিকে ঘোষণা করতে হল যে, আইনস্টাইন জার্মান জাতিস্বার্থের বিরোধী কাজে লিপ্ত এবং বিদেশে জার্মানিতে অত্যাচার চলছে বলে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছেন। অকাদেমি আইনস্টাইনকে লিখল, "আপনার কাছ থেকে জার্মান জনসাধারণ সম্পর্কে একটা ভালো কথা নিশ্চয়ই বিদেশে ভালো ফল দিত।" আইনস্টাইন জবাব দিলেন যে, তাঁর কাছে 'জার্মান জনসাধারণের' জন্যে 'ভালো কথা' বলার (অর্থাৎ নাৎসী রাজত্বের আমলে—অনুবাদক) অর্থ দাঁড়াত যে, ন্যায়বিচার ও মানুষের মুক্তি সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সকল ধারণার জন্যে তিনি জীবনভোর লড়েছেন, তাকে পরিত্যাগ করা। এই ধরনের দলিল যদি

১ Ph. Frank, op. cit., p. 291.

প্রমাণ হিসাবে দেওয়া হয়, তাহলে জার্মান জনসাধারণ এতাবৎ যে নীতিগুলির জন্যে লড়াই করে সভ্য জগতে নিজেদের সম্মানের আসন সংগ্রহ করে নিয়েছে, সেগুলিকেই হেয় করা হবে। "এই ধরনের প্রমাণসূচক দলিল দিয়ে আজকের অবস্থাতে আমাকে অন্তত পরোক্ষভাবে নীতিগত মানদণ্ডের দিক থেকে অন্যায়কে সমর্থন করা এবং সকল রকমের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, যা বজায় আছে, তাকে নষ্ট করে দেওয়া হবে। এই কারণেই অকাদেমি থেকে পদত্যাগ করতে আমি বাধ্য হয়েছি এবং আপনার চিঠি থেকে আবার প্রমাণিত হল যে আমি ঠিক কাজই করেছি।"(১)

ম্যাকস প্ল্যাংক তাঁর শ্রেণীগত ঝোঁকের জন্যে জার্মানির ঘটনাবলীর আসল তাৎপর্য ধরতে পারেন নি। তিনি আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করতেন যে নতুন (নাৎসী) রাজত্বের বাড়াবাড়ি সাময়িক ঘটনাবলীর আনুষঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে। একজন অধ্যাপক যে বরাবরের মতো জার্মানি ত্যাগ করে চলে যাবে বলে ঠিক করেছিল, তাকে তিনি পরামর্শ দিলেন এক বছরের ছুটি নিয়ে বাইরে থাকতে। তিনি নিশ্চিত ভেবেছিলেন যে, বছর খানেকের মধ্যে নতুন গভর্নমেন্টের এই সকল অস্বস্তিকর যে চেহারা দেখা দিয়েছে, তা দূর হয়ে যাবে। একবার একটা ব্যাপারে তিনি হিটলারের কাছে নিজে ব্যক্তিগত-ভাবে দরবার করতে গেলেন, যাতে একজন 'অনার্য' বৈজ্ঞানিককে কাইজার ভিলহেল্‌ম ইন্‌সটিটিউটে নেওয়া হয়। প্ল্যাংক এটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে, ফুরার (সর্বাধিনায়ক, অর্থাৎ হিটলার—অনুবাদক) তাঁর স্বাভাবিক হিষ্টিরিয়াসুলভ ভঙ্গিতে রাইখ-এর (জার্মান রাষ্ট্রের) শত্রুদের 'ধ্বংস করার' কথা বলে ঘোষণা করলেন যে, এ কাজ থেকে তিনি কিছুতেই নিরস্ত হবেন না। প্ল্যাংকের ভাগ্যে জার্মান বিজ্ঞানের অবনতি দেখা ছিল অবধারিত এবং আইনস্টাইন নিজে খুশি ছিলেন যে, তিনি তাঁর বন্ধুর (অর্থাৎ প্ল্যাংকের) 'পরে যে বোঝা চেপেছিল, তাকে বাড়িয়ে দেন নি।

১৯৩৩ সালের মার্চে কাপুথ গ্রামে পুলিস গিয়ে হাজির হল এবং আইনস্টাইনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। (পুলিসের মতে, এই সম্পত্তি দিয়ে নাকি কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সাহায্য করা হবে)। এর অল্প পরেই আইনস্টাইনের সব লেখাগুলি, তার মধ্যে আপেক্ষিকতাও ছিল, প্রকাশ্যে

Ideas and Opinions p. 209.

জনসমক্ষে অন্যান্য আরও অনেক 'অনার্য ও কমিউনিস্ট সাহিত্যের' সঙ্গে বার্লিনের স্টেট অপেরা হাউসের সামনে পোড়ানো হয়।(১)

এসব সত্ত্বেও এমন কি নাৎসী রাজত্বেও কিছু অধ্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ শেখাতেন। তবে তাঁরা এটা করতেন আপেক্ষিকতার নাম না করে অথবা কোনো সময়েই তাঁরা আইনস্টাইনের নামোচ্চারণ করতেন না; তাঁরা মূল ধারণাতে না গিয়ে তার সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলিকে ছাত্রদের সামনে রাখতেন। কয়েকজন পদার্থবিদের পরিকল্পনা ছিল লেনার্ডকে ভাগাতে হবে এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানে তাঁর আপেক্ষিকতা-বিরোধী ধারণাগুলিকেও। তাঁরা মনে করেছিলেন, ব্রাতিস্লাভার, যেখানে লেনার্ডের পূর্বপুরুষ বাস করতেন, মহাফেজখানায় খোঁজাখুঁজি করলে হয়তো এমন তথ্য পাওয়া যাবে যাতে প্রমাণ করা যাবে যে লেনার্ডের নিজেরই ধমনীতে ইহুদী রক্ত বইছে।

নাৎসী বর্বরতার এই দিনটিকে আজকের দিনে জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের রাজধানী বার্লিনের ঐ স্টেট অপেরা হাউসের সামনে বিশেষ করে স্মরণ করা হয় এবং যে-ধরনের সাহিত্যগুলি পোড়ানো হয়েছিল, তার প্রচার করা হয়।—অনুবাদক।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ

প্রিন্সটন

ব্যাভারিয়ান চিত্রকর, জোসেফ শারল ১৯২৭ সালে আইনস্টাইনের একটা ছবি এঁকেছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি নাৎসীদের কারাগার থেকে পালিয়ে প্রিন্সটনে এসে হাজির হন। প্রিন্সটনে শারল একজন বুড়ো লোকের কাছে জানতে চান, কেন তিনি আইনস্টাইনকে এতটা শ্রদ্ধা করেন যদিও তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই জানেন না। বৃদ্ধ লোকটি জবাব দিয়েছিল : "আমি যখন আইনস্টাইনের কথা ভাবি তখন মনে হয় আমি আর একলা নই।"

নের্নস্ট ও অন্যান্য জার্মান বিজ্ঞানী যখন দ্বিতীয় ভিলহেলমকে (জার্মানির সম্রাট বা কাইজার—অনুবাদক) বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, বার্লিনে একটা বিশেষ রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে যাতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়, তখন তাঁদের সামনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যের প্রয়োজনে এই ধরনের ইনস্টিটিউটের দরকার ছিল এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের অবস্থা ও ঐতিহ্য অনুসারে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ এই ধরনের সংস্থা গড়ে উঠেছিল। জার্মানির কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিটিউট-এর টাকাকড়ি সম্পূর্ণ কাইজারের হাতেই ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিসার্চ ইনস্টিটিউটগুলির শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও বড় বড় শিল্পপতিরা সেগুলিকে যথেষ্ট টাকা দিয়ে সাহায্য

করত। ১৯২০-এর দশকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্যে মৌলিক গবেষণার কাজে আরও বেশি করে সাংগঠনিক স্বতন্ত্রতার দরকার ছিল। ১৯৩০ সালে লুই বামবারগার ও তাঁর বিধবা বোন মিসেস ফেলিকস্ ফুল্ড আব্রাহাম ফ্লেক্‌সনারের কাছে নতুন রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করার জন্যে পরামর্শ চান ; শেষোক্ত ব্যক্তিটি আমেরিকাতে শিক্ষার সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু করেছেন। ডঃ ফ্লেক্‌সনার মন্তব্য করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ ধরনের রিসার্চের কাজ চালাবার জন্যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সংখ্যায় ইনস্টিটিউট রয়েছে এবং তিনি নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পরামর্শ দেন। ফ্লেক্‌সনার নিজেই তাঁর প্রধান সংগঠক হন এবং তাঁর নাম দেওয়া হয় 'উন্নত গবেষণা প্রতিষ্ঠান'।

ফ্লেক্‌সনারের এই ধারণা ছিল যে, এমন কয়েকজন প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীকে নিযুক্ত করা হবে যাঁদের পড়াবার বা প্রশাসনিক কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না, তেমনি তাঁদের খাওয়া-পরার জন্যেও ভাবতে হবে না, কাজেই তাঁরা সবচেয়ে সাধারণ ও মৌলিক সমস্যা নিয়ে গবেষণায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে পারবেন। ইনস্টিটিউটের মধ্যমণি হবেন এই ধরনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা, যাঁদের ঘিরে মেধাবী তরুণ গবেষকরা থাকবে। নতুন ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করে চিঠি লিখতে গিয়ে যে-বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে যাতে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে তার 'পরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ফ্লেক্‌সনার যেমন একবার বলেছিলেন : "এটা এমন এক সুন্দর আশ্রয়স্থল হবে, সেখানে পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা যেন সারা দুনিয়াটাকে এবং তার ঘটনাবলীকে নিজেদের গবেষণার ক্ষেত্র বলে মনে করতে পারে, অথচ তাৎক্ষণিক কোনো কাজের ধান্ধায় তাদের কোনো সময় নষ্ট করতে হবে না।"(১)

কাজ শুরু করার জন্যে ফ্লেকসনার ঠিক করলেন যে, ইনস্টিটিউটের মূলকেন্দ্র গড়ে উঠবে এমন কয়েকজন পণ্ডিতকে নিয়ে যাঁরা গাণিতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করবে। ফাইন হল-এর একটা অংশে ইনস্টিটিউটকে স্থাপন করা হল, সেটি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গথিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত সুন্দর বাড়ির মধ্যে, যেখানে গণিত চর্চা হতো।

১ Ph. Frank, op. cit., p. 321.

১৯৪০ সালে ইনস্টিটিউট ফাইন হল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আরও একটু নিরালা জায়গায় সরে গেল—এটা প্রিন্সটন থেকে হাঁটা পথে আধ ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত।

১৯৩২ সালের জানুয়ারিতে পাসাডেনাতে বিখ্যাত পদার্থবিদ আর এ মিলিক্যান প্রস্তাব করেছিলেন যে, ফ্লেক্‌সনার যেন আইনস্টাইনের সঙ্গে উন্নত গবেষণার জন্যে ইনস্টিটিউটের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেন; আইনস্টাইন তখন কালিফোর্নিয়াতে ছিলেন। ফ্লেক্‌সনার বলেছেন যে, প্রথমে তিনি আইনস্টাইনের কাছে কথাটা পাড়তে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি যখন সেটা করলেন, তখন তিনি আইনস্টাইনের কোনো রকম আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত সাধারণ বন্ধুতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সামাজিক শিষ্টাচারে অভিভূত হয়ে গেলেন।

এর পরে আবার অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তাঁদের সাক্ষাৎ হয়, ফ্লেক্‌সনার তখন আইনস্টাইনকে কাজ করতে আহ্বান করে আমন্ত্রণ জানান। তখন কথাটা আবার তোলা হবে বলে ঠিক করা হয়।

এর মধ্যে আইনস্টাইনের পক্ষে বার্লিনে বাস করা যে আর সম্ভব হবে না, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন অবশ্য ফ্লেক্‌সনারকে আইনস্টাইন বলেছিলেন যে, বছরের খানিকটা সময় বার্লিনে কাটাবার আশা তিনি করেন। কিন্তু তার সম্ভাবনা খুবই সামান্য ছিল।

প্রিন্সটনে গিয়ে আইনস্টাইন উন্নত গবেষণা-কেন্দ্রের দায়িত্ব নেন। ইনস্টিটিউটে তাঁকে যে পদ দেওয়া হয়েছিল, একটা ব্যাপারে তাতে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, রিসার্চের কাজের জন্যে কাউকে টাকা দেওয়াটা ঠিক কাজ নয়; রিসার্চের কাজ হবে নিজের তাগিদে এবং তার জন্যে কোনো শিক্ষাগত কর্তব্য ধার্য হবে না। অন্যদিকে লেকচার, সেমিনার, পরীক্ষা নেবার জন্যে অধিবেশন, মিটিং এবং এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে যে-সময়টা পাওয়া যাবে, সেটাই তাঁর যথার্থ নিজস্ব সময়। সেদিক থেকে প্রাগ অথবা জুরিখ এর চাইতে বার্লিনে তাঁর এই ধরনের শিক্ষকতার কাজ অনেক হাল্কা ছিল। প্রিন্সটনে কার্যত কাজ কিছু ছিলই না। কয়েকজন তরুণ গবেষকের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা করতেন, যাদের ও তাঁর সকলেরই রিসার্চের ঔৎসুক্য অনেকখানি একই ব্যাপার নিয়ে ছিল। এই তরুণদের মধ্যে ছিলেন ভালটার মেয়ার, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ অবধি এক সঙ্গে তাঁরা কাজ করেছেন এবং বার্লিন থেকে তিনি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে

এসেছিলেন ; এ ছাড়াও ছিলেন নাথান রোসেন (১৯:৪-৩৫), পিটার বার্গমান (১৯৩৭-৩৮) এবং ভ্যালেন্তিন বার্গমান (১৯৩৮-৪৩) (এদের দুজনের নাম প্রায় একই হওয়াতে নানারকমের ঠাট্টাতামাসা ও ভুল বোঝাবুঝিও প্রিন্সটনে হতো), আর্নস্ট স্ট্রাউস (১৯৪৪-৪৭), জন কেমেনি (১৯৪ -৪৯), রবার্ট ক্রাইচনান (১৯৫০) এবং ব্রুরিয়া কাউফমান (১৯ ১-৫৫)। ১৯৩৬-৩৮ সালে আইনস্টাইনের সহকর্মী ছিলেন লিওপোল্ড ইনফেল্ড, যাঁর স্মৃতিকথা থেকে অনেক উদ্ধৃতি এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে ; আইনস্টাইন তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে প্রিন্সটনে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের, তাঁদের সঙ্গে কম মিশতেন।

নিছক বৈজ্ঞানিক কাজ করার জন্যে আইনস্টাইন মাইনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন ; এর শিকড় ছিল গভীরে, সম্ভবত তাঁর অবচেতন মনে। গবেষণা ছাড়া অন্য কোনো পেশা থেকে জীবিকা নির্বাহ করা উচিত বলে তাঁর ধারণা ছিল। স্পিনোজা অত বড় দার্শনিক(১) হয়েও যে হীরা খোদাইয়ের কাজ করতেন, এটা তাঁর মনে বেশ ছাপ ফেলেছিল। একেবারে অন্য ধরনের জীবিকা অর্জন করার যদি আর কোনো উপায়ই না থাকে, তাহলে অন্তত অধ্যাপনার কাজ করে মাইনে নিয়ে নিজের উপযুক্ত অবসর সময়ে গবেষণা করার কাজটা তিনি পছন্দ করতেন। স্বাধীনভাবে যাতে কাজ করতে পারেন তারই জন্যে এটাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কর্মকর্তারা বিজ্ঞানীদের স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে না, এটা বারবার বলা সত্ত্বেও স্পিনোজার অনুকরণে আজকের দিনের উপযোগী কোনো স্বাধীন পেশা অবলম্বন করে জীবিকা অর্জন করাটা আইনস্টাইনের পছন্দসই ছিল।

১ মহাবিশ্বের সুষমা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন প্রায়ই বলতেন যে, স্পিনোজা যেভাবে ঈশ্বরকে দেখেছেন, সেইভাবে তিনিও দেখেন। কাজেই স্পিনোজার বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে আইনস্টাইনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বেশ কিছুটা মিল ছিল।
বারুক অথবা বেনেডিকৎ স্পিনোজা (১৬৩২-৭৭)—হল্যাণ্ডের একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ; তাঁর কালেই স্পেনের সামন্ততান্ত্রিক অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে হল্যাণ্ডে দ্রুত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ছিল। বলাবাহুল্য, ইংলণ্ডের ১৬৪৮-এর পিউরিটান বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রভাবেও তখন হল্যাণ্ডে যথেষ্ট অনুরূপ চিন্তাধারা প্রসারিত হচ্ছিল।
সেদিক থেকে তাঁর কালপর্বের অন্যতম দুই বস্তুবাদী চিন্তাবিদ, দেকার্তে ও

তবে এটা করা সম্ভব ছিল না। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের সমস্যা আইনস্টাইনের মনকে এতটা অধিকার করে ছিল যে, তাঁর পুরো সময়টা এই কাজে দেবার যে সুযোগ তাঁর সামনে এল সেটা গ্রহণ না করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। প্রতিদিন সকালে ফাইন হল-এ (এবং ১৯৪০-এর পরে গবেষণা কেন্দ্রের নতুন বাড়িতে) গিয়ে তিনি উপস্থিত হতেন ; সেখানে সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের কাজ কতটা এগিয়েছে, তাদের কোথায় ঠেকছে এবং কোন্ পথে এগোতে হবে—এই সব তিনি আলোচনা করতেন ; তার পরে নিজের পড়াশুনার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে গিয়ে ঐ একই সমস্যা নিয়ে কাজ করতেন।

তবু কাজে অনেক রকমের বাধা পড়ত। সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহু রকমের লোক তাঁর কাছে নানা রকমের উপদেশ, সাহায্য অথবা কোনো ব্যাপারে প্রকাশ্য বিবৃতি দাবি করে তাঁকে অনেক সময় উত্ত্যক্ত করত। সাধারণত তারা যা চাইত তা পেত। তার ফল এই দাঁড়াত, যে-মানুষটা সবচেয়ে নিরিবিলি থাকা পছন্দ করতেন, তাঁকেই কিনা দুনিয়ার অন্য যে-কোনো বিজ্ঞানীর চাইতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হতো, যদিও এটা যে কেবলমাত্র বাইরের অবস্থার চাপে পড়েই হতো তা নয়, আইনস্টাইনের নিজস্ব বিশ্ববীক্ষার যে-চরিত্র ছিল, তার সঙ্গেও এর একটা মিল আছে।

জার্মানি থেকে যে বিজ্ঞানীরা পালিয়ে বা চলে আসতে বাধ্য হচ্ছিলেন

ফ্রান্সিস বেকনের সঙ্গে স্পিনোজার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেক মিল আছে। এঁদের মতোই স্পিনোজার মতে জ্ঞানের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রকৃতির 'পরে প্রভুত্ব বিস্তার করা এবং মানুষের উন্নতি সাধন করা। মানুষের ইন্দ্রিয়ানুগ স্বতঃপ্রতিভাত জ্ঞানের চাইতে যুক্তির ভিত্তিতে বৌদ্ধিক জ্ঞানকে তিনি অনেক উন্নততর বলে মনে করতেন। ইচ্ছার স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করতেন না, মুক্তি আসবে নিয়মানুবর্তী বাধ্যবাধকতার জ্ঞান ছাড়িয়ে।

অবশ্যই এ সবই বস্তুবাদী দর্শনের আওতায় পড়লেও স্পিনোজার বস্তুবাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধিবিদ্যক কারণ গতি যে বস্তুর অস্তিত্বের প্রকাশ, এটা তিনি বুঝতেন না।

আইনস্টাইন স্পিনোজার কাছে নানাভাবে ঋণী বলে ঘোষণা করেছেন ; তিনি যে স্পিনোজার জীবিকা অর্জনের পদ্ধতিকে এতটা তারিফ করতেন, এখানে সেই তথ্যটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।—অনুবাদক।

তাঁদের জন্যে কাজ খুঁজে বার করার ও তাঁদের সাহায্য করার জন্যে লণ্ডনের এক জনসভায় আইনস্টাইনকে বক্তৃতা করতে হয়। তিনি সেখানে বলেছিলেন যে, লাইটহাউস রক্ষকের কাজটিই বিজ্ঞানীদের পক্ষে চমৎকার। এটা মোটেই ঠাট্টা ছিল না। লাইটহাউসের নিরিবিলি স্থানটি আইনস্টাইন বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্যে উৎকৃষ্টতম জায়গা বলে মনে করতেন। বৈজ্ঞানিক কাজ থেকে ক্রমাগত ছোটোখাটো ব্যাপারে যে তাঁকে সময় দিতে হতো এ নিয়ে তিনি বন্ধুদের কাছে অনুযোগ করতেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বিজ্ঞানের গবেষণায় তাঁর পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা।

"তিনি আমাকে অনেকবার বলেছেন," লিখছেন লিওপোল্ড ইনফেল্ড, "রুজি-রোজগারের জন্যে হাতের কাজকে, যেমন কিনা জুতো তৈরি করা ও পদার্থবিদ্যাকে, নেহাৎ সখের বিষয় বলে দেখাকে তিনি মোটেই অপছন্দ করতেন না ; বরঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে রোজগার করার চাইতে এটা তাঁর কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হতো। এই মনোভাবের পেছনে গভীর কিছু লুকিয়ে রয়েছে। এটা হচ্ছে তাঁর 'ধর্মীয়' অনুভব, যেটার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বৈজ্ঞানিক কাজ, যা থেকে প্রথম যুগের খ্রিস্টিয় সাধুসন্তদের কথা মনে পড়ে। পদার্থবিদ্যা একটা মহান বিষয় এবং তার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। পদার্থবিদ্যা ভাঙ্গিয়ে টাকা রোজগার করাটা তিনি ঠিক কাজ বলে মনে করতেন না। বরঞ্চ নিজের জীবিকা অর্জনের জন্যে অন্য কিছু করো, যেমন কিনা লাইটহাউসের তত্ত্বাবধান করা বা জুতো তৈরির কাজ করা, আর পদার্থবিদ্যাকে একান্তে পরিপাটি করে রাখো। মনে হতে পারে এটা যেন ছেলেমানুষী, কিন্তু এটাই আইনস্টাইনের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়।"(১)

বিজ্ঞানকে আগ্রাসী ও ধ্বংসের কাজে লাগাবার জন্যে যে চেষ্টা আসন্ন হয়ে উঠছিল এবং বিজ্ঞানের পক্ষে সেটা যে ট্রাজিডি—এটা আইনস্টাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার অনেক আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। ১৯১৪-১৮-এর মহাযুদ্ধ, যাতে নতুন ধরনের বোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ, বিমান থেকে বোমা বর্ষণ, ট্যাংক এবং বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার হয়েছিল—এ সবই তাঁর কাছে ছিল তিক্ত অভিজ্ঞতা। পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের সাফল্যকে

১ L. Infeld, op. cit., p. 286.

যে আরও বেশি করে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগানো হবে—এটা তিনি আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। সকল রকমের সরকারী বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ছেদ করাটা তিনি পছন্দ করতেন, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপার বিবেচনা করা ছাড়াও বিজ্ঞানের প্রয়োগের জন্যে বিজ্ঞানীদের যে একটা দায়িত্ব আছে, সেটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই মনোভাবের জন্যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করতে হয়, যার ফলাফল হয়েছে একেবারে বিয়োগান্ত।

আইনস্টাইনের কাছে লাইটহাউস এমন একটা আদর্শ জায়গা যেখানে থাকতে পারলে অজস্র লোকের দেখা-সাক্ষাৎ ও অনুরোধের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়—এগুলি করার ফলে নিজের কাজ করার সময় খুব কমই থাকে। আইনস্টাইন যে জনসাধারণকে পছন্দ করতেন, সেটা মোটেই কোনো অস্পষ্ট ব্যাপার ছিল না। মানবজাতির ভাগ্যে কী আছে—এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে তিনি যে ব্যক্তিমানুষের সুখদুঃখ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, তা মোটেই নয়। এটা তাঁর কাছে একটা বোঝার মতো ছিল এবং দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে তাঁর মন বিচরণ করত এবং সব সময়েই কাজ করার প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর।

"যদিও শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি এবং পদার্থবিদ্যা নিয়েই আইনস্টাইন মাথা ঘামাতেন", ইনফেল্ড লিখছেন, "তবুও যেখানে তাঁর সাহায্য করার দরকার রয়েছে এবং যেটা কার্যকর হতে পারে বলে তিনি মনে করতেন, নিশ্চয়ই তা করতেন। তিনি হাজার হাজার সুপারিশপত্র দিয়েছেন। শত শত লোককে দিয়েছেন নানা রকমের উপদেশ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একজন ছিটগ্রস্ত লোকের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন, কারণ সেই লোকটির পরিবারবর্গ তাঁকে লিখে অনুরোধ করেছিল যে, একমাত্র আইনস্টাইনই নাকি তাকে সারাতে পারেন। লোকদের সঙ্গে তিনি দেখা করতেন, আর তিনি তাদের প্রতি ছিলেন দয়ালু, মুখে হাসিটুকু লেগে আছে, তাদের প্রতি বুঝদার এবং বেশ কথা বলছেন কিন্তু আসলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন কখন তার সঙ্গে কথা শেষ হবে এবং নিজের কাজে ফিরে যাবার নিভৃত অবকাশটুকু তিনি পাবেন।"(১)

১ L. Infeld, op. cit., p. 287.

বৈজ্ঞানিক সমস্যায় ভারাক্রান্ত মনের জন্যেই আইনস্টাইন শুধু নিভৃতে থাকতে চাইতেন না। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার উৎস ছিল আরও গভীরে। 'দুনিয়াকে যেভাবে আমি দেখি' (The World as I See It) নামক প্রবন্ধে এই মনোভাবের অন্তর্দৃষ্টিটা পাওয়া যায় :

"সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক দায়িত্ববোধের জন্যে আমার তীব্র মানসিক উপলব্ধির সঙ্গে অন্য মানুষজন এবং মানব গোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার ক্ষেত্রে আমার প্রয়োজনীয়তা বোধের ঘাটতির মধ্যে সংঘাত রয়েছে। সত্যিই আমি একজন 'নিঃসঙ্গ পথিক' এবং কখনও আমার নিজের দেশ, আমার বাড়ি, আমার বন্ধুদের প্রতি, এমন কি আমার নিজের, একেবারে নিকটতম পরিবারবর্গের প্রতি, সমগ্র হৃদয় দিয়ে কোনো টান আমি অনুভব করি নি। এই সব সম্পর্ক সত্ত্বেও দূরত্বের একটা বোধ এবং নিঃসঙ্গ থাকার প্রয়োজনীয়তা আমি কখনও হারাই নি—যতই দিন অতিবাহিত হয়েছে, এই মনোভাব আরও বেড়েছে। কোনো ক্ষোভ না নিয়েই একজন মানুষ তীব্রভাবে বুঝতে পারে, অন্য মানুষজনের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সাযুজ্য স্থাপন করার ক্ষমতা তার কতটুকু আছে। নিশ্চয়ই সেই ধরনের মানুষ তার সফলতা ও উদাসীনতা খানিকটা হারিয়ে ফেলে ; কিন্তু অন্যদিকে, তার কাছের মানুষদের মতামত, অভ্যাস ও বিচারশক্তি সম্পর্কে সে বহুলাংশে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে এবং ঐ ধরনের অনিশ্চিত ভিত্তির 'পরে তার মানসিক স্থৈর্য স্থাপন করার লোভকে এড়িয়ে চলে।"(১)

একজন নিঃসঙ্গ ভাবুক নিভৃতে শান্তি চাইছে, অথচ সে সামাজিক ন্যায়বিচারের দৃঢ় সমর্থক। একদিকে খোলা মন এবং জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে আন্তরিকভাবে অভিলাষী ও তাতে আনন্দিত এবং অন্যদিকে নিজের অন্তর্জগতে নিভৃতে একলা থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আইনস্টাইনের এই ভাবমূর্তি নিশ্চয়ই স্ববিরোধে আকীর্ণ। অথচ আবার এই স্ববিরোধের মধ্যে একটা গভীর সুষমাও রয়েছে।

প্রথমত, 'ভাবুক' বিশেষণটা আইনস্টাইনের 'পরে প্রয়োগ করতে হলে নিশ্চয়ই কিছুটা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে সাবধানে রাশ টেনে করতে হবে।

১ Ideas and Opinions, p. 9.

এমন কি 'নিছক বিবরণ' দেওয়ার যে-সমর্থক সেও কখনও ঘটনাবলীর অবস্থাকে পুরোপুরি বর্ণনা দিয়েই স্থির থাকতে পারে না। আর আইন-স্টাইন—যিনি 'কঠোরভাবে পরীক্ষা' করার সবচেয়ে বড় প্রবক্তা, বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির সক্রিয় কোনো দিককে সামনে আনার জন্যে প্রকৃতিকে যেন থার্ড ডিগ্রীর জেরা(১) করে থাকেন—সেই আইনস্টাইনকে নিশ্চয়ই প্রচলিত অর্থে কেবলমাত্র ভাবুক বলা যায় না। আপেক্ষিকতাকে আর কী বলা যেতে পারে যদি না সেটা দৃশ্যগত আপাত সত্য-ঘটনাকে বরবাদ করে দিয়ে এমন একটা প্রক্রিয়ার জগতের সামনে হাজির হওয়া বোঝায়, যেটার সত্যাসত্য কেবলমাত্র সক্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারাই যাচাই হতে পারে? আইনস্টাইনের কাছে কোনো কিছু জানতে হলে যেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে। তাতে মানব-জীবনকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা যায়। বিষয়মুখী যৌক্তিকতা ও সুষমা এবং জগৎ-প্রপঞ্চের নিয়মাবলী ও কার্যকারণ সম্পর্কগুলির অনুসন্ধান শেষ পর্যন্ত একটা যুক্তিসঙ্গত মানব-সমাজ দেখার আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়। জগতের সুষমার জন্যে আকুল অনুসন্ধান পরিণতি পায় "সামাজিক সুবিচার ও সামাজিক দায়দায়িত্বের জন্যে তীব্র আবেগে"র মধ্যে। এর জন্যে অবশ্য জন-গণের সঙ্গে রোজই যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন হয় না। ১৯২০-এর দশকেই আইনস্টাইনের মনে একলা থাকার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল। একথা তিনি নিজেই বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন এবং সেটা তাঁর বন্ধুদের কাছে বেশ পরিষ্কার ছিল—এ দুটো তাঁর নানা রকমের সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে একত্রে চলছিল।

এই ধরনের কাজকর্ম প্রিন্সটন-এর একেবারে ঘনিষ্ঠ পরিবেশে তাঁর নির্জনতায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করত না। বৃহত্তর জগতে আইনস্টাইনের সামাজিক স্বার্থ ও সহানুভূতির জন্যে বন্ধু ও শত্রু, দুই-ই ছিল; তাঁর প্রত্যক্ষ পরিমণ্ডলকে সেগুলি প্রভাবিত করতে পারত না। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বৈজ্ঞানিক সমাজ তখনও এমন স্তরে পৌঁছয় নি, যেখানে বৈজ্ঞানিক ও

পুলিসী জেরাতে আসামী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে গোপন কথা বার করার জন্যে যেমন মারধোর বা থার্ড ডিগ্রী প্রয়োগ করা হয়, সেই উপমা অনুসারে আইনস্টাইন প্রকৃতির রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করতে যেন 'থার্ড ডিগ্রী' প্রয়োগ করে থাকেন।—অনুবাদক।

সামাজিক স্বার্থের মিলন ঘটবে ; বৈজ্ঞানিকরা তখনও বিজ্ঞানের সামাজিক মূল্য কী তা বুঝতেন না। এই দিক থেকে নিছক পদার্থগত সমস্যার দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে বিশের ও তিরিশের দশকে আইনস্টাইন সেই ধরনের চিন্তা-পদ্ধতিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন যেটা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পদার্থবিদদের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

প্রিন্সটন-এ থাকার সমগ্র কালপর্ব জুড়ে আইনস্টাইন সেই সব প্রত্যক্ষ সমস্যা থেকে ক্রমশ সরে আসছিলেন—যেগুলি তখনকার বেশিরভাগ পদার্থ-বিদের মাথা ঘামানোর বিষয় হয়েছিল। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের ভিত্তি রচনার জন্যে তিনি তখন নানারকম জটিল 'গাণিতিক নির্মাণকার্য নিয়ে' মগ্ন ছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কতকগুলি অভিন্ন সাধারণ নিয়ম থেকে কণাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অস্তিত্বের হদিস মেলার কথা। আইনস্টাইন যেভাবে সমস্যাটার দিকে পৌঁছবার চেষ্টা করছিলেন, বেশিরভাগ পদার্থবিদই তার সঙ্গে একমত ছিলেন না ; এ ব্যাপারে নতুন যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কাছে তো কিছুই বোধগম্য হতো না এবং সবটা মিলিয়ে আইনস্টাইন নিজেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তা সত্ত্বেও প্রস্তাবিত সমাধান-সূত্রের জটিলতা যাই হোক না কেন, সমধর্মী পদার্থগত নিয়মগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যৌক্তিক ঐক্যবদ্ধ জগতের ধারণার সামগ্রিক ছকটি আকর্ষণীয়ই ছিল। যদিও এই ছক রূপায়িত করতে হলে, যেভাবে আইনস্টাইন দেখেছিলেন, এমন বিস্তৃত পদার্থগত ও গাণিতিক নির্মাণকার্য করতে হবে যার জটিলতা ও ব্যাপকতা সত্যিই যে কাউকে নিরস্ত করে দেবার মতো—তবুও শুধুমাত্র এই ধারণাটাই(১) বৈজ্ঞানিক পেশার বাইরের বহু মানুষের মনেও সাড়া জাগাতে পেরেছিল।

সমস্যার জটিলতা বা সূক্ষ্মতার মধ্যে না গিয়েও বহু মানুষ যে জাগতিক সুষমাকে মেনে নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে আইনস্টাইনের মনে একটা ধারণা নিশ্চিতভাবে জন্মাতে লাগল। অন্যদিকে, সমভাবাপন্ন মানুষদের ঘনিষ্ঠ মহলটা ক্রমশই ছোট হতে থাকল। সেদিক থেকে আইনস্টাইন তাঁর একাকীত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন।

১ অর্থাৎ একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের এই ধারণা যে, একই নিয়মাবলীর সূত্রে পরমাণুর কেন্দ্রকের আকর্ষণ, মহাকর্ষ ও তড়িৎ-চুম্বকীয় আকর্ষণকে গ্রথিত করতে হবে।—অনুবাদক।

প্রিন্সটনে তাঁদের পৌঁছবার অল্প দিনের মধ্যেই এলসাকে ইউরোপে দৌড়তে হল তাঁর বড় মেয়ে ইলসের কাছে, প্যারিসে সে তখন মৃত্যুশয্যায়। ইলসের মৃত্যুটা ছিল এক মর্মান্তিক আঘাত। এলসা প্রচণ্ডভাবে শোকাহত হলেন এবং হঠাৎ বুড়িয়ে গেলেন। মারগোকে নিয়ে প্রিন্সটনে ফিরে এলেন এলসা, সঙ্গে নিয়ে এলেন বড় মেয়ে ইলসের চিতাভস্ম।

ইতিমধ্যে ১১২ নং মারসার স্ট্রিটে তাঁদের বাড়ির কাজ শেষ হয়ে আসছিল। বাড়ির ভেতরটা কীভাবে সাজানো হবে এবং কী ধরনের আসবাবপত্র বসবে, এলসা সেটার তদারক করতেন, কিন্তু তাঁর কন্যার মৃত্যুর আঘাত থেকে তিনি কখনও সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারেন নি। তাঁর হৃৎপিণ্ড ও কিডনির গুরুতর গোলমাল দেখা দিল। নিউ ইয়র্ক থেকে অল্প কিছুদিন পরে যখন মারগো ফিরে এল, সে দেখল তার মা শয্যাগত এবং ভারী দুর্বল। "ও বেঁচে থাকার চেষ্টাটা প্রায় ত্যাগ করেছে" আইনস্টাইন তাঁর প্রথম পক্ষের কন্যাকে বললেন। আইনস্টাইনের নিজের চেহারা ম্লান ও হতাশাগ্রস্ত আর চোখ দুটি শোকাচ্ছন্ন।

এলসার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। অ্যান্‌তোনিয়া ভ্যালেতাঁকে একটা চিঠিতে এলসা লিখলেন: "আমি যে তাঁর কাছে এতোটা বেশি ছিলাম তা কখনও ভাবি নি, এখন সেটা জেনে আমি খুব সুখী।"(১)

ক্যানাডার মন্‌ট্রিয়াল শহরের কাছেই একটা লেকের ধারে চমৎকার একটা পুরানো বাড়ি গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবার জন্যে আইনস্টাইন ভাড়া করলেন। পাল-তোলা নৌকা চালানো শুরু হল। বাড়িটা ঘিরে যে চমৎকার পুরানো বনভূমি ছিল এলসা তাতে ভালো বোধ করলেন। তাঁর সমস্ত চিন্তাই স্বামীকে ঘিরে। "চমৎকার স্বাস্থ্য রয়েছে তাঁর", অ্যান্‌তোনিয়া ভ্যালেতাঁ-কে লিখলেন তিনি, "এবং সম্প্রতি কিছু গুরুতর সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন। তবে তিনি যা সব করেছেন তা বুঝতে ও কাজে লাগাতে বহু সময় কেটে যাবে। তিনি নিজে মনে করেন যে, এটাই তাঁর মহত্তম আর সর্বাপেক্ষা বড় সাফল্য।"(২)

এলসা আর সেরে ওঠেন নি, ১৯৩৬ সালে তিনি মারা যান।

১ A. Vallentin, op. cit., p. 190.

২ Ibid., p. 191.

আগের মতোই আইনস্টাইনের জীবনযাত্রা চলতে থাকে। পুরানো ইংলণ্ডকে মনে করিয়ে দেয় এই রকমের লাল ইঁটের তৈরি বাড়ি দিয়ে ঘেরা প্রিন্সটন শহরে আইনস্টাইন হেঁটে চলাফেরা করতেন। তাঁর পড়ার ঘরে তিনি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের গাণিতিক নির্মাণকার্য কী হবে তা নিয়ে অঙ্ক কষতেন। কিন্তু অনেকখানি বদলে গিয়েছিলেন তিনি। এলসার অভাব কিছুতেই পূরণ হবার নয়। একবার প্রিন্সটনে এলসা বলেছিলেন: "বছর যেমন যায় আমরাও বদলাই কারণ আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি—আমাদের পরিবেশ অথবা ইচ্ছা অথবা অন্যান্য প্রভাবের দ্বারা; কিন্তু ছোটবেলায় অ্যালবার্ট যা ছিল এখন বড় হয়েও সে তাই-ই রয়ে গেছে।" এবারে কিন্তু তিনিও বদলাচ্ছেন আর আগের চেয়ে বেশি করে নিজের নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করতে পারছেন।

১৯৪৯ সালের মার্চে তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে বহু অভিনন্দনসূচক চিঠির জবাবে আইনস্টাইন তাঁর বন্ধুদের কাছে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন তাতে এই নিঃসঙ্গতার বোধ আরও পরিস্ফুট। তলপেটের একটা গুরুতর অস্ত্রোপচার থেকে তিনি তখন সবে সেরে উঠেছেন। যেটা ভয় করা গিয়েছিল, সুখের বিষয় তা নয়। কিন্তু বড় দুর্বল তিনি। তাঁর এই অবস্থার জন্যে অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের, হাসিখুশি ভাবের এবং অন্য লোকের প্রতি নজরের অভাব ছিল না এবং আরও বিশেষ করে এর জন্যে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের মৌলিক সমস্যাগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার কোনো বাধা ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁর মনোভাবে একটা দুঃখের রেশ ছিল। ১৯৪৯-এর মার্চের শেষে সোলোভিনকে তিনি লিখছেন:

"তোমার প্রীতিপূর্ণ চিঠি আমাকে খুবই নাড়া দিয়েছে, যেটা অন্য অনেক চিঠির তুলনায়, যা এই দুঃখজনক অবস্থাতে আমি পেয়েছি, একেবারে আলাদা। তোমার বোধ হয় মনে হয় যে, আমি আমার ফেলে-আসা জীবনের কাজকে খুব নিশ্চিত সন্তোষের সঙ্গে দেখি। নিকট থেকে দেখলে কিন্তু ব্যাপারটা অত চমৎকার বলে মনে হবে না। এমন কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণাতে আমি উপনীত হতে পারি নি যে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে পারি। আমার পথটা যে ঠিক, সে সম্পর্কেও জোর করে আমি বলতে পারি না। সাম্প্রতিক কালের লোকেরা আমাকে বিদ্রোহী কালোপাহাড়ী মনোভাবের মানুষ বলে মনে করে এবং তাদের মতে আমি প্রতিক্রিয়াশীল,

যার দিন ফুরিয়ে গেছে। অবশ্যই এটা প্রচলিত প্রথা, তাছাড়া দূরদৃষ্টিরও অভাব দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আমি নিজে সন্তুষ্ট নই। সত্যি কথা বলতে গেলে যদি কারুর সমালোচকের মন থাকে এবং সে যদি নিজের প্রতি সৎ হয় এবং যদি পরিহাস ও বিনয় মিলে এমন একটা ভারসাম্য তৈরি করে যেটা বাইরের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তাহলে এ ছাড়া আর কিছু হতে পারত না।"(১)

এই চিঠি লেখার সময় আইনস্টাইনের কী ধরনের মেজাজ ছিল, সেটার হদিশ পাওয়া যায়। কিন্তু এতে তাঁর চরিত্রের গোটাকতক গুণও আমাদের চোখে পড়ে, যেগুলি তাঁর বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। যদিও একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের কাজের ফলাফল সম্পর্কে তাঁর অসন্তোষেরই প্রধানত প্রতিফলন এটা, তবু এই চিঠিতে সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিকের যে চরিত্র তাঁর ছিল, সেটার সম্পর্কেও আমরা একটা গভীর পরিচয় পাই। আগে যা বলা হয়েছে, একজন মহাত্মা যিনি পরম সত্যগুলি ঘোষণা করেন, এভাবে আইনস্টাইন কখনও নিজেকে জাহির করেন নি। মর্মবস্তুর দিক থেকে তাঁর বৈজ্ঞানিক ধারণা-গুলি যে-কোনো পরম ধারণার বিরোধী। আর এর সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে তাঁর ছিল সমালোচকের মন, সাধুতা, বিনয় ও পরিহাসপ্রিয়তা—এই সব গুণই যে-কোনো ধরনের গোঁড়ামীর বিপক্ষে যায়। এইজন্যেই আইনস্টাইনের তত্ত্বের প্রভাব ছিল এত বেশি যেটা রূপায়িত হয়েছিল এমন একটা সময়ে— যখন মূল্যবোধকে সাধারণভাবে নতুন করে পুনর্মূল্যায়ন করা হচ্ছিল।

পুনর্মূল্যায়ন করার অর্থ অবশ্য নিশ্চয়ই এই নয় যে, সকল মূল্যবোধকে বরবাদ করতে হবে এবং আপেক্ষিকতাকে বুঝতে হবে অনপেক্ষভাবে (যদি এই কথার মারপ্যাঁচে এক শব্দের দুই অর্থ হওয়াটা—pun-টা আমরা মেনে নি)। একটা সমালোচকের মন, যার সঙ্গে বিনয় ও হাস্যপরিহাস জড়িয়ে রয়েছে, সেটা কখনও সন্দেহবাদিতায় অথবা একেবারে সবকিছু অরাজক নেতিবাচকতায় পর্যবসিত হতে পারে না; যে-মন মতান্ধতার বিরুদ্ধে সে কখনও নেতিবাচকতাটাকেই গোঁড়ামীর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে না এবং সে চিরন্তন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে এই অর্থে নয় যে, তারা (অর্থাৎ, মূল্যবোধগুলি) অপরিবর্তনীয়, বরঞ্চ এই মূল্যবোধের ক্রমাগত রূপান্তর ঘটবে, এই অর্থেই করে থাকে।

---

১ Solovine, p. 95.

আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ছিল গভীরভাবে আশাবাদী, যদিও নিশ্চিতভাবেই তাতে বেশ খানিকটা দোদুল্যমানতা, সংশয় ও অনিশ্চয়তার ছাপ ছিল—এ সবই একটা প্রাণবন্ত অনুসন্ধিৎসু মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে-দেওয়া মন থেকে আলাদা করে রাখে। সবদিক থেকে দেখতে গেলে, আইনস্টাইন জগতের একটা দ্ব্যর্থহীন ও পরিষ্কার প্রতিচ্ছবির পক্ষপাতী ছিলেন। জগৎ-প্রপঞ্চের ধোঁয়াটে ও অন্ধকারময় চেহারা তাঁর চোখে পড়ত কিন্তু সেটা তাঁর পছন্দসই ছিল না। কোনো অস্পষ্ট কুজ্‌ঝটিকাময় চেহারা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারতেন না, মনে করতেন যে, সেটা যেন নিশ্চিত দ্ব্যর্থহীন এবং একেবারে ঠিক-ঠিক হয়। এখানেই আপেক্ষিকতাবাদ থেকে পাওয়া একেবারে সঠিক ছবিটির সঙ্গে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার অনিশ্চয়তার সংঘাত। এই সংঘাতের যেটা যুক্তিসিদ্ধ দিক, সেটা পরের দুটি পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে।

চল্লিশের দশকের শেষে এবং পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে আইনস্টাইনের মেজাজ তাঁর কয়েকজন বন্ধুর মৃত্যুতে বেসুরো হয়ে গিয়েছিল। প্রতিবার নতুন করে কেউ চলে গেলে, যে-সব বন্ধু ও সহকর্মী ১৯৩০-এর দশকে চলে গেছেন তাঁদের বিচ্ছেদ-বেদনা নতুন করে বাজত। প্রিন্সটনে আইনস্টাইন প্রায়ই তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী বিজ্ঞানী পলি এরেন্‌ফেস্ট-এর কথা ভাবতেন; তিনি ১৯৩৩ সালে আত্মহত্যা করেছিলেন। এরেন্‌ফেস্টের আত্মহত্যাকে আইনস্টাইন মনে করতেন বিজ্ঞানীর সামনে বিজ্ঞান যে প্রশ্ন রাখে এবং তার জবাব যা তিনি পেতে পারেন, তাদের মধ্যে সংঘাতেরই প্রকাশ। এরেন্‌ফেস্টের আত্ম-হত্যার আশু কারণ অবশ্য ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। গভীর যে কারণগুলি, সেটা ছিল এমন একটা অসন্তোষের মধ্যে, যেটা তাঁকে শেষ জীবনে তাড়না করেছিল।

মানুষ ও বিজ্ঞানীরূপে পলি এরেন্‌ফেস্টের বৈশিষ্ট্য আইনস্টাইন উপস্থিত করেছেন ১৯৩৪ সালে এক শোকবার্তা লিখে। আইনস্টাইন লিখছেন, "মহৎ গুণসম্পন্ন মানুষেরা অনেক সময় এই জীবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে যায়। সাধারণত এটা ঘটে যদি কেউ জীবনের নতুন ও বাইরের আরও কঠোর অবস্থা মেনে নিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হয়। অন্তরের কোনো অসহনীয় দ্বন্দ্বের জন্যে স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটাতে অস্বীকার করাটা, যা কিনা সুস্থচেতা মানুষের দিক থেকে আজও একটা বিরল ঘটনা, সবচেয়ে মহত্তম ও নৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

অন্তরের এই রকম শোচনীয় দ্বন্দ্বের কাছে আমাদের পলি এরেন্‌ফেস্ট নিজেকে আত্মবলি দিয়েছেন। যারা তাঁকে ভালো করে জানত, তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছে যে, এই নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিত্ব প্রধানত এমন একটা বিবেকের দ্বন্দ্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, যেটা কোনো-না-কোনোভাবে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, যিনি পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম করেছেন, তাঁর সামনে এসে হাজির হয়।"(১)

একজন পণ্ডিতের সামনে বিজ্ঞান যে সমস্যাগুলি এনে হাজির করে তার সমাধান না করতে পারার ফলে এই সংঘাতটা আসে। এরেন্‌ফেস্ট এই সমস্যাগুলি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝতেন। কিন্তু তাঁর নিজের গঠনমূলক কাজ করার ক্ষমতাকে তিনি তাঁর সমালোচনামূলক ক্ষমতা থেকে অনেক খাটো করে দেখতেন। "শেষ কয়েক বছরে" আইনস্টাইন লিখছেন, "তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের সামনে যে অদ্ভুত আবর্তসংকুল অবস্থা এসে হাজির হল, তাতে এই অবস্থাটার আরও অবনতি ঘটল। যেটা নিজের হৃদয় বা মন দিয়ে পুরোপুরি গ্রহণ করি না অথচ সেটাকেই শিখতে এবং সেইসব বিষয় শেখাতে হবে—সেটা সবসময়েই খুব মুস্কিলের ব্যাপার; সেটা আরও বেশি মুস্কিলের ব্যাপার হয় এমন একটা মনের কাছে, যার সততা সীমাহীন, যে মনের কাছে কোনো কিছু পরিষ্কার হওয়াটার অর্থ সব কিছু। তার সঙ্গে আরও একটা অসুবিধা যুক্ত হল, সেটা হচ্ছে নতুন চিন্তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এমন একজন মানুষকে, যার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। আমি জানি না, এই কথাগুলি যাঁরা পড়বেন তাঁদের মধ্যে কতজন এই ট্রাজিডিটা ঠিক ধরতে পারবেন। অথচ ঠিক এটাই প্রধানত তাঁকে জীবন থেকে পালিয়ে যাবার অবস্থায় এনে দিল।"(২)

আইনস্টাইনের কাছে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের জন্যে বিজ্ঞানের দাবি এবং তার জন্যে একটা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন জবাব না পাবার সম্ভাবনাটা যতটা না কষ্টের ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি বিষাদময় হয়ে দাঁড়িয়েছিল লোরেনজ-এর সঙ্গে সমস্যা ও সমাধানের মধ্যের প্রভেদটা এবং এটা আরও বেশি করে দাঁড়িয়েছিল এরেন্‌ফেস্টের সঙ্গে। আইনস্টাইন সহজাতভাবেই ছিলেন

১ Later Years, p. 236.

২ Ibid., p. 236.

আশাবাদী, আর জগৎপ্রপঞ্চকে জানা সম্ভব এবং তাঁর একটা সুষমা আছে, এই ধারণাতে সেই আশাবাদ আরও পূর্ণ হয়েছিল। সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা ছিল, যেগুলি ১৯১৬ সালে অতিক্রম করা সম্ভব হয় এবং তাঁর চেয়েও অনেক বেশি মুস্কিলের ও অলঙ্ঘনীয় বাধা দেখা দিয়েছিল একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বকে বিকশিত করতে—এটা তাঁর কাছে বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়েছিল ; কিন্তু তার পেছনে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস কাজ করছিল যে, বিজ্ঞানের পথ যতই দুরূহ ও আঁকাবাঁকা হোক না কেন, সেটা প্রকৃত বিশ্ব-সুষমার নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়।

বাইরের দিক থেকে আইনস্টাইনের চেহারাতে যতই অবিচলিত প্রশান্তি থাকুক না কেন, তিনিও নিজের মানসিক সত্তার তীব্র যন্ত্রণায় আলোড়িত হতেন। বাইরের লোকের কাছে সেটা কখনও ধরা পড়ত না, কিন্তু তাঁর আপাত-প্রশান্তির আড়ালে প্রায়শই এই যন্ত্রণার ঝড় বয়ে যেত। যে ধরনের স্বর্গীয় প্রশান্তি গ্যোয়েটের মধ্যে প্রতিভাত বলে মনে করা হয়, আইনস্টাইন ছিলেন তার ব্যতিক্রম।

একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব বিকশিত করতে গিয়ে যে ধরনের 'গাণিতিক যন্ত্রণার' অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল এবং পর্যবেক্ষণের দ্বারা তার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্যে তাঁর অক্ষমতার কথা যখন তিনি লিখেছেন, তখন সত্যিই যে প্রশ্নগুলির জবাব দিতেই হবে অথচ যেটা দিতে তিনি অক্ষম—এই বোধ তাঁকে প্রচণ্ড তাড়না করেছে। প্রিন্সটনে এরেন্‌ফেস্টের ট্র্যাজিডির কথা মনে পড়ার মতো অবস্থা প্রায়ই হতো। অ্যান্‌তোনিয়া ভ্যালেন্তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে এই প্রশ্নকে তিনি আবার তোলেন এবং নতুন যে প্রজন্ম এরেন্‌ফেস্টকে নাড়া দিয়েছিল তার সংঘাতের কথা বলেন।

ভ্যালেন্তাঁ বলেছেন, "তিনি যথেষ্ট আবেগের সঙ্গে কিন্তু খানিকটা খাপ-ছাড়া ভাবে কথা বলেন, কারণ এটা এমন একটা সংঘাতের কথা যার মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেও গেছেন। যখন তিনি সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছেন, সেই সুখের দিনগুলিতে যে নাটকের উৎপত্তি সেটা এখন ক্রমশই অধিকতরভাবে তীব্র হচ্ছিল। এটা এক পক্ষ প্রচণ্ড কল্পনাশক্তির পরিচয় দিচ্ছে আর অন্য পক্ষ পেছনে ফেলে-আসা ধারণাগুলিকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং সেটা যেন পরিত্যক্ত রাস্তার ধারে পাথরের চাঁইয়ের মতো পড়ে আছে। এটা এমন একজন মানুষের জীবন-নাট্য

যার বয়েস হওয়া সত্ত্বেও সে মানুষ নিজের পথ ধরেই চলে, যে-পথ ক্রমশই পরিত্যক্ত হচ্ছে এবং যাকে বন্ধু ও তরুণ সম্প্রদায় ভুল পথ বলে, কানাগলি বলে মনে করে।"(১)

এই মনোভাব থেকেই আইনস্টাইনের ভাবনা-চিন্তা চলে-যাওয়া বন্ধুদের কাছে ফিরে যেত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মারি কুরী-স্কলডোস্কা, যাঁর মৃত্যুর পরে আইনস্টাইন লিখেছিলেন: "একটা প্রজন্ম ও ইতিহাসের গতিধারার ক্ষেত্রে বড় মানুষদের নৈতিক গুণাবলীর তাৎপর্য নিছক বৌদ্ধিক কৃতিত্বের চাইতে অনেক বেশি। এমন কি শেষোক্তরাও (অর্থাৎ বৌদ্ধিক কৃতিত্ব—অনুবাদক) সাধারণভাবে যতটা মর্যাদা পান, তার চাইতে তাঁদের চারিত্রিক মহত্ত্বের উপর তাঁরা বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল।"(২)

চলে-যাওয়া বন্ধুদের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ এবং তাঁদের সম্পর্কে আবেগময় নাটকীয় ভাবনাটা কেবলমাত্র মেনে-নেওয়া দুঃখের প্রশান্ত নিস্তরঙ্গতা নয়। আবেগময় এই নাটকীয় ভাবনাগুলি তাঁর মহান নৈতিক সততার, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠার এবং জনগণের প্রতি দরদের পরিচায়ক—যে গুণগুলি বিজ্ঞানের ও মানব সমাজের ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করে।

"শ্রীমতী কুরীর সঙ্গে কাজে যুক্ত হবার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল", আইনস্টাইন লিখেছেন, "আর সেটা হচ্ছে কুড়ি বছর ধরে একটানা গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ক্রমশই বেশি করে আমি তাঁর মানবিক সৌন্দর্যের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলাম। তাঁর কাজ করার ক্ষমতা, তাঁর ইচ্ছাশক্তি ছিল একেবারে খাঁটি, নিজের প্রতি ছিল তাঁর বৈরাগ্য, তাঁর ছিল বস্তুনিষ্ঠতা আর নিষ্কলুষ বিচারপ্রবণতা—এই সব কিছু এমন ধরনের গুণাবলী যা একজন মানুষের মধ্যে একসঙ্গে পাওয়া দুর্লভ। প্রতি মুহূর্তে তিনি সমাজের সেবক বলে মনে করতেন আর ছিল তাঁর অগাধ বিনয়—কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোনো আত্মসন্তুষ্টির ভাব ছিল না। কঠোরতা ও অবিচার থেকে সব সময়ে পীড়িত মনোভাব তাঁর ছিল। এটাই তাঁর বাইরের চেহারাটাকে অতটা রুক্ষ করে তুলেছিল, যারা তাঁর খুব নিকটের লোক ছিল না তারা সহজেই এটাকে ভুল

১ A. Vallentin, op. cit., p. 200.

২ Ideas and Opinions, pp. 76-77.

বুঝত—এ এমন একটা রুক্ষতা যাতে কোনো শিল্পীর তুলির অাঁচড় দিয়ে একটু কমনীয়তা আনা যায় না।"(১)

১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে পল লজভাঁ মারা গেলেন এবং উচ্চ নৈতিক নিষ্ঠার প্রতীকরূপে যাঁরা শহীদের পর্যায়ভুক্ত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আরও একটি নাম যুক্ত হল। "তিনি ছিলেন আমার একজন নিকটতম বন্ধু; নিজে একজন বড়ো গোছের সাধুসন্তের মতো লোক এবং বিরাট প্রতিভার অধিকারী", সোলোভিনকে একটা চিঠিতে আইনস্টাইন লিখেছিলেন।(২)

বিজ্ঞানের সেবকরূপে তাঁর যেসব বন্ধু ও সহকর্মী মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে আইনস্টাইনের চিন্তা মাঝে মাঝে সরে যেত এলসার কাছে —তাঁকে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারতেন না।

এই বছরের শেষের দিকে একমাত্র বোন মাজার মৃত্যু দেখাটাও আইনস্টাইনের ভাগ্যে ছিল; মিউনিকে তোলা একটি পুরানো ফোটোতে দেখা যায়, এই ছোট মেয়েটি ছিল তাঁর ভায়ের মতো অবিকল দেখতে।

১৯৩৯ সালে মাজা ও তার স্বামী, আরাও-এর ক্যানটনের স্কুলের মাষ্টারমশাই ভিনটেলারের ছেলে, ইতালির ফ্লোরেন্স থেকে প্রিন্সটনে এল। তারা ফ্যাসিস্ত রাজত্বের আবহাওয়া আর সহ্য করতে পারছিল না। মাজার স্বামী কিছুদিনের জন্যে সুইজারল্যাণ্ডে গেল এবং মাজা এল ভায়ের কাছে।

প্রিন্সটনে বহু লোক ভাইবোনের সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল। "বোনের কথা বলার ভঙ্গি ও গলার স্বর," ফ্র্যাংক লিখছেন, "আর একই সঙ্গে যে-কোনো বক্তব্যকে কিছুটা ছেলেমানুষী করে বলা, সংশয়ের সঙ্গে বক্তব্য রাখা—এ সবই তার ভায়ের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে আশ্চর্যজনক ভাবে মিলে যেত।"

১৯৪৭ সালে আইনস্টাইন সোলোভিনকে লিখলেন: "মনের দিক থেকে দেখতে গেলে আমার বোন বেশ ভালোই বোধ করছে কিন্তু সে এমন অবস্থায় গিয়ে পোঁছচ্ছে যেখান থেকে আর ফেরবার পথ নেই। তার সমসাময়িক বেশির ভাগ লোকের চাইতে সে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি ঢালু পাহাড়ের পথ বেয়ে নেমে যাচ্ছে।"(৩)

১ Ibid., p. 77.
২ Solovine, p. 83.
৩ Solovine, p. 85.

পরের চিঠিগুলিতে আইনস্টাইন মাজার স্বাস্থ্যের অবনতির কথা বলছেন। তার বিছানার পাশে বসে আইনস্টাইন তাকে বহু সময় প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্য ও অন্যান্য বই জোরে জোরে পড়ে শোনাতেন। ১৯৫১ সালের গ্রীষ্মকালে মাজা মারা যায়। আইনস্টাইনের একেবারে নিকটতম পরিবারের মধ্যে ১১২নং মারসার স্ট্রিটের দোতলা বাড়িতে তখন রইলেন তাঁর প্রথম পক্ষের মেয়ে মারগো ও তাঁর সেক্রেটারি হেলেন ডুকাস; বাড়িটি উন্নত গবেষণা কেন্দ্রের কাছেই।

এই বাড়ির অনেকগুলি ছবি দুনিয়ার লোকের কাছে বাড়িটাকে বিশেষ পরিচিত করে তুলেছে—তা না হলে প্রিন্সটনের অন্যান্য অধ্যাপকের বাড়ি থেকে এটাকে বিশেষ আলাদা করা যেত না।

দরজাতে যাবার পথটি ছেঁটে-দেওয়া ঝোপগুলির একটা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে গেছে। ভেতরে একটি কাঠের সিঁড়ি দোতলাতে উঠে গেছে যার দেওয়ালে শুকনো খড় লাগানো রয়েছে।

আইনস্টাইনের পড়বার ঘর থেকে চমৎকার একটা পুরানো গাছের বাগান দেখতে পাওয়া যায়। দরজার উলটো দিকে প্রায় পুরো দেওয়ালটা জুড়ে রয়েছে একটি জানলা। দেওয়ালের বাঁ দিকে এবং পেছনের দেওয়াল ভর্তি বইয়ের তাক। জানলার বাঁ দিকে একটা ছোট জায়গা জুড়ে গান্ধির ছবি রয়েছে।(১) ঢোকবার পথের ডানদিকে একটি দরজা চলে গেছে এক ফালি খোলা ছাদে, অন্যটা আইনস্টাইনের শোবার ঘরে। এই দেওয়ালে ঝুলছে জোসেফ সার্ল-এর অাঁকা কয়েকটি চমৎকার ছবি এবং ফ্যারাডে ও ম্যাকস্-ওয়েলের আলেখ্য।

জানলার সামনে রয়েছে একটা বড় ডেস্ক আর তার পাশে একটি ছোট টেবিলে কয়েকটি পাইপ ও অস্ট্রেলিয়ার এক ধরনের বুমেরাং।(২) ঢোকবার পথের পাশেই রয়েছে একটি গোল টেবিল ও একটি আরামকেদারা যাতে বসে

১ স্মরণ করা যেতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধির শহীদত্ব বরণের পরে আইনস্টাইনের বিখ্যাত বিবৃতি: ভবিষ্যতের পুরুষ হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে, আমাদের মধ্যে এই রকমের একজন মানুষ জন্মেছিল।—অনুবাদক।

২ পুরাণে বর্ণিত সুদর্শন চক্রের মতো, যাকে ছুঁড়ে দিলে আবার হাতে ফিরে আসে।—অনুবাদক।

আইনস্টাইন হাঁটুর উপরে কাগজ রেখে লিখতে পছন্দ করতেন, আর লেখা পাতাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

রোজ সকালে বাড়ি থেকে আইনস্টাইন উন্নত গবেষণা কেন্দ্রে (Institute of Advanced Studies) যাবেন। মারসার স্ট্রিট ধরে খানিকটা গিয়ে তাঁর চলার পথ চলে যাবে ছায়া-ঘেরা গলিতে, যেটা তাঁকে সুন্দর প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িতে নিয়ে যাবে; সেখানে রয়েছে বাদাম গাছ, সাধারণ ধরনের কয়েক রকম গাছ, ম্যাপল(১) ও লিনডেন গাছ। সেখানে আরও অনেক ফলের গাছ রয়েছে, বিশেষ করে আপেলের গাছ এবং শরৎকালে গলিপথটি গাছ থেকে ঝরে-পড়া আপেলে ঢেকে থাকে। কয়েকটি গলিপথ চলে গেছে সুড়ঙ্গের আকারে—যেটা তৈরি করেছে পথের দুধারের গাছ এবং লিনডেন গাছগুলি উপর দিকে বীথি রচনা করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনস্টাইন সম্পর্কে মনোভাব বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন রকমের ছিল। প্রতিক্রিয়াশীলরা তাঁকে ডাকতো 'লাল অধ্যাপক' বলে (অর্থাৎ, কমিউনিজমের মতবাদে বিশ্বাসী—অনুবাদক)। পাদ্রি ও 'পরিবার-বর্গের পিতারা' প্রেসে প্রতিবাদ করত একজন 'বাস্তুহারার' জনসমক্ষে বক্তৃতার বিরুদ্ধে, যে নাকি "আমেরিকানদের সরিয়ে নিতে চায় তাদের ব্যক্তিগত মানুষী ঈশ্বরের কাছ থেকে।" কিন্তু আমেরিকার বেশির ভাগ মানুষ আইনস্টাইনের বিবৃতিগুলিতে তীক্ষ্ণ ঔৎসুক্য দেখাত এবং তাদের নিজস্ব অনেক সমস্যা যা তাদের উত্ত্যক্ত করছে, তার সমাধান খুঁজত।

প্রিন্সটন-এর বাসিন্দারা সেদিক থেকে যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সারা দুনিয়ার মানুষের প্রতিচ্ছবি। আইনস্টাইনের চারধারের পরিবেশটা ছিল সত্যিই লক্ষ্য করার মতো। একদিকে দীর্ঘ ছায়া-ঘেরা বীথি দিয়ে আইনস্টাইনের যাওয়া-আসাটা সারা প্রিন্সটনের দৃশ্যপটের অন্যতম একটি দৃশ্য হয়ে উঠেছিল। কফি-হাউসের মালিক ও অন্যান্য যারা এখানে আসত তারা আইনস্টাইনের রুচি ও অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত ছিল। প্রিন্সটন-এর অধিবাসীদের পক্ষে অন্যান্য যে কোনো নাগরিকের মতো আইনস্টাইনের সঙ্গে দিনান্তে কিছুটা

১ ম্যাপল গাছের রস থেকে মিষ্টি গুড় পাওয়া যায়। আর লিনডেন হচ্ছে বিখ্যাত লেবু গাছ, বার্লিনের অন্যতম প্রধান সড়কের নাম হয়েছে এ থেকে।—অনুবাদক।

সময় কাটানো বেশ চালু রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে প্রিন্সটন-এর বাসিন্দারা তাঁর মধ্যে দেখত 'বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রবাদ-পুরুষকে।'(১)

ব্রিটিশ কলম্‌বিয়া থেকে স্কুলের যে মেয়েটি আইনস্টাইনকে লিখেছিল, "আমি আপনাকে চিঠি লিখে দেখতে চাই সত্যি সত্যি আপনার মতো কোনো মানুষ আছে কি, না"(২)—প্রিন্সটনের বাসিন্দাদের মনোভাব তার থেকে খুব বেশি কিছু তফাৎ ছিল না। আইনস্টাইন যে একজন সুপরিচিত অথচ সাধারণ ব্যক্তি-মানুষ, আর অন্যদিকে একজন প্রবাদ-পুরুষ—স্কুলের মেয়েটির এই দুটি ধারণা মিলে যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল, সাধারণ পথ-চলা মানুষের আইনস্টাইন সম্পর্কে ধারণা তার থেকে খুব বেশি আলাদা ছিল না: সেটা ছিল, ইনি এমন একজন, যিনি বিরাটত্ব, ব্যাপকতা ও আপাতবিরোধী অস্তিত্ব নিয়ে খুব বড় মানুষ, অথচ এই সঙ্গেই তাঁর মধ্যে রয়েছে খুব সাধারণ মানবিক অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের ক্ষমতা।

অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিকই প্রিন্সটনে বাস করেছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই একাধারে এত 'সাধারণ' ও একজন প্রবাদ-পুরুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন নি। এ থেকে আইনস্টাইনের জনপ্রিয়তাকে আমরা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতে পারি।

যে বছরগুলি আইনস্টাইন প্রিন্সটনে কাটিয়েছেন, তাতে এই প্রশ্নের একটা সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া সম্ভব। আইনস্টাইনের বিজ্ঞান সম্পর্কে যা কিছু ঔৎসুক্য ছিল, তা অধিকাংশ পদার্থবিদের ছিল না এবং জনসাধারণ তার কিছুই জানত না। তা সত্ত্বেও প্রিন্সটনে তিনি যে কাজ করেছেন তা বিশের দশক থেকেই যেন সাধারণ মানুষ অনুভব করত: সেটা হচ্ছে, আইনস্টাইনের উদ্দেশ্য ছিল একটা সাধারণ বিষয়মুখী যুক্তিসম্মত জগৎপ্রপঞ্চের চেহারা উপস্থিত করা, যেটা মোটেই নরকেন্দ্রিক বা রহস্যময় হবে না, যাতে প্রকৃতিতে যুক্তির রাজ্য খুঁজে বার করা যাবে। মানুষ সব সময়েই মনে করেছে যে, বিজ্ঞানের যুক্তিসম্মত আদর্শ সামাজিক যুক্তিসম্মত আদর্শগুলি থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। যে প্রবাদ-পুরুষ মহাবিশ্বের সুষমা খুঁজে বার করতে আগ্রহী এবং সেটাকে মর্তলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তিনি নিশ্চয়ই অন্য যে-কোনো

১ Ph. Frank, op. cit., p. 356.
২ C. Seelig, op. cit., p. 344.

মানুষের মতোই সাধারণ মানুষ। প্রিন্সটনের লোকদের, যারা আইনস্টাইনকে রোজ দেখত, তাঁর ঐতিহাসিক কীর্তি সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল। আর যে লোকেরা আইনস্টাইনকে কখনও চাক্ষুষ দেখে নি কিন্তু তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা পোষণ করেছে, তারা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটা অনুমান করে নিত।

চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে আইনস্টাইনের মনোভাব

কড়ি দিয়ে পাশার দান ফেলছে—তুমি এইরকম ঈশ্বরে বিশ্বাস করো ; আর আমি বিশ্বাস করি জগৎপ্রপঞ্চে যে নিখুঁত নিয়মাবলী শাসন করছে তার বিষয়মুখী অস্তিত্ব রয়েছে।

ম্যাকস বোর্ন-কে লেখা আইনস্টাইনের চিঠি (১৯৪৪)

বার্লিনে আইনস্টাইন যখন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মধ্যে পথ খুঁজে পাবার চেষ্টায় রত, তখন কোপেনহাগেনে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার নতুন মতামত নিয়ে একটা সম্প্রদায় গড়ে উঠছে। সেটা প্রকাশ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করল যখন নিয়েল বোর পরমাণুর কাঠামো বোঝাতে কোয়াণ্টাম-এর(১) ধারণা আমদানি করলেন।

পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার বিকাশ শুরু হয়েছে মেন্‌ডেলিয়েভ-এর 'পর্যাবৃত্ত সারণী'(২) থেকে। ১৮৬৯ সালে এই পর্যাবৃত্ত সারণী আবিষ্কৃত

১ আমরা এখানে 'কোয়াণ্টাম'-এর শব্দগত উৎস ধরে 'কণীয়' বা ঐ ধরনের কিছু তর্জমা করলাম না, কারণ আমরা পরে দেখবো, কোয়াণ্টাম-এর ধারণাতে একই সঙ্গে কণীয় এবং 'তরঙ্গধর্মী' বোঝানো হয়েছে। কোয়াণ্টাম-এর দ্বৈত চরিত্রকে কোনো বাংলা প্রতিশব্দে না এনে মূল লাতিন শব্দটিই ব্যবহারের আমরা পক্ষপাতী।—অনুবাদক।

২ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক মেন্‌ডেলিয়েভ তখনকার দিনে আবিষ্কৃত ৯২টি মৌল পদার্থের মধ্যে যতগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের পারমাণবিক ওজন অনুসারে সাজিয়ে একটি চমৎকার

হবার পরে যে চল্লিশ বছর কেটে গেল, তার মধ্যে ঐ মৌল পদার্থগুলির রাসায়নিক ধর্ম সারণীতে তাদের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ওজনের অবস্থান অনুসারে পর্যায়ক্রমিক ভাবে যেন ফিরে ফিরে আসে—এটার পদার্থ-গত ব্যাখ্যা দেবার অনেক প্রচেষ্টা হয়েছিল। এই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছিল যখন আলাদা আলাদা আধা-পারমাণবিক কণাগুলি আবিষ্কৃত হয়।

১৯১১ সালে রাদারফোর্ড হাতে-নাতে দেখিয়ে দিলেন যে, পরমাণুর (বা অ্যাটমের) রয়েছে একটি কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস (যাতে তার পুরো আয়তন বা ভল্যুমের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র পাওয়া যায়), যার চারধারে আবর্তিত হচ্ছে ঋণাত্মক (negative) বিদ্যুৎশক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রন কণাগুলি। প্রাথমিক এই চেহারাটা পরে অনেক বেশি জটিলতর হয়ে যায়। নিউক্লিয়াসে দেখা গেল ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তিবিশিষ্ট প্রোটন এবং তার সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তি-নিরপেক্ষ নিউট্রন কণাগুলি রয়েছে। ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে আবর্তনের কক্ষপথগুলি বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে, একেবারে পাশাপাশি ঠেসাঠেসি করে কিন্তু প্রত্যেকটি আলাদা, যেন ইলেকট্রন কণাগুলি এক-একটি খোসার মধ্যে রয়েছে। পরমাণুটি যতই ভারী হবে ততই বেশি পরিমাণে তাতে নিউক্লিয়ার (১) কণাগুলি বিদ্যমান থাকবে এবং সেই অনুসারে তত বেশি সংখ্যায় ইলেকট্রন কণাগুলি নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে আবর্তন করবে। হাল্কা থেকে ভারী পরমাণুর দিকে যেতে হলে আমরা দেখবো, ইলেকট্রনগুলি নিয়ে প্রথম একটি খোলস, তারপরে দুটি এবং পর পর এইরকম হবে। বাইরের খোলসে রয়েছে প্রথমে একটা, তারপরে দুটো, ইত্যাদি ইলেকট্রন কণা যতক্ষণ না তারা খোলসটাকে ভর্তি(২) করে ফেলছে; এবং তারপরে পরের খোলসটিতে আবার ইলেকট্রনের সংখ্যাগুলি বাড়তে আরম্ভ করে, প্রথমটাতে

'সারণী' তৈরি করে ফেলেন। তাতে দেখা যায় তখনও পর্যন্ত আবিষ্কার না-হওয়া কয়েকটি পদার্থের সম্ভাব্য গুণাগুণ বলে দেওয়া সম্ভব।

—অনুবাদক।

১ নিউক্লিয়ার বলতে আমরা পরমাণু সংক্রান্ত, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, সব কিছু বুঝি।—অনুবাদক।

২ ইলেকট্রনের এই বিভিন্ন খোলসগুলি (shell) যেন পারমাণবিক নিউ-ক্লিয়াসের চতুর্দিকে বিভিন্ন শক্তিস্তরে (energy level) বিরাজ করছে।

—অনুবাদক।

অবশ্য একটাই ইলেকট্রন। পরপর প্রতিটি খোলসকে ভর্তি করে দেবার জন্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ইলেকট্রনের দরকার পড়ে। তাহলে ক্রমাগত পারমাণবিক ওজনে ভারী হয়ে যাচ্ছে। এইরকম ভাবে যদি পরমাণুগুলিকে পর পর সাজানো যায়, তাহলে পর্যায়ক্রমিক নিয়মানুসারে এমন পরমাণুগুলি পাওয়া যাবে যাদের বাইরের খোলসে একই সংখ্যক ইলেকট্রন পাওয়া সম্ভব। যেহেতু মৌল পদার্থগুলির রাসায়নিক ও কয়েকটি পদার্থগত ধর্ম কী হবে তা নির্ভর করে বাইরের খোলসে কতগুলি ইলেকট্রন রয়েছে তার 'পরে, সেইহেতু এই ধর্মগুলি যেন পর্যায়ক্রমিক ভাবে ফিরে আসে(১)।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে, কক্ষপথে আবর্তনকারী ইলেকট্রন তাপগতি বিজ্ঞানের (thermodynamics) নিয়মের সঙ্গে মেলে না। ঐ ধরনের ইলেকট্রনকে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গগুলিকে নির্গত করতেই হবে, যার দ্বারা সে দ্রুত তার শক্তি ক্ষয় করে থাকে। তার ফলে ইলেকট্রন তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলতে থাকে এবং ক্রমশ কেন্দ্রকের দিকে পাক খেতে খেতে যেন নীচে(২) নেমে আসতে থাকবে এবং শেষ অবধি এর উপর পড়ে যাবে। তাহলে পরমাণুর কোনো সুস্থির অবস্থা বজায় থাকত না; তা কিন্তু নয়, পরমাণু হচ্ছে বেশ স্থায়ী কাঠামোসম্পন্ন বস্তু।

এই দ্বন্দ্বের সমাধান করেন নিয়েল বোর, যিনি মতপ্রকাশ করলেন যে, ইলেকট্রন কেবলমাত্র কয়েকটি কক্ষপথে গমনাগমন করতে পারে, যেটা ঐ গতিশীল ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট শক্তি-স্তরের উপযোগী। কক্ষপথে থাকার সময় ইলেকট্রন কোনো তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকীরণ করে না। যখন এক কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন অন্য কক্ষপথে ঝাঁপিয়ে চলে যায়, তখন শক্তির বিকীরণ হয়। পরমাণু যে-শক্তি ক্ষয় করে থাকে সেটা উঁচু ও নিচু মানের ইলেকট্রনের কক্ষপথের দুই বিভিন্ন শক্তি-স্তরের মধ্যে যতোটুকু তফাৎ তার সমান এবং সেটা (অর্থাৎ, শক্তি ক্ষয়—অনুবাদক) তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকীরণে বেরিয়ে যায় এবং সেটাই হচ্ছে আইনস্টাইনের আলোর কোয়ান্টা অথবা ফোটন। একটা

১ অথবা বলা যেতে পারে পর্যাবৃত্ত সারণীতে সাজানো বিভিন্ন মৌল পদার্থের মধ্যে সারণী অনুসারে তাদের রাসায়নিক ও পদার্থগত চরিত্রের ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যাবে।—অনুবাদক।

২ নীচে বলা হচ্ছে, কারণ যেমন ইলেকট্রনের শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, সে উচ্চমানের শক্তিস্তর থেকে নিম্নতর মানে এসে পড়ছে।—অনুবাদক।

ইলেকট্রন যখন এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে ঝাঁপ খাচ্ছে, তখন একটি ফোটন নির্গত হয়।

বোর-এর চমৎকার স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান আইনস্টাইনকে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল ; এটা তাঁকে সাধারণ অনুমান থেকে মোটামুটিভাবে সরাসরি সিদ্ধান্তে পৌঁছবার অনেক পূর্বেই সেখানে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া তাদের স্থাপন করা হয়েছিল অত্যন্ত ছাড়া-ছাড়া এবং আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন পরীক্ষাগত তথ্যের ভিত্তিতে। ১৯২০-এর দশক পর্যন্ত পরিমাণগত বিকীরণ(১) এবং আলোর কোয়ান্টার ধারণা পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগমনের দিক থেকে নড়বড়ে ভিত্তির 'পরে রয়ে গেল। সেটা পদার্থবিজ্ঞানের ধ্রুপদী ভিত্তিভূমি-গুলিকে টলিয়ে দিয়েছিল কিন্তু গতিবিজ্ঞানের অথবা তাপগতিশীলতার এমন কোনো মৌলিক নিয়ম তখনও বিকশিত হয় নি, যেটা তার পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আইনস্টাইন তাঁর 'আত্মজীবনীমূলক নোটস'-এ লিখছেন : "এটা যেন এমন একজনের পায়ের তলা থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হল, যার কিন্তু দাঁড়াবার জন্যে অন্যত্র তেমন কোনো শক্ত জমি নেই, যার উপরে কিছু তৈরি করা যেতে পারে। এই পলকা ও দ্বন্দ্বাত্মক ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে বোর-এর মতো অমন অপূর্ব অনুভূতিসঞ্জাত ধারণাবিশিষ্ট ও কৌশলসম্পন্ন মানুষ যে বর্ণালী বিন্যাসের লাইনগুলির এবং পরমাণুর ইলেকট্রনের খোলসগুলির প্রধান নিয়ম আবিষ্কার করতে পারে, যার রাসায়নিক তাৎপর্যও রয়েছে—এটা আমার কাছে একটা অলৌকিক এবং আজও অপূর্ব বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হয়। চিন্তার রাজত্বে সাঙ্গীতিক সুষমা ও সৌন্দর্যের এটা উচ্চতম চেহারা।"(২)

এই পরিপ্রেক্ষিতে সাঙ্গীতিক সুষমার কথা আমরা আগেই বলেছি। কারণ বোর-এর তত্ত্ব, যাতে ইলেকট্রনগুলি শক্তির বিকীরণ না করে কক্ষপথে আবর্তন করছে—এই আপাতবিরোধী প্রতিপাদ্য অনুভূতিসঞ্জাত পদার্থগত জ্ঞানের এক চমৎকার নিদর্শন।

আইনস্টাইন এই অনুভূতিসঞ্জাত জ্ঞানের কথা বুঝতেন। বোর-এর তত্ত্ব

১ অর্থাৎ, শক্তির যে বিকীরণ হচ্ছে, সেটা টুকরো টুকরো এবং তাকে মাপা যায়। —অনুবাদক।

২ Philosopher-Scientist, pp. 45-47.

সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন আইনস্টাইনের নিজের চিন্তা-পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য ও শৈলীর উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছিল। এই নতুন তত্ত্বের প্রতি মোটেই তাঁর সহানুভূতি ছিল না, এটা তাঁর পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণার বিপক্ষে যায়। ১৯৬১ সালে 'পদার্থগত সমস্যা সম্পর্কে মস্কো ইন্সটিটিউট'-এর এক বক্তৃতায় নিয়েল বোর এই নতুন পারমাণবিক মডেল সম্পর্কে আইনস্টাইনের প্রতিক্রিয়া স্মরণ করে বলেন: "আইনস্টাইন বলেছিলেন যে, এই ধরনের কোনো কিছুতে পৌঁছানো হয়ত আমার নিজের পক্ষে সম্ভব হতো, কিন্তু এ সব যদি সত্য হয়, তাহলে পদার্থবিজ্ঞানের সমাপ্তি ঘটবে।"(১)

এই মন্তব্যের মধ্যে প্রচুর তাৎপর্য ও সাধারণীকরণ রয়েছে। "এই ধরনের কোনো কিছুতে পৌঁছানো হয়ত আমার নিজেব পক্ষে সম্ভব হতো।" কোয়ান্টাম তত্ত্বে পদার্থবিজ্ঞানের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের গতির নতুন চেহারা দেখা গেল। এই ছবির (বা চেহারার) মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং আইন-স্টাইন দেখতে পেলেন অথবা অনুভূতিসঞ্জাত জ্ঞানে আঁচ করতে পারলেন যে, বোর-এর দ্বন্দ্বমূলক প্রতিপাদ্যগুলি আরও বেশি সাধারণ দ্বন্দ্বের মধ্যে নিয়ে যাবে, যাতে দেকার্তে ও স্পিনোজার দার্শনিক লেখাগুলি থেকে যে ছিমছাম (ideal), সুষম, যুক্তিসম্মত জগৎপ্রপঞ্চের চেহারা পাওয়া গিয়েছিল, যা নিউটনের গতিবিজ্ঞানে দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছিল (এবং যাতে অনপেক্ষ বা পরম গতির বিজাতীয় ধারণা নিয়ে এসেছিল) এবং যেটা শেষ অবধি আপেক্ষিকতার সুষম চেহারার মধ্যে বিকশিত হয়েছে—সেটা বরবাদ অথবা বহুলাংশে খণ্ডিত হয়ে যাবে। আইনস্টাইনের কাছে পদার্থবিজ্ঞানের অর্থ হচ্ছে এই ছবিকে বিস্তৃত করা। কাজেই বোর এর তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: "এ সব যদি সত্য হয়, তাহলে পদার্থবিজ্ঞানের সমাপ্তি ঘটবে।" যে সময়ে বোর-এর পারমাণবিক মডেল নিয়ে বহুদিক থেকে বিতর্ক চলছে (হাইড্রোজেনের অপেক্ষা জটিলতর পরমাণুতে এর প্রয়োগ কতখানি করা যাবে), তখন আইনস্টাইন এই নতুন তত্ত্বের আসল অর্থ দেখতে পেলেন: যে আদর্শ জগৎ-চিত্র অপেক্ষিকতা-বাদের স্রষ্টার কাছে পদার্থবিজ্ঞানের আসল স্তম্ভ বলে মনে হয়েছিল, ঐ তত্ত্ব তার পতনের বা তাকে সীমাবদ্ধ করার কথা ঘোষণা করল।

বোর কিন্তু অন্যদিকে ফোটন তত্ত্বের ঐ দিকগুলিতেই এবং তাঁর নিজের তত্ত্বগত নির্মাণকার্য যা ধ্রুপদী আদর্শের সঠিক নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করার

১ Nauka i Zhizn (Science and Life), 1961, No. 8. p. 77.

উপক্রম করছিল, তাতেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর নিজের অনুভূতিসঞ্জাত জ্ঞান তাঁকে যতোটা না ধ্রুপদী আদর্শকে নষ্ট করে দিতে চালিত করেছে, তার চেয়ে বেশি চালিত করেছে পদার্থবিজ্ঞানের বাইরের রূপরেখাটাকে ঝাপসা করে এবং ধুয়ে-মুছে দিতে। এই ধরনের অনুভূতিসঞ্জাত জ্ঞানের জন্যে বোরকে পদার্থবিজ্ঞানের রেমব্রাঁ* (এটা ঠিকই যে ধ্রুপদী বিজ্ঞানের ধারণাগুলির পরিষ্কার ছিমছাম ছকের রূপরেখা শেষোক্ত ধারণায় ঝাপসা হয়ে গেছে) বলা হয়েছে। বোরকে উনবিংশ শতাব্দীর সেই সব চিত্রকরের সঙ্গেও তুলনা করা যায় যাঁরা গোইয়াকে (Goya) অনুসরণ করে ছবিতে আগেকার দুই শতাব্দী ধরে যে পরিষ্কার ভাব দেখা যেত, তা থেকে সরে যান।

১৯২০-এর দশকে বোর যে সব সূত্র হাজির করলেন, তাতে ইলেকট্রন-গুলি আলাদা-আলাদা তাদের পছন্দমতো কক্ষপথে আবর্তন করছে এবং শক্তি বিকীরণ করছে না, এই ধারণাটাকে নিশ্চয়ই দ্বন্দ্বাত্মক বলে ধরতে হবে। একটি সাধারণ তত্ত্ব বিকশিত হল, যাতে তাদের জন্যে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া গেল। তবে বিজ্ঞানে এ পর্যন্ত যা কিছু জানা ছিল, তার মধ্যে এই তত্ত্বটিকেই সবচেয়ে আপাতবিরোধী বলে মনে হল, কারণ এতে কণাদের সঙ্গে তরঙ্গের ধারণাকে(১) আমদানি করা হয়েছে।

১৯২০-এর দশকে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে যে সংকট দেখা দিল, তার কারণ ছিল বিজ্ঞানীরা বোর-এর পারমাণবিক মডেলের ব্যাখ্যা করে একটা সাধারণ তত্ত্ব উপস্থিত করতে পারলেন না, অথচ তা থেকে (বোর-এর মডেল থেকে) পদার্থবিজ্ঞানে পরপর অনেকগুলি আবিষ্কার হয়ে নতুন যুগের সূচনা হল।

১৯২৪ সালে লুই দ্য ব্রগলি **বস্তুর তরঙ্গ**-এর ধারণা উপস্থিত করলেন (তাদের এখন দ্য ব্রগলি তরঙ্গ বলা হয়)। দ্য ব্রগলির মতে বস্তুদেহ যুক্ত কণাগুলি, এক্ষেত্রে ইলেকট্রন, তরঙ্গ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। যে কক্ষপথটি একটা ইলেকট্রন অধিকার করে থাকে তাতে গোটা কয়েক সম্পূর্ণ সংখ্যায় এই ধরনের তরঙ্গ থাকা দরকার। এটাই হল, পছন্দ করা বা 'অনুমোদিত' কক্ষপথ। তরঙ্গ

---

* বিখ্যাত চিত্রকর, যাঁর আঁকা ছবির দৃশ্যপটে ঐ রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।—অনুবাদক।

১ অর্থাৎ একাধারে তাদের মধ্যে কণা ও তরঙ্গধর্মী চরিত্র পাওয়া যাচ্ছে।
—অনুবাদক।

যে-ভাবে বয়ে যায় কণাটির গতি সেই নিয়মগুলির অধীন (বা সেই নিয়মগুলিকে মেনে চলে)। এ থেকে তরঙ্গ-বলবিদ্যার উদ্ভব। ১৯২৫ সালে এরউইন শ্রোডিংগার এক ধরনের (তরঙ্গের) দোলায়মানতার বিস্তৃতি কতটুকু তার সমীকরণ লিখে ফেললেন—তাকেই বলা হল তরঙ্গের সম্পর্কযুক্ত একটি ক্রিয়া (function)। এই সমীকরণের সমাধান হওয়াতে ধারাবাহিকভাবে পৃথক বিযুক্ত পরিমাণের শক্তিপুঞ্জ অর্পিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনে অবস্থিত পরমাণুগুলির উপরে, যেগুলি কয়েকটি কক্ষপথে ভ্রাম্যমান ইলেকট্রনগুলির যথার্থ উপযুক্ত বা মানানসই।(১)

তরঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক্রিয়াটা তাহলে কী? উক্ত সম্পর্কযুক্ত ক্রিয়াটি (ফাংশন) নিশ্চয়ই পরিমাণগত কিন্তু তাহলে ইলেকট্রনের আচরণ (অর্থাৎ কী ভাবে শক্তি-স্তরে গমনশীল—অনুবাদক) নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে কি ভাবে?

ম্যাকস বোর্ন এর জবাব দিয়েছেন: আসলে এখানে যেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা, সেটা হল একটা ইলেকট্রনের সঙ্গে মোলাকাত হবার **সম্ভাব্যতা** (probability, অর্থাৎ, গাণিতিক দিক থেকে বুঝতে হবে—অনুবাদক)। আমরা যদি একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট বা বিন্দুতে এবং একটা বিশেষ সময়ে(২) তরঙ্গের ক্রিয়াকে (ফাংশনকে) হিসাবের মধ্যে ধরবার চেষ্টা করি, তাহলে যে-সমাধান পাওয়া যাবে (অথবা বলতে গেলে একটা অনপেক্ষ মূল্যের বর্গক্ষেত্র), সেটা হল একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ইলেকট্রনটির সাক্ষাৎ পাবার সম্ভাবনা।

ম্যাকস বোর্ন ও পাসকুয়াল জর্ডান **দ্য ব্রগলি-তরঙ্গের তীব্রতার** (নিশ্চয়ই সবটাই একটা তরঙ্গের ধারণা) সঙ্গে দেশগত একক মাত্রার আয়তনে (unit volume) **গড়পড়তা কতগুলি ইলেকট্রন** থাকতে পারে (যেটা নিশ্চয়ই কণাগত ধারণাতে বোঝা যায়) তাদের সম্পর্ক বার

১ অর্থাৎ, সমগ্র পরমাণুর কতটা শক্তি রয়েছে তার সঙ্গে ইলেকট্রনের ভ্রাম্যমান কণাগুলি কোন কক্ষপথে বিরাজ করছে, তার গাণিতিক সম্পর্ক রয়েছে।—অনুবাদক।

২ পয়েন্ট ও সময়—অর্থাৎ গণিতের দিক থেকে চারটি মাত্রাকেই এখানে ধরা হচ্ছে।—অনুবাদক।

করেছিলেন। তরঙ্গধর্মী ও কণীয় চরিত্রের ধারণাগুলির মধ্যের সম্পর্কটা নিম্নোক্ত ধরনের চেহারা নেয়।

একটা নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক আয়তনে (volume) **গড়পড়তা** সংখ্যার হিসাবে কতগুলি ইলেকট্রন থাকতে পারে তার কথা আমরা বলেছি,—বিরাট সংখ্যা নিয়ে গুণলে গড়পড়তা হিসাবে কী দাঁড়ায়। একই ভাবে আমরা বলতে পারি, যখন আমরা একটা মুদ্রাকে উপর দিকে ছুঁড়ে দিই (টস্ করি), তখন **গড়পড়তা হিসাবে** দশবারের মধ্যে পাঁচবার মাথার দিকটা পড়বার কথা। সম্ভাব্যতা হচ্ছে তাহলে এখানে অর্ধেক অর্থাৎ বলতে গেলে, যতোবার মুদ্রাটিকে টস্ করা হবে তার মধ্যে মাথার দিকটি পড়বার সম্ভাব্যতা অর্ধেক।

বোর্ন ও জর্ডান ধরে নিয়েছিলেন যে, ইলেকট্রন কণাগুলির গড়পড়তা সংখ্যার সঙ্গে দ্য ব্রগ্‌লি-তরঙ্গের তীব্রতা আনুপাতিক ভাবে কমে-বাড়ে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট আয়তনে গড়পড়তা কতগুলো ইলেকট্রন থাকতে পারে সেটা সেই আয়তনের মধ্যে প্রতিটি ইলেকট্রন কণা থাকার সম্ভাব্যতার 'পরে নিশ্চয়ই নির্ভরশীল। সেজন্যেই সেই নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে ইলেকট্রন কণার সন্ধান পাওয়ার সম্ভাব্যতা হিসাবে তরঙ্গের তীব্রতাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দ্য ব্রগলির তরঙ্গের দোদুল্যমান বৈশিষ্ট্যের ধারণাতে নিজেদের আবদ্ধ রাখছি, ততক্ষণ কোনো ঝামেলা নেই: শ্রোডিংগার-এর সমীকরণে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু ও মুহূর্তে (সময়ে) একেবারে নিশ্চিতভাবে তরঙ্গের তীব্রতাকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যখন কণীয় ধারণাতে পৌঁছে যাই এবং ইলেকট্রনগুলিকে কণা রূপে বিচার করি, তখন এই সমীকরণ একটা নির্ধারিত তথ্যকে, একটা পর্যবেক্ষিত ফলাফলকে নির্ধারণ করে না, করে কেবল তার সম্ভাব্যতাকে।

তরঙ্গের গতির তীব্রতা নির্ধারিত হয় তার দোদুল্যমানতার বিস্তৃতির দ্বারা। কিন্তু দোদুল্যমানতার গড়পড়তা বিস্তৃতি হল শূন্য, কারণ এই দোদুল্যমানতার একদিকের অবচ্যুতি (ইতিবাচক অর্থে), অন্যদিকের (নেতিবাচক অর্থে) মতোই ঘনঘন ঘটতে থাকে; এই অবচ্যুতিগুলি গড়পড়তা হিসাবের দিক থেকে সমান সংখ্যায় হবে; যেমন একটা তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, যতগুলি ঢেউ উপরে উঠছে, ঠিক ততোগুলিই নীচে নামছে। তরঙ্গের ওঠানামার মধ্যে দোদুল্যমানতার বিস্তৃতির (amplitude) বর্গক্ষেত্রকে ওঠানামার তীব্রতা কত বেশি তা হিসাব করতে ধরা হয়: তাহলে

নেতিবাচক সংখ্যাগুলির বর্গক্ষেত্র কিন্তু ইতিবাচক হয়ে যায় (কারণ একটি নেতিবাচক সংখ্যার বর্গক্ষেত্র নিশ্চয়ই একটি ইতিবাচক সংখ্যা) এবং গড়পড়তার হিসাব তাহলে আর শূন্য হয় না। এজন্যেই দ্য ব্রগলি-তরঙ্গের তীব্রতার মাপ হল তরঙ্গের ক্রিয়াকলাপের (ফাংশনের) দোদুল্যমানতার বিস্তৃতির অনপেক্ষ পরিমাণের বর্গক্ষেত্র। একটা বিশেষ বিন্দুতে ও মুহূর্তে একটি ইলেকট্রনকে পাবার সম্ভাব্যতার মাপ এটি। স্রোডিংগার-এর সমীকরণের দ্বারা এর সম্ভাব্যতা নির্ধারিত হচ্ছে, যাতে দ্য ব্রগলি-তরঙ্গকে একটা বিশেষ বিন্দু ও মুহূর্তে তীব্রতা দেওয়া হচ্ছে।

তা হলে ১৯২৫-২৬ সালে যে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার উদ্ভব হল, সেটা এমন নিয়মগুলি নিয়ে কাজ করছে যাতে, সাধারণভাবে বলতে হলে, একটা কণার গতির,—একটা বিশেষ মুহূর্তে (সময়ে) তার অবস্থান (অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ভাবে তার দেশ) এবং তার বিশেষ গতিবেগ কী—তা নির্ধারণ করা যায় না, করা যায় কেবলমাত্র তার অবস্থান ও গতিবেগের সম্ভাব্যতাকে। কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে যত সঠিক করে একটি কণার স্থানাঙ্ককে(১) ধরা যাবে, ঠিক ততটাই অনিশ্চিতভাবে তার গতিবেগকে নির্ধারণ করা যাবে, আবার বিপরীতভাবেও এটা করা যাবে। ১৯২৭ সালে ভার্নার হাইসেনবার্গ যে অনিশ্চয়তার সূত্রকে (uncertainty principle) রূপায়িত করেন, এ তারই প্রকাশ।

অনিশ্চয়তার সম্পর্ককে 'কল্পনার' অথবা 'চিন্তার' পরীক্ষার দ্বারা উদাহরণ দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক, একটা ইলেকট্রন একটা সরু গর্তের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে। যে কোনো বিশেষ মুহূর্তে ইলেকট্রনের অবস্থানটি মাপা যায় এবং গর্তটা যত ছোট হবে ততটা সঠিক ভাবে তার অবস্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। ইলেকট্রনের 'অবস্থান' কোথায় এই ধারণা করার জন্যে তাকে মাপা যে যায় এটা একান্ত প্রয়োজনীয়। অথচ একই মুহূর্তে ইলেকট্রনের গতিবেগকে একেবারে সঠিকভাবে নির্ধারণ করার সম্ভাবনা এই পরীক্ষাতে বাদ পড়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রনের গতির সঙ্গে সঙ্গে দ্য ব্রগলি-তরঙ্গগুলি বয়ে যাচ্ছে, যেটা গর্তের ধারে ঘা খাচ্ছে এবং তার দিক-পরিবর্তন ঘটছে; এর ফলে ইলেকট্রনের গতিবেগ বদলে যায় এবং গর্তটা যতোই ছোট হবে ততই এই দিক-পরিবর্তন বেশি ঘটবে। যদি আমাদের ইলেকট্রনের গতিবেগকে আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ

১ Co-ordinates, অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক দেশ এবং চতুর্মাত্রিক কাল।

—অনুবাদক।

করার দরকার হয়, তাহলে আমাদের তার অবস্থান যে আরও বেশি মাত্রায় বেঠিক (বা অনিশ্চিত) হয়ে যাবে, সেটা মেনে নিতে হবে। অন্য কথায় বলতে হলে, একটা ইলেকট্রনের অবস্থান ও গতিবেগকে একই সঙ্গে একেবারে ঠিক-ঠিক ভাবে নির্ধারণ করার ধারণার কোনো পদার্থগত অর্থ করা যাচ্ছে না। আমরা যদি এই সম্পর্ককে হিসাবের মধ্যে ধরি এবং যদি ঠিক কী হচ্ছে সেটা একেবারে নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ না করতে চাই, তাহলে আমরা ইলেকট্রনের অবস্থান ও গতিবেগের ধ্রুপদী ধারণাগুলি প্রয়োগ করতে পারি।

'আমরা একই সঙ্গে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ইলেকট্রনকে একটা নির্দিষ্ট অবস্থান ও গতিবেগ দিতে পারি না। কিন্তু আমরা একটা বিশেষ মুহূর্তে তার কোথায় অবস্থান হবে এবং তার গতিবেগ কী হবে, তার সম্ভাব্যতা স্থির করে দিতে পারি। এই সম্ভাব্যতা শ্রোডিংগার-এর সমীকরণে পাওয়া যাবে।

যে নিয়মগুলি বাস্তব ঘটনাবলী নির্ধারণ করার পরিবর্তে ঘটনাবলীর সম্ভাব্যতাকে নির্ধারণ করে, তাদের বলা হয় রাশিবিজ্ঞানের নিয়ম (statistical laws)। এক সময়ে তারা ল্যাপলাস-এর নির্দেশ্যবাদকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল, অর্থাৎ এই ধারণাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল যে, একটা বিশেষ মুহূর্তে মহাবিশ্বের সমস্ত কণার স্থানাঙ্ক ও গতিবেগ থেকে পরের মুহূর্তে মহাবিশ্বের কী অবস্থা হবে তাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্ধারণ করা যাবে, যেমন যাবে ইতিহাসে এর পরে কী ঘটনাবলী ঘটছে সেটা নির্ধারণ করা। প্রথমে তাপগতিবিদ্যার রাশিবিজ্ঞানগত নিয়মগুলি ল্যাপলাসীয় নির্দেশ্যবাদকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল। এখন এটাকে অন্য একটা ক্ষেত্র থেকে সীমাবদ্ধ করা হল: কণাগুলির ধারণা গতিবিজ্ঞানের নিয়মাবলীর অধীন নয়, একটা বিশেষ মুহূর্তে কতগুলি স্থানাঙ্ক বা গতিবেগের সম্ভাব্যতা কী হবে, সেটাই এই ধারণা নির্ধারণ করে মাত্র।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক নামজাদা তাত্ত্বিক পদার্থবিদের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হল, যাদের ম্যাকস বোর্ন পরে 'অসন্তুষ্টদের দল' বলে অভিহিত করেছেন। এই ব্যাপারে প্রথম ব্যাপক আলোচনা হয় ১৯২৭ সালের সোলভে কংগ্রেসে। 'অসন্তুষ্টদের' মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন আইনস্টাইন। তিনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার (অথবা বলা যেতে পারে, তার 'সম্ভাব্যতা' সম্পর্কে ব্যাখ্যার) অন্যতম সবচেয়ে সক্রিয় ও গভীর সমালোচক ছিলেন। কংগ্রেস এবং পরে তাঁর লেখাতে আইনস্টাইন প্রমাণ দাখিল করলেন যে, 'অনিশ্চয়তার সূত্র'

(uncertainty principle) পদার্থগত বাস্তবতার পুরো ব্যাখ্যা উপস্থিত করে না। রাশিবিজ্ঞানগত নিয়মগুলিই যে জগৎপ্রপঞ্চের মূল নিয়ম,— এই মতের বিরুদ্ধে যে আঘাতগুলি এল, বোর, হাইসেনবার্গ, বোর্ন ও অন্যরা তাদের ঠেকিয়ে দিলেন। যুক্তিটা আরও শক্ত হয়ে দাঁড়াল কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সৃষ্টিকর্তাদের দ্বারা ; তাঁরা চেষ্টা করলেন (প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের সমর্থনে) গতিবিদ্যা থেকে রাশিবিজ্ঞানগত নির্দেশ্যবাদে (determinism) উত্তরণটা প্রকৃতিরাজ্যে **অনিশ্চয়তা**-রই স্বীকৃতি। তাছাড়া, কয়েকজন ঘোষণা করলেন যে, পদার্থবিদরা একমাত্র যে বাস্তবতা সম্পর্কে বলতে পারে (অর্থাৎ, তাকে মেনে নিতে পারে) সেটা হল, পদার্থগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার সময় যন্ত্রের মাপকাঠিতে এবং পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যা পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত, 'সম্ভাব্যতার তরঙ্গ'-এর ধারণা প্রথমে আইনস্টাইনই কিছুটা পরিমাণে করেছিলেন। আলোর কোয়াণ্টাম (বা কণীয়) চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কার্যত আলোর তরঙ্গধর্মী ও কণীয় (বা কণাগত) ধারণাকে এক সঙ্গে সামনে আনেন। আলো হল শক্তিবিশিষ্ট তরঙ্গ, এটা এমন ধরনের যে, দেশগতভাবে একক মাত্রার আয়তনে (unit volume of space) রয়েছে নির্দিষ্ট পরিমাণের আলোকতরঙ্গের শক্তি। যে দেশ-এর মাধ্যমে একটা আলোর রশ্মি গতিশীল হয়, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাতে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের কিছুটা শক্তিগত ঘনত্ব থাকে। কিন্তু আলো হচ্ছে কণার, ফোটনের সমষ্টি। আলোর কণীয় চরিত্রের ধারণাতে ধরা হয়. যে দেশ-এর মাধ্যম দিয়ে একটা আলোর রশ্মি যায় তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফোটনের গড়পড়তা ঘনত্ব।(১) তাহলে গড়পড়তা ফোটনের ঘনত্ব হবে (যেটা একটা ফোটন কণার সাক্ষাৎ পাওয়ার **সম্ভাব্যতার** অনুপাতে বদলে যায় : সম্ভাব্যতা যত বাড়বে ততই অধিক সংখ্যায় ফোটনের সন্ধান পাওয়া যাবে), আমরা যদি তরঙ্গের ধারণাতে যাই, শক্তির ঘনত্বের মাপ, অর্থাৎ তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতার তীব্রতার গড়পড়তা হিসাবে হবে। এই দোদুল্যমানতাগুলি (oscillations) যা তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের মতো দেশ-এর মাধ্যম দিয়ে চালিত হয়, সেটা একটা ফোটন কণার সাক্ষাৎ পাওয়ার সম্ভাব্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এটা আইন-

১ অর্থাৎ, আলো যদি ফোটন কণার সমষ্টি হয় তাহলে দেশ-এর মাধ্যম দিয়ে যাবার সময় যত সংখ্যায় ফোটন কণা থাকবে তার গড়পড়তা হিসাব ধরলে একটা ঘনত্ব পাওয়া যাবে।—অনুবাদক।

স্টাইনের ফোটন তত্ত্ব থেকে যুক্তিসম্মত ভাবে বেরিয়ে এসেছে। ১৯২৫-২৬ সালে বিকশিত কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রথম দিকে ইলেকট্রন নিয়ে কাজ করত। একটা ইলেকট্রনের সাক্ষাৎ পাবার সম্ভাব্যতা, একটা নির্দিষ্ট আয়তনে তার স্থানবিশেষে অবস্থিতির সম্ভাব্যতা, তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। পরন্তু নির্ধারিত হয় ড্য ব্রগলির 'বস্তু-তরঙ্গের' দ্বারা, যাকে বোর্ন সম্ভাব্যতার তরঙ্গ বলে গণ্য করেছেন।

শ্রোডিংগারের তরঙ্গসংক্রান্ত সমীকরণ একটা ইলেকট্রনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে (একটা ইলেকট্রনের অবস্থান কোন্ স্থানে সেটা নির্ধারণ করার জন্যে তাকে ব্যবহার করা যেতে পারে); আলোক-বিজ্ঞানে সমানুরূপের তরঙ্গ-সমীকরণ ফোটনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই অর্থে আইনস্টাইনের ফোটন তত্ত্বের মধ্যে ইতিমধ্যেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মূল দ্বন্দ্বগুলি রয়ে গিয়েছিল। আলো কণার সমষ্টি দিয়ে তৈরি। অন্যদিকে, সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য পরীক্ষা থেকে হদিশ পাওয়া যাচ্ছে যে, আলো হচ্ছে তড়িৎ-চুম্বকীয় দোলন বা দোলায়মান তরঙ্গ (তরঙ্গধর্মী)। অধিকন্তু, আইনস্টাইন যা সিদ্ধান্ত করেছিলেন—তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের তীব্রতা তার ফোটনের তীব্রতার সমানু-পাতিক, তা থেকে এই ধারণাতে উপনীত হওয়া যায় যে, তরঙ্গের তীব্রতা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে একটা ফোটন কণার অবস্থিতিকে নির্ণয় করার পক্ষে উপযুক্ত: তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গগুলি আসলে সেই ধরনের তরঙ্গ, যার একটা ফোটন কণার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার সম্ভাব্যতা খুব বেশি। আইনস্টাইন সম্ভাব্যতার তরঙ্গ স্বীকার করেন নি, কারণ তাহলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হল এই যে, এটারই (অর্থাৎ সম্ভাব্যতার তরঙ্গই—অনুবাদক) অতিক্ষুদ্র জগতের সাধারণ নিয়মাবলী হচ্ছে এমন একটি: নিয়ম যা ঘটনাবলীর কেবলমাত্র সম্ভাব্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাঁরই নিজের তত্ত্ব এই সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেছে।

অতীতের দিকে তাকিয়ে ফোটনের ধারণাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, ধ্রুপদী জগৎপ্রপঞ্চের ভিত্তিভূমি থেকে আরও মৌলিকভাবে অনেক বেশি দূরে সরে যাওয়ার উপাদান তার মধ্যে রয়েছে। প্ল্যাংকের থেকে বিপরীতভাবে আইনস্টাইন বলেছেন তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রে শক্তি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবহমান নয়। এটা তিনি বলেছেন শক্তির বিকীরণ বা বিশোষণের ক্ষেত্রেই নয়, তার মধ্যবর্তী অবস্থার জন্যেও বটে। ক্ষেত্র

(field) তার চরিত্রের দিক থেকে স্বভাবতই আলাদা আলাদা,- বিচ্ছিন্ন তো বটেই ("বীয়ার পানীয় কেবলমাত্র পাইন্টের বোতলেই বিক্রি হয় না, পরন্তু এতে আলাদা আলাদা পাইন্টের অংশ থাকে")। এই ধারণা থেকে একটা স্বাভাবিক সাধারণীকরণ হল যে, সকল ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা, বিচ্ছিন্ন, একটি কণার 'পরে একটি ক্ষেত্রের ক্রিয়াকে আমরা ততটা সঠিকভাবে বলে দিতে পারি, যেটা কোনো অবিভাজ্য পরিমাণের চেয়ে বেশি দূর যেতে পারে না। ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা এই ধারণা থেকে উদ্ভূত যে, কণারা কি ভাবে আচরণ(১) করবে, সেটা নির্ধারিত হবে তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা (মাখ-এর সূত্র), অর্থাৎ, কণাদের দ্বারা সৃষ্টি শক্তি-ক্ষেত্রের এবং তাদের 'পরে যারা কাজ করছে, তাদের দ্বারা। যদি আমরা ধ্রুপদী বলবিদ্যাকে কণাদের 'পরে ক্রিয়াশীল যেসব বল (force) (যেমন, একটা কাঠামোর অনপেক্ষ ত্বরণবেগ থেকে উদ্ভূত হয় যে জাড্যের বল), তা থেকে আলাদা করে নি অর্থাৎ, যদি আমরা তাকে (ধ্রুপদী বলবিদ্যাকে) 'ধ্রুপদী আদর্শের' আরও নিকটে নিয়ে আসি, তাহলে আমরা এমন একটা মহাবিশ্বকে পেয়ে যাবো যেখানে যা কিছু ঘটছে তার নিয়ন্ত্রক হল বল-এর ক্ষেত্র।

এই ক্ষেত্রগুলিকে যদি একেবারে সীমাহীন নিশ্চয়তার (অর্থাৎ, যার মধ্যে সামান্যতম ভুলচুক বা অনিশ্চয়তা থাকবে না—অনুবাদক) দ্বারা নির্ণয় না-করা যায়, তাহলে আমাদের আদর্শ ছবিটাতে ছোট ছোট ফোঁটা দেখা যাবে। ধ্রুপদী ভাবগত ছবি কয়েকটি ন্যূনতম শক্তির পরিমাণের দ্বারা, কয়েকটি ন্যূনতম বলের দ্বারা সীমায়িত, যারা কণার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কাজেই ফোটনতত্ত্ব শেষ অবধি যেন একটা টাইম বোমার মতো হয়ে দাঁড়াল, যাকে 'ধ্রুপদী ভাবগত ছবির' নীচে যেন রাখা হল ;(২) আর যদিও সেটা অতি সামান্য পরিসরের ক্ষেত্রে 'ভাবগত ছবি'-র পক্ষে ভীতির কারণস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও সেটা এমন একটা ছবি যাতে সবকিছু একেবারে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হতো ; তার প্রতি এতাবৎ যে পরম আস্থা ছিল তাকে সরিয়ে দেবার পক্ষে সেটা যথেষ্ট

১ অর্থাৎ, কিভাবে গতিশীল হবে, তার চরিত্র কী ইত্যাদি।—অনুবাদক।

২ অর্থাৎ, টাইম বোমার মতো সময় বুঝে ফেটে গিয়ে তার উপরের বস্তুকে উড়িয়ে দেবে।—অনুবাদক।

এবং সেটা এতদূর পর্যন্ত সঠিক যাতে একটা অণুর অবস্থাতে সামান্যতম পরিবর্তনকেও কোনো ক্ষেত্রের ক্রিয়ার দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব।(১)

একটা কণার গতিশীল অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তনের সঙ্গে ক্ষেত্রের তীব্রতার যে সম্পর্ক, সেটা পদার্থবিদ্যার একটি স্তম্ভস্বরূপ এবং কেবলমাত্র সেটা নিউটোনীয়, আইনস্টাইনও তার সংস্কার সাধন করেছেন। বিভিন্ন কণাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াকে আইনস্টাইন সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার জন্যে দায়ী বলে মনে করতেন। একটা কণার গতিশীল অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তনকে বর্ণনা করা যায় পরিবর্তনশীল ক্ষেত্রগুলির সংযোগকারী সমীকরণের দ্বারা। এই সমীকরণগুলিকে বলা হয়, **ন্যূনতম বিয়োগফল সংক্রান্ত (ডিফারেনসিয়াল) সমীকরণ**। এর উদাহরণ হচ্ছে, একটা মহাকর্ষের ক্ষেত্রে একটা কণার গতিশীলতার সমীকরণ। কণার গতিবেগের সামান্যতম পরিবর্তন তার ক্ষেত্রের তীব্রতার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

কোয়াণ্টামের ধারণাগুলি চালু হবার আগে মনে করা হতো যে, একটি অণুর আচরণকে অন্য অণুগুলির ক্রিয়াকলাপের বা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করে যে নিয়ম, তা কণার গতিশীল অবস্থাতে যত সামান্য পরিবর্তনই হোক না কেন, সবসময়েই ঠিক থাকবে (যেমন, তার ত্বরণবেগ)। এখন আমরা দেখছি, একটা ক্ষেত্রের তীব্রতা তার ন্যূনতম পরিমাণের চেয়ে কম হতে পারে না এবং সেটা একমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণে বাড়তে পারে। এর পূর্বে আমরা বস্তুর আলাদা আলাদা, খণ্ড খণ্ড চরিত্রের কথা বলেছি, বলেছি পরমাণুরা হল বস্তুর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশ। এখন আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একদিকে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এবং অন্যদিকে তাদের গতিশীল অবস্থাতে তাদের যে পরিবর্তন ঘটছে, সেগুলি আলাদা আলাদা, খণ্ড খণ্ড ; তাদের দ্ব্যর্থহীন সম্পর্ক তারা খুইয়ে ফেলছে যখন সেই পরিমাণগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে,

১ ধ্রুপদী বলবিদ্যার ধারণা বা ভাবগত ছবিতে শক্তির পরিমাণ কতো তার দ্বারা সবকিছু নির্ধারণ করা হয়। নিউটনের 'দূরের বস্তুর প্রতি ক্রিয়া' action at a distance—এই সূত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার। আইনস্টাইন তার স্থানে নিয়ে এলেন 'ক্ষেত্র' বা 'শক্তিক্ষেত্র'-র ধারণা। যেমন মহাকর্ষ কোনো নিউটনীয় ধারণানুসারে 'দূরের বস্তুর প্রতি ক্রিয়া' নয়। আইনস্টাইনের মতানুসারে মহাকর্ষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুর আকর্ষণ-বিকর্ষণে সেই ক্ষেত্রের চেহারা যেন বেঁকেচুরে যাচ্ছে।—অনুবাদক।

সেগুলি ক্ষেত্রের তীব্রতা ও গতিশীল অবস্থা সূচিত করতে যে ন্যূনতম সীমিত পরিমাণ দরকার হয়, তার চেয়ে কম হয়ে দাঁড়ায়।

দুটো ছবির তুলনা করা যাক। একটা ছবি আঁকার প্লেটে যে রংগুলি থাকে তাদের মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। ছবির ক্যানভাসে বিভিন্ন রং প্রায় যেন আপনাআপনি মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। অন্য ছবিটাকে, খাঁটি অবিমিশ্র রং দিয়ে করা হচ্ছে এবং তাতে কয়েকটি ছোট ছোট বিভিন্ন রংয়ের ফোঁটা রয়েছে। এটাই ছিল বাস্তব-রূপবাদীদের (ইমপ্রেসানিস্টদের) পদ্ধতি, যারা মনে করত যে, ছবির প্লেটে রংকে না মিশিয়ে চোখে মেশালেই বিষয়-বস্তুর যথার্থ প্রতিরূপ পাওয়া যাবে। যেভাবে পুরানো দিনের মহান চিত্র-করেরা জমির দৃশ্যপট এঁকেছিলেন, তার সঙ্গে জগৎপ্রপঞ্চের ধ্রুপদী চেহারাটা মিলে যায়। কোয়ান্টামের ছবি যেন বাস্তব-রূপবাদীদের রীতিতে মাঝে-মাঝে অন্য রংয়ের বিন্দু দিয়ে আঁকা ছবি। পদার্থগত বাস্তবতাকে এই দুইয়ের মধ্যে কে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করছে?

প্রাক্-কোয়ান্টাম যুগে—কী বোঝানো হচ্ছে, বস্তুকে না গতিকে,—তার দ্বারা উত্তরের রকমফের হতো। বস্তুকে ধরা হতো আলাদা-আলাদা, খণ্ড-খণ্ড ভাবে, শেষ অবধি যেটা দাঁড়াত সেটা হল, অনেকগুলি আলাদা রংয়ের ফোঁটা দিয়ে আঁকা চিত্র, যে ফোঁটাগুলি এক-একটি পরমাণুর পালটা বা তার সঙ্গে মানানসই যেন এক-একটি দাগ। গতির চেহারা ছিল নিরবচ্ছিন্ন এবং গতির নিয়মাবলী যত সামান্য পরিমাণেই বাড়ুক না কেন এবং গতিবেগের পেছনে বল যতই মাপের দিক থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক না কেন, তাদের মধ্যে সংযোগ থাকবেই।

অজস্র অলঙ্ঘনীয় তথ্যাদির ভিত্তিতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ক্ষেত্র ও গতির আলাদা-আলাদা, খণ্ড-খণ্ড ছবিতে পৌঁছে গেল। ফোটনের ধারণাকে ভিত্তি করেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেত। কিন্তু ১৯১৭ সালে কণার গতির রাশি-বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতার (statistical-probability) ধারণার দিকে আইনস্টাইন আর এক ধাপ এগিয়েছিলেন। ফোটনের ধারণা এবং বোরের মডেল থেকে তিনি প্ল্যাংকের দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত বিকীরণের নিয়মগুলি গড়ে তোলেন। পারমাণবিক বিকীরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে যে নিয়মাবলী সেগুলির চরিত্র রাশিবিজ্ঞানগত, তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকীরণের সম্ভাব্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তরঙ্গের বিকীরণ এবং কণার বিকীরণ (দুটোই সবসময়ে অনিশ্চিত চরিত্রের);

এদের মধ্যে রয়েছে অসঙ্গতি এবং আইনস্টাইন তাঁর বিকীরণ-তত্ত্বের এটাকেই দুর্বল দিক বলে মনে করতেন।

"এই তত্ত্বের দুর্বলতা রয়েছে," তিনি লিখেছিলেন, "একদিকে, এই তথ্যের মধ্যে যে, তরঙ্গের ধারণাগুলির সঙ্গে কোনো নিবিড় যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে না এবং অন্যদিকে, প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলির সময় এবং গতিপথকে সেটা আকস্মিকতার 'পরে ছেড়ে দেয়।"(১)

প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলির, যেমন একটি ফোটন কণা নির্গত হয় যখন একটা ইলেকট্রন বোর-এর নির্ধারিত এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে ঝাঁপ খায়, সবটাই আকস্মিকতার, ব্যাপার এবং যখন বিকীরিত ফোটনের সংখ্যা হবে খুব বেশি একমাত্র তখনই রাশিবিজ্ঞানের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সম্ভাব্যতার সঙ্গে সেটা মিলবে।

তরঙ্গের ধারণার সঙ্গে বিকীরণের আকস্মিক চরিত্রের নিবিড় যোগাযোগের অভাব—এই সংক্রান্ত বিবেচনা থেকে আইনস্টাইনের কাছে মনে হয়েছিল এটা পদার্থবিদ্যার প্রতি দারুণ আঘাতের লক্ষণ। বোর-এর এতে মোটেই কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তিনি জানতেন যে, আলোক-ক্রিয়াতে আলো কণার মতো আচরণ করে, যেমন আলোক-বিদ্যুৎ কোষগুলিতে (photo-electric cells) ফোটন কণাগুলি একটি ধাতুর পাত্রের উপরের গাত্র থেকে ইলেকট্রনগুলিকে ধাক্কা মেরে ছিটকে বার করে দেয়। বোর এটাও জানতেন যে, ছোট্ট সরু গর্তের অথবা জালের মধ্যে দিয়ে আলো যদি চলে যায়, তাহলে সেই আলো তরঙ্গের মতো আচরণ করে—যাতে ধারগুলিকে 'পাশ কাটিয়ে যে তরঙ্গগুলি চলে যায় তারা বিচ্ছুরণের আকার নেয়। এজন্যেই আলো সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে হবে—তা থেকে যে-সিদ্ধান্তেই পৌঁছনো যাক না কেন।

'জীবিত দার্শনিকরা' নামে রচনাবলীর যে খণ্ডটি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে উৎসর্গ করা হয়েছে, তাতে বোর আইনস্টাইনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা এবং ফোটন কণাকে যে নিয়মগুলি নিয়ন্ত্রিত করে তাদের চরিত্র নিয়ে যে তর্ক হয়েছিল, সে সম্পর্কে লিখছেন:

"১৯২০ সালে বার্লিনে যখন আইনস্টাইনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের

১ Physikalische Zeitschrift, 1917, 18, p. 127.

একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, তখন আমাদের কথাবার্তার প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে এই মৌলিক প্রশ্নগুলি ছিল। যে আলোচনা হয়েছিল, আমি বারবার সেই চিন্তাতে ফিরে গেছি, সেটা আইনস্টাইনের নির্লিপ্ত মনোভাব সম্পর্কে আমার মনে গভীর শ্রদ্ধার ছাপ ফেলে। তাঁর পছন্দসই 'ফোটনের পরিচালক ভৌতিক তরঙ্গগুলির' (ghost waves) মতো চিত্রবৎ স্পষ্ট শব্দগুলির পেছনে নিশ্চয়ই কোনো রহস্যবাদের ঝোঁক ছিল না; কিন্তু তাঁর অন্তর্ভেদী মন্তব্যের পেছনে একটা গভীর হাস্যকৌতুক লুকানো ছিল, যেটা আলোকিত করত। তা সত্ত্বেও মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে একটা প্রভেদ বরাবরই ছিল, কারণ ধারাবাহিকতা বা যুক্তিপরম্পরাকে বর্জন না করে আপাতবিরোধী অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে সঙ্গতিবিধান করার ব্যাপারটা তাঁর পুরো দখলে ছিল। আইনস্টাইন বোধ হয় এই ধরনের আদর্শ বর্জন করতে অন্য যে কারুর চেয়ে বেশি নারাজ ছিলেন; এই অবস্থায় অন্যরা জ্ঞানের এই নতুন ক্ষেত্রে অনাবিষ্কৃত ও দিনের পর দিন ধরে সঞ্চিত পারমাণবিক ঘটনাবলীর বহু বিচিত্র ব্যাপারকে মেলাতে না পেরে সঙ্গতিসাধনের জরুরি প্রয়োজনে হাল ছেড়ে দিত।"(১)

১৯৬১ সালে মস্কোতে গিয়ে বোর আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর প্রথম দিককার আলোচনাগুলির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। আইনস্টাইন যখন নিরবচ্ছিন্নতা ও কার্যকারণ-সম্পর্কের আদর্শ ছেড়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেন, বোর তখন জবাব দিয়েছিলেন:

"আপনি কী পাবার আশা করেন? আপনি তো সেই মানুষ যিনি, আলো যে কণার সমষ্টি, সেই ধারণার প্রবর্তন করেছেন! আপনি যদি পদার্থবিদ্যার এই অবস্থার জন্যে উদ্বিগ্ন হন, যেখানে আলোর দ্বৈত চরিত্র দেখা যাচ্ছে, তাহলে জার্মান গভর্নমেন্টকে বলুন, আলোকবিদ্যুৎ কোষগুলির (photoelectric cells) ব্যবহারকে বে-আইনী ঘোষণা করে দিতে—যদি আলোর চরিত্র তরঙ্গধর্মী হয়, আর আলো যদি কণার সমষ্টি হয়, তাহলে বিচ্ছুরণের জালের ব্যবহার বাতিল করতে হবে।"

বোর আরও বললেন: "আমার যুক্তিটার পেছনে খুব জোর ছিল না অথবা

১ N. Bohr, 'Discussion with Einstein', in Philosopher-Scientist, pp. 205-06.

বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারত না, অবশ্য তখনকার অবস্থাতে আর কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না।"

আজকে এটা পরিষ্কার যে, আইনস্টাইন যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তা শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যার পুরানো অবস্থা সম্পর্কে আনুগত্য থেকেই উদ্ভূত হয় নি ; বরঞ্চ বলা যেতে পারে, (পদার্থবিদ্যাতে) নতুন অবস্থা যে তখনও চূড়ান্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং আরও সাধারণ ও আরও সঠিক মৌলিক পদার্থগত সূত্রগুলির যে তখনও উদ্ভব হতে পারে—এ সম্পর্কে তাঁর একটা অনুভূতিসঞ্জাত মনোভাব ছিল।

বোর তাঁর স্মৃতিচারণে আরও বলেছেন :

"আইনস্টাইন তিক্তভাবে মন্তব্য করলেন :

'তাহলেই দেখুন, আপনার মতো মানুষ এসেছেন আমার কাছে এবং যে কেউই আশা করবে যে, দুজন সমভাবাপন্ন মানুষ যখন একসঙ্গে মিলিত হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে একটা সাধারণ মিটমাট হবে, তারা একই ভাষায় কথা বলবে। বোধ হয়, আজকের পদার্থবিদদের কয়েকটা বিষয়ে একমত হওয়া উচিত, কয়েকটি সাধারণ বিষয় যা আমরা নতুন কোনো আলোচনা শুরু করার পূর্বে একমত হয়ে মেনে নেবো।

'আমি কিছুটা উষ্মার সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম :

'না, তা কখনই নয়! আমার পক্ষে এটা চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ হবে বলে আমি মনে করবো, যদি আমি আগে থেকে কোনো সিদ্ধান্তকে মেনে নি।"(১)

এইখান থেকেই তাঁদের দুজনের পথ দুদিকে গেল। পদার্থবিদ্যার সাধারণ মৌলিকতা নিয়ে আইনস্টাইন ভাবনাচিন্তা করতেই লাগলেন, যা থেকে বিশিষ্ট সমস্যাগুলি পাওয়া যেতে পারে। তিনি বিজ্ঞানের ধ্রুপদী মৌলিক নীতিগুলির মধ্যে তাদের খুঁজতে লাগলেন। ধ্রুপদী সুষম ছকের মধ্যে যাদের ঠিক ধরা যায় না, তাদের মধ্যে পদার্থগত বাস্তবতার নতুন নিয়মগুলি আবিষ্কার করার কাজে বোর নতুন অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান পেলেন।

আইনস্টাইনের মন্তব্য, "এসব সত্য হলে পদার্থবিজ্ঞানের সমাপ্তি বলে ধরতে হবে"—এটা নিশ্চয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বক্তব্য। বোর-এর দৃষ্টিভঙ্গি মেনে

১ Nauka i Zhizn (Science and life), 1961, No. 8, p. 73.

নিলে পদার্থবিজ্ঞানের সমাপ্তি—এটা তখন যা জানা ছিল সেটা বিবেচনা করে আইনস্টাইন বলেছিলেন। তিনি একেবারে নাকচ করে দেন নি, পরন্তু বিচার করে বলেছিলেন সম্ভব হলেও হতে পারে, অন্তত নীতির দিক থেকে ("এ সব সত্য হলে ")।

তাহলে আমরা এমন একটা সাহসী মনের পরিচয় পাচ্ছি যে কিনা নিজের সৃষ্টিকার্য যদি পূর্বের বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলির বিরুদ্ধে যায়, তাহলে ঐ বিজ্ঞানের মূল ভাবনাকেই প্রশ্ন করে বসে। এটা এমন একটা মন যে একটা তত্ত্বের সত্যতা, উপরন্তু তার সৌন্দর্যকে ('উচ্চ সাঙ্গীতিক চরিত্র') মেনে নিচ্ছে, যেটা তার বৈজ্ঞানিক আদর্শের সঙ্গে মিলছে না এবং তাকে আঘাত করছে। শেষ বিচারে, এই ধরনের সীমাহীন সহনশীলতা 'একান্ত ব্যক্তিগত' অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার প্রকাশ, এমন কি বিষয়গত, 'ব্যক্তিক সীমা বহির্ভূত' জগৎ-চিত্রের স্বার্থে যখন একজনের 'নেহাৎই ব্যক্তিগত' বৈজ্ঞানিক আদর্শকেও বলি দিতে হয়—এটা ততদূর পর্যন্তও প্রসারিত। আইনস্টাইন নিমগ্নচিত্তে এমন একটা ধ্রুপদী আদর্শগত জগতের ছবিকে গড়তে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে বিভিন্ন কণাসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়ার জগতের সকল ঘটনাবলীকে একেবারে সঠিকভাবে চিত্রিত করা যায়। তবে এই আত্মমগ্নতা তাঁর বিষয়মুখী সত্যের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে বড় ছিল না। অ্যারিস্ততলের ভাষায় তিনি বলতে পারতেন, "নিউটন আমার কাছে প্রিয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সত্য আরও প্রিয়তর।" 'নিউটন'কে এখানে 'নিউটোনীয় ধরনের বলবিদ্যা'র সুষমার প্রতীক বলে ধরে নিতে হবে। দেকার্তে অথবা স্পিনোজার সম্পর্কে সঠিকভাবেই অনুরূপ কথা বলা যেতে পারে। আইনস্টাইনের কাছে নিউটন ছিলেন বিজ্ঞানের ধ্রুপদী আদর্শের প্রতীক। তিনি 'নিউটনের কর্মসূচী'র (যাতে সব কিছুই বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়) এবং 'ম্যাকসওয়েলের কর্মসূচী'র কথা বলতেন (যাতে প্রতিটি বিন্দুতে একটি বস্তুর গতি নির্ধারিত হয় তার পরে ক্ষেত্র কী কাজ করছে, তাঁর দ্বারা)—যে দুটি কর্মসূচী তাঁর কাছে পদার্থ-বিদ্যার কর্মসূচীর স্তম্ভস্বরূপ ছিল। আমরা এখানে এই বইয়ের নবম পরিচ্ছেদের শিরোনামে মেয়ারের উক্তিটি স্মরণ করতে পারি: "প্রকৃতি তার সহজ-সরল সত্যে মানুষের হাতের তৈরি কোনো সৃষ্টির এবং আধ্যাত্মিক কোনো মায়াজালের অপেক্ষা অনেক বেশি সুন্দর।"

সোলোভিনকে লেখা চিঠি থেকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশও আমরা এখানে

উদ্ধৃত করতে পারি : "যে বস্তুগুলিকে আমরা অন্য বস্তুদের মাপবার জন্যে ব্যবহার করে থাকি তাতে পূর্বোক্ত বস্তুরা যে শেষোক্তদের 'পরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সেটা আমরা অবহেলা করতে পারি না" এবং শেষ মন্তব্য : "যুক্তির বিরুদ্ধাচরণ না করে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না।"

বোর-এর তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর এই মন্তব্যের তুলনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, 'ধ্রুপদী আদর্শে' যে হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে, আইনস্টাইন সেই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করতেন না। 'পদার্থবিদ্যার সমাপ্তি ঘটবে' বলে তাঁর উক্তিটি বিষয়মুখী জগৎ সম্বন্ধে করা হয় নি, করা হয়েছে 'নিউটোনীয় কর্মসূচী'র এবং 'ম্যাকস্ওয়েলের কর্মসূচী'র পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে।

কোয়ান্টাম-রাশিবিজ্ঞানগত ধারণাগুলি সম্পর্কে আইনস্টাইনের মনোভাব ছিল জটিল, কিন্তু সেটার সম্পর্কে বোর যা উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার সঙ্গে মোটা-মুটিভাবে মিলে যায়। তিনি নিজের কাজের সঙ্গে ঐ সব ধারণার সংযোগ দেখতে পেতেন, তার থেকে পদার্থবিজ্ঞানে বিপদ আসতে পারে বলে মনে করতেন এবং তাঁর একটা অনুমান ছিল পরের গবেষণা এই সংকটকে কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং এই আশা পোষণ করতেন যে, প্রক্রিয়াগুলির সম্ভাব্যতা নয়, খোদ প্রক্রিয়াগুলির নির্ধারক মৌল গতিবিদ্যার নিয়মগুলিকেই আবিষ্কার করা যাবে,যেটা ধ্রুপদী তাপগতিশীলতার বিজ্ঞানে হয়েছিল।

দ্য ব্রগলি-র তত্ত্ব এই রকমের রাশিবিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যার সাহায্য না নিয়েই বোঝাবার চেষ্টা করত। আজ অতীত-স্মৃতি স্মরণ করে আমরা তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গগুলির মধ্যে সম্ভাব্যতার তরঙ্গকে কিছুটা যেন মনে করতে পারি। এই শতাব্দীর প্রথম পাদে পণ্ডিতেরা কণার গতির রাশিবিজ্ঞানগত নিয়ম-গুলিকে গতিবিজ্ঞানের নিয়মে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন অথবা তাঁরা অন্তত ঐ ধরনের গতিকে পথ দেখাবার মতো চালক-তরঙ্গের অস্তিত্বের সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। দ্য ব্রগলির তরঙ্গ এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গদের এককে অন্যের উপমা হিসাবে ব্যবহার করাতে এই নতুন তত্ত্বকে গ্রহণ করার সুবিধা হল এবং এই সঙ্গেই এটা 'বস্তুর তরঙ্গ'-এর বাস্তবতা সম্বন্ধে মনকে প্রস্তুত করে দিল। তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গগুলির সঙ্গে ফোটনদের কোনো-না-কোনোভাবে যোগ আছে, যদিও ঠিক কীভাবে তা বলা শক্ত। অনুমিত হল, একটা বাস্তব ক্ষেত্র-এর তীব্রতার যে বদল হয় তার প্রতিনিধিত্ব করে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গগুলি।

ড্য ব্রগলি-র তরঙ্গগুলিকে যেন কোনো বাস্তব ক্ষেত্র-এর প্রবহমান দোলায়মানতা বলেও গণ্য করা উচিত। তবে এই ধরনের আশা ও প্রকল্প শীঘ্রই 'সম্ভাব্যতার তরঙ্গের' ধারণায় স্থান নিল।

আগেই বলা হয়েছে, এই ধারণা সম্পর্কে আইনস্টাইনের মনোভাব ছিল জটিল। তিনি পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষবাদী সিদ্ধান্তগুলিকে এবং 'অনিশ্চয়তা'র ধারণাগুলিকে বরবাদ করলেন এবং তাঁর সমালোচনামূলক যুক্তির এই দিকটাকে খণ্ডন করা সম্ভব ছিল। বিশেষভাবে তাঁর পদার্থগত বিবেচনাগুলি এবং 'চিন্তা নিয়ে পরীক্ষাগুলি'-র উদ্দেশ্য ছিল হাইসেনবার্গ, বোর, বোর্ন এবং 'সম্ভাব্যতার তরঙ্গের' অন্য অনুগামীদের কাছ থেকে কিছু বিরুদ্ধ যুক্তি আদায় করা। একমাত্র আজকে, একটা সাধারণ ধারণাকে অথবা বলা যেতে পারে, তত্ত্ব সংক্রান্ত একটা অনুভূতিসঞ্জাত জল্পনাকে, যেটা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার চাইতে আরও সাধারণ এবং আরও সঠিক, একটা বিশেষ কাঠামোর মধ্যে এনে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এই ব্যাপারটা একটু অনুসন্ধান করে দেখা যাক।

১৯৩২ সালে বার্লিনে আইনস্টাইনের ফিলিপ ফ্র্যাংক-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। ফ্র্যাংক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার 'গোঁড়া' রাশিবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার এবং তা থেকে যে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষবাদী সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসত, তার পক্ষপাতী ছিলেন। এই সূত্রে ফ্র্যাংক আইনস্টাইনকে উদ্ধৃত করছেন :

"পদার্থবিজ্ঞানে একটা নতুন ফ্যাশান দেখা দিয়েছে। চতুরতার সঙ্গে রূপায়ণ করে কয়েকটি তত্ত্বগত পরীক্ষা করার পরে এটা প্রমাণ করা হয় যে, কয়েকটি পদার্থের পরিমাণগত মাত্রাকে (যার বিশালত্ব বা বিরাটত্ব আছে) মাপা যায় না অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, স্বীকৃত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী অনুযায়ী পর্যবেক্ষণাধীন বস্তুগুলির আচরণ এমনই যাতে তাদের মাপবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ থেকে তাই এই সিদ্ধান্ত টানা হয় যে, পদার্থবিজ্ঞানের ভাষাতে এই ধরনের পরিমাপের মাত্রাগুলিকে রেখে দেওয়ার কোনো অর্থই হয় না; তাদের সম্পর্কে কোনো কিছু বলাটা একেবারে নিছক অধিবিদ্যার পর্যায়ে পড়ে।"(১)

আইনস্টাইনকে এইভাবে বলতে শুনে ফ্র্যাংক উল্লিখিত ধারণাকে

১ **Ph. Frank, op. cit., p. 260.**

আপেক্ষিকতাবাদের মূল সূত্রগুলির সঙ্গে এক করে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। উদাহরণস্বরূপ "অনপেক্ষভাবে একই সঙ্গে ঘটছে", এই সম্পর্কিত ধারণাকে আপেক্ষিকতা বরবাদ করে এই যুক্তিতে যে, কোনো আসল অথবা কাল্পনিক পরীক্ষাতে বিভিন্ন ঘটনাবলী যেগুলি বিভিন্ন নির্দেশক কাঠামোতে পরস্পরের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে গতিশীল, তাদের নিয়ে কোনো আসল বা কাল্পনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়। কাজেই ফ্র্যাংক এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, আপেক্ষিকতাবাদ যে ধারণাগুলিকে বরবাদ করছে, তার কারণ তাদের পর্যবেক্ষণ করা যায় না। তিনি সেই মর্মে আইনস্টাইনকে বললেনও : "কিন্তু যে ফ্যাশানের কথা আপনি বলছেন, ১৯০৫ সালে আপনি তো সেটা আবিষ্কার করেছেন।"

"একটা ভালো রসিকতাকে কিন্তু বারবার করা যায় না," আইনস্টাইন জবাব দিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন যে, আপেক্ষিকতাবাদ বিষয়মুখী প্রক্রিয়া ও সত্যিকারের বাস্তব পদার্থগুলিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং সেই একই বাস্তবতার মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক আছে, সেটাই প্রতিষ্ঠিত করছে। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষবাদ ও 'নতুন ফ্যাশান'-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

বস্তুত, অতিক্ষুদ্র জগতের নিয়মগুলির কোয়ান্টাম-রাশিবিজ্ঞানগত চরিত্র থেকে গৃহীত প্রত্যক্ষবাদী সিদ্ধান্তগুলি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা থেকে আসে না। তত্ত্ব আর তার জ্ঞানতত্ত্বগত ব্যাখ্যার মধ্যে ফারাক যে অনেকখানি—সেটাই আইনস্টাইন বলতে চেয়েছিলেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মধ্যে আমরা একটা স্বাভাবিক 'জ্ঞানের বক্রতা' দেখতে পাই—যেটাকে একেবারে পরম সত্য বলে ধরে নিয়ে ব্যাখ্যা করলে এই জ্ঞানতত্ত্বগত ভাষ্যে গিয়ে পৌঁছতে হয়। ১৯৬০-এর দশকের পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এই 'বক্রতা'র মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ দিকটা আছে, সেটা ধ্রুপদী ধারণা থেকে যতটা না দূরে, তার থেকে তার অনেক বেশি দূরত্ব হচ্ছে ১৯২০-এর দশকের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সঙ্গে।

এর একটা প্রাথমিক ব্যাখার তাহলে দরকার আছে। আপেক্ষিকতাকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সঙ্গে তুলনা করা যাক। 'ইথারের পরিপ্রেক্ষিতে গতি', 'অনপেক্ষভাবে কয়েকটি ঘটনা একই সঙ্গে ঘটতে পারে', এবং এই রকমের আর কিছুকে পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করা যেতে পারে না। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই লোরেন্‌জ-এর তত্ত্বে এই ধরনের পরীক্ষামূলক পরিমাপের

অসম্ভাবিতা লক্ষ্য করেছি। গতি যে দিকে সেই দিকে যদি বস্তুগুলি দৈর্ঘ্যে সংকুচিত হয়ে যায়, তাহলে ইথারের সম্পর্কে কোনো পরীক্ষাই, তা সে আসলই হোক, যেমন মাইকেলসন-এর পরীক্ষাতে, অথবা কাল্পনিকই হোক, গতিকে রেকর্ড করতে পারে না।

আপেক্ষিকতা আরও দূরে যায়। ইথারের পটভূমিতে বাস্তব; বিষয়মুখী গতির অস্তিত্ব এই তত্ত্ব অস্বীকার করে (যেহেতু ইথার আছে কি, না, তা খুঁজে পাওয়া যায় না) এবং উক্ত গতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পদার্থগত ধর্মকেও এ মানে না। যখন পর্যবেক্ষণ করাটা বাস্তবতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় তখন লোরেন্‌জ-এর সঙ্গে আইনস্টাইনের ধারণাগুলির যে প্রভেদ, সেটাও আর থাকে না। বিষয়মুখী বাস্তবতার এই স্বীকৃতি এই প্রভেদকে বিশেষ গুরুত্ব দান করে। ইথারের মাধ্যমে গতির ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট সকল রকমের ধ্রুপদী ধারণা থেকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে এবং তাদের সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে ঘোষণা করেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে 'অবস্থান' এবং 'গতিবেগ' বলে ধারণাগুলিতে অনেকগুলি শর্ত আরোপ করে তার প্রয়োগকে সীমিত করা হয়েছে। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে এই ধরনের ধ্রুপদী ধারণাগুলি ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না; এই ধ্রুপদী ধারণাগুলি ছাড়া সেটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। বস্তুত, ক্ষুদ্র দেশ-কাল-এর জগতে কণাগুলি স্থানাঙ্ক অথবা গতিবেগ অধিকার করে না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ধ্রুপদী ধারণাগুলি থেকে অত মৌলিকভাবে বিচ্যুত হয় না। এটা (অর্থাৎ; কোয়ান্টাম বলবিদ্যা) একটা কণার অবস্থান ও গতিকে ততটা চূড়ান্তভাবে বরবাদ করে দেয় না, যেভাবে আপেক্ষিকতা পরম দেশ, কাল ও গতির ধারণাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এ থেকে অবশ্য এটা বোঝা যায় না যে, আপেক্ষিকতা ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা থেকে আরও দূরে সরে গেছে। বরঞ্চ এর উলটোটাই হয়েছে। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা যদিও কণার অবস্থান ও গতিবেগ একেবারে বরবাদ করে নি, তাহলেও এই ধারণাগুলি নিউটনের পরম ধারণার চাইতে, যার সঙ্গে ধ্রুপদী আদর্শের সংঘাত ছিল, অনেক বেশি মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। আরও বেশি মাত্রার বিপ্লবী কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ধ্রুপদী আদর্শকে পরিচ্ছন্ন বা 'শোধন' করে দেবে না, তাকে ধ্বংস করে দেবে।

গোড়াতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ধ্রুপদী আদর্শকে শুধুমাত্র সীমিত করে দিয়েছিল। গতিবেগের অনিশ্চয়তার পরিবর্তে কিছুটা নিশ্চিতভাবে একটা কণার অবস্থান নির্ধারণ করা সম্ভব; আবার উলটে দেখলে, অবস্থানের অনিশ্চয়তার পরিবর্তে গতিবেগকে কিছুটা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে কিন্তু এটা ঠিক করা হয়েছিল যে, প্রতিটি ক্ষুদ্র কণার রাজত্বে (বা একটা পুরো ব্যবস্থাতে—অনুবাদক) একটা কণার অবস্থান নির্ধারণ করা একেবারে ঠিক-ঠিক ভাবে অসম্ভব, এমন কি যখন তার গতিবেগের অনিশ্চয়তা রয়েছে। তারপরে নতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হল যাতে পরমাণুর অভ্যন্তরীণ চরিত্র থেকে ধ্রুপদী ধারণাগুলি আগের চাইতে অনেক বেশি দূরে চলে গেল।

পদার্থবিজ্ঞানের এই ঘরানা (বা স্কুল, যেটা পরের পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে) কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল। নিয়েল বোর এই শেষোক্তের মূল প্রতিপাদ্যগুলিকে ১৯২৭ সালের কোমো শহরে পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর যুক্তিগুলিকে তিনি 'আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা' নাম দিয়ে ১৯৪৯ সালে লিপিবদ্ধ করেছেন:

"এটা স্বীকার করে নেওয়াই আসল কথা যে, **ঘটনাবলী ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার ব্যাখ্যার চৌহদ্দি থেকে যত দূরেই যাক না কেন, তার সব রকমের প্রমাণ ধ্রুপদী সংজ্ঞার সাহায্যেই প্রকাশ করতে হবে।**"(১) এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরমুলা কারণ এতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ধ্রুপদী ইতিবাচক দিকটা ভালো করে প্রকাশ পেয়েছে। শেষোক্ত বক্তব্যটা থেকে বোঝা যায় যে, ধ্রুপদী ধারণাগুলি সকল পর্যবেক্ষণযোগ্য পদার্থগত ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যদিও কতটা সঠিকভাবে সেগুলিকে প্রয়োগ করা যাবে, সেটা ক্রমহ্রাসমান সঠিকতার পরে নির্ভরশীল।

যদি এমন ঘটনাবলীর অস্তিত্ব থাকে যেখানে ধ্রুপদী ধারণাগুলি **একেবারেই প্রয়োগ করা যায় না**, তাহলে সেই ঘটনাগুলি কোয়ান্টাম বলবিদ্যাতে এমন একটা সীমাবদ্ধতা এনে দেবে—যাতে সেটা কেবলমাত্র কিছু বাস্তব প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে পারে। তাহলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার

১ Philosopher-Scientist, p. 209.

সমালোচনা তার 'রক্ষা করার' দিকগুলির (ধ্রুপদী ধারণাগুলির তুলনাতে) বিরুদ্ধে চালিত হচ্ছে না, পরন্তু চালিত হচ্ছে উক্ত প্রয়োগের শর্ত সংক্রান্ত যে সূত্র তার বিরুদ্ধে। ধ্রুপদী ধারণাগুলিকে শর্তহীনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, সেই দিক থেকে সমালোচনাকে চালিত করতে হবে, চালিত করতে হবে এমন 'লুকানো' প্যারামিটারের (১) অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে, যাতে অতিক্ষুদ্র জগতের মধ্যে যে ঘটনাবলী রয়েছে, তাকে একেবারে সঠিকভাবে নির্ধারিত করা যায় এবং যাকে একেবারে বিনা শর্তে ধ্রুপদী ধারণাগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

কোমো-র কংগ্রেসে আইনস্টাইন যান নি। বোর-এর এবং নতুন তত্ত্বের অন্য প্রবক্তাদের কাছে ঐ বছর ব্রাসেল্‌স-এর পঞ্চম সোলভে কংগ্রেসে তিনি তাঁর আপত্তিগুলি উত্থাপন করেন। ১৯৩০ সালে এর পরের সোলভে কংগ্রেসে বিতর্কটা চলতেই থাকে; বোরকে বিশ্বাস করানোর জন্যে আইনস্টাইন কয়েক ধরনের বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত তত্ত্বগত পরীক্ষার কথা বলেন—নানারকমের শর্ত, বাক্‌স, দাঁড়িপাল্লা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে। বোর অবশ্য দেখিয়ে দেন যে, এই ধরনের নির্মাণকার্যেও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না। আইনস্টাইন ও বোর-এর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলেই তাঁদের আলোচনা চলত। পল এরেনফেস্ট এই সব আলোচনাতে যোগ দিতেন এবং তাঁর কাজ ছিল এই দুটি মানুষের তর্কের মধ্যে মধ্যস্থতা করা।

১৯৩৫ সালে পোদোলস্কি ও রোসেন-এর সঙ্গে সহযোগিতায় রচিত একটি প্রবন্ধে (চিন্তাগত নির্মাণকার্যের (thought constructions) ব্যাপারটা না এনে) কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমালোচনা করলেন আইনস্টাইন, 'পদার্থগত বাস্তবতাকে কি কোয়ান্টাম-গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে সম্পূর্ণ বর্ণনা করা যায়?'(২) বোর একই শিরোনাম দিয়ে তার জবাব দিলেন।(৩) কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ও আইনস্টাইনের মধ্যে পার্থক্যটা পরস্পরের যুক্তির মধ্যে দিয়ে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল।

১ parameter—অর্থাৎ, এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনা এমনভাবে যুক্ত যে প্রথমটির বদলের 'পরে দ্বিতীয়টির বদল হয়। —অনুবাদক।

২ Physical Review, 47, 777 (1935)

৩ Physical Review, 48, 696 (1935)

আইনস্টাইনের দার্শনিক অবস্থান ছিল স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ। ১৯৩৮ সালে সোলোভিন-কে লেখা একটা চিঠিতে তিনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং প্রত্যক্ষবাদের সম্পর্কের মধ্যে যে মুস্কিল দেখা দিয়েছিল তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যটি দেখিয়ে দেন। বিষয়ীমুখী প্রত্যক্ষবাদী মতামতের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "প্রকৃতির বিষয়মুখী বাস্তবতার ধারণাকে (অর্থাৎ, মন বা চিন্তার বাইরে বিশ্বজগতের স্বাধীন অস্তিত্বের ধারণাকে—অনুবাদক) সেকেলে সংস্কার বলে ধরে নেওয়া হয় এবং কোয়ান্টামের তাত্ত্বিকরা যেটা অপরিহার্যভাবে ঘটবেই, তারই নৈতিক উৎকর্ষ বা মূল্যকে মেনে নিয়েছে। মানুষেরা ঘোড়ার অপেক্ষা কোনো কিছু প্রস্তাবিত হলে বেশি প্রভাবান্বিত হয়, যে কারণে তাদের প্রতিটি কালপর্ব সম্পর্কে একটা ফ্যাশান আছে, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠরা তার উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুই অবহিত নয়।"(১)

"অপরিহার্যভাবে যেটা ঘটবেই তার নৈতিক উৎকর্ষ।" এক্ষেত্রে অপরিহার্যতা হচ্ছে ধ্রুপদী ধারণাগুলিকে অতি ক্ষুদ্র জগতের তত্ত্বে প্রয়োগ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা এবং মৌল কণাগুলির গতিকে বর্ণনা করতে হবে যুগ্ম বিষম রাশিগুলির(২) অনিশ্চয়তার দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে, যাতে নির্দেশিত প্রতিটি মুহূর্তে ও বিন্দুর বিষমরাশিগুলির সঠিক মূল্য (বা পরিমাণ) কী হবে তার সম্ভাব্যতা মাত্র পাওয়া যায়। ধ্রুপদী ধারণাগুলিকে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে বহু রকমের তথ্য দিয়ে যারা কণাগুলির তরঙ্গধর্মী ও কণীয় চরিত্র, উভয়কেই সমর্থন করে।

আইনস্টাইন যা বলতে চান, তাতে 'অপরিহার্যতা' থাকলেই (অর্থাৎ, এইভাবে দেখাটা বা ব্যাখ্যা করাটা প্রয়োজনীয়—অনুবাদক) অথবা তাঁর নিজস্ব ভাষায় একমাত্র 'বাইরে থেকে সমর্থিত' হলেই কোনো সমস্যাকে সমাধান করা যাবে না। একটা ধারণাকে তার সাধারণ পদার্থগত সূত্রগুলি থেকে বুঝে নিতে হবে। বিষয়মুখী বাস্তবতার জ্ঞানলাভ অসম্ভব—এই পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণাজাত অনিশ্চয়তার সম্পর্ক ও কোয়ান্টাম-বলবিদ্যার রাশিবিজ্ঞানগত চরিত্র জ্ঞান-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্যতা সৃষ্টি করে,

---

১ Solovine, p. 71.

২ যুগ্ম বিষমরাশি (conjugate variables)—অর্থাৎ একটির সঙ্গে অন্যটি গণিতের দিক থেকে এমনভাবে যুক্ত, যাতে একটি যেন অন্যটির গুণনীয়ক। —অনুবাদক।

এবং জগৎপ্রপঞ্চের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার সীমা বেঁধে দেয়। অপরিহার্যতা হয়ে দাঁড়ায় নৈতিক উৎকর্ষ। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যে রক্ষণশীল বক্তব্য, সেটা অপরিহার্যতার ফল রূপে রইল না, যে সব ঘটনাকে আরও বিশদ করা প্রয়োজন তার প্রস্তাবিত ব্যাখ্যার ফল হিসাবেও রইল না। তাকে (অর্থাৎ, কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে) ধরে নেওয়া হল যেন পূর্ব থেকে সিদ্ধান্ত করা জ্ঞানের গুণাবলীর প্রকাশ—যেটা 'নৈতিক উৎকর্ষ' থেকে আসছে। আইনস্টাইনের কাছে কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চের যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোনো রকমের বাঁধাবাঁধি করাটা, অনিশ্চয়তাবাদ, অথবা বাস্তবতার বিষয়মুখী চরিত্রের অস্বীকৃতি—বিজ্ঞানের অলঙ্ঘনীয় ও পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করার মূল নীতিগুলি থেকে দূরে সরে যাওয়া বলে মনে হয়েছিল। তিনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যাতে সেই 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা' চেয়েছিলেন, যাকে বিষয়মুখী বাস্তবতার এবং আরও সাধারণভাবে যুক্তিগ্রাহ্যতার ধারণা থেকে পাওয়া যেতে পারে।

আইনস্টাইন দেখেছিলেন যে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যাতে রাশিবিজ্ঞানগত সম্ভাব্যতা(১) অভিজ্ঞতার পরিপন্থী নয়। তবে তাঁর কাছে এই তথ্য কিন্তু অণুবিশ্বের কোনো কিছুকে একেবারে নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায়—এই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে না। আইনস্টাইন মনে করতেন যে, একটা প্রাথমিক প্রক্রিয়ার ছবি ভাবা যেতে পারে, যার পথরেখাকে একেবারে সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। সত্য সত্যই এটা নীতিগত ভাবে সম্ভব কি, না, সেটা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অন্যতম বিতর্কমূলক বিষয়বস্তু।

১৯৫০ সালে আইনস্টাইন স্লোলোভিনকে লিখলেন:

"প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিক থেকে একেবারে সঠিকভাবে কোনো কিছুকে নির্ধারণ করার অবস্থা হতে পারে না। এ ব্যাপারে আমাদের সম্পূর্ণ মতের মিল আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃতির বর্ণনাতে কি বলা যায় যে, কোনো কিছুকে নির্ধারণ করা যায়? তাছাড়া আরও বিশেষ প্রশ্ন রয়েছে যে, স্বতন্ত্র বস্তুগুলির এমন ভাবগত ধারণা করা কি সম্ভব, যেটা নীতিগতভাবে রাশি-

১ রাশিবিজ্ঞানগত সম্ভাব্যতা বলতে এখানে যেটা বলা হচ্ছে, সেটা হল পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে বিভিন্ন শক্তিস্তরের কক্ষপথে অবস্থিত ইলেকট্রন কণাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ধরা যাবে না, তাদের রাশিবিজ্ঞানগত সম্ভাব্যতার মধ্যেই বুঝতে হবে।—অনুবাদক।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে করা যাবে, একমাত্র এইখানে আমাদের মতের প্রভেদ থাকতে পারে।"(১)

মৌল কণাগুলির রাশিবিজ্ঞান-বহির্ভূত (non-statistical, অর্থাৎ রাশিবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া—অনুবাদক) ব্যবহারিক নিয়মগুলি সম্পর্কে আইনস্টাইনের ভাবনাচিন্তা ছিল অনুভূতিসঞ্জাত এবং তিনি কখনও তাদের কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পের মধ্যে সূত্রায়িত করেন নি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আগের যুগের পদার্থবিদ্যাকে আবার পুনর্বাসন করতে হবে—ঐ ভাবে তিনি কখনও দেখতেন না। এই সময়ে অ-ধ্রুপদী (non-classical) অবস্থান থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমালোচনা কোনো বাস্তব চেহারা নিতে পারে নি এবং সেটা ধোঁয়াটে এবং প্রধানত অনুভূতিসঞ্জাত চিন্তার ঝোঁক রূপেই রয়ে গেল। এই প্রশ্নে আইনস্টাইনের অনেক উক্তিই তাঁর কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে সমালোচনার ধারাতেই করা হয়েছে।

১৯৩৬ সালে ফ্র্যাংকলিন ইনস্টিটিউট-এর পত্রিকায় 'পদার্থবিদ্যা ও বাস্তবতা'(২) শীর্ষক প্রবন্ধে আইনস্টাইন লিখেছিলেন যে, কোয়ান্টাম-বলবিদ্যার কোনো বর্ণনা যে একেবারে চূড়ান্ত বা পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য হতে পারে, এটাকে দ্বন্দ্বমুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে, এটা তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুভূতিসঞ্জাত মনোভাবের এত বিরোধী যে, তিনি এর চাইতে আরও কোনো পূর্ণাঙ্গ ধারণার জন্যে অনুসন্ধানের কাজ কখনও ছেড়ে দিতে পারেন না। 'আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা'-তে এর জবাব দিতে গিয়ে বোর একবার অন্যভাবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন: "কোয়ান্টাম বলবিদ্যাতে আমরা পারমাণবিক ঘটনাবলীর আরও খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনকে যে খেয়ালখুশিমতো পরিত্যাগ করার কথা ভাবছি তা নয়, আমরা এটা দেখেছি যে, এই ধরনের বিশ্লেষণ **নীতিগতভাবে** বাদ দেওয়া হচ্ছে।"(৩)

এই ধরনের 'আরও খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ' বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, গতিময় পরিবর্তনশীলদের, যেমন একটা বস্তুর অবস্থান ও গতিবেগকে বেশ খানিকটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এই

১ Solovine, p. 99.

২ Ideas and Opinions, p. 290.

৩ Philosopher-Scientist, p. 235.

সঠিকতাকে এই শর্তের দ্বারা সীমিত করছে : একটা পরিবর্তনশীল গুণনীয়ক যতটা তীব্র হবে, অন্যটা তত কম তীব্র হবে। তবুও নিম্নলিখিত প্রশ্নটার সমাধান হল না : অতিক্ষুদ্র এবং অতিক্ষুদ্রতর জগতে নীতির দিক থেকে অবস্থান ও গতিবেগের ধারণাগুলির প্রয়োগের কোনো সীমা আছে কি ?

১৯৩৭ সালে বোর যখন প্রিন্সটনে যান, তখন আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর আলোচনার একটা কৌতুকজনক দিক ছিল, যেটা হল স্পিনোজা বেঁচে থাকলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তর্কতে কোন্ পক্ষ(১) অবলম্বন করতেন ? আইনস্টাইনের কাছে স্পিনোজার দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল জগৎপ্রপঞ্চের ঐক্য ও নিশ্চয়তা এবং বিষয়মুখী ও বস্তুগত প্রকৃতির সাধারণ প্রকাশ। আইনস্টাইন এই ধারণাকেই তাঁর 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা' এবং 'বাইরের জগতের কাছ থেকে সমর্থন'-এর মধ্যে মূর্ত করেছেন। তিনি দেখেছেন, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা তাদের সন্তুষ্ট করে না। আমরা এখন জানি যে, একেবারে নতুন সূত্রগুলিকে মূর্ত ক'রে যে ঘটনাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে, তার পর কোয়ান্টাম বলবিদ্যার এই অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় ; এটা এমন একটা অবস্থা যা যে-কোনো তত্ত্বকে বানচাল করতে পারে।

"পদার্থগত বাস্তবতার প্রতিটি উপাদানেরই পদার্থগত তত্ত্বে একটি পালটা দিক থাকতে হবে", লিখছেন আইনস্টাইন, পোদোলস্কি ও রোসেন। তাই যদি অবস্থা হয় তা হলে আদালতে হাজির হয়ে একজন সাক্ষীকে যেমন শপথ নিতে হয় যে, "সত্য, **পুরা সত্য** বলিব এবং সত্য ছাড়া আর কিছু বলিব না", তেমনি একটা পদার্থগত তত্ত্বে বাস্তবতার পুরো বর্ণনাটা পাওয়া যাবে। তবুও তাঁর ১৯৪৯ সালের আত্মজীবনীতে আইনস্টাইন এমন একটা তত্ত্ব বেছে নেবার মানদণ্ডের কথা বলতে চান, যেটা **আপেক্ষিকভাবে** 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা' এবং 'বাইরের থেকে সমর্থন' দেবে। এই দুটি সংজ্ঞা বিজ্ঞানকে এমন এক পথে চালনা করবে যেটা সত্যকে অনিঃশেষভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে কিন্তু '**পুরো** সত্যে'র কোনো গ্যারান্টি দেবে না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উক্তিতে আইনস্টাইন পদার্থগত বাস্তবতার বর্ণনার ক্ষেত্রে একেবারে চূড়ান্ত সম্পূর্ণতার মানদণ্ড কী হবে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আজ কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে যখন আমরা অনেক বেশি সাধারণ ও সঠিক তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করে দেখি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, পদার্থগত বাস্তবতার এটা একটা **আপেক্ষিকভাবে**

অসম্পূর্ণ বর্ণনা মাত্র। 'এই অসম্পূর্ণতাটি যে কোনো বলবিজ্ঞানে রয়েছে—যাতে অপরিবর্তনীয় কণাদের গতি হল কয়েকটি মৌলিক প্রক্রিয়া এবং 'নিউটনীয় ধাঁচের' যে কোনো বলবিদ্যাতেও নিহিত রয়েছে,— এটা কেবলমাত্র এখন পরিস্ফুট হয়েছে। কেবলমাত্র এখন আমরা নতুন জগৎপ্রপঞ্চের ছবির রূপরেখাকে একটা প্রতিপাদ্য হিসাবে (অর্থাৎ, প্রমাণিত হয় নি) উপস্থিত করতে পারি; যেটা 'নিউটোনীয় ধাঁচের' বলবিদ্যাতে পাওয়া যায় তার অপেক্ষা অনেক বেশি বোধগম্য; সামগ্রিক এবং সঠিক হবে। আগেকার দিনে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে জগৎপ্রপঞ্চের বর্ণনাতে যে সম্পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যেত, সেটা আরও ব্যাপক ধারণাগুলির অনুভূতিসঞ্জাত পূর্বলক্ষণ নির্ধারণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেটা আইনস্টাইনের ম্যাকস বোর্নকে লেখা চিঠিতে যে বাণী উদ্ধৃত আছে, তাতে পাওয়া যাবে। 'পাশার দান ফেলছে যে ঈশ্বর'—এর দ্বারা আইনস্টাইন বোঝাতে চাইছেন সেই ধারণাকে—যে ধারণা অনুযায়ী, রাশিবিজ্ঞানের নিয়মগুলি পদার্থগত বাস্তবতার মৌলিক নিয়ম।

"আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রত্যাশাতে আমরা দুই বিপরীতে মেরুতে গিয়ে পৌঁছেছি। তুমি বিশ্বাস করো ঈশ্বর পাশার দান ফেলে চলেছেন আর আমি প্রচণ্ড জল্পনামূলকভাবে হলেও ধরবার চেষ্টা করি সেই জগৎকে যার বিষয়মুখী অস্তিত্ব আছে এবং যেখানে নিখুঁত নিয়ম বিরাজ করছে। আশা করি, আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে কেউ-না-কেউ আরও বাস্তবসম্মত পথে অথবা অনেক বেশি দৃঢ় ভিত্তিভূমির 'পরে একে পাবার চেষ্টা করবে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের মস্তবড় প্রাথমিক সাফল্য আমাকে কিন্তু ঐ পাশার দানের চালের 'পরে মূলগত বিশ্বাস স্থাপন করতে বলে না।"(১)

"ঈশ্বর পাশার দান ফেলেন না।" আইনস্টাইন এখানে 'ঈশ্বর' বা 'দেবতাকে' কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক পটভূমিতে বলেছেন এবং এটা আবার নিশ্চয়ই বিষয়মুখী যুক্তির নামান্তর মাত্র—যেটা হল বাস্তবতার সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মগুলি রাশিবিজ্ঞানের নয়, এরা ঘটনাবলীর সম্ভাব্যতাকে নয়, আসল ঘটনাবলীকেই নির্ধারণ করে। আমরা দেখেছি; গভীরতর ও অনেক বেশি সাধারণ নিয়মগুলি যে তাপগতিবিজ্ঞানের দৃশ্যপটের পেছনে কাজ করে

১ M. Born, Natural Philosophy of Cause and Chance, Clarendon Press, Oxford, 1949, p. 122.

যাচ্ছে, সেটা ব্রাউনীয় গতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের কাজের একটা পথের বাঁক ছিল। আইনস্টাইন বুঝেছিলেন (আমরা আগে এটার উল্লেখ করেছি) যে তাপগতিবিজ্ঞানের রাশিবৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিকে, অর্থাৎ সামগ্রিক কোনো ব্যবস্থাপনার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করছে যে নিয়মগুলি, তাদের স্থান পরিবর্তনের এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মের মধ্যে নামিয়ে আনা যায় না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সরল এবং সাধারণ গতির রূপ থেকে গতির উচ্চতর চেহারাকে যে আলাদা করা যায় না—এতে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল।

আলাদা-আলাদা কণাদের চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রিত করে যে রাশিবিজ্ঞান-গত নিয়মগুলি তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিল। এই নিয়মগুলির দ্বারা অন্যান্য গতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গতিবিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে ব্যাখ্যা করা গেল না, যেটা তাপগতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটল। তা সত্ত্বেও আইনস্টাইন রাশিবিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে মৌলিক বলে মেনে নিতে পারলেন না।

বাস্তবতার সর্বজনীন গতিশীল নিয়মগুলিকে বোঝাবার জন্যে যে প্রচেষ্টাগুলি একেবারে 'খাপছাড়া জল্পনামূলকভাবে' করা হচ্ছিল, আইনস্টাইন তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তিনি আশা করছিলেন যে, ভবিষ্যতে 'আরও অনেক বেশি ঐ ধরনের ধারণার উপযোগী দৃঢ় ভিত্তি' পাওয়া যাবে। সেজন্যে বোর্ন-এর কাছে কোনো বিশেষ যুক্তি তিনি দিতে পারলেন না এবং কেবলমাত্র আত্মমুখী অনুভূতিসঞ্জাত জ্ঞানের কথা বললেন, যা থেকে জগৎপ্রপঞ্চের সর্বজনীন গতিশীল নিয়মশৃঙ্খলাতে তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি বোর্ন-কে লিখেছেন, "পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে আমার মনোভাবকে আমি এমনভাবে জোরালো করতে পারি না যাকে আপনি যুক্তিগ্রাহ্য বলতে পারেন। আমি অবশ্য দেখতে পাচ্ছি যে, রাশিবিজ্ঞানগত ব্যাখ্যাতে (যার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান প্রচলিত রীতির কাঠামোতে প্রথম আপনার দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল) যথেষ্ট সত্য রয়েছে। তবুও আমি এটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে পারছি না, কারণ পদার্থবিজ্ঞান দূরত্বের প্রক্রিয়ার মায়াময় কল্পনাকে বাতিল করে, যে দেশ ও কাল-এর বাস্তবতাকে মানতে হয়, তার পেছনে যথেষ্ট সত্য আছে।... আমি স্থির বিশ্বাস করি যে, শেষ অবধি এমন একটা তত্ত্বে আমরা উপনীত হতে পারবো যাতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্পর্কগুলি সম্ভাব্যতা দিয়ে নয়, পরন্তু ধারণাগত তথ্যের দ্বারা নির্ধারিত হবে, যেটা মাত্র কিছুদিন আগেও লোকে

ধরে নিত। তবে আমার যুক্তির জন্যে আমি যুক্তিসম্মত কারণগুলি দেখাতে পারছি না, আমি কেবলমাত্র আমার ছোট আঙুলটাকে সাক্ষী মানতে পারি, যে আমার চামড়ার বাইরে আর কোনো কর্তৃত্বকে মানবার দাবি করে না।"(১)

এর কিছুদিন পরেই আইনস্টাইন বোর্ন-কে আবার লিখলেন, বোর্ন এর সঙ্গে দেখা করতে তখন তিনি বিশেষ আগ্রহী :

"আমি বুঝতে পারি কেন আপনি আমাকে পুরানো পাপী বলে মনে করেন। আমিও অবশ্য বুঝতে পারি, কী করে একলা এই পথে আমি এসেছি তা আপনি বুঝতে পারেন নি। আপনি নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেবেন না তবে এতে আপনার মজা লাগতে পারে। আমি আপনার প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের মঞ্চটিকে একটু ছুঁয়ে দেবার সুযোগ পেলে খুশিই হবো। তবে মনে হয় সেটা এ জন্মে করার সুযোগ আমার না হওয়াই সম্ভব।"(২)

সেলিগ-এর অনুরোধে বোর্ন এই চিঠির জবাব দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি প্রত্যক্ষবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নন এবং আইনস্টাইন রক্ষণপন্থী নিশ্চয়তাবাদের অনুগামী। শেষোক্ত বক্তব্যটাকে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

রাশিবিজ্ঞানগত নিয়মগুলিকে আইনস্টাইন পদার্থগত বাস্তবতার মৌলিক নিয়ম বলে স্বীকার করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল যে, মৌলিক নিয়মগুলি ঘটনাবলীকেই নির্ধারণ করে, কেবলমাত্র তাদের সম্ভাব্যতাকে নয়। সেলিগকে একটা চিঠিতে তিনি লেখেন দেশ-এর প্রতিটি বিন্দুতে ঘটনাবলীকে নির্ধারণ করে যে-ক্ষেত্র, তার ধারণা একেবারে প্রাথমিক।

"সমসাময়িকদের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি সম্পর্কে আমার মতের অমিল রয়েছে এবং আমি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে কিছু বলার দাবি করতে পারি না। মৌলিক নিয়মগুলির রাশিবিজ্ঞানগত চরিত্রের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না এবং প্রায় সর্বব্যাপী মতের বিরুদ্ধে আমি সত্যই মনে করি যে, ক্ষেত্র-এর ধারণা অন্তত আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত, যদি না সেটাই শেষ কথা হয় এবং সেটার ধারণা একেবারে প্রাথমিক।"(২)

জেমস্ ফ্র্যাংককে লেখা একটা চিঠিতে তিনি বলছেন :

"আমি মনে করতে পারি যে ঈশ্বর কোনো প্রকৃতির নিয়ম ব্যতিরেকেই

১ M. Born, op. cit., 1949, p. 122.

২ C. Seelig, op. cit., S. 395.

এই জগৎপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি করেছেন। এক কথায় সৃষ্টির আগে পদার্থের পিণ্ডাবস্থা (chaos বা বিশৃঙ্খলা) ছিল। কিন্তু রাশিবিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে যদি চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে হয় এবং ঈশ্বর যেন এখানে পাশার দানের মতো বাজি ফেলছেন, সেটা আমার কাছে একেবারেই গ্রহণীয় নয়।"(১)

১৯৪৮ সালে ইনফেল্ডকে লিখতে গিয়ে, একজন পদার্থবিদ, যিনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনার উল্লেখ করেছেন আইনস্টাইন। আইনস্টাইন বলছেন যে, ঐ আলোচকের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী দক্ষতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

"কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা চালানো আমার পক্ষে বড মুস্কিল হচ্ছিল কারণ বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁর যুক্তির জোর যেখানে ছিল, সেখানে আমার ছিল না। যেখানে নীতিগত প্রশ্নটা নিয়েই সমস্যা দেখা দিল, সেখানে তাঁর বক্তব্য যতোই ছাপ ফেলুক না কেন, তিনি আমার যুক্তিসম্মত সরলতার প্রতি নিষ্ঠা অথবা তাত্ত্বিক মানদণ্ডের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারটা বুঝতেই পারলেন না। যারা মনে করে যে কোয়ান্টাম তত্ত্বে সমস্যার আসল শাঁসটুকুকে (বা প্রধান যুক্তিটুকুকে—অনুবাদক) ধরা যায়, তারা আমার অবস্থানকে অদ্ভুত এবং অসম্বদ্ধ বলে মনে করেছে।"(২)

এই চিঠিটিই আইনস্টাইনের 'যৌক্তিক সরলতা'র অর্থকে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। এটা বাস্তবতার একটা সত্তাতত্ত্ববাদী বৈশিষ্ট্য, এতে বিষয়মুখী যুক্তির প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার বিষয়মুখী নিশ্চয়তার (determinacy) কথা বলা হয়েছে। আইনস্টাইনের কাছে পরমভাবে কোনো কিছু যুগপৎ ঘটার বিষয় থেকে এবং পরম দেশকে ইচ্ছামতো ধরে নেওয়ার সূত্র থেকে মুক্ত হয়ে এই নিশ্চয়তার প্রকাশ ঘটে।

এই দিক থেকে তত্ত্বটি তার সৃষ্টিকর্তাকে অনেকখানি পেরিয়ে গেছে। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির সমতা পারমাণবিক যুগের প্রবর্তন করেছে, পদার্থগত তত্ত্বের পরিসরে এক অণুর অন্য অণুতে রূপান্তরের কথা বলেছে। আইনস্টাইনের কাজের মূল উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এর কোনো প্রভাব পড়ে নি, যার উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা তত্ত্বকে গড়ে তোলা যাতে অপরিবর্তনশীল বস্তুর গতিটা মৌলিক ধারণা রূপেই থাকবে।

১ Ibid., 396.

২ Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 59, Issue 1, p. 174.

লিওপোল্ড ইনফেল্ড তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখছেন :

"পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান স্রোতোধারা থেকে আইনস্টাইন যে বিচ্ছিন্ন এবং এককভাবে রয়েছেন তা দেখাটা সুখের ছিল না। কয়েকবার এই মানুষটি, যিনি ছিলেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো পদার্থবিদ, আমাকে প্রিন্সটনে বলেছেন : "পদার্থবিদরা আমাকে মনে করে একটা বুড়ো বোকা লোক, কিন্তু আমি স্থিরভাবে বিশ্বাস করি যে, পদার্থবিজ্ঞানের ভবিষ্যতের বিকাশ আজকের পথ থেকে সরে যাবে।" আজকের দিনে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে আইনস্টাইনের আপত্তির জোরটা একটুও কমে নি। বরঞ্চ এখন আমি মনে করি, ১৯৩৬ সালে তিনি যতটা নিঃসঙ্গ ছিলেন, তার থেকে আজ অনেক কম।"(১)

বস্তুত পঞ্চাশের দশকে, ইনফেল্ড যখন এই কথাগুলি লিখেছেন এবং বিশেষ করে ষাটের দশকে, পদার্থবিজ্ঞান সেই বিশ্বচিত্রের সীমায় পেঁাছে যায়, যেটা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছিল, যার বিস্তৃতি ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে বর্তমান শতাব্দীতে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লোকে মনে করত যে, জগৎটাকে ব্যাখ্যা করতে হলে দেশ-এর পটভূমিতে কণাগুলি কিভাবে গতিশীল সেই ছবিটা আঁকলেই চলবে—এমন একটা ছবি যা সমস্ত অণুর অবস্থান ও গতিবেগকে ঠিক করে দিতে পারে, তারা মনে করত সেই ধরনের ছবি পদার্থগত বাস্তবতার ব্যাখ্যাকে একেবারে সম্পূর্ণ করে দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা বুঝলেন যে, অণুদের গতি ঘটনাবলীর মর্মবস্তুকে বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং এমন ধরনের জটিল প্রক্রিয়াগুলি রয়েছে যা কিনা যান্ত্রিক মডেলের সাহায্যে বোঝানো যাবে না। বিংশ শতাব্দীতে আইনস্টাইন দেখালেন যে, অণুদের গতি এবং সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুদেহ নিউটনের ধ্রুপদী নিয়মগুলি মেনে চলে না; কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আরও পরিষ্কার করে বলে দিল যে, অণুর গতি ঠিক করাটা একটা জটিল প্রক্রিয়া, যাতে একটা অণুর অবস্থান ও গতিবেগ যুগপৎ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। 'ধ্রুপদী আদর্শে'র এ একটা সীমানা নিশ্চয়ই। প্রাথমিক কণাদের আবিষ্কার এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণীকরণ, যা পরের পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে, এই 'আদর্শ'কে বরবাদ করে দেবার জন্যে একটা মৌল ভিত্তি তৈরি করে দিল। একে বরবাদ করার যে

১ Ibid., p. 173.

প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল, সেটা বহুলাংশে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্র গুলির পরিষ্কার ব্যাখ্যার 'পরে নির্ভর করছিল, যেটা উদ্ভূত হয়েছিল আইনস্টাইন এবং রক্ষণশীল সম্ভাব্যতাবাদের ধারক-বাহক ব্যাখ্যাকারদের আলোচনা থেকে।

একদিক থেকে দেখতে গেলে এই আলোচনাগুলি বোর ও রক্ষণশীল মতের অনুগামীদের নিজস্ব অবস্থানকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করতে প্ররোচিত করেছিল। আইনস্টাইনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার এবং আলোচনার প্রসঙ্গ তুলে বোর 'পদার্থগত সমস্যার মস্কো ইন্সটিটিউট'-এর লেকচারে বলছেন :

"ঐ কথাবার্তার পরে আমরা প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ করতাম এবং তর্কও করতাম। আজকের দিনে যারা প্রথম এই নিয়ে কাজ করছে তারা এর অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব জানে, যা এক সময়ে আমাদের মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আজ যখন আইনস্টাইন আমাদের মধ্যে নেই, তখন আমি বলতে চাই যে, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যাকে নিখুঁত করে তোলার জন্যে তিনি তাঁর চিরন্তন, অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অনেক কিছু করেছেন, তত্ত্বগুলির ধ্রুপদী সম্পূর্ণতা দান করার জন্যে, একীভূত কাঠামো সৃষ্টি করার জন্যে প্রয়াস করেছেন—যার ভিত্তিতে পুরো পদার্থগত ছবিটা তৈরি করা যাবে। পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ, যেটা মনে হয়েছিল আগের পর্যায় থেকে অবিসম্বাদীভাবে বেরিয়ে আসছে, তিনি তার মধ্যে এমন দ্বন্দ্ব খুঁজে পেয়েছেন, যেটা পদার্থবিজ্ঞানের আরও অগ্রগতির ক্ষেত্রে উদ্দীপক শক্তির মতো কাজ করেছে। প্রতিটি স্তরেই আইনস্টাইন বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং ঐ চ্যালেঞ্জগুলি না থাকলে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের বিকাশ হতো আরও মন্থর গতিতে।" (১)

দ্বিতীয়ত, এই আলোচনাগুলি চলার মাধ্যমে সমালোচনামূলক মঞ্চটি বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, প্রক্রিয়াগুলির খানিকটা বিশেষ চৌহদ্দির মধ্যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কোনো অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ উপস্থিত করে না। এদিক থেকে দেখতে হলে নিউটোনীয় বলবিদ্যা থেকে তার প্রভেদ রয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ছিল, যেমন দূরের বস্তুর প্রতি তাৎক্ষণিক কোনো ক্রিয়া ঘটানো, পরম কাল এবং পরম গতির মাপকাঠি হিসাবে জাড্যের বল, যেটা 'ধ্রুপদী আদর্শে'র সঙ্গে

---

১ Nauka i Zhizn (Science and Life), 1961, No. 8, p. 73.

সংঘাত উপস্থিত করে, যেটা 'নিউটোনীয় ছাঁচ'-এর বলবিদ্যার সর্বজনীন ভিত্তিস্বরূপ।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ধ্রুপদী বিষয়ের অস্তিত্ব ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল এবং এর মধ্যে এমন কিছু ছিল না যা মৌল সূত্রের বিরোধিতা করে এবং মনগড়া অনুমানের সাহায্যে কাজ চালায়। কাজেই এখান থেকে নিউটোনীয় বলবিদ্যার চাইতে ভিন্নভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল—যদি একেবারে নতুন তথ্যগুলিকে পেশ করা হতো, যদি এমন একটা নতুন জগৎ আবিষ্কৃত হতো, যেখান কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রাথমিক প্রতিপাদ্যগুলির কোনো স্থান হতে পারে না।

প্রাথমিক কণাগুলির পদার্থবিজ্ঞানে এই ধরনের তথ্য জমা হতেই লাগল। কিন্তু আইনস্টাইনের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমালোচনার অস্ত্রসম্ভারের মধ্যে সেগুলি স্থান পায় নি এবং প্রথম দিকে তাঁর সমালোচনার এমন কোনো মূল্য ছিল না যা থেকে অপর পক্ষ নিজেই সঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে। মনে করা হতো, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বকে অনুসন্ধান করার মতো এরও কোনো উদ্দেশ্য নেই। এ থেকে ঠিক সেই সুরেই আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক কাজকর্মকে প্রায় নিষ্ফল বলে মনে করা হল—যখন তাঁর প্রতিভা একেবারে উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে পারত। এই ধরনের সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া মুশকিল।

এই ধারণা যে, আইনস্টাইনের সমালোচনা (তথা একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান) একেবারে নিষ্ফল—সেটাকে আমরা সেই ধরনের সমালোচনা বলছি যা থেকে অনুসন্ধানের পথ বেরিয়ে আসে, তার 'পরে নির্ভর করে। দ্ব্যর্থহীন, ইতিবাচিক পদার্থগত তত্ত্বের মধ্যে একটা আপাত ও আশু অনুসন্ধানমূলক মূল্য আছে। কিন্তু যে-সব ধারণা সবে গড়ে উঠছে এবং তখনও কোনো সুস্পষ্ট ইতিবাচক রূপ নেয় নি, সেগুলি এমন অনুসন্ধান-মূলক মূল্য বহন করে (যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য স্পষ্ট নয়) যা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে সেগুলিকে রেখে দেয়।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যাতে আইনস্টাইনের সমালোচনার যে প্রশ্নগুলি রয়েছে আজ তার বিষয়মুখী অর্থ যথেষ্ট পরিষ্কার। হাইসেনবার্গ ও বোর একটা গতিশীল প্রাথমিক কণা ও অন্য একটি বস্তু-দেহের,—যার অবস্থান ও গতিবেগ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন। এই ধরনের বস্তু-দেহ যেমন একটা রন্ধ্র, যার মধ্যে দিয়ে একটি

কণা চলে যায়, নিশ্চয়ই পরীক্ষা চলাকালে সেটা গতিবিহীন থাকে। শেষ বিচারে রন্ধ্রটি নিজেই যে-কণাগুলি দিয়ে তৈরী—যাদের অবস্থান অথবা গতিবেগ নেই—এই তথ্যটুকু আমরা হিসাবের মধ্যে ধরি না। একবার যখন আমরা কোয়ান্টাম-পারমাণবিক ধারণাগুলিকে রন্ধ্র পর্যন্ত প্রসারিত করি, তখন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অর্থ হারিয়ে যায়, কারণ এতে প্রথমত, কোয়ান্টাম বস্তুগুলি (কণা) সম্পর্কে বক্তব্য থাকে এবং দ্বিতীয়ত, থাকে ধ্রুপদী বস্তুগুলি সম্পর্কে (রন্ধ্র)। কোয়ান্টাম বলবিদ্যাতে শুধুমাত্র নেতিবাচক মর্মবস্তু পাওয়া যায় না ; এ কেবলমাত্র একটা অণুর স্থানাঙ্ক এবং গতিবেগকে যুগপৎ একই সময়ে একেবারে সঠিকভাবে নির্ধারণ করার সম্ভাবনাকেই শুধু বরবাদ করে না। আগে যা বলা হয়েছে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ইতিবাচক মর্মবস্তু আছে ; এ ঘোষণা করে যে, একটা বিশেষ অবস্থাতে এবং বিশেষ কয়েকটি শর্ত-সাপেক্ষে একটি কণার অবস্থান ও গতিবেগ নির্ধারণ করা সম্ভব। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার এই ইতিবাচক মর্মবস্তুকে আরও বেশি মৌলিক (যে অর্থে ধ্রুপদী ধারণা-গুলিকে বরবাদ করে দেওয়া হয়) তত্ত্বগুলি দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, যাতে হাইসেনবার্গের শর্তগুলি ছাড়াই, এর সম্ভাবনাকে ঠিক করে দিয়ে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে, এই ক্ষেত্রজ পরিবর্তনশীল কণাগুলিকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।

ধ্রুপদী বস্তুকে বাদ দিয়ে জগৎপ্রপঞ্চকে দেখাটা নিশ্চয়ই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার চৌহদ্দির বাইরে যায়। এই ধরনের জগৎকে বর্ণনা করতে গিয়ে ধ্রুপদী ধারণাগুলিকে নিশ্চয়ই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ক্ষেত্রে যা করা হয় তার চেয়েও মৌলিকভাবে সংশোধন করে নিতে হবে।

বহু বছর ধরে ধারণা ছিল যে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে আইনস্টাইনের সমালোচনা এসেছে ধ্রুপদী অবস্থান থেকে—এটা ইতিহাসের অন্যতম একটা প্রধান ভ্রান্ত ধারণা। তাঁর সমালোচনার আসল বিষয়মুখী অর্থ হচ্ছে, এটা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সীমানা কতোটুকু, সেটাকে দেখিয়ে দেয়, যার পরে আরও অনেক বিপ্লবী তত্ত্ব রয়েছে।

ঠিক আক্ষরিক অর্থে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা নয়, ইতিহাসের দিক থেকে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা ; অর্থাৎ, বলতে গেলে, নতুন ধারণাগুলি মোটামুটি বেশ পরিষ্কার চেহারা নেবার পূর্বে ধারণাগুলির আসল রূপ পরিগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। আমরা শীঘ্রই এমন সব ধারণা নিয়ে আলোচনা করবো যাতে

আমাদের পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে আইনস্টাইনের কী অবস্থান ছিল তা আমরা বুঝতে পারবো। সত্য বটে, এটা কেবলমাত্র বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন নয়, এতে আইনস্টাইনের ধারণাগুলির বিবর্তনও বুঝতে পারা যাবে। বহু বছর ধরে তিনি বিজ্ঞানের ধ্রুপদী আদর্শের সীমানার মধ্যে নিজেকে রেখেছেন, অর্থাৎ, তিনি এমন একটা জগতের ছবি অাঁকতে চেয়েছিলেন, যাতে অপরিবর্তনশীল বস্তুর গতি এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমালোচনা 'পেছন' থেকে নয়, 'সম্মুখ' থেকে, তা থেকে অগ্রসর হয়ে আরও বেশি মৌলিক অবস্থান থেকে, গতিবিজ্ঞানের যে উপাদানগুলি পরিবর্তনশীল (Variables) তাদের অনিশ্চয়তা থেকে, মাখ-এর সূত্রের এবং বিজ্ঞানের **'ধ্রুপদী আদর্শে'র সীমানা ছাড়িয়ে** করতে হবে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে কোথায় প্রয়োগ করতে হবে, আইনস্টাইন তার একেবারে ঠিক-ঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছেন:

"**বলবিদ্যার** (বড় হরফ আইনস্টাইনের দেওয়া) সমস্যার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, যেখানে-যেখানে কাঠামোর প্রতিক্রিয়াগুলি এবং তাদের অংশবিশেষগুলি সঠিকভাবে বিভিন্ন বাস্তব বিন্দুগুলির মধ্যে (কোয়ান্টাম বলবিদ্যা) সুপ্ত শক্তি নিয়ে রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, সেখানে তারা এখনও এমন একটা কাঠামো উপস্থিত করে যেটা তার বদ্ধ চরিত্রের মধ্যে সঠিকভাবে সুস্থিত ঘটনাবলীর মধ্যেকার অভিজ্ঞতাবাদী সম্পর্কের বর্ণনা দেয়, যেটা তাত্ত্বিক দিক থেকে আশা করা যেতে পারে।"(১)

এখানে যান্ত্রিক (বা গতিবিজ্ঞানের) প্রক্রিয়াগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হল। আইনস্টাইন তাদের মনে করেন, বিভিন্ন কণাদের প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত গতি, যে প্রতিক্রিয়া কণাদের দেশগত বিস্তৃতির 'পরে নির্ভরশীল। এটা এমন একটা ছবি, যাতে কণাদের গতি তাদের অবস্থানের 'পরে কোনো-না-কোনো ভাবে নির্ভরশীল এবং তারই বিপরীত বস্তুগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার বলের 'পরেও নির্ভরশীল, অর্থাৎ, এটাই তাহলে 'ধ্রুপদী আদর্শ'—সেই জগতের চেহারা যেটা মাখ-এর সূত্র মেনে চলে এবং জগৎপ্রপঞ্চে যা-কিছু প্রক্রিয়া ঘটছে তাদের বিভিন্ন ভরযুক্ত বস্তুর গতি ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে।

---

১ Philosopher-Scientist, p. 666.

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ

আপেক্ষিকতা, কোয়ান্টা ও একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব

কালের গ্রন্থি ছিঁড়ে গেছে
—অভিশপ্ত আক্রোশ,
আর তাকে জোড়া দিয়ে
ঠিক করতে
জন্মেছি কিনা আমি !

শেকস্‌পীয়ার, 'হ্যামলেট'

হ্যামলেটের অন্তরের বিয়োগান্ত যন্ত্রণার কথাটুকু ব্যক্ত হয়েছে উপরের ঐ পঙ্‌ক্তিগুলিতে। আর সেটা প্রকাশ পেয়েছে এমন একটা শক্তিশালী শৈল্পিক সাধারণীকরণের আঙ্গিকে যাতে অত্যন্ত দূরবর্তী মানবিক আবেগ ও সংঘাত তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এলসিনোরের প্রাসাদে (১) জগতের নৈতিক সুষমা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আদর্শকে কার্যে পরিণত করার মাধ্যমে যে বিশ্ব-সুষমাকে হ্যামলেট দেখেছিলেন, সেটা বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যার অপরাধের দ্বারা একেবারে বেসুরো হয়ে তাঁর স্নায়ুকে আহত

১ শেকস্‌পীয়ারের সুবিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক, হ্যামলেট-এ, ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেটকে তাঁর মৃত পিতার অশরীরী প্রেতাত্মা যখন বলে দেয়, কী করে হ্যামলেটেরই মাতা ও পিতৃব্যের ষড়যন্ত্রে তাঁর পিতাকে খুন করা হয়, তখন হ্যামলেটের এই বিখ্যাত স্বগতোক্তি। তখন হ্যামলেট বুঝতে পারেন যে, তাঁকেই পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে এবং তাতেই নাটকের শেষ অবধি ট্র্যাজিডি। —অনুবাদক।

করেছিল। তাঁর স্কন্ধে বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এবং তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রতিশোধের দ্বারাই তাঁর জগতের সুষমা ফিরে আসতে পারে। তাঁর কাজটা যে কত কঠিন তা তিনি বুঝেছিলেন এবং তিনি জানতেন যে, সোজা, দৃঢ়ভাবে কাজ করলে 'কালের গ্রন্থিকে জোড়া দেওয়া যাবে না।'

আইনস্টাইনের কাছে আদর্শ সুষমা ছিল স্পিনোজার জগৎ, একটা একীভূত জগৎ যাতে রয়েছে পারস্পরিক ও আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন বস্তুগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, যাতে প্রত্যেকের গতি নির্ধারিত হচ্ছে তার 'পরে অন্যদের প্রতিক্রিয়া কী হয় তার দ্বারা। আইনস্টাইন এই ধ্রুপদী আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন—যখন সপ্তদশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতার সূত্রকে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত নতুন ঘটনাবলী পর্যন্ত প্রসারিত করলেন। সুষমাটা অবশ্য জাড্যজনিত গতির জন্যেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, যেটা ধ্রুপদী আদর্শের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না জগৎপ্রপঞ্চের চেহারাতে ত্বরণবেগ প্রবর্তন করা হচ্ছে ততক্ষণ বস্তুগুলির মধ্যে এমন কিছুই থাকছে না, যেটা বিভিন্ন বস্তুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে না। প্রবল মননশীল প্রচেষ্টার দ্বারা আইনস্টাইন জগৎপ্রপঞ্চের চেহারা থেকে পরম ত্বরণবেগকে পৃথক করতে পারলেন। আর এই পর্যন্ত এসেই তাঁকে থেমে যেতে হল।

এর পরে রয়ে গেল, তড়িৎ-চুম্বকীয় ও মহাকর্ষের ক্ষেত্রের মধ্যে প্রভেদ এবং সেটা বিশ্বসুষমার সঙ্গে খাপ খেলো না। অন্যদিকে মৌলিক কণাগুলির গতির মধ্যে এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল, যা কিনা বিশ্বসুষমার আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় নি। নিউটোনীয় বলবিদ্যা, যা এই ছাঁচ থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং আইনস্টাইনের বলবিদ্যা, যা সেই ছাঁচকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল, উভয়েই কণাদের গতির অবিচ্ছিন্নতা থেকে এল, যার অবস্থান ও গতিবেগ হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থা এবং তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া। ১৯২০-র দশকে দেখা গেল যে, সাধারণভাবে বলতে হলে, একটি কণার অবস্থান ও গতিবেগকে একটা বিশেষ নির্দিষ্ট মুহূর্তের মধ্যে যুগপৎ ঠিক একই সময়ে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

আইনস্টাইনের কাছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা একাধারে বিষয়ীমুখী (subjective) অথবা বিষয়মুখী (objective) ট্র্যাজিডি ছিল না। প্রথমত,

নিউটনের পরমকে এবং লোরেন্‌জ-এর ইথারকে(১) হটিয়ে দেওয়াটা আইন-স্টাইনের কাছে এমন কোনো ওস্তাদের মার ছিল না, যাতে পরম- সত্যের প্রত্যাশিত স্বর্ণযুগে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে। আগেই যা বলা হয়েছে, নিউটোনীয় গোঁড়ামীকে শুধু নয়, একেবারে গোঁড়া (বা মতান্ধ) মনোভাবকেই বরবাদ করে দিতে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অন্য যে-কোনো তত্ত্বের অপেক্ষা বেশি অবদান রেখেছে। দ্বিতীয়ত, ফোটনের ধারণার জন্যে কৃতিত্ব আইনস্টাইনেরই প্রাপ্য, অর্থাৎ সেই তত্ত্বের সূত্রকে বার করার কৃতিত্ব, যাতে কণাদের তরঙ্গধর্মী এবং তরঙ্গদের কণাধর্মী বলা হয়। আর শেষ অবধি, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমালোচনার সঙ্গে আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানের ধ্রুপদী ধারণাগুলিতে প্রত্যাবর্তন না করে আরও অগ্রসর হবার সম্ভাবনাকে মুক্ত করে দিলেন।

তাঁর জীবনের শেষ দিকে প্রকৃতির বিশ্বজনীন সূত্র হিসাবে মাখ এর প্রতি-পাদ্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার চাইতে তিনি বর্জন করার দিকেই এগিয়েছিলেন। তিনি শুধুমাত্র নিউটোনীয় বলবিদ্যার সীমিত চরিত্রের কথাই বলেন নি, পরন্তু 'ঐ ধরনের সকল চরিত্রের' কথাই বলেছিলেন।

'ধ্রুপদী আদর্শের' সীমানাকে অতিক্রম করে একটি নতুন তত্ত্বের রূপায়ণ করার জন্যে যে চিন্তাবিদ পদার্থবিজ্ঞানকে ঐ আদর্শের কাছাকাছি আনতে অতখানি করেছিলেন, সেটা তাঁর কাছে একটা বিষয়ীমুখী ট্র্যাজিডি হতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান যখন এগিয়ে যেতে লাগল, আইনস্টাইন তখন সেটাকে বিশ্বসুষমার পরাজয় বলে মনে করেন নি। এই বইয়ের গোড়ার দিকে আইনস্টাইনের যুক্তিবাদের পরিধি ও প্রাণবন্ততা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর বিশ্ববীক্ষার বিশেষ চরিত্রই হল: তিনি কখনও কোনো ব্যাপারেই শেষ কথা বলার লোক ছিলেন না, যে-অবস্থান থেকে তাঁকে হেরে চলে আসতে হয়, সেটাকে আইনস্টাইন কখনও ট্র্যাজিডি বলে মনে করতেন না। এজন্যেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা তাঁর কাছে বিষয়ীমুখী ট্র্যাজিডি (অর্থাৎ নিজের হেরে যাওয়ার ব্যাপার—অনুবাদক) ছিল না।

তাঁর ধারণার জন্যে এটা বিষয়মুখী ট্র্যাজিডিও ছিল না, কারণ আইন-

---

১ অর্থাৎ, একটি কণাকে ঠিক-ঠিকভাবে ধরতে হলে বা বুঝতে হলে তার যে চতুর্মাত্রিক সংজ্ঞাগুলি থাকা দরকার, তা হয় না। ত্রিমাত্রিক গতিবেগের সঙ্গে সময়ের সংজ্ঞা ঠিক মিলে যায় না।—অনুবাদক।

স্টাইনের ধারণাগুলির এটা ছিল সঠিকভাবেই দৃঢ় ও স্বাভাবিক বিকাশ যা জগৎপ্রপঞ্চের চেহারাকে 'ধ্রুপদী আদর্শের' চৌহদ্দির বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ রূপায়ণের অব্যবহিত পরেই একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের সমস্যাকে আশু বিবেচ্য বিষয়বস্তু বলে উপস্থিত করা হল। মহাকর্ষকে মহাকাশের (বা দেশ-এর) বক্রতার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করা হতে লাগল। সেই রকমের অন্য বলের ক্ষেত্রকে মহাকাশের (বা দেশ) অন্য জ্যামিতিক ধর্মের সঙ্গে মেলানো যায় কি, না ? তাহলে সব রকমের বলের ক্ষেত্রকে কি জ্যামিতির দিক থেকে একীভূত সম্পর্কতে নামিয়ে আনা যায় এবং সেগুলিকে মহাকাশের (বা দেশের) কয়েকটি জ্যামিতিক ধর্মের দিক থেকে একীভূত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রকাশ করা যায় ? যে সময়ে এই প্রশ্নগুলি প্রথম পেশ করা হয়েছিল, তখন দু'টি ক্ষেত্রের কথা জানা ছিল : মহাকর্ষের ও তড়িৎ-চুম্বকীয়। শেষোক্তকে 'জ্যামিতিক' রূপ দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে এবং তাকে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে মহাকাশের (বা দেশের) জ্যামিতিক ধর্মের পরিবর্তন রূপে। এই প্রচেষ্টাগুলি আইনস্টাইনের চিন্তাকে প্রায় তিরিশ বছরের মতো আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

১৯৪২ সালের বসন্তকালে আইনস্টাইন তাঁর বন্ধু হান্‌স্ মুহ্‌সামকে, যিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে সে সময়ে হাইফা-তে ছিলেন, লিখলেন :

"আমাকে একজন ছিটগ্রস্ত বুড়ো লোক বলে ধরা হয়, যে নাকি মোজা পরে না।(১) কিন্তু আমি আগের চাইতে অনেক বেশি দ্রুত, প্রায় অসম্ভব দ্রুত হারে কাজ করছি এবং আমি এখনও আশা করি যে, পদার্থগত একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের সমাধান করতে পারবো। মনে হয় যেন আমি একটা আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে এরোপ্লেনে উড়ে যাচ্ছি আর জানি না কী করে আবার ভূমিতে নামতে পারবো · ভালো সময় আসবে যখন আমি বেঁচে থাকবো বলে আশা করি এবং ঈপ্সিত ভূমির চেহারাটা অন্তত দেখবার আশা রাখি।"(২)

দু'বছর পরে তিনি মুহ্‌সাম-কে আবার লিখলেন :

১ পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে অনেক রকমের আটপৌরে ব্যবস্থার মধ্যে, আইনস্টাইন কোট বা মোজা পরা পছন্দ করতেন না।—অনুবাদক।

২ Helle Zeit, S. 50-51.

"আমার সমীকরণে নিজের আস্থা রাখার ক্ষেত্রে আমি ঠিক কি না, সেটা দেখার জন্যে আমি বেঁচে থাকবো। এটা অবশ্য আশা করা ছাড়া আর কিছু নয়, কেননা প্রতিটি নতুন নতুন পরিবর্তন প্রচণ্ড গাণিতিক অসুবিধা সামনে এনে হাজির করে। আমি এতদিন তোমাকে চিঠি লিখি নি কারণ কিছুটা বিবেকের দংশন এবং লেখার একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এমন একটা গাণিতিক পীড়নের মধ্যে আমি রয়েছি, যার থেকে আমার কোনো মুক্তি নেই। সময় বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আমি কোথাও যাই না এবং সবরকমের অন্য জিনিস সন-তারিখের দোহাই পেড়ে শিকেয় তুলে রেখেছি···যা দেখছো, কিপটে হয়ে গেছি আমি, যদিও আমার স্বচ্ছ মুহূর্তগুলিতে আমি বুঝতে পারি, সময়ের জন্যে যে লোভ আমার রয়েছে সেটা কত নিষ্ফল ও বোকামি।"(১)

আইনস্টাইন মনে করতেন যে, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্ভব করে তুলবে অতি ক্ষুদ্র জগতের কোয়াণ্টাম-রাশিবিজ্ঞানগত নিয়মগুলিকে, যাদের পেতে হবে আরও গভীর ও সাধারণ রাশিবিজ্ঞান-বহির্ভূত পদার্থগত নিয়মগুলি থেকে, যা তথ্যগুলিকেই নিয়ন্ত্রিত করে, শুধুমাত্র তাদের সম্ভাব্যতাকে নয়।

সোলোভিনকে তিনি ১৯৩৮ সালে লিখেছেন, "আমি তরুণদের সঙ্গে ভারী চমৎকার এক তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছি, যেটা আশা করি সম্ভাব্যতার সাম্প্রতিক রহস্যবাদ এবং পদার্থবিজ্ঞানে বাস্তবতার ধারণা থেকে দূরে চলে যাবার যে ঝোঁক দেখা দিয়েছে, তাদের পরাস্ত করবে।"(২)

বারো বছর পরে সোলোভিনকে লেখা আর এক চিঠিতে আইনস্টাইন স্বীকার করছেন যে, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব এখনও পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয় নি, কারণ গাণিতিক দিক থেকে এত অসুবিধা দেখা গেছে যে, তাদের দ্ব্যর্থহীন সমাধান হওয়া অসম্ভব, আবার অন্যদিকে শুধুমাত্র দার্শনিক ও তর্কবিদ্যার যুক্তি পদার্থবিজ্ঞানীদের মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।

"একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব এখন শেষ হয়ে গিয়েছে···এর জন্যে যথেষ্ট কাজ করা সত্ত্বেও একে কোনোভাবে যাচাই করে দেখার আমার কোনো উপায় নেই। এই ধরনের অবস্থা বহু বছর ধরে থাকবে, আরও এই কারণেই থাকবে যে,

১ Ibid., S. 51.

২ Solovine, P. 75.

পদার্থবিদরা কোনোভাবেই তর্কশাস্ত্রসম্মত অথবা দার্শনিক যুক্তিগুলি গ্রহণ করেন না।"(১)

তিরিশ বছর ধরে একটি প্রতিভার তুলনাহীন প্রচেষ্টা বিফলে যাবে, এটা কি সম্ভব?

এই প্রশ্নের জবাব দেবার পূর্বে ১৯৩০-এর দশক থেকে পদার্থবিজ্ঞানে আর একটি ঝোঁকের রূপরেখা অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে।

১৯২৪-২৬ সালে রূপায়িত কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ছিল একটা অ-আপেক্ষিকতাবাদী (non-relativistic) তত্ত্ব। আপেক্ষিকতাবাদে যেসব প্রক্রিয়া আগে থেকে বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, যেমন একটি ইলেকট্রনের গতিবেগের অনুপাতে তার ভর বদলে যাবে, সেটা ঐ তত্ত্ব ধর্তব্যের মধ্যে আনে নি। ১৯২৯ সালে ডিরাক ইলেকট্রনের গতির বর্ণনা ক'রে তার তরঙ্গধর্মী সমীকরণ আপেক্ষিকতার দিক থেকে করেছিলেন, যাতে দ্রুতগতিতে ধাবমান উচ্চশক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রনগুলির সঠিক বর্ণনা দিয়ে তার ভর-এর পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু হিসাব অনুসারে ইলেকট্রনের শক্তিগুলির নেতিবাচক মূল্য পাওয়া গেল। পদার্থগতভাবে এই অগ্রহণীয় সিদ্ধান্তে ডিরাক বাধ্য হলেন অনুমান করতে যে, তাঁর তরঙ্গের সমীকরণে শক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রন কণার তুলনায় একটা কণার ব্যবহার আলাদা ধরনের হবে। ধনাত্মক শক্তিবিশিষ্ট এই কণা যথাসময়ে আবিষ্কৃত হল আর তার নাম রাখা হল পজিট্রন।

দেখা গেল যে, একটা পজিট্রনের সঙ্গে একটা ইলেকট্রনের মিলন ঘটলে দুটি বা তিনটি ফোটন-কণা নির্গত হয়। উলটোভাবে ফোটন ইলেকট্রন-পজিট্রন (কণার) জোড়ে পরিণত হতে পারে। এক কণা থেকে অন্য কণায় বদল হওয়াতে কণার যে রূপান্তরণ, সেটা ধ্রুপদী ছবিতে একটা নতুন উপাদান প্রবর্তন করে। ধ্রুপদী বিজ্ঞানে বস্তুর গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়, যাতে পরমাণুদের এমন স্তরে নামিয়ে আনা হয়, যার ফলে তারা আবার নতুন করে জোট বাঁধতে পারে, অর্থাৎ, কণাদের নামিয়ে আনা হয় এমন স্তরে যেখানে তারা ধ্বংসাতীত ও অপরিবর্তনীয়। মৌল পদার্থের পরিবর্তন করা সম্ভব,(২)—এটা প্রথম আবিষ্কৃত হল পরমাণুগুলি ও পরমাণু-কেন্দ্রকগুলি

১ Ibid., p. 107.

২ ধ্রুপদী পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে মেন্‌ডেলিয়েভ-এর পর্যাবৃত্ত সারণী অনুসারে ৯২টি মৌল পদার্থ দিয়ে জগৎপ্রপঞ্চ গঠিত। মধ্যযুগের

যে-উপাদান দিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের নিয়ে যে নতুন করে জোট বাঁধা যায়, সেটি আবিষ্কৃত হবার পরে; এই উপাদানগুলি হল ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। মৌল পদার্থগুলির রূপান্তরণের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষুদ্র কণাদের অধীনস্থ আরও ক্ষুদ্রতর কণাদের (smaller sub-particles) নতুন করে জোট বাঁধার অথবা গতির ব্যাপারটা নেই। সাম্প্রতিক জগৎপ্রপঞ্চের চেহারাতে রূপান্তরণকে একটা প্রাথমিক প্রক্রিয়া রূপে দেখানো হয়, যাকে আর অন্য প্রক্রিয়ার মধ্যে নামিয়ে আনা যায় না।

মৌলিক রূপান্তরণ স্পষ্টতই আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলির বাইরে পড়ে। এখানে ধ্রুপদী অর্থে স্থানচ্যুত হবার এবং কালানুক্রম অনুসারে দেশগত চেহারার বদলের কোনো ব্যাপার নেই। কাজেই প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় একটা কণার গতিবেগের এবং অন্যান্য যান্ত্রিক ধারণার যেন কোনো অর্থ নেই। যদি গতিই না থাকে তাহলে স্থানচ্যুতির অর্থে গতির আপেক্ষিকতার কোনো অর্থই হয় না। অন্যদিকে, মৌলিক পদার্থগুলির রূপান্তরণ এমন একটা প্রক্রিয়া যাকে আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে আগে থেকে বলে দেওয়া যায়। যখন ইলেকট্রন ও পজিট্রন ফোটনে রূপান্তরিত হয় তখন তাদের স্থিতি-ভর (rest mass) অদৃশ্য হয়ে যায়। ফোটনদের কোনো স্থিতি-ভর নেই। ফোটনদের ইলেকট্রন ও পজিট্রনে রূপান্তরণে গতিশীল ভর-এর স্থিতি-ভর-এ পরিবর্তন ঘটে। এটা একটা খুব সাধারণ ও মৌলিক নিয়ম। বস্তুগুলি যখন এমন গতিবেগ নিয়ে ধাবমান হয় যাকে আলোর গতিবেগের অনুপাতে বেশ হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য(১), তখন গতির জন্যে ভর-এর বৃদ্ধি হয় যথেষ্ট। ইলেকট্রন ও পজিট্রনের ফোটনে রূপান্তরণের ক্ষেত্রে স্থিতি-ভরটা সম্পূর্ণ গতিশীল ভর-এ পরিণত হয়। এই ধরনের ক্রিয়াকে বলা হয় **অতি-আপেক্ষিকতা**।

অ্যালকেমিস্টদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও একটি মৌল পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরণ করা সম্ভব হয় নি, যদিও তাই থেকে রসায়নশাস্ত্রে প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে।

পদার্থের পারমাণবিক গঠনতন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পরে একদিকে যেমন বহু নতুন আইসোটোপ (যেন কোনো মৌল পদার্থের জুড়িদার) আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি পদার্থের রূপান্তরণও সম্ভব হয়েছে।—অনুবাদক।

১ ইতিপূর্বে যেমন আমরা আলোর গতিবেগের সঙ্গে সময় সংকোচনের কথা বলেছি, ঠিক তেমনি একটি গতিশীল দ্রব্যের ভর-এরও কম-বেশি হয় আলোর গতিবেগের অনুপাতে।—অনুবাদক।

এখানে আমরা এমন একটা চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আসছি, যেটা আইনস্টাইনের শেষ জীবনের, ১৯৩০-৫০-এর এই দুই দশকের কাজ বিশ্লেষণ করার পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়। আইনস্টাইনের আত্মজীবনীমূলক নোটস, চিঠিপত্র ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের ধারণাতে আত্মনিয়োগ এবং গোঁড়াভাবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিরোধিতা করা তাঁর জীবনের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে। এটা এমন একটা সময় যখন তিনি সারা মহাবিশ্বব্যাপী একটা ঐক্যবদ্ধ ধারণাতে পৌঁছবার জন্যে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অপেক্ষা অনেক বেশি সামগ্রিকভাবে বোধগম্য কোনো তত্ত্বের দিকে এগোচ্ছিলেন। ১৯৩০-এর দশক থেকে যে ধারণা তাঁকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেটা হল তাঁর জীবনের কাজের সম্পূর্ণতা দান করা, সমস্ত কিছুর একটা সাধারণীকরণে পৌঁছনো।

বেশির ভাগ জীবনী ও বিশ্লেষণে কিন্তু তাঁর প্রিন্সটন-এর কালপর্বকে নিষ্ফল রিসার্চের কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে। তাঁরা (অর্থাৎ, জীবনীকাররা) তাঁর জীবনের এই পর্বের যে একমাত্র ইতিবাচক কাজ দেখতে পান, সেটা হল—ক্ষেত্রগত সমীকরণগুলি থেকে গতির সমীকরণ বার করা। এই ধরনের মনোভাব নিয়ে আইনস্টাইনের জীবনকে দেখার জন্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের বিবর্তন-ধারা সম্পর্কে দারুণ কদর্থ বা অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টির সময়ে তাঁর নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রচেষ্টাকে ধরে নেওয়া হয়েছিল এমন একজন চিন্তাবিদের মনোভাবরূপে, যিনি তাঁর কালের চাইতে অনেক এগিয়ে চিন্তা করেন এবং পরে সেটার ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এমন একজন বিজ্ঞানীর মনোভাব রূপে, যিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন এবং এখন বিজ্ঞানের সাধারণ অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছেন না।

এখন অতি-আপেক্ষিকতার অনুসন্ধান করে সম্প্রতি যা লাভ হয়েছে তাতে ১৯৩০ থেকে ১৯৫০-এই দুই দশকে আইনস্টাইনের কাজের নতুন মূল্যায়ন হচ্ছে। এর অর্থ হল তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মের নবমূল্যায়ন। এর মধ্যে আইনস্টাইনের সঙ্গে যেটার সংস্রব বেশি, সেটা হল—তাঁর 'একমাত্র ব্যক্তিগত' অভিজ্ঞতাগুলি, চিন্তা ও অনুসন্ধানের বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক প্রগতির 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' মর্মবস্তুকে গড়ে তুলতে কতোখানি অবদান রেখেছে তাই দেখা। এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে যেটা প্রয়োজন সেটা হল বিজ্ঞানে আসল প্রগতি

কতোটুকু হয়েছে তার মূল্যায়ন করা এবং সেটা করতে হলে এ পর্যন্ত যে সকল সাধারণ ও সঠিক তত্ত্ব পাওয়া গেছে তা থেকে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে।

প্রাথমিক কণাদের সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করার এবং তাদের রূপান্তরণের জন্যে যে বিশেষ গবেষণা করা হয়, আইনস্টাইন তাতে কার্যত কোনো অংশগ্রহণ করেন নি। প্রাথমিক কণাদের তত্ত্বে অগ্রগতি ঘটাবার পথ ছিল দীর্ঘ এবং এটা এমন একজন মানুষকে মোটেই বিচলিত করে নি যিনি জগৎপ্রপঞ্চের 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার' তত্ত্বকে বিশদভাবে রূপায়ণের জন্যে নিজেকে নিয়োগ করেছেন। সেই সময়ে পদার্থগত তত্ত্বগুলির 'বাইরের থেকে সত্য' বলে প্রমাণিত হওয়াটা বাস্তবিকই সবাইকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। দশমিকের নবম ভগ্নাঙ্ক অবধি তত্ত্বগত ভবিষ্যদ্বাণী, পরীক্ষাগতভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তত্ত্বগত এক নির্মাণকার্য দ্রুত অন্য নির্মাণকার্যে পর্যবসিত হওয়ার কোনো বাধা ছিল না, যেটাও আবার স্বল্পস্থায়ী হতো। এর কারণ ছিল, তাদের প্রায় সবটাই একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে করা হতো। এই ধরনের স্বল্পস্থায়ী নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ধরে-নেওয়া অসম্পূর্ণ প্রতিপাদ্যের ফলে প্রাথমিক কণাদের 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'বিশিষ্ট একটা স্বাভাবিক সাধারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে পদার্থবিদদের ঔৎসুক্য জাগরিত হল। এই বিবর্তনটা নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যায়।

তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকীরণ-জাত কণাদের প্রতিনিধিত্ব করছে ফোটনগুলি, যারা তড়িতাবিষ্ট কণাদের যে ব্যবস্থা আছে তার দ্বারা বিশোষিত বা গায়েব হয়ে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ শূন্য বা ফাঁকা অবস্থাতে, যেখানে অন্য কোনো কণা নেই, সেখানে একটা তড়িতাবিষ্ট কণা তথাকথিত ফোটনদের নির্গত ও বিশোষিত করে থাকে। তারা শক্তিপুঞ্জে তাদের অবদান রাখে এবং সেহেতু একটা ইলেকট্রনের ভর-এতেও কিছু অবদান রাখে। কার্যত যেগুলি ফোটন কণা, তাদের পরপর বিকীরণ ও গায়েব হয়ে যাওয়ার মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের ব্যবধানটুকু যত কম হবে, ইলেকট্রনের শক্তিপুঞ্জে তাদের অবদান তত বেশি হবে। একটা ফোটনের কার্যত নির্গত হওয়ার এবং তার গায়েব হয়ে যাওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান হবে অতি সামান্য মাত্র এবং তাহলে যে-পথটা পরিক্রমা করা হচ্ছে (যেটা আলোর গতিবেগের সঙ্গে ফোটনের জীবনকালের সময় দিয়ে গুণ করে বার করতে হবে) সেটাও সমানভাবেই হ্রস্ব হবে।

তাহলে একটা ইলেকট্রনে ফোটন কণাগুলি কার্যত যে-শক্তি প্রদান করে তা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি। একটা ইলেকট্রন যে-শক্তি নির্গত করে তার সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়াকে হিসাবের মধ্যে ধরলে ইলেকট্রনের শক্তি ও ভর-এর পরিমাণ প্রায় অনন্তের পর্যায়ে (অর্থাৎ, অনেক বেশি) পৌঁছায়।

এটা এমন একটা অবস্থা, যেটা পদার্থগত ঘটনাবলীর সম্বন্ধে প্রচলিত সমস্ত জ্ঞানের বিরুদ্ধে যায়। তাহলে, হিসাবের বাইরে চলে যায় অনন্ত শক্তিপুঞ্জ ও তাদের ভর-এর পরিমাণ। এটাকে নানা রকমের উদ্ভাবিত পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পাওয়া সম্ভব। 'বাইরের থেকে প্রমাণিত হওয়া' এবং 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা' নিয়ে যে পদার্থগত তত্ত্ব গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে ফারাক বেশ খানিকটা অদ্ভুত রূপ পরিগ্রহ করেছে। নানা উপায়ে অনন্ত শক্তি ও তাদের ভর-এর পরিমাণের ব্যাপারটা চুকিয়ে দেবার উপায় আছে। সেটা করতে হলে খুব বেশি শক্তিবিশিষ্ট কার্যত যেগুলি ফোটন কণা, যারা কণাদের শক্তিপুঞ্জে বেশ ভালো পরিমাণে অবদান রাখে, তাদের হিসাবের মধ্যে নিলে চলবে না। এটা যেন 'ধারে নেওয়া হয়' এই আশা করে যে, মৌলিক কণাদের ভবিষ্যৎ-তত্ত্ব উচ্চশক্তিদের বিধিবহির্ভূত নিয়মের বাইরে কিভাবে বরবাদ করা হচ্ছে তার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভিত্তি যোগাবে। এই ধরনের তত্ত্ব আরও সাধারণ সূত্রগুলি থেকে ন্যূনতম সময়ের ও ন্যূনতম দূরত্বের মধ্যবর্তী অবস্থাটুকুর ধারণার 'পরে ভিত্তি করে রচিত হতে পারে। আমরা শীগগিরই এই ধারণাকে বিচার করে দেখবো। আসল কথাটা হচ্ছে, আজ আর পদার্থবিদরা ব্যর্থহীনভাবে ছকে-আঁটা তত্ত্বের জন্যে অপেক্ষা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন না। তাঁরা ভবিষ্যতের কোনো তত্ত্বের আশায় অনন্ত শক্তিকে হটিয়ে দেবার পদ্ধতিকে বার করেন।

এই অবস্থাতে 'খাঁটি বর্ণনার' ধারণার এবং আগে থেকে ধরে-নেওয়া ভাবনার অথবা পদার্থগত ধারণাগুলির চরিত্রটা বাস্তবিকই প্রাচীনের পর্যায়ে পড়ে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলীভিত্তিক তত্ত্বগুলি সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি-মূলে যেসব প্রক্রিয়া রয়েছে তার ব্যর্থহীন বিবরণ দিতে অপারগ। পদার্থবিজ্ঞান এইসব প্রক্রিয়ার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলী-বহির্ভূত চিত্রের সন্ধান করে, কিন্তু সেটাকে পূর্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয় না। এই ধরনের তত্ত্বের সম্ভাবনায় আস্থাবান হয়ে পদার্থবিজ্ঞান ইলেকট্রনের শক্তিকে হিসাব করে দেখে, যা থেকে তাদের অনন্ত (বা অগাধ) পরিমাণের মূল্যকে সরিয়ে দেওয়া

হয় 'যেন ধার করে।' তা থেকে আজ 'বাইরের থেকে সমর্থন'-এর এবং 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা' সম্বন্ধে আইনস্টাইনের পরিকল্পনার (বা ছকের) যাথার্থ্য অনেক বেশি।

এটা লক্ষ্য করা দরকার যে, ১৯৩০-৫০-এর দুই দশকের মধ্যে একদিকে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের বিকাশ সাধনের জন্যে আইনস্টাইনের প্রয়াস ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমালোচনা এবং অন্যদিকে, অন্যান্য পদার্থবিদের দ্বারা মৌলিক কণাদের তত্ত্বের বিশদ রূপদান—এই দুটি ধারার মধ্যে আইনস্টাইনের ঐ ছক মূর্ত হয়ে উঠেছে। শেষোক্তটি থেকে কয়েকটি বিশেষ ধরনের সুন্দর ও সুসঙ্গত ধারণার মধ্যে যাওয়া সম্ভব হয়; যেটা অবশ্য সমগ্র ছবিটার সঙ্গে খাপ খায় নি। তাছাড়া, এ থেকে যে ছক পাওয়া গেল সেটা ঠিক ঐ একই ধারণার মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করল। আমাদের শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আপেক্ষিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব হয়ে দাঁড়াল এম্‌পেডোক্‌লস-এর দ্বারা আঁকা ছবির মতো, যাতে পৃথিবীতে প্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে আলাদা-আলাদাভাবে এবং তারপর তাদের এলোমেলোভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

মৌল কণাগুলিতে যে 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'র অভাব রয়েছে, তার হদিস পাওয়া যায় প্রত্যক্ষবাদী গবেষণামূলক পরিমাণগুলির প্রাচুর্যের মধ্যে। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিটি ধ্রুব উপাদান (সংখ্যা বা ঘটনা) থেকে দেখা যায় যে, হেতুপরম্পরার ব্যাখ্যা ভেঙ্গে পড়ছে (অর্থাৎ, যুক্তির জোর থাকছে না —অনুবাদক), যার জন্যে এমন একটা পরিমাণকে (বা সংখ্যাকে) আনতে হয়, যেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আইনস্টাইনের ভাব-কল্পনা ছিল এমন একটা জগৎকে নিয়ে যেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক ধ্রুব উপাদানকে বাদ দিয়ে হবে। মৌল কণাদের তত্ত্ব বিভিন্ন অণুদের ভর ও শক্তির প্রত্যক্ষ পরীক্ষামূলক পরিমাণকে বজায় রেখে করা হয়েছে। হাইসেনবার্গ যখন কয়েকটি কণার ভরকে হিসাব করেছেন, তখন তা থেকে যে সূত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত-স্বরূপ পাওয়া গিয়েছিল, তারা আজও বজায় আছে।

মোটামুটিভাবে দেখতে হলে মৌল কণাদের তত্ত্বের মধ্যে 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার' অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে, ১৯৩০-৫০-এর দুই দশকে আইনস্টাইনের নির্মাণগুলিতে 'বাইরের থেকে সমর্থনের' অভাব দেখা যায়। তারা জানা তথ্যগুলিকে বিরোধিতা করে না, কিন্তু যে সঠিক পরীক্ষার দ্বারা বিশ্বের ছবিটাকে সংশোধন

করার জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল, সেটাও পেয়ে গেছে বলে তারা দাবি করতে পারে না। মৌল কণাগুলির যেসব তত্ত্ব একের পর এক যেন সাজানোভাবে এসে গেল (এরা অনেক সময়ে তাদের পাশাপাশি সহাবস্থান করত) পদার্থবিজ্ঞানের পত্রিকাগুলিতে, সেগুলিকে তাদের যুক্তিনিষ্ঠার সংঘাতের দিক থেকে যথেষ্ট 'পাগলামী' বলে গণ্য করা হয় নি। ধ্রুপদী ধারণার সঙ্গে তাদের রীতিমতো বিচ্ছেদ ঘটে নি। আইনস্টাইনের নির্মাণকার্যগুলি স্ববিরোধী পরীক্ষাগত ধারণার দিক থেকে খুব বেশি রকমের 'পাগলামী' ছিল না। মৌল কণাদের 'রক্ষণশীল' তত্ত্বে প্রচুর সংঘাতমূলক ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়েছে। এমন কি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণকে বোঝাতে 'বিজাতীয়' ধারণার উদয় হয়েছে।

আমরা কি আশা করতে পারি যে, বৈজ্ঞানিক প্রগতির ভিন্নমুখী পথটি পরস্পরকে ছেদ করবে? এমন তত্ত্ব কি বিকশিত হবে যাতে নতুন ও আরও বেশি সংঘাতমূলক এবং 'পাগলামী'-র সাধারণ ধারণাগুলিকে, মৌল কণা-গুলির পদার্থগত যে-চেহারা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের সংঘাতমূলক তথ্যের সবটুকু দিয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে বোঝানো যাবে?

এই ধরনের তত্ত্বের কাছে পৌঁছবার পথটা দীর্ঘ। মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগে ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ম্যাকস্ ফন লুয়েকে লেখা আইনস্টাইনের কথাগুলি আমরা স্মরণ করতে পারি। আপেক্ষিকতাবাদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বার্লি‘নে এক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হওয়াতে তিনি জবাব দিচ্ছেন:

"বার্ধক্য ও খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে এ ধরনের যাত্রা করা সম্ভব নয়, তাছাড়া আমি বলতে বাধ্য যে এর জন্যে আমি দুঃখিতও নই কারণ ব্যক্তিপূজার কাছাকাছি যে-কোনো কিছুতেই আমার সবসময়েই ঘোরতর আপত্তি। আর বর্তমান অবস্থাতে অনেক লোকই এই তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে অবদান রেখেছেন এবং এটা এখনও সম্পূর্ণ হতে অনেক দেরি—যদি বহু বছরের অনুসন্ধান আমাকে কোনো কিছু শিখিয়ে থাকে, সেটা হল এই যে, বেশির ভাগ লোক যা বোঝে (তোমাকে বাদ দিয়ে বলছি) তার থেকে আমরা মৌল কণাদের বোঝাবার ব্যাপারে অনেক বেশি দূরে আছি এবং আজকের অবস্থাতে উৎসবের জাঁকজমক মোটেই মানায় না।"(১)

১ C. Seelig, op. cit., S. 396.

আইনস্টাইনের অবস্থান কী সেটা বোঝাবার জন্যে এই চিঠিটা ভালো উদাহরণ। তিনি এমন মানুষ ছিলেন না, যিনি হয় পুরানো আবিষ্কৃত সত্যকে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন (যার মধ্যে সাব-অ্যাটোমিক প্রক্রিয়াগুলির ধ্রুপদী ধারণাগুলিকেও ধরতে হবে) অথবা নতুন ধারণাগুলিকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে রাজি হবেন। তাঁর সমালোচনাগুলি আসছিল আসলে ধ্রুপদী নয়, কোয়ান্টাম-আপেক্ষিকতাবাদী অবস্থান থেকে। যে চিঠিটি উদ্ধৃত করা হল তাতে তিনি আপেক্ষিকতাবাদের অসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন। আপেক্ষিকতাকে আরও বিশদ করতে হলে কোয়ান্টামের নিয়মগুলির পক্ষে সেটা যুক্তিসিদ্ধ বলে প্রমাণ করতে হবে।

সাম্প্রতিক ধারণাগুলির প্রকৃতি যে অসম্পূর্ণ এই স্বীকৃতি তখনই তাৎপর্যময় হতে পারে—যদি এই নীতিকে গ্রহণ করা যায় যে, প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলির একটা সঙ্গতিপূর্ণ একীভূত তত্ত্ব গড়া সম্ভব।

যদি এই ধরনের তত্ত্ব আপাত-ঝোঁকগুলি থেকে টানা হয় এবং এটা হবেই বলে আগে থেকে বলে দেওয়াটা যদি ঠিক যুক্তিসম্মত হয়, তাহলে আইনস্টাইনের জীবনের শেষ তিরিশ বছরের বিরাট প্রচেষ্টাকে নীতিগতভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে। পদার্থবিজ্ঞানের উদাহরণ অনুসরণ করে আমরা যেন 'ধার করে' কিছুটা পেছনের দিকে গিয়ে মূল্যায়ন করতে পারি। বস্তুত আইনস্টাইনের জীবনী লিখতে হলে এটা প্রয়োজন, কারণ কেবলমাত্র সাম্প্রতিক গবেষণার সঙ্গেই আইনস্টাইনের কাজ সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তার চেয়ে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের সঙ্গে। এই দিক থেকে আইনস্টাইনের তথাকথিত নিজেকে (দূরে) সরিয়ে রাখার বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

ইনফেল্ড এটাকে আইনস্টাইনের কাজেরই বৈশিষ্ট্য, সম্ভবত, সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেছেন। এতে এই মানুষটি বহুলোকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেও কিভাবে নিজের মধ্যে ডুবে থাকতেন—একটা বিশেষ মুহূর্তে, যখন অধিকাংশ পদার্থবিদ কোনো তথাকথিত জরুরি সমস্যা নিয়ে উত্তেজিত, তিনি তখন তাতে কিভাবে নীরব থাকতেন এবং পরের বছরগুলিতে সামান্যমাত্র মনোযোগ হয়তো তিনি তাতে দিয়েছেন—এ সবই তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায়।

"তাঁর পক্ষে", ইনফেল্ড লিখেছেন, "নিজেকে এইভাবে গুটিয়ে নিয়ে থাকতে পারাটা একটা আশীর্বাদের ব্যাপার ছিল। কারণ এর দ্বারা মামুলি

গতানুগতিক পথে তাঁর চিন্তাধারা ঘুরে বেড়াত না। নিজেকে এইরকম আলাদাভাবে রাখা, যে সমস্যাগুলি আইনস্টাইন নিজে করতেন সে সম্পর্কে স্বাধীন চিন্তাকে জনতার গড্ডালিকা প্রবাহের সঙ্গে না মিশিয়ে তাঁর নিজের জন্যে নির্জন চলার পথ বেছে নেওয়া—এ সবই তাঁর সৃষ্টিকর্মের একান্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। এটা কেবলমাত্র মৌলিকত্ব নয়, শুধুমাত্র কল্পনার দৌড় নয়, তার চাইতে অনেক বেশি ; এটা বুঝতে পারা যায় সমস্যাবলী নিয়ে আইনস্টাইনের কাজ করার পদ্ধতিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে।"(১)

এই দিক থেকে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের প্রতি একটু নজর দেওয়া যাক। এখানে আমরা আইনস্টাইনের নিঃসঙ্গ থাকার ব্যাপারটাকে কেবল-মাত্র তাঁর পারিপার্শ্বিক কী ছিল, তা দিয়ে বিচার করতে পারি, যে-অর্থে বার্ন শহরে অন্য কোনো পদার্থবিদের সঙ্গে তাঁব যোগাযোগ ছিল না এবং যেখানে তিরিশ বছর বয়েস হওয়া অবধি তিনি যথার্থ পদার্থবিদ যাঁরা তাঁদের কাউকে দেখেন নি। ('একমাত্র আয়নাতে ছাড়া' ইনফেল্ডের মন্তব্য)। তিনি তাঁর প্রবন্ধে, 'চলমান বস্তুদের তড়িৎগতিশীলতা' সম্পর্কে কিন্তু এমন একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেটা অনেক পদার্থবিদের খুব প্রিয় বিষয়বস্তু। এটা বোঝা যায়, যখন একই সঙ্গে অন্য দুটি মৌলিক লেখা, লোরেন্‌জ এবং পোঁয়েকার-এর দ্বারা প্রকাশিত হয়, যা মাইকেলসন-এর পরীক্ষাকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। রুশ গণিতবিদ, এন এন লুজিন একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, একজন তরুণ বিজ্ঞানী, যিনি বিপ্লবী ধারণাগুলিকে এগিয়ে দিচ্ছেন, তিনি কখনও জনসমক্ষে প্রচারিত হবেন না, যদি না তাঁর ধারণাগুলি বৈজ্ঞানিক সমাজকে খুব মুশকিলের এবং প্রায়শই নিষ্ফল অনুসন্ধানের হাত থেকে মুক্তি দেয় এবং যদি তাতে তাদের কোনো সাহায্য না হয়। "বিজ্ঞানীদের যদি আরামে বিছানায় শুয়ে-থাকা অবস্থা থেকে টেনে বার করতে হয়, তাহলে যে সকল সমস্যা তাদের বিব্রত করে, তার জবাব দিতে হবে।"

মাইকেলসন-এর ও অন্যান্য একই ধরনের পরীক্ষাগুলির নেতিবাচক ফলা-ফলের কারণ ব্যাখ্যা করে অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্নের জবাব দিয়েছে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ। ঠিক এই কারণেই এই শতাব্দী যখন শুরু হচ্ছে, তখন

---

১ L. Infeld, op. cit., p. 275.

অন্ত পদার্থগত কাজের দ্বারা ঠিক ততখানি ঔৎসুক্য এর (অর্থাৎ বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের—অনুবাদক) দ্বারাও জাগরিত হয়েছিল। আমরা আগেই আইনস্টাইনের তত্ত্ব সম্পর্কে অতটা ঔৎসুক্য, যেটা অন্যান্য পদার্থগত তত্ত্বের আবিষ্কারের তুলনায় অত্যন্ত বেশি, কেন জাগরিত হয়েছিল তার আলোচনা করেছি। মাইকেলসনের পরীক্ষার ফলে যে সমস্যা ধ্রুপদী পদার্থবিজ্ঞানের সামনে এসে দেখা দিল, সেটার প্রভাব ছিল মারাত্মক ; এ যেন গ্রীক পুরাণের স্ফিংক্স্-এর ধাঁধাঁর মতো, যাতে ইডিপাসকে সঠিক জবাব দিতে হবে কিন্তু যার পুরস্কার হচ্ছে মৃত্যু। ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার 'মৃত্যু' যে বাক্যের উপমা ছাড়া আর কিছু নয়, সেটার পুনরুক্তি করার কোনো প্রয়োজন নেই ; ঠিক একই যুক্তি দিয়ে যে-কেউ একজন পুনরুজ্জীবনের কথা বলতে পারে। যেটার আসলে মৃত্যু (বা বরবাদ) হল, সেটা হচ্ছে গতিবেগ যোগ করার ধ্রুপদী নিয়মের যাথার্থ্য ও অলঙ্ঘনীয়তা এবং পরম কালের ধ্রুপদী ধারণা।

১৮৯০-এর দশকে তাত্ত্বিক চিন্তার পদ্ধতিতে দুটি ঝোঁক দেখা যায়। একটার কাজ ছিল, এমন একটি তত্ত্ব অনুসন্ধান করা যাতে নতুন পরীক্ষাগত তথ্য পাওয়া যায়। এতে তত্ত্বদের 'বাইরের থেকে সমর্থন' খুঁজে পাবার চেষ্টা চলছিল। অন্য ঝোঁকটাতে এমন তত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল, যাতে ঘটনাবলীর অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষেত্রকে ব্যাখ্যা করার জন্যে ইচ্ছামতো, অস্থায়ী অনুমানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। একটা তত্ত্বের 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'কে এ খুঁজে বার করেছে। লোরেন্ৎজ-এর কাজ চালাবার (এড্ হক্) তত্ত্বকে আইনস্টাইনের তত্ত্বের দ্বারা অতিক্রমণ (বা একের বদলে অন্যকে স্থান দেওয়া হল) করা হল ; শেষোক্তটি সাধারণ সূত্রের ভিত্তিতে মাইকেলসন-এর পরীক্ষার ফলাফলগুলিকে বুঝিয়ে দিল (অর্থাৎ, এমনভাবে বুঝিয়ে দিল যাতে শেষ বিচারে অনেকগুলি বিভিন্ন তথ্যের 'পরে সেটা নির্ভর করে রয়েছে)।

অনেক পদার্থবিদকে চিন্তিত করত যে প্রশ্নটি তার জবাব দেওয়া হল। পরীক্ষাগুলি করা হয়েছিল কিন্তু তাদের ফলাফলগুলি প্রচলিত তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খেল না এবং একটা নতুন তত্ত্ব গড়ে তোলার দরকার পড়ল, যেটা নতুন পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলে যাবে। অনেক তত্ত্বের মধ্যে আইনস্টাইনের তত্ত্ব ছিল এমন একটি যা 'বাইরের থেকেও সমর্থিত হচ্ছিল' আবার 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'ও তাতে পাওয়া যাচ্ছিল।

পদার্থবিজ্ঞানকে আক্রমণ করছে এরকমের কোনো সমস্যা বা পূর্বতঃসিদ্ধতার সমাধান সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ করতে পারে নি। গ্যালিলিও-র পরীক্ষা-গুলির ফলাফলকে এ বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল, যেটা অবশ্য বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের কাছে কোনো সমস্যা ছিল না। আইনস্টাইন এমন একটা মহাকর্ষ তত্ত্বের নতুন রূপায়ণ করছিলেন, যাতে অন্য কারুর বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল না। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে তখন আট বছর কাজ করার এবং আরও তিন বছর সেটা পরীক্ষাগতভাবে যাচাই হবার জন্যে অপেক্ষা করার বছরগুলি ছিল তাঁর পক্ষে একান্ত নির্জনতার বছর। আইনস্টাইনের প্রচণ্ড বৈজ্ঞানিক একগুঁয়েমী না থাকলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আপেক্ষিকতা-বাদ প্রকাশিত হতে পারত না এবং হয়তো বা আরও দেরি হতো। আইনস্টাইন যেমন একবার ইনফেল্ড-এর কাছে মন্তব্য করেছিলেন :

"আমি করি কি, না করি, এতদিনে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কৃত হয়ে যেতো। সমস্যাটা সমাধানের জন্যে পেকে উঠেছিল। কিন্তু সাধারণ তত্ত্ব সম্পর্কে এটা যে হতোই তা আমি মনে করি না।"

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ শেষ পর্যন্ত রূপায়িত হবার তিনশ বছর পূর্বেই তার 'বাইরের থেকে সমর্থন' পাওয়া সম্ভব ছিল। এই তত্ত্বের রূপায়ণের জন্যে যে তথ্যটা জানা ছিল, সেটা হল মহাকর্ষজনিত ও জাড্যজনিত ভর-এর সমতা। দ্বিতীয় সমর্থনের যেটা দরকার ছিল, সেটা হল—মহাকর্ষের ক্ষেত্রে আলোর রশ্মি বেঁকে যাওয়া। তবে 'বাইরের থেকে সমর্থনে'র ও অভ্যন্তরীণ সুষমা খুঁজে বার করার জন্যে যে অনুসন্ধান—এই দুটি প্রচেষ্টার মিলন ঘটল বিজ্ঞানের কর্মব্যস্ত পথের ধূলিধূসরতার মধ্যে।

প্রিন্সটনে থাকার পুরো সময়টা ধরে আইনস্টাইনের নিঃসঙ্গতা আগের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যার মোটামুটি প্রভাবশীল অথবা সমগ্র ঘরানার (স্কুলের) বাইরে অবস্থান করছিলেন। এই তত্ত্বতে এমন কিছু ছিল না, যা একটা পরীক্ষাগত ফলাফলের ব্যাখ্যার দ্বারা ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজকে আকৃষ্ট করতে পারত। এই তত্ত্বের 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা' ও তার 'বাইরের থেকে সমর্থন'-এর কোনো ক্ষেত্রে মেলবার অবস্থা ছিল না। এইবার 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা' কল্পনার দিক থেকে সর্বাপেক্ষা সামগ্রিক ছিল। পদার্থগত প্রক্রিয়ার

সামগ্রিকতাকে বোঝাতে গিয়ে সংযোজক কোনো প্রতিপাদ্য ছাড়াই গোড়ার দিকে অনেকগুলি অনুমান হিসাবে ধরে নিতে হয়েছিল। প্রাথমিক এই অনুমানগুলি যদিও কোনোভাবেই এমন কোনো পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিল না, যাতে তা থেকে বিশ্বাস উৎপন্ন হতে পারে।

তিরিশ বছর ধরে যে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব আইনস্টাইনের মনকে অধিকার করে ছিল তার ঐতিহাসিক অর্থ ও পরিণতিকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনার পরিণতি ও অর্থের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে আইনস্টাইনের মনোভাব ঠিক পুরোপুরি নেতিবাচক ছিল না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পাল্টা কোনো ধারণা তিনি হাজির করেন নি অথবা অণুবিশ্বের কোনো অ-পরিসংখ্যানগত তত্ত্বও তিনি বিকশিত করার চেষ্টা করেন নি। বরঞ্চ, ইতিবাচক রূপেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা রূপায়িত হয়েছে। তবুও এই তত্ত্বের ইতিবাচক ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যা ছিল তা সম্ভবত শেষ পর্যন্ত একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে প্রবেশ করবে না। আমরা আইনস্টাইনের তত্ত্বকে 'ভ্রান্ত'* (কোটেশন চিহ্নের মধ্যে) বললেও বলতে পারি কারণ তার সাধারণ প্রতিপাদ্যের মধ্যে এমন কিছু ভুল নেই, যেমন অনেকগুলি নিয়ম রয়েছে যারা ক্ষেত্রগুলির কাঠামো নির্ধারণ করে এবং সকল রকমের জানা-ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে একই একীভূত ক্ষেত্রের নানা রকমের চেহারা। ১৯৫৯ সালে 'একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্পর্কে আইনস্টাইনের রূপরেখা প্রসঙ্গে মন্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধে ভের্ণার হাইসেনবার্গ মৌল কণা ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্রুত বৃদ্ধির জন্যেই আইনস্টাইন প্রধানত সফল হতে পারেন নি বলে মন্তব্য করেছেন। ১৯৩০-৫০-এর দুই দশকে এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং সেই সময়ে পদার্থবিদ্যার এমন কোনো নামকরা পত্রিকা ছিল না যাতে নতুন কোনো মৌল কণা ও ক্ষেত্রের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা না-করা হয়েছে। প্রতিটি কণাই একটি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে কণাকে অন্য কণাদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাহক হিসাবে দেখা হয়, ঠিক যেমন ফোটন কণাগুলি ইলেকট্রনদের ও অন্যান্য তড়িতাবিষ্ট কণাদের মধ্যে তড়িৎ-চুম্বকীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। নতুন তথ্যের এই বিপুল বিস্ফোরণের মধ্যে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের পক্ষে শক্ত জমি পাওয়া কঠিন ছিল।

---

* অর্থাৎ, ভ্রান্ত, এটা জোর করে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যাচ্ছে না।

—অনুবাদক।

"গোড়ার দিকে সত্যসত্যই এই আশ্চর্য উল্লেখজনক প্রচেষ্টা যেন সফল হচ্ছিল না," লিখছেন হাইসেনবার্গ, "একই সময়ে যখন আইনস্টাইন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের সম্পর্কে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ক্রমাগত নতুন মৌল কণা ও তাদের সঙ্গে যুক্ত নতুন ক্ষেত্রগুলি আবিষ্কৃত হচ্ছিল। তার ফলে, আইনস্টাইনের কর্মসূচী পূরণ করার জন্যে যেটার আবশ্যক ছিল, সেটার অভাব ঘটে এবং তাঁর প্রচেষ্টা থেকে কোনো বিশ্বাসযোগ্য ফল পাওয়া যায় নি।"

কিন্তু একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের তাত্ত্বিক বিকাশ সাধনের কাজে এই অসুবিধার পরিণতিতে আইনস্টাইনের কর্মসূচীর পক্ষে ক্রমশ যুক্তি সংগৃহীত হতে লাগল। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০-এর দশকের আবিষ্কারগুলি বিশ্ব-ছবিতে এমন কণার অস্তিত্ব প্রকাশ করল যা অন্য কণায় রূপান্তরিত হয় এবং এমন ক্ষেত্রের সন্ধান পেল যা অন্য ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়। এখন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ধারণাগত ভিত্তির উপর রাখা সম্ভব হল: একটি কোয়ান্টাম-এর অন্য কোয়ান্টামে বদল হওয়াটা থেকে বেরিয়ে এল একটা ক্ষেত্রজনিত ব্যাপার থেকে অন্যতে বদল হওয়াটা, একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে অন্যতে যাওয়াটা। আমরা দেখলাম যে, অতি মাত্রায় আপেক্ষিকতাবাদের ক্রিয়াগুলির 'কোয়ান্টাম-উত্তর' বিশ্বের ধারণা এবং একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব বিশ্বের মৌল প্রক্রিয়া হিসাবে মৌল কণাগুলির রূপান্তরণের সাধারণ ধারণার মধ্যে একত্রিত হতে পারে। এটা এখনও করা সম্ভব হয় নি। আমরা একমাত্র জগতের ছবির ব্যাপারে এমন ভাবে একটা মহাকর্ষগত তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সম্ভাবনার কথা বলতে পারি, যা থেকে এমন একটা বিশ্ব-চিত্র পাওয়া যাবে যেটা হল কণাগুলির রূপান্তরণের পদার্থগত চিত্র। এই ধরনের ছবি যে সম্ভব এবং তার ফলে বস্তুদেহগত ছবি যে সম্ভব, সেটা আজ বাস্তব বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তা থেকে আইনস্টাইনের 'নিষ্ফল' ধারণার সম্পর্কে আমাদের মনোভাব বদলেছে।

একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব আপেক্ষিকতাবাদের একটা সম্পূর্ণ রূপ উপস্থিত করবে। আইনস্টাইন যেভাবে দেখেছেন, তাতে ঐ 'সম্পূর্ণতা'র অর্থ হচ্ছে যে, এমন প্রাথমিক, সাধারণ ধারণা ও নিয়ম আবিষ্কার করা, যা আগের চাইতে অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব রূপায়ণে সক্ষম করে তুলবে এবং তার থেকে আগেকার তত্ত্বগুলি পাওয়া যাবে। এটাই ছিল বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সংক্ষিপ্তসার। এ থেকে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের বিকাশ সম্ভব হল, যাকে একটা বিশেষ ধরনের তত্ত্ব হিসাবে নেওয়া যায়। আপেক্ষিকতাবাদের সম্পূর্ণতাকে অনুরূপ-

ভাবে সাধারণ আপেক্ষিকতা (অর্থাৎ, যাকে মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব বলা যেতে পারে) রূপে বিবেচনা করা যায় : একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বকে এমন ধরনের অবস্থা তৈরি করতে হবে, যাতে একীভূত ক্ষেত্র মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সম্পর্ককে মেনে চলে। প্রতিটি তত্ত্বেই আমরা এমন সীমাবদ্ধ ধারণা ও সংখ্যা বা পরিমাণ পাই যেটা কোনো একটা নির্দিষ্ট তত্ত্বের গণ্ডির মধ্যে তাদের প্রকৃতিকে প্রকাশ করে না এবং তাকে মৌলিক বলেই ধরতে হবে। অন্য সাধারণ তত্ত্বদের তুলনায় তাদের সাধারণভাবে ও অন্যান্য শর্তের তুলনায় শর্তাধীন ও প্রকৃতি-নির্ভর করে তুলতে হবে। খ-গোলের বলবিদ্যাতে, যেটা নক্ষত্র, গ্রহ এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তত্ত্ব, প্রাথমিক, নিশ্চিত ও অব্যাখ্যাত বস্তুরা হচ্ছে গগনমণ্ডলের অঙ্গ এবং তাদের মধ্যের প্রাথমিক দূরত্ব। এই বিষয়গুলি একমাত্র এমন এক মহাজাগতিক বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থন করা যায় যাদের অন্য কণা, পরমাণু ও মৌল কণাদের গতিবিধি ও রূপান্তর দিয়ে করা সম্ভব। পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানে, একমাত্র মৌল কণাদের ভর ও আধানগুলিকে দিয়ে গণনা করা সম্ভব যেটার জন্যে মৌল কণাদের সম্পর্কে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের আরও সাধারণ নিয়মাবলীর দ্বারা ব্যাখ্যা ও সমাধান করা সম্ভব।

বিভিন্ন খ-গোলের মধ্যে প্রাথমিক যে দৃষ্টান্তগুলি রয়েছে সেগুলি সেই রকমের কেন এবং অন্য রকমের নয় কেন? আমরা যখন তাদের মাইল অথবা কিলোমিটার অথবা অন্য কোনো ইউনিটের দ্বারা প্রকাশ করি, তখন সমস্যাটা আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায় : খ-গোলের বিভিন্ন বস্তুদের মধ্যের দূরত্ব হচ্ছে একটা ইচ্ছামতো ধরে-নেওয়া পদ্ধতি যা কিনা সেন্টিমিটার, মাইল, কিলোমিটার অথবা আলোকবর্ষের উপর নির্ভর করে। পারস্পরিক দূরত্বকে অতিক্রম করা যায় যদি আমরা কোনো ধরনের মাপবার প্রাকৃতিক যন্ত্রকে, যেমন সৌরজগতের ব্যাসার্ধকে, হিসাবের মধ্যে ধরি। এই মাপকাঠি দিয়ে হিসাব করলে নেপচুনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ তুলনায় এক কক্ষের অন্তবর্তী হয়ে দাঁড়াবে, তাকে সৌরজগতের উৎপত্তির সঙ্গে বর্ণনা করা চলবে। তেমনি যদি গ্রামের অনুপাতে না হয়ে ইলেকট্রনের ভর-এর অনুপাতে করা হয়, তাহলে এ্যাটমীয় ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার এই ধ্রুবকগুলি—এই ভরগুলিকে আরও সাধারণ নিয়ম থেকে বিশেষভাবে চালিয়ে নিয়ে আসতে হবে, অর্থাৎ কিনা, তাদের নিয়ে আসতে হবে মৌল কণাদের একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব থেকে

এবং নিয়ে আসতে হবে কণাগঠনের চিত্র থেকে—যা বিভিন্ন ধরনের কণার ভরের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রকাশ করে।

আইনস্টাইনের কাছে পদার্থবিজ্ঞান থেকে আগে-থেকে ধরে-নেওয়া ধ্রুব উপাদানগুলির বর্জন, তাদের ব্যাখ্যা এবং সাধারণ তত্ত্ব থেকে একটা বিশিষ্ট তত্ত্বের সীমায়িত মূল্যগুলির নির্ণয়—বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির মৌল প্রবণতা হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। এই ধরনের আগে-থেকে ধরে-নেওয়া ধ্রুব উপাদানগুলির বর্জন মহাবিশ্বের ঐক্য ও জ্ঞেয়তার প্রকাশ। তাঁর 'আত্মজীবনীমূলক নোটস'-এ তিনি একটা প্রতিপাদ্য হিসাবে দেখিয়েছেন যে, ভাবগত বিশ্ব-চিত্র আঁকার ক্ষেত্রে কোনো খেয়ালখুশিমাফিক ধ্রুব উপাদানের অস্তিত্ব নেই। আলোর যে গতি প্রতি সেকেণ্ডে এত সেন্টিমিটার বলে মাপা হয়, সেটা আগে-থেকে ধরে-নেওয়া ইউনিটের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু, আইনস্টাইন বলেছেন, আমরা যেন আলোর গতিবেগ একটা নির্দিষ্ট সেকেণ্ডে কতোটুকু দূরত্বে যাচ্ছে তা না করে যেন ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ দিয়ে হিসাব করতে পারি। একটা ভর-এর একক হিসাবে একটা গ্রামকে না দেখে তার বদলে ইলেকট্রনের ভর বা ঐ রকম কিছুকে দিয়ে দেখতে হবে। তাহলে পরে পদার্থবিদ্যা থেকে সেন্টিমিটার, গ্রাম অথবা সেকেণ্ড প্রভৃতি ধ্রুবকগুলি ছেড়ে দিয়ে তার বদলে 'প্রাকৃতিক' ইউনিটগুলিকে নিতে হবে।

"যদি এটা করা হয়েছে বলে মনে হয়, তাহলে পদার্থবিজ্ঞানের মৌল সমীকরণের ক্ষেত্রে একমাত্র 'আয়তনহীন' ধ্রুবকগুলিই পাওয়া যাবে। এ নিয়ে কথা বলতে হলে আমাকে এমন একটি থিওরেমের কথা বলতে হবে, যেটা প্রকৃতির সরলতার অর্থাৎ বোধগম্যতার (বা তাকে জানা যায়) 'পরে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া বর্তমানে আর কিছু হতে পারে না: এই ধরনের মন-গড়া ধ্রুবক বলে কিছু নেই, অর্থাৎ বলতে গেলে, প্রকৃতি এমন ভাবে গঠিত, যাতে এই ধরনের নির্ধারক নিয়মগুলি যৌক্তিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব, যাতে এই নিয়মগুলির মধ্যে একমাত্র সম্পূর্ণভাবে যৌক্তিক নির্ধারক ধ্রুবকগুলি দেখা দেয় (এরা এমন সব ধ্রুবক নয়, যার সংখ্যাগত মূল্যগুলিকে বদল করা যায়—তত্ত্বকে বদল না করে)।"(১)

অতএব, আইনস্টাইনের মতে প্রতিটি আয়তনহীন ধ্রুবক—একটা ক্রটির

১ Philosopher-Scientist, pp. 62-63.

বদলে অন্য ক্রুতি, একটা ভর-এর বদলে অন্য ভর, (যেমন কিনা, একটা কণার ভর-এর বদলে ইলেকট্রনের ভর), একটা দৈর্ঘ্যের বদলে অন্য দৈর্ঘ্য (যেমন কিনা, তরঙ্গের ঢেউ, অথবা একটা কণার ব্যাসার্ধ অথবা মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ) —এ সবই একটা তত্ত্বের বদলে অন্য তত্ত্ব দিয়ে বোঝানো যায় ; ভাবগত দিক দিয়ে ধরলে সব সময়েই এই ধরনের ধ্রুবকের কারণ সংক্রান্ত প্রশ্ন, ধ্রুবকের জন্যে নানা তত্ত্বে নানারকম মাত্রা নির্ধারণ করা হয় কেন, তার জবাব পাওয়া সম্ভব। এটা আসছে 'প্রকৃতির সরলতার, অর্থাৎ বোধগম্যতার 'পরে আস্থা' থেকে। আমরা এখন আইনস্টাইনের ধারণা সম্বন্ধে এই কথাগুলির আসল মানে বুঝতে পারি। বাইরের জগৎকে জানার অর্থ হল, যে নিয়মগুলিকে এ মেনে চলে, সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান, যে কার্যকারণ সম্বন্ধগুলি সারা জগতে পরিব্যাপ্ত থেকে জগৎকে ঐক্য-বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান।

প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের সহকারী আর্নস্ট স্টাউস তাঁর শিক্ষকের একটা বিশেষ উক্তি তাঁর স্মৃতিকথায় উদ্ধৃত করেছেন: "আমাকে যেটা ঔৎসুক্য জাগায়: ঈশ্বর কি এই মহাবিশ্বকে অন্যভাবে তৈরি করতে পারতেন, যৌক্তিক সরলতার চাহিদা কি সীমাহীন হতে পারে?"(১)

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে আইনস্টাইনের 'ঈশ্বর' আসলে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার যৌক্তিক কার্যকারণ সম্পর্কের আর একটি নাম। আমরা এটাও জানি যে, যৌক্তিক সরলতার অত্যন্ত কম-সংখ্যক স্বাধীন প্রতিপাদ্যের মধ্যে, জগৎ-চিত্রের ঠিক-ঠিক ভাবে ফুটিয়ে তোলা তত্ত্বের মধ্যে এই কার্যকারণ সম্পর্ক প্রকাশ পায়। প্রশ্ন হল, যৌক্তিক সরলতার মানদণ্ডটি কি কোনো স্বচ্ছ বিশ্ব-চিত্র নির্মাণের দিকে নিয়ে যায়? মনে হয়, আইনস্টাইন বলতে চান যে, "ঈশ্বর মহাবিশ্বকে অন্যভাবে গড়ে তুলতে পারতেন না" কারণ যৌক্তিক সরলতার তাগিদই বিশ্ব-চিত্রের বিশেষ নির্ধারক শক্তি। বিষয়মুখী সত্যের দিকে অগ্রসর হতে হতে বিজ্ঞান ক্রমশই যৌক্তিক সরলতা অর্জন করে (এর কারণ হচ্ছে পরীক্ষামূলক ধ্রুবকগুলির, যা যৌক্তিকভাবে গৃহীত নয়, বর্জন এবং যেহেতু অন্যান্য ধ্রুবকগুলির সঙ্গে তাদের কার্যকারণ সম্পর্কের অভাব রয়েছে) এবং ক্রমবর্ধমানভাবে বাস্তবতার একটা বিশ্বস্ত বিবরণ উপস্থিত করে। বিশ্বচিত্রগুলি একের পর এক সমধর্মী রূপ গঠন করে।

তাহলে আইনস্টাইন যখন যৌক্তিক প্রয়োজনের কথা বলেন তখন তাঁর মনে

১ Helle Zeit, p. 72.

আসলে যে বস্তুটা রয়েছে সেটা হল প্রকৃতির নিয়মগুলির মধ্যে যথার্থ বিষয়মুখী সংযোগ। প্রতিটি নিয়ম অন্য নিয়মগুলির সঙ্গে সংযুক্ত এবং কার্যকারণ সম্পর্কের অখণ্ড ধারা মহাবিশ্ব ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের অণুবিশ্বকে জড়িয়ে রেখেছে। এর ফলে একটি নিয়ম থেকে অন্য নিয়মকে যৌক্তিকভাবে বার করে নিয়ে আসা সম্ভব, সংখ্যাগত নিয়ম ও ধ্রুবকগুলিকে জড়িয়ে একটি অখণ্ড ধারা বিশ্বের সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাপুঞ্জ, গ্রহদের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, কণাদের ভর ইত্যাদি কিছুই আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপযোগী মানদণ্ডকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। বিশ্ব-চিত্রে বিশুদ্ধ কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাপুঞ্জ নেই, যেমন নেই নিছক কোনো পূর্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব। একটা তত্ত্বের গণ্ডির মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্ককে আটকে দেওয়া যায়; কিন্তু এটাকে বরাবরের জন্যে আটকে দেওয়া যায় না, এটা কোনো এক সময়ে এই গণ্ডিকে পেরিয়ে যাবেই।

আজকের কার্যকারণ সম্পর্কের অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক জোহানেস কেপলার একবার মহাবিশ্বের পরিমাণবাচক সম্পর্কগুলির সম্বন্ধে সৌর জগতের গ্রহগুলির মধ্যেকার দূরত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন: "এগুলি যা তাই কেন, অন্য রকম নয় কেন?" এর উত্তর পেতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সংখ্যার রহস্যবাদের মধ্যে নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের যা বৈশিষ্ট্য সেই কার্যকারণ সম্পর্কের চিন্তা আইনস্টাইনের কর্মে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। কিন্তু তিনিও সকল পদার্থগত ধ্রুবকের বাস্তব কার্যকারণভিত্তিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি, তিনি এমন কোনো তত্ত্ব বার করতে পারেন নি, যাতে সমস্ত ধ্রুবক বস্তুজাগতিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়। আপেক্ষিকতার প্রাথমিক সম্পর্কগুলি ততদিন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাপুঞ্জ-ভিত্তিক চরিত্রেরই থাকবে, যতদিন না গতিশীল বস্তুর সাধারণ ধর্ম থেকে তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যাবে। এই ধরনের ধর্মগুলি এর টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন চরিত্রের মধ্যে, এর আণুবীক্ষণিক কাঠামোর মধ্যে, অণুবিশ্বের পরিমাণবাচক সম্পর্কগুলির মধ্যে (অর্থাৎ যে তথ্যগুলিকে নিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান কাজ করে) থাকতে পারে। আপেক্ষিকতা গতিশীল পরিমাপকারী দণ্ডগুলির সংকোচনকে এবং গতিশীল কাঠামোর মধ্যে কালের প্রসারণকে মৌল সম্পর্ক বলে মনে করে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে পরিমাপকারী দণ্ড ও ঘড়ি হচ্ছে স্থূলসত্তা।

হাইসেনবার্গ লিখেছেন : "সাধারণভাবে বলতে গেলে অনেকগুলি মৌল কণা নিয়ে এরা গঠিত, এরা নানাধরনের শক্তি-ক্ষেত্রের জটিল ক্রিয়ার অধীন, এইজন্যে তাদের আচরণ বিশেষ করে সরল নিয়মের দ্বারা কী করে বর্ণনা করা যাবে সেটা বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

আইনস্টাইন সম্পূর্ণভাবেই বুঝেছিলেন যে, আপেক্ষিকতাবাদের প্রাথমিক সম্পর্কগুলিকে (যে আপেক্ষিকতাবাদ মাপবার দণ্ড ও ঘড়ির আচরণের ব্যাখ্যা দেয়) সমীকরণের মাধ্যমে আরও সাধারণ সম্পর্কগুলি থেকে আবিষ্কার করা যায়। তাঁর 'আত্মজীবনীমূলক নোটস'-এ তিনি লিখছেন :

"…উপরে যে তাত্ত্বিক বর্ণনা দেওয়া হল, সে সম্পর্কে এটা মন্তব্য করা যেতে পারে। কাউকে এই তথ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হতেই হবে, যেটা (চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্র ছাড়া) দুধরনেব পদার্থগত বিষয় প্রবর্তন করে, যথা (ক) মাপবার দণ্ড বা যন্ত্র ও ঘড়িগুলি, (খ) অন্যান্য যাবতীয় বস্তু, যেমন তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র, বস্তুগত বিন্দু ইত্যাদি। একদিক থেকে দেখতে গেলে এটা একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ : ঠিকমতো বলতে হলে, মাপবাব যন্ত্র ও ঘড়িগুলিকে হাজির করতে হবে মৌল সমীকরণের সমাধান হিসাবে (যেমন কিনা পারমাণবিক সংঘাতের বিষয় হিসাবে), নিশ্চয়ই তত্ত্বগতভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা হিসাবে নয়।"(১)

অবশ্য আমরা যখন 'মাপবার যন্ত্র ও ঘড়ির' কথা বলি তখন আমরা সেটাকে আলংকারিক অর্থেই বুঝি। নিশ্চয়ই এমন এক সময় ছিল যখন এই ধরনের বক্তব্যকে একেবারে আক্ষরিকভাবে নেওয়া হতো। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাইরাকিউস যথার্থই ভেবেছিলেন, যে-লীভার দিয়ে আর্কিমিডিস জগৎটাকে সরিয়ে দেবেন, সেটা বোধ হয় পেছনে কোথাও রাখা আছে, একটা উপযুক্ত আলম্ব (যার উপর ভর দিয়ে অন্য অংশগুলি ঘোরে) পেলেই সেটাকে সামনে আনা যাবে। অন্যরা যারা এই আলম্বতে বিশ্বাস করত না, তারা আর্কিমিডিসকে মিথ্যা অভিযোগে চিহ্নিত করত। ঠিক তেমনিভাবেই একটা সরলবিশ্বাসে এটা মনে করা যেতে পারে যে, 'মাপবার যন্ত্র ও ঘড়িগুলি' একমাত্র শাসকদের উপস্থিতিতেই কাজ করে। দর্শকরা সেগুলিকে ব্যবহার করতে পারে। আমরা এখানে এমন জিনিসগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেগুলির

---

১ **Philosopher-Scientist, p. 59.**

অস্তিত্ব দর্শকদের এখানে উপস্থিত হবার বহু শত-শত কোটি বছর পূর্বেই ছিল। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, আইনস্টাইন 'মাপবার যন্ত্র' ও 'ঘড়িগুলির' দ্বারা, অর্থাৎ, কঠিন দণ্ড ও পৌনঃপুনিক গতি ও 'দর্শকদের' দ্বারা বিষয়মুখী প্রক্রিয়াগুলিকে বর্ণনা করেছেন। এইগুলিকে নিয়ে নিয়মিত ঘড়িকে (আবর্তনের সংখ্যা বা একটা প্রাথমিক মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তগুলির টুকরো টুকরো অংশকে) এবং দুটি বিন্দুর মধ্যেকার কঠিন দণ্ডের সংখ্যা মাপা সম্ভব। 'বিভিন্ন মাপবার যন্ত্র ও ঘড়ি' বলে এই ফরমুলার বিষয়ীমুখী ধারণাকে সহজেই দূর করা সম্ভব। আসল বাস্তবে যে মুশকিলটা দেখা দিল সেটা হল (আইনস্টাইন যেটা কিছুতেই এবং কোনোভাবেই অতিক্রম করতে পারতেন না), এমন একটা আণুবীক্ষণিক প্রক্রিয়া, যার দেশগত ও কালগত পরিমাপের সম্পর্কগুলিকে ('মাপবার দণ্ড ও ঘড়িগুলির আচরণকে') এমন একটা কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে, যেটা পরস্পরের সঙ্গে চলে। আজও আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং ঠিক কি ভাবে হচ্ছে বলতে পারি না যে, বস্তুর আণুবীক্ষণিক কাঠামো (এবং সম্ভবত দেশ ও কালের বিচ্ছিন্নতা) কী করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সম্পর্কগুলিতে পরিণত হচ্ছে। তারা জগতের সকল প্রক্রিয়া, গ্যালাক্সি, গ্রহ, অণু ও পরমাণু-জগতের সমস্ত প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু তারা কি দেশ ও কালের অপরিসীম ক্ষুদ্র জগতের ও মৌল কণাগুলির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে? এটা আমরা জানি না। যদি তারা এটা করে, তাহলে পারমাণবিক কাঠামো দিয়ে মাপবার দণ্ড ও ঘড়িগুলির আচরণকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব: আমরা তাদের মধ্যের আপেক্ষিক তত্ত্বের সম্পর্কগুলির চরিত্রকে ব্যাখ্যা করতে পারি না তাদের অধীনস্থ প্রক্রিয়াগুলিকে ধরে। আমরা অবশ্য আশা করতে পারি যে, অতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাণু জগতে এমন সব সম্পর্ক পাওয়া যাবে যার থেকে—আপেক্ষিকতাবাদী সম্পর্কগুলি দেখা দেবে এবং তারা আরও বৃহত্তর কালগত ক্ষেত্রে এবং বৃহত্তর দেশগত পটভূমির দিকে চলে যাবে।

আমরা তাপগতিবিদ্যা সংক্রান্ত আইনস্টাইনের কাজে নতুন সূত্রভিত্তিক সম্পর্ক ও ধারণার এবং উনিশ শতকীয় ধ্রুপদী তাপগতিবিদ্যার মধ্যে একটা উত্তরণশীল সম্বন্ধ দেখতে পাই। এটা হল স্বতন্ত্র অণুদের আণুবীক্ষণিক গতির থেকে বৃহৎ জগতের অবস্থায় রূপান্তর। এখন আমরা আইনস্টাইনের তত্ত্বের অধীনে গতিগুলিকে পাচ্ছি। অতিক্ষুদ্রাণুর অবস্থা থেকে এই সব গতিতে

যাওয়ার মধ্যে সমস্যা রয়েছে। কয়েকটি দিক থেকে দেখলে আইনস্টাইনের ধারণা এর মধ্যে পড়ে। স্মরণ করা যাক যে, আপেক্ষিকতার গতি থেকে নতুন ইলেকট্রনের গতিবেগ বেরোল, যা নাকি ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়ের ফোটনে রূপান্তর থেকে ঘটল এবং ফোটন থেকে বেরোল ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়। আরও স্মরণ করা যাক, কোয়ান্টাম বলবিদ্যাতে ও আইনস্টাইনের অবস্থান প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছিল: প্রাথমিক আবিষ্কারগুলির পর গত তিরিশ বছরে যা কিছু ঘটেছে,—মৌল কণাদের রাসায়নিক রূপান্তর, এক কণা থেকে অন্য কণাতে পরিবর্তন—তা সবই বহু ধরনের তথ্যের ব্যাখ্যা করে। এই কালপর্বেই এক ধরনের কণা থেকে অন্য ধরনের কণা নির্গত হওয়া এবং পরে কণার মধ্যে তাদের বিশোষণের ধারণা দেখা দিয়েছিল ও বিকশিত হয়েছিল। আমরা জানি যখন একটা কণা বড় আকারে বিদ্যমান থাকে, তখন সে অনবরত ও প্রকৃতপক্ষে (অতিক্ষুদ্র জগতের ক্ষেত্রে) অন্য কণাতে রূপান্তরিত হয় এবং আবার ফিরে আসে।

তাই মনে হয় দেশ-কালের বিচ্ছিন্ন কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে কণাদের রাসায়নিক রূপান্তরকে দেখাই স্বাভাবিক। একটা বিশেষ ধরনের কণা একটা প্রাথমিক, অবিভাজ্য দেশগত ক্ষেত্র থেকে ঝাঁপ দেয় অন্য একটা ক্ষেত্রে—একটা প্রাথমিক, অবিভাজ্য কাল-ব্যবধানের ধারায়, এই প্রক্রিয়ায় একটা কণা অন্যতে রূপান্তরিত হয়। কণার প্রাথমিক রাসায়নিক রূপান্তর ও প্রাথমিক উত্তরণের অবিভাজ্যতা সংক্রান্ত অনুমানটি দেশ ও কালের বিচ্ছিন্নতাকে বুঝতে সাহায্য করে। যদি একটা কোষ থেকে কোনো কণা মিলিয়ে যায় এবং অন্য আর একটি কোষের মধ্যে তাকে পুনরায় দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে কোনো সিগন্যালকেই একেবারে ন্যূনতম অপেক্ষা দূরে পাঠানো চলে না অথবা একেবারে ন্যূনতম সময় ছাড়া চলে না। দুটি ঘটনা—একটি পয়েন্ট x-এ, t টাইম ঘটনা দিয়ে, আর অন্যটি x' পয়েন্টে, t' টাইম দিয়ে—এদের মধ্যে আলাদা করতে হলে ন্যূনতম দূরত্ব অথবা ন্যূনতম কালের হিসাব করতে হয়।

দেশ ও কালের বিচ্ছিন্নতার ধারণা তখনই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হবে যখন সেটা বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে। এর অনেক পূর্বেই এপিকিউরাস বলেছিলেন 'কাইনিম্যাস'-এর কথা—'যেগুলিকে শুধুমাত্র কল্পনার দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়' এবং তারা সবসময়েই সমান গতি বজায় রাখে—সেইরকম পরমাণুর আণুবীক্ষণিক বিচ্যুতির কথা।

এমন অনেক পরমাণু আছে যারা খুব সামান্য গতি নিয়ে দৌড়য়; তারা কখনই গতিহীন হতে পারে না যদি তাদের 'কাইনিম্যা'র গতিকে একদিকে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

এপিকিউরাসের 'কাইনিম্যা'র সমকালীন তুলনা হল প্রাথমিক রূপান্তর ও বিচ্যুতির জগৎ—সেটা আইনস্টাইন যেভাবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে বলেছিলেন, সেই রকমই। আমরা তাদের পরিবর্তে রূপান্তরণ-বিচ্যুতির বিরাট সংখ্যক ফলাফল দেখে কিছু বলতে পারি না, যাতে স্বতন্ত্র রূপান্তরণকে উপেক্ষা করা হয় এবং অতিবৃহৎ জগতের ব্যাপারকে বড়ো করে দেখানো হয়: একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা কণার অবস্থান জেনে আমরা কেবল তার গতিবেগের সম্ভাব্যতা নির্ণয় করতে পারি। একটা কণা একদিকেই চলে এবং তার অতিবৃহৎ জগতের একটাই গতি থাকে, যদি সেই দিকে তার মৌলিক বিচ্যুতি অন্যদিকে রূপান্তরণের গতির চেয়ে অনেক কম পরিমাণের হয়। এই অবস্থাতে অনেকখানি রূপান্তরণ হবার পরে ঐ কণার গতিবেগ অতিবৃহৎ দূরত্বের থেকে অনেক তীক্ষ্ণভাবে তীব্র গতিবেগ নিয়ে হবে। এখানে সব কিছু কোয়ান্টাম বলবিদ্যার রাশিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী চলে এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পেছনে যে নিয়মগুলি রয়েছে, সেগুলি অনুযায়ী নয়। ·এটা মোটেই কোনো 'লুকানো গুণনীয়ক' ও অজ্ঞাত প্রক্রিয়ার ব্যাপার নয় যাতে একটা পরীক্ষার মধ্যে সব কিছু নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত করা যেতে পারে, যাতে একটা বস্তুদেহের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট গতিশীল অবস্থান ও গতি, যেটা সেই বস্তুদেহের অবস্থানের একটা বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে এবং তার সম্ভাব্য কোনো গতিবেগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে, সে ব্যাপারও নয়। এর মধ্যে কোনো 'লুকানো গুণনীয়ক' নেই এবং একটা কণার গতি (একটা অপরিবর্তনীয় কণা যা কিনা মিলিয়েও যায় না আবার ফিরেও আসে না) নির্ধারিত হয় তার কোয়ান্টাম বলবিদ্যার রাশিবিজ্ঞানগত নিয়মের দ্বারা। কিন্তু এই ধরনের গতি প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলির বৃহৎ সংখ্যার রাশিবিজ্ঞানগত ফলাফলকে প্রকাশ করে মাত্র—এই প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে নির্ধারক বা অনির্ধারক গতিশীল পরিবর্তনধর্মী উপাদানগুলি মোটেই প্রযোজ্য নয়।

এই ধরনের ছকগুলি এমন একটা প্রক্রিয়ার ভাবগত দৃষ্টান্ত—যা আইনস্টাইনের নিষ্ফল ধারণার উপলব্ধির ঐতিহাসিক মূল্যায়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোনোভাবেই এই ধারণাগুলি পদার্থবিদ্যাকে কোয়ান্টাম-রাশিবিজ্ঞানগত

কার্যকারণ-সম্পর্ক থেকে ধ্রুপদী কার্যকারণ-সম্পর্কের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে নি। উল্লিখিত ছকটি অতিক্ষুদ্রাণু জগতের তত্ত্বগত বিকাশের সম্ভাবনাকে নীতিগতভাবে ভুলে ধরার দৃষ্টান্ত। ক্ষুদ্রাণু জগতের তত্ত্ব কোয়ান্টাম বলবিদ্যার চাইতে ধ্রুপদী ধারণা থেকে আরও দূরে চলে যায়—যাকে ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরও বেশি স্ববিরোধী ও 'পাগলামী' বলে মনে হবে। আইনস্টাইন এইভাবে দেখেছিলেন যে, জ্ঞান-প্রক্রিয়া চরমভাবে নিষ্পত্তিমূলক তত্ত্বের আকারে কখনও পরম সীমার মুখোমুখি হয় না। আবার এটা পেছন দিকেও যায় না (অর্থাৎ অর্জিত জ্ঞানের স্তর থেকে অতীতের অজ্ঞানতার দিকে ফিরে যায় না—অনুবাদক)। জ্ঞান-প্রক্রিয়াতে অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, কিন্তু সেটা ঘটে সব সময়েই নতুন ভিত্তির উপর।

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকেই আইনস্টাইন এমন ধারণাগুলিকে সামনে আনছিলেন যা মৌল কণাগুলির ধর্ম ও ক্ষেত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে একমাত্র এই ষাটের দশকেই আপেক্ষিকতাবাদী কোয়াণ্টাম পদার্থ-বিদ্যার মধ্যে সুপরিণত হয়ে উঠছে। এই পরিচ্ছেদের গোড়ার দিকে আমরা ১৯৪৪ সালে মুহ্‌সামকে লেখা একটা চিঠিতে আইনস্টাইনের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি, যাতে আইনস্টাইন তাঁর গাণিতিক যন্ত্রণাবোধের কথা বলছেন। এই পরিচ্ছেদের পূর্বে রয়েছে এমন একটা প্যারাগ্রাফ যাতে একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্বের একটা সাধারণ রূপরেখা রয়েছে :

"লক্ষ্যটা হল পদার্থগত দেশ-এর আপেক্ষিকতাবাদী বৈশিষ্ট্য, যাতে ডিফারেন্‌শিয়াল সমীকরণকে আনা যাচ্ছে না। শেষোক্তটি থেকে কোয়াণ্টা ও বস্তুর যুক্তিসম্মত ধারণা পাওয়া যায় না। এক অর্থে এটা একেবারে নিকটস্থ ক্রিয়ার সূত্রকে বর্জন করা বোঝায়, যে সম্বন্ধে আমরা হার্টজ্'র সময় থেকেই নিশ্চিত ছিলাম। নীতিগতভাবে রাশিবিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন না করে এটা করা সম্ভব—যেটাকে আমি সব সময়েই একটা দুর্বল সমাধান বলে ভেবেছি।"(১)

'পদার্থগত দেশ-এর আপেক্ষিকতাবাদী বৈশিষ্ট্য'র অর্থ হল এমন একটা দেশ-এর ধারণা, যাতে দেশ-এর মধ্যে ক্রিয়াশীল পদার্থগত প্রক্রিয়ার চরিত্রকে

১ Helle Zeit, S. 51.

তার ধর্মগুলি থেকে বার করা যায়। এই ধরনের চরিত্র, আইনস্টাইনের মতে, এমন গাণিতিক পদার্থ নিয়ে হবে, যাতে পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ থেকে তাদের ভিন্ন হতেই হবে।

আমরা আগেই ডিফারেনশিয়াল সমীকরণের পদার্থগত অর্থের কথা বলেছি। তার মধ্যে রয়েছে কণাদের গতিবেগের অতি সামান্য বৃদ্ধির অনুপাত এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেশ ও কালের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কণাদের উপর ক্রিয়াশীল বল। এই ধরনের সমীকরণের অর্থ হল যে, দেশগত ক্ষেত্র ও কালগত ব্যবধান যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, ঘটনাগুলি সবসময়েই ঘটছে, এর মধ্যেই তাদের অনুসন্ধান করা হয় এবং এই ঘটনাগুলি পদার্থবিদ্যার নিয়মের অধীন—যে নিয়মগুলিকে সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। আর একভাবে বলতে গেলে তাদের অর্থ রয়েছে পদার্থগত দেশ ও কালের অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে, দেশ ও কালকে অনন্ত অবধি ভাগ করার মধ্যে, যাতে তারা এই অর্থে পদার্থগত হয় যে, তাদের কাঠামো পদার্থগত প্রক্রিয়াগুলির চরিত্রকে নির্ধারণ করে। এইভাবে ধরলে পদার্থের পারমাণবিক কাঠামোর ও ক্ষেত্রগুলির বিযুক্ত কাঠামোর সঙ্গে অর্থাৎ শক্তির (এনার্জি) অবিভাজ্য অংশ হিসাবে ক্ষেত্র-কোয়ান্টার অস্তিত্বের সঙ্গে, সেটা কি মিলে যায়? না, আইনস্টাইন বলছেন, এরা মেলে না। তাহলে পরে ঘনিষ্ঠ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সূত্রকে অর্থাৎ পদার্থগত প্রক্রিয়াগুলির অবিচ্ছিন্নতার ধারণাকে প্রতিটি প্রক্রিয়ার এক মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে, একটা বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে বিকশিত হওয়ার ধারণাকে বর্জন করতে হবে।

রাশিবিজ্ঞানের পদ্ধতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের মন্তব্যে যাওয়াটা আরও অনেক বেশি মুশকিলের। এটা মনে করা ভুল হবে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে রাশি-বিজ্ঞানগত ধারণাকে আইনস্টাইন 'দুর্বল সমাধান' বলে মনে করতেন। ধ্রুপদী ও কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা নিয়ে আইনস্টাইনের অনেক মৌলিক কাজ রয়েছে এবং রাশিবিজ্ঞানগত পদ্ধতি প্রয়োগ ও বিকশিত করে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করেছেন। কাজেই এই মন্তব্য করার অর্থ হল এইটা বোঝানো যে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যাতে রাশিবিজ্ঞানগত নিয়মগুলি পদার্থগত বাস্তবতার চূড়ান্ত নিয়ম। আইনস্টাইনের মত হচ্ছে যে, এ ছাড়াও এমন সব গভীরতর নিয়ম রয়েছে, যেগুলি রাশিবিজ্ঞানের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না।

আশ্চর্যের কথা হলেও এটা কিন্তু ম্যাকস বোর্ন-এর কোয়ান্টাম ও ধ্রুপদী বলবিদ্যার রাশিবিজ্ঞানগত প্রকৃতির ধারণার মূলত বিরোধী নয়।

মুহ্‌সামকে লেখা (এবং অন্যান্য আরও অনেক বক্তব্য থেকে) চিঠি থেকে এটা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে, তিনি 'কোয়ান্টাম-উত্তর' (transquantal) প্রক্রিয়াগুলিকে ধ্রুপদী, এমন কি বলবিদ্যাগত বলে মনে করতেন। এই প্রক্রিয়াগুলি 'ধ্রুপদী' গতির মধ্যে পড়ে না, যাতে প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে তীব্র-ভাবে অবস্থান ও গতিশীলতা বর্ণনা করা আছে যাতে অন্যত্র ডিফারেন্শিয়াল সমীকরণ ব্যবহৃত হতে পারে এবং তাদের ক্ষুদ্রতম অংশ অবধি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবস্থান দিয়ে বিচার করা যায়। কিন্তু তীক্ষ্ণ অবস্থান অথবা তীব্র গতিসম্পন্ন 'পরিমাণগত' গতির মধ্যেও তারা নেই। তারা নিশ্চয়ই কেবলমাত্র যান্ত্রিক গতি ও ভৌত পদার্থগুলির স্থানচ্যুতির মধ্যেও নেই। আপেক্ষিক সীমানাগুলিকে জড়িয়ে একটা নির্দিষ্ট ধরনের যে-কার্যকারণ সম্পর্ককে একদা আপাতবিরোধী বলে মনে হতো—তাকে অতিক্রম করে অন্যান্য ধরনের কার্যকারণ সম্পর্কও রয়েছে, সেটাও আপাতবিরোধী: ল্যাপলাসের ধ্রুপদী নিশ্চয়তাবাদের পরে রয়েছে কোয়াণ্টাম-বলবিদ্যাগত নিশ্চয়তাবাদ এবং এর পরেও রয়েছে অতিক্ষুদ্রাণু প্রক্রিয়াগুলির নিশ্চয়তাবাদ, যেটা ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার থেকে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী। কার্যকারণ সম্পর্কের সাধারণ সূত্রই শুধু শাশ্বত; এটা জ্ঞানের মতোই শাশ্বত কারণ জ্ঞান হচ্ছে একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যাতে জগৎপ্রপঞ্চের কার্যকারণ-সম্পর্কজনিত ধারণা আরও সংশোধিত ও চিহ্নিত হয়, ব্যাখ্যাত হয় এবং সাধারণভাবে আরও জটিলতর হয়ে ওঠে।

আপেক্ষিকতাবাদের মৌলিক নিয়মগুলির সামান্যীকরণের পক্ষে অতি-ক্ষুদ্রাণু পদার্থের নিয়মগুলি সম্ভবত কাজে লাগে। মাপবার দণ্ড ও ঘড়ির আচরণ প্রাথমিক দূরত্ব ও প্রাথমিক কালগত ব্যবধানের মধ্যেকার সম্পর্কগুলির উপর বেশ ভালোভাবেই নির্ভর করে চলতে পারে। এর পরেরটাকে একটা ধারণাগত দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করা যায়। 10^{-13} এর কাছাকাছি দৈর্ঘ্যে একটা ন্যূনতম দৈর্ঘ্য করা যায়। এটাই হচ্ছে বলতে গেলে সেই ন্যূনতম দূরত্ব যার উপরে একটা সিগন্যালকে পাঠানো যায়—এটাই একটা কণার সম্ভাব্য ন্যূনতম স্থানচ্যুতি। এখন দেখা যাক, একটার সঙ্গে অন্যটার সময়ের ব্যবধান দাঁড়াচ্ছে মাত্র 3×10^{-24} সেকেণ্ড। এটাই হচ্ছে তাহলে একটা সিগন্যালের ন্যূনতম কালক্ষেপের সময়—যে সময়ের মধ্যে একটা কণার সময়ের পরি-প্রেক্ষিতে স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে। আমাদের শেষ অবধি অনুমান করতে হয়

যে, একটা কণার স্থানচ্যুতি হবে 10^{-13} দৈর্ঘ্য নিয়ে যখন তার সময় লাগবে 3×10^{-24} সেকেণ্ড। এটাই তাহলে একটা কণার ন্যূনতম সিগন্যাল, 10^{-13} সেকেণ্ড, যেটা করতে সময় লাগছে 3×10^{-24} সেকেণ্ড। অন্যভাবে বলতে গেলে, একটা কণার ঝাঁপ দিতে সময় লাগছে 10^{-13} সেকেণ্ড, যেটা করতে সময় লাগছে 3×10^{-24} সেকেণ্ড। এই ঝাঁপ দেবার জন্যে সময়ের সঙ্গে দূরত্বের মাপ হবে, অর্থাৎ, $10^{-13}/3 \times 10^{-24} = 3 \times 10^{10}$ সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড অথবা ৩,০০,০০০ কিলোমিটার/সেকেণ্ড, (যেটা হল আলোর গতিবেগ)। কণারা এর চেয়ে বেশি দ্রুত যেতে পারে না এবং কোনো বস্তুও এর চেয়ে বেশি দ্রুত যেতে পারে না। আমরা যদি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে সকল রকমের প্রাথমিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কথা ভাবি (3×10^{-24} সেকেণ্ডে, 10^{-13} এর স্থানচ্যুতির কথা), তাহলে আমরা একটা মাইক্রোস্কোপিক্ পথ দেখতে পাবো যেটা মাইক্রোস্কোপিক পথের চেয়ে অনেক ছোট আকারের হবে: স্থানচ্যুতিটা ঠিক একই ভাবে হতে হবে, যদিও বিভিন্ন আকারে। যদি আমরা একটা কণার মাইক্রোস্কোপিক স্থানচ্যুতির কথাটা হিসাবের মধ্যে না ধরি এবং কেবলমাত্র অনেকগুলি কণার গতির কথাটা হিসাবের মধ্যে ধরবার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের সামনে থাকবে একটা নিরবচ্ছিন্ন **ম্যাক্রোস্কোপিক পথ**। সেটা প্রাথমিক স্থানচ্যুতির চেয়ে অনেক হ্রস্ব-তরঙ্গের হবে। যেমন, বিপরীত দিকে চলতে গেলে একটা কণার সমান পরিমাণের স্থানচ্যুতি হয় বলে তাকে মোটামুটিভাবে একই স্থানে থাকতে হবে এবং তার ম্যাক্রোস্কোপিক পথটাকে হিসাবের মধ্যে ধরা হবে না। তাহলে পরে, ম্যাক্রোস্কোপিক গতিবেগও প্রায় নেই বলেই ধরা হবে। যদি স্থানচ্যুতির সংখ্যা একই দিকে চলতে গিয়ে অনেক বেশি হয়, তাহলে তার ম্যাক্রোস্কোপিক পথটাও হবে দীর্ঘতর। আর শেষত, প্রাথমিক স্থানচ্যুতির ঘটনা যদি একই দিকে ঘটে তাহলে ম্যাক্রোস্কোপিক পথটাও মাইক্রোস্কোপিক পথের সঙ্গে মিলে যাবে এবং ম্যাক্রোস্কোপিক গতিটা আগের গতির সমান হয়ে দাঁড়াবে। এটাই যেকোনো বস্তুর পক্ষে চূড়ান্ত গতি এবং তা থেকে এমন কতকগুলি নিয়ম বার করা যায় যেগুলি মাপবার দণ্ড ও ঘড়ির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে আপেক্ষিকতাবাদের সম্পর্কগুলিকে।

আমরা মৌলিক দেশগত স্থানপরিবর্তনের এবং মৌলিক কালগত ব্যবধানের কথা এমনভাবে বলেছি, যাতে এক দেশগত কোষ থেকে অন্য দেশগত কোষ-এ

বদল করাটা আলোর গতিবেগের সমান হয়। যদি এই সব ধ্রুবককে বেছে নেওয়ার, অর্থাৎ এই বিশেষ উদ্দেশ্যে বেছে নেওয়ার, অন্য কোনো কারণ না থাকত তাহলে সমগ্র অনুমানটা হয়ে দাঁড়াত একটা বিশেষ ধরনের ইচ্ছামতো নির্মাণকার্য—যেটার মধ্যে প্রামাণিকতার অভাব থাকলেও সেটা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলে যেত। দেশ ও কালগত ব্যাপারে পরমাণুর অস্তিত্বটা—একেবারে যেটা ক্ষুদ্রতম মৌলিক কিন্তু যার পেছনে দূরত্ব ও সময়ের পরিমাপের হিসাব রয়েছে—একেবারে সর্বাপেক্ষা মৌলিক, যার পরে আর দূরত্ব বা কালকে ভাঙ্গা যায় না—এগুলিকে শুধু একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই প্রবর্তন করা হয় নি। ঠিক একইভাবে উল্লিখিত বস্তুদের অর্ডারের কথা বলা হয়েছে : ১০⁻ ⁸ দূরত্ব এবং $3x10^{-24}$ সেকেণ্ড। অনেকগুলি পদার্থগত সমস্যাতে এই সংখ্যাগুলি বেশ স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা চলে যে পদার্থ-বিদ্যা কোনো এক সময়ে ম্যাক্রোস্কোপিক তত্ত্ব হিসাবে আপেক্ষিকতাবাদের কোয়ান্টাম-পারমাণবিক তত্ত্বের সত্যতায় পেঁাছুবে এবং এই সত্যতার মধ্যে যে প্রাকৃতিক ধ্রুবকগুলি স্থান পাবে সেগুলি হল সর্বনিম্ন দূরত্ব ও কালগত বিরাম মুহূর্ত।

অতএব একমাত্র এখনই মৌল কণাদের তত্ত্বের আপাত-সম্ভাবনার আলোকে এবং এইক্ষেত্রে কম-বেশি নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্‌বাণী করার প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের শেষ তিরিশ বছরের কাজকর্মের নিছক গতানুগতিক নেতিবাচক মূল্যায়নকে আমরা সংশোধন করে নিতে পারি। কিন্তু এটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় যে, এতবড় একজন প্রতিভা, যাকে নিয়ে বিজ্ঞান গর্ব করতে পারে, তাঁর দীর্ঘকালের নিবিড় গবেষণাকে বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে বরবাদ করে দেওয়া সম্ভব। অনেকের মনে হতে পারে যে, আইনস্টাইনের চোখের সামনে একটা নতুন জগতের অস্পষ্ট চিত্র হাজির ছিল। এই নতুন জগতের চিত্রটা এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে রূপায়িত হয় নি, কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে আরও নির্দিষ্ট চিত্র উপস্থিত করার অবস্থায় পেঁাছেছি। বোর্ন-এর মন্তব্য অনুসারে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্বন্ধে আইনস্টাইনের 'অসন্তুষ্টির' মধ্যে কখনও ধ্রুপদী ধারণাগুলিতে ফিরে যাবার মনোভাব ছিল না। আর এটা আজকের দিনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে আইনস্টাইনের চিন্তায় কোনো 'গুপ্ত মাপকাঠি' ছিল না, যা তাঁকে ধ্রুপদী অবস্থানে নিয়ে যেতে পারত। আজকে অবশ্য আমরা কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে আরও নির্দিষ্টভাবে সংশোধন

করার অবস্থানে এসে গেছি—যাতে বিশ্ব-চিত্রের মৌল ভাবমূর্তি হিসাবে একটা অপরিবর্তনীয় গতিশীল কণার ধ্রুপদী ধারণাকে আরও মূলগতভাবে বর্জন করা যায়।

মাখ-এর সূত্রকে আইনস্টাইন যখন বর্জন করেন, তখন তার মধ্যে ঐ ধরনের প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা নিহিত ছিল। মাখ-এর সূত্রে মহাবিশ্বকে বস্তুগুলির গতি ও বলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতে পর্যবসিত করা হয়। এটা নিশ্চয়ই কণাদের সৃষ্টি ও বিশোষণ থেকে আলাদা, যেটা কিনা জগৎ-চিত্রের অন্তর্নিহিত বস্তুদের অপরিবর্তনীয়তার সূত্রকে লঙ্ঘন করে। এই ধরনের প্রক্রিয়ার ফলে একটা 'ধ্রুপদী আদর্শের' ছবি পাওয়া যায় না, 'নিউটনীয় বলবিদ্যার মতো' বিশ্ব-চিত্রের ধারণার সঙ্গেও এটা খাপ খায় না। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লেষণে আপেক্ষিকতা এমন একটা ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছেছে, যেখানে জগতের এই ছবিটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। 'ধ্রুপদী আদর্শের' মধ্যে যথেষ্ট আবেদন থাকা সত্ত্বেও আইনস্টাইনও এই প্রাথমিক ধারণায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

এ একটা বৈজ্ঞানিক মনীষার লক্ষণ। আইনস্টাইনের আগ্রহ ছিল বিজ্ঞানের মৌল ভিত্তি নিয়ে, বিশ্বের ঘটনাবলী নির্ধারণকারী সাধারণ সূত্রগুলিকে নিয়ে। ১৯২৪ সালে তিনি সোলোভিনকে এইভাবে লিখেছিলেন :

"আমার কাছে বিজ্ঞানের ব্যাপারে আগ্রহটা সূত্রগুলি অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর এটাই আমার কাজের সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা। যে সামান্য কয়েকটি নিবন্ধ আমি প্রকাশ করেছি, সেগুলিও ঐ একই পরিস্থিতির ফসল : সূত্র বা নীতিগুলিকে উপলব্ধি করার প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষার জন্যে ব্যর্থ প্রয়াসের পেছনে আমি যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছি।"(১)

এটা ১৯২৪ সালে লেখা, ঠিক যখন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব চমৎকারভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। ইতিমধ্যেই আইনস্টাইন জগৎপ্রপঞ্চের জন্যে সার্বিক সুষমার আরও সাধারণ ভিত্তিভূমিকে খুঁজে বার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি সেটা খুঁজে বার করতে পারেন নি এবং অনেক সময়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধানকে যেন একেবারে নিষ্ফল বলে মনে করেছেন। এর পরেও এই ভিত্তিভূমিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাছাড়া তিরিশের ও চল্লিশের দশকে পদার্থবিদ্যার জগতে যে প্রধান বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার পদ্ধতি

১ Solovine, p. 49.

প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গেও বিশ্ব-চিত্রের প্রাথমিক চেহারাগুলি সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের মিল ছিল না। পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে পরিস্থিতিটা বদলে যায়। কোয়ান্টাম বিদ্যুৎগতিবিদ্যার নিছক ধারণাগত পদ্ধতি ও মোল কণাগুলির সাধারণ তত্ত্বের উপযোগী 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'বিশিষ্ট দ্ব্যর্থহীন একীভূত ধারণা অর্জনের জন্যে পদার্থবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে চিন্তার জগতে যাবার দরকার ছিল। আর তখনই এটা দেখা গেল যে, তিরিশ বছর ধরে যে ধারণাগুলি নিয়ে তিনি কাজ করেছেন, তা নিস্ফল নয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আইনস্টাইনের জীবন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা অপরিবর্তনীয় ছাপ রেখে গেল, যার পরিচয় মিলবে অর্জিত সাফল্যের মধ্যে ততটা নয়, যতটা তাঁর উত্থাপিত সমস্যাগুলির মধ্যে।

আমরা আগেই বলেছি যে, আইনস্টাইনের পক্ষে কোয়ান্টাম-আপেক্ষিকতাবাদের ধারণাটা মোটেই ট্রাজিডি ছিল না। তার মানে অবশ্য এটা নয় যে তাঁর ভাবধারার বিবর্তনটা ছিল মসৃণ আর তাতে কোনোরকম কঠিন যন্ত্রণাদায়ক ও নিস্ফল অনুসন্ধান ছিল না।

এই অনুসন্ধানের জন্যে আইনস্টাইনের মনে যে নিদারুণ তাড়া ছিল, সেটা তাঁর নানারকমের চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায়। ভাবী প্রজন্মের কাছে যে **সমস্যাগুলি** একজন গবেষক তুলে ধরেন সেটাই বড় কথা; তাঁর নিজের কাছে **উত্তরটা** আসল বিষয় আর উত্তর না পাওয়া গেলে বেছে-নেওয়া পথের সত্যতা সম্বন্ধে অসন্তোষ ও সংশয় দেখা দেয়।

আইনস্টাইনের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর আধুনিক বিজ্ঞানে স্থান পেল না কেন?

প্রথমত, এ পর্যন্ত একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে সমস্যাটির কোনো ইতিবাচক ও দ্ব্যর্থহীন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় নি। তা থেকে অবশ্য এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না যে, কেন তিনি তাঁর রূপায়িত আপেক্ষিকতাবাদের জন্যে 'ধ্রুপদী আদর্শ' থেকে সরে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

তিনশ' বছর ধরে যে 'ধ্রুপদী আদর্শ' চলে আসছিল এবং যা দেকার্তে ও স্পিনোজার যুক্তিবাদে ও নিউটোনীয় বলবিদ্যা আর উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল, আইনস্টাইনের ভাবধারা হল তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ।

আজকে বিজ্ঞান নতুন এক জগতের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু

আইনস্টাইন এই প্রবণতাগুলির অগ্রদূত হতে পারেননি। তাঁর মনীষা 'ধ্রুপদী আদর্শে'র সীমাবদ্ধ উপলব্ধির মধ্যে এবং নতুন কার্যকারণ সম্পর্কের সুষমা অনুসন্ধানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। আর আমরা এখন জানি তাঁর অনুসন্ধান ঐ আদর্শকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল। তিনি এর বেশি আর যান নি।

অন্য নানারকমের পশ্চাদপট ছাড়াও এই কার্যকারণ সম্পর্কের সুষমা সেই ইস্পাত-কঠিনরূপে গড়ে ওঠে নি—যে-রূপে 'ধ্রুপদী আদর্শ' আইনস্টাইনের কাছে ধরা দিয়েছিল। এই নতুন ধরনের বিজ্ঞানের আদর্শ একদিন একটা সুসমন্বিত চেহারা পাবে। একটা পরিচ্ছন্ন, ঐক্যবদ্ধ, সাধারণ তত্ত্বের অনুসন্ধান ইতিমধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের মর্মবস্তু হয়ে উঠেছে এবং বিজ্ঞান আইনস্টাইনের চিন্তা-পদ্ধতির মেজাজের কাছাকাছি এসে পড়ছে। কিন্তু ইতিবাচক সমাধানটি নিশ্চয়ই অন্য রকমের হবে।

আইনস্টাইনের চিন্তা-পদ্ধতি অনেক সময়েই পদার্থগত ও দার্শনিক সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারে মিশে যেত। এটা আসত তাঁর 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'কে অনুসন্ধানের প্রবণতা থেকে, সেইরকম পদার্থগত তত্ত্ব সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা থেকে, যা বাস্তবতার সাধারণ ছক থেকে স্বভাব-সুন্দরভাবেই বেরিয়ে আসবে।

তত্ত্বগত পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিকাশের মধ্যে এই ধারণাটা ক্রমশই সমর্থিত হচ্ছে। চল্লিশের দশকের শুরুতে আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞানের সমস্যাগুলি দূর করা যেতে পারে একমাত্র দার্শনিক বিশ্লেষণের সঙ্গে পদার্থগত বিশ্লেষণের সম্পর্কক্রে গভীরতর ও ঘনিষ্ঠতর করে। ১৯৪৪ সালে তিনি লিখলেন: "আজকের বিজ্ঞানের সমস্যা পদার্থবিদদের দার্শনিক সমস্যাকে আরও বেশি করে আয়ত্ত করতে বাধ্য করে, যেটা আগেকার দিনের প্রজন্মগুলিকে করতে হতো না।"(১)

পদার্থবিদদের যে-সকল সমস্যা ভাবিয়ে তোলে আইনস্টাইন সে সম্পর্কে বলতেন 'নিছক চিন্তা'র সঙ্গে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ভিত্তির কথা। তিনি বলতেন যে, বিভিন্ন ধরনের মতামতের কুজঝটিকার মধ্যে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঝোঁক রয়েছে, 'বিষয়মুখী জগৎকে', 'বস্তুপুঞ্জের' জগৎকে···বিশুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে জানার প্রতিটি প্রয়াসের মধ্যে একটা ক্রমবর্ধমান সংশয়বাদ" রয়েছে।

১ Ideas and Opinions, p. 19.

আইনস্টাইন যে 'বিষয়মুখী জগৎ' ও 'বস্তুপুঞ্জ' কথাগুলি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে ব্যবহার করেছেন—তাঁর ভাষায় এর কারণ হল, এমন ধারণাগুলিকে তিনি প্রবর্তন করতে চান, যেগুলি "দর্শনের প্রহরীরা সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে।" তিনি লিখছেন যে, গ্যালিলিও-র সময় থেকে এই চিন্তাধারা ক্রমশই পেয়ে বসেছে যে, অভিজ্ঞতার কাঁচামালকে ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা ঝাড়াইবাছাই না করে বস্তুপুঞ্জের জ্ঞান কিছুতেই লাভ করা সম্ভব নয়। আইনস্টাইন এই ধারণার সঙ্গে একমত কিন্তু প্রপঞ্চবাদকে তিনি এর সিদ্ধান্ত হিসাবে মেনে নিতে পারেন না।

জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রতিটি ব্যাপারে আইনস্টাইন যে সকল চিন্তার মৌলিকত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন আমরা ইতিমধ্যেই তার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছি। মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আমাদের 'আসল চিন্তা'কে প্রকল্প নির্মাণ করতে বাধা দিতে পারে না, কারণ সেগুলি মহাবিশ্বের সাধারণ জ্ঞান থেকে আসছে, কতকগুলি নির্দিষ্ট পরীক্ষা থেকে নয়। ঠিক ভাবে দেখতে হলে এই সিদ্ধান্তগুলিকে পরীক্ষার সামনে আনতে হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে এই অর্থে 'অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা'ও রয়েছে যে, বাস্তবতার সাধারণ ধারণাগুলি থেকেই তাদের বার করে আনা হয়।

বিশ্ব-জ্ঞানের সামগ্রিকতা থেকে গৃহীত একটা সুসঙ্গত তত্ত্ব সৃষ্টির ধারণা আইনস্টাইনের জ্ঞানতত্ত্বগত বিবৃতিগুলির মধ্যে একেবারে সাধারণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এগুলি ষাটের দশকের প্রধান দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেটা নাকি আবার ধারণাগত অস্থায়ী পদ্ধতিগুলিকে প্রতিপন্ন করবে। তাদের যেন খানিকটা 'ঋণ করে' নেওয়া হয়েছিল এই যুক্তিতে যে, তাদের মধ্যে একটা 'অন্তর্নিহিত পূর্ণতা' রয়েছে। এখন সময় এসেছে যখন প্রাপ্য পরিশোধ করতে হবে এবং তার জন্যে দরকার সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জড়িয়ে নিয়ে সাধারণ সমস্যাবলী সম্বন্ধে পদার্থগত চিন্তা এবং সেই অনুসারে নির্দিষ্ট পদার্থগত ধারণার সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুসংহত দার্শনিক বিশ্লেষণের একটা নতুন সমন্বিত রূপ দান।

নিয়েল বোর তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতিকে যে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, সেটাকে স্মরণ করে আমরা কেবলমাত্র প্রচণ্ড 'পাগলাটে' পদার্থতত্ত্ব দেখে খুশি থাকতে পারি। এটাই আইনস্টাইনের আসল 'বিস্ময়' যা আপাতবিরোধী তত্ত্বগুলিকে ডেকে আনে। আইনস্টাইনের কাছে 'বিস্ময়

থেকে পলায়ন' এমন একটা আপাতবিরোধী তত্ত্বকে সামনে আনে যাতে আপাতবিরোধী ঘটনাবলীকে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আজকে এটা মোটেই কোনো আপাতবিরোধী ঘটনার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল আপাতবিরোধী ধারণার। বিজ্ঞান আজ এমন একটা একীভূত তত্ত্বের মুখে দাঁড়িয়ে আছে যা সমগ্র মহাবিশ্বকে জড়িয়ে রয়েছে। এর মৌলিক সূত্রগুলি 'ধ্রুপদী আদর্শ' থেকে মূলগতভাবে আলাদা, কারণ এটাই সবচেয়ে বেশি 'পাগলাটে' তত্ত্ব। এটা পৃথক পৃথক পদার্থগত ধারণা থেকে 'পাগলামি'কে দূর করে দিচ্ছে, ঠিক যেভাবে আপেক্ষিকতাবাদ মাইকেলসনের আবিষ্কৃত তথ্য থেকে 'বিস্ময়'কে সরিয়ে দিয়েছিল। আইনস্টাইনের 'বিস্ময় থেকে পলায়ন' ও বিস্ময়কর তত্ত্বের সাহায্যে বিস্ময়কর তথ্যকে ব্যাখ্যার ব্যাপারটা হল সমকালীন 'পাগলামি থেকে পলায়নের' আদিরূপ, বিস্ময়কর বিশেষ তত্ত্ব থেকে পদার্থগত বাস্তবতার বিস্ময়কর সাধারণ চিত্রে উত্তরণ। 'পাগলামি'র মাত্রাটা নির্ধারিত হয় সংশোধিত ধারণাগুলির সম্ভাবনা ও ঐতিহাসিক স্থায়িত্ব দিয়ে। বোর ভেবেছিলেন যে, আগের যুগের 'পাগলামি'র জন্যে পদার্থবিদ্যাকে আরও বেশি পরিমাণে পাগলামির আশ্রয় নিতে হবে—এটা পদার্থবিদ্যার সাধারণ সুস্থিত অবস্থা।

এ থেকে এটা মনে করা স্বাভাবিক যে, সংশোধন করতে হলে 'ধ্রুপদী আদর্শ'কেই সংশোধন করতে হবে, যে ধ্রুপদী আদর্শ আইনস্টাইনকে তাঁর অনুসন্ধানে পরিচালিত করেছে এবং শেষ জীবনে তিনি যার সীমাবদ্ধতায় এসে পৌঁছেছিলেন।

ষড়বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

'পদার্থবিজ্ঞানের বিবর্তন'

আমাদের তাত্ত্বিক নির্মাণ কার্যের দ্বারা বাস্তবতাকে আয়ত্ত করা সম্ভব—এই বিশ্বাস ছাড়া এবং আমাদের জগতের অন্তর্নিহিত সুষমাতে আস্থা স্থাপন করা ছাড়া কোনো বিজ্ঞান হতে পারে না। সমস্ত বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির পেছনে এই মৌল প্রবর্তনাটি আছে ও থাকবে। আমাদের সকল রকমের প্রচেষ্টার পেছনে, পুরানো ও নতুন সব রকম মতামতের মধ্যে নাটকীয় সংঘর্ষের পেছনে উপলব্ধির চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা, আমাদের জাগতিক সুষমাতে চিরন্তন আস্থা আমরা স্বীকার করি...।

এ. আইনস্টাইন, এল. ইনফেল্ড
'পদার্থবিজ্ঞানের বিবর্তন' (১৯৩৮)

১৯৩৬ সালে পোল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা মাথা চাড়া দিচ্ছিল এবং পোল্যাণ্ডের ছাত্র লিওপোল্ড ইনফেল্ড, যিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে ১৯২০ সালে দেখা করেছিলেন এবং তখন লোভভ বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে এবারে বিশ্ব-বিদ্যালয়টি ছাড়তে হবে। তিনি আইনস্টাইনকে লিখলেন এবং আইনস্টাইন তাঁকে প্রিন্সটনে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। ইনফেল্ড পদার্থবিদ্যাতে একটা ছোট বৃত্তি পেলেন যাতে তাঁর আইনস্টাইনের কাছে কাজ করার

সুবিধা হল। যথাসময়ে তিনি প্রিন্সটনে পেঁাছে ফাইন হল-এর ২০৯ নম্বর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ; এখানেই ছিল গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার গবেষণার জায়গা। ষোল বছর পরে তাঁদের আবার দেখা হল এবং লিওপোল্ড ইনফেল্ড দেখলেন যে, সময়ের ব্যবধানের তুলনায় আইনস্টাইন বেশি বুড়িয়েছেন। তবে আইনস্টাইনের চোখের দৃষ্টি ছিল আগের মতোই গভীর ও উজ্জ্বল।

ইনফেল্ড ভেবেছিলেন যে, আইনস্টাইন তাঁর সঙ্গে সংক্ষেপে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে একটু আলাপ করবেন, কীভাবে ইউরোপ থেকে তিনি পার হলেন সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কিন্তু আইনস্টাইন যে সমস্যা নিয়ে কাজ করছিলেন, তখনই সে সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন। এটা মোটেই কোনো একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির ঔদাসীন্য নয়। আর ইনফেল্ড সেটা জানতেন কারণ আইনস্টাইনের সদিচ্ছা ও বন্ধুতার যথেষ্ট পরিচয় তিনি এর আগেই পেয়েছিলেন। তিনি আবার আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্বে অভিভূত হলেন। আইনস্টাইন পুরোপুরিভাবে 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' জগতে ডুবে ছিলেন এবং যতটা খুশি মনে ও খোলামেলাভাবে তিনি অন্যদের সঙ্গে সমস্যাগুলি আলোচনা করতে লাগলেন, তাতে বোঝা গেল যে এটাই হচ্ছে তাঁর বিশেষ ব্যক্তিত্ব। ইনফেল্ডের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আইনস্টাইন তাঁর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের কাজ সম্পর্কে একটা রূপরেখা তুলে ধরলেন। এই সময়ে আপেক্ষিকতাবাদের দিক থেকে গাণিতিক পদ্ধতির অন্যতম লেখক, লেভি-সিভিতাকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল। লেভি-সিভিতার বয়স তখন ষাটের কাছাকাছি। সিভিতা ছিলেন একজন ছোটখাটো রোগা মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্যে ফ্যাসিবাদের পক্ষে শপথ নেওয়ার যে বিধান ছিল, সেটা করতে অস্বীকার করায় তাঁকে ইতালি ছাড়তে হয়। আইনস্টাইন ব্যস্ত আছেন দেখে লেভি-সিভিতা চলে যেতে চাইছিলেন। তিনি কোনো কথা না বলে ইঙ্গিতে এটা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন (তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর ইংরাজির চেয়ে তাঁর ইঙ্গিতটাই বেশি কার্যকর হবে)। আইনস্টাইন তাঁকে আলোচনাতে যোগ দিতে বললেন। আগে যেটুকু আলোচনা হয়েছে সেটা তিনি বললেন। লেভি-সিভিতার অ্যাঙ্গলো-ইতালিয়ানটা ধরা যেতে পারত কারণ তার বেশির ভাগই ছিল অঙ্কের ফরমুলা। ইংরাজিতে আইনস্টাইনের দখলটাও খুব বেশি ছিল না, তবে যেহেতু তিনি একেবারে একটুও চপলতা প্রকাশ না করে স্পষ্টভাবে কথা বলতেন এবং নিজের

ধারণাগুলিকে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করতেন, তাই তাঁর কথা বুঝতে অসুবিধা হতো না।

"আমি শান্তচিত্ত ও চমৎকার মানুষ আইনস্টাইনকে এবং ছোট্ট রোগা মানুষ লেভি সিভিতাকে দেখলাম—যাঁরা কিছুটা অঙ্গভঙ্গি করছিলেন, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা ফরমুলার দিকে নজর দিচ্ছিলেন এবং ভাবছিলেন যে, তাঁরা ইংরাজি বলছেন," ইনফেল্ড লিখেছেন, "যে ছবিটা তাঁরা তৈরি করছিলেন এবং কয়েক সেকেণ্ড পরে-পরেই আইনস্টাইন যে-ভাবে তাঁর ঝোলা পাৎলুনকে টেনে ধরছিলেন,—এই সবটা মিলে এমন একটা দৃশ্য তৈরি হচ্ছিল যা একদিকে মনকে অভিভূত করে আবার মজাদারও বটে—আমি কখনও এটাকে ভুলবো না। আমি নিজের হাসি সংবরণ করে মনে মনে নিজেকেই বললাম :

"তুমি এখানে দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত পদার্থবিদদের সঙ্গে আলোচনা করছ আর তুমি কিনা হাসতে চাও কারণ তিনি পাৎলুন আটকে রাখার মতো কোনো কিছু পরেন নি। নিজের সঙ্গে এই আলাপচারিতায় কাজ হল এবং আমি আমাকে সংযত করতে পারলাম। আর ঠিক সেই সময়েই আইনস্টাইন তাঁর নবতম কিন্তু তখনও অপ্রকাশিত পেপারটি, যা তিনি আগের বছর তাঁর সহকারী রোসেন-এর সঙ্গে করেছেন, নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন।"(১)

এই মজাদার ঘটনাটা আইনস্টাইনের জীবনীর জন্যে বিশেষ প্রয়োজন। এই বইয়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইনস্টাইনের জীবন-কাহিনীকে কয়েকটি সাধারণ ঘটনা আর ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি তথ্যের মধ্যেই ধরা যায় না। নিছক ব্যক্তিগত সাধারণ খুঁটিনাটি তথ্য তাঁর জীবনের কয়েকটি লক্ষণকে, গতানুগতিক জীবনযাত্রার প্রতি তাঁর বৈরাগ্যকে সূচিত করে মাত্র। তিনি যে পাৎলুন বেঁধে রাখবার জন্যে ভেতরে কোনো কিছু পরতে চাইতেন না, এটা একটু মজাদার মনে হতে পারে। কিন্তু এটা হাস্যকর নয়। এটাতে হয়তো একটু হাসির উদ্রেক হতে পারে কিন্তু এ থেকে বোঝা যায় যে, এটা ছিল একটা গভীর বৌদ্ধিক জীবনের অভিব্যক্তি, যেটা ভাসাভাসা মর্যাদাবোধ নিয়ে মাথা ঘামাত না। একবার ইনফেল্ড-এর পরিচিত এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আইনস্টাইন কেন লম্বা চুল রাখেন, একটা হাস্যকর

১ L. Infeld, op. cit., p. 260.

লেদার জ্যাকেট পরেন এবং কেন ভেতর থেকে পাৎলুন আটকাবার কোনো কিছু পরেন না বা কোনো কলার ব্যবহার করেন না।

ইনফেল্ড বলছেন: "এর জবাবটা বেশ সহজ এবং বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখার প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা এর থেকে বোঝা যায়। নিজের চাহিদাকে সীমাবদ্ধ রাখা আর এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়েই স্বাধীনতাকে বাড়ানো—এটাই ছিল তাঁর ধারণা। আমরা অসংখ্য রকম জিনিসের দাস আর এই দাসত্ব দিনকে দিন বেড়েই চলেছে···আমরা বাথরুমের, ফ্রিজিডায়ারের, গাড়ির, রেডিও-র এবং অন্যান্য অসংখ্য জিনিসের দাস। আইনস্টাইন চেয়েছিলেন এগুলির প্রয়োজনকে সর্বনিম্ন মাত্রায় নামিয়ে আনতে। লম্বা চুল রাখলে নাপিতের দরকার হয় না। মোজা না পরেও কাজ চলতে পারে। একটা লেদার জ্যাকেটে বেশ কয়েক বছর ধরে কোটের কাজ চলে যায়। পাৎলুন আটকাবার কোনো ভেতরের পোশাক দরকার নেই, যেমন দরকার নেই রাত্রের জামা ও পাজামার। ন্যূনতম জিনিসেই আইনস্টাইন কাজ চালিয়েছেন এবং জামা, জুতো, সার্ট, জ্যাকেট—এ সবই একান্ত জরুরী জিনিস, একে আর কমিয়ে আনা চলে না।"(১)

তাঁর একটা গল্পতে ম্যাক্সিম গর্কি এমন একটা মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন যে দুরন্ত বাতাসের সামনে তার কোটকে ঠিক করে রাখতে চাইছে। "আমি তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলাম ছোট অসুবিধার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মানুষ কী পরিমাণ শক্তিক্ষয় করে থাকে। আমরা যদি দৈনন্দিন ছোটখাটো ক্ষতিকর নোংরা জিনিসগুলিকে নিয়ে এতটা মাথা না ঘামাতাম, তাহলে আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের ভয়ংকর সাপগুলিকে সহজেই ধ্বংস করতে পারতাম।"

নিজের প্রয়োজনকে সহজ সরল ও কমিয়ে আনার জন্যে তাঁর যে আকাঙ্ক্ষা ছিল—সেটার কারণ হল তাঁর তীব্র সামাজিক ন্যায়বিচারের বোধ। 'দুনিয়াকে আমি যে-ভাবে দেখি' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন:

"আমি নিজেকে রোজ শতবার বলে থাকি যে, জীবিত ও মৃত এই রকম অনেক লোকের পরিশ্রমের 'পরে নির্ভর করে আমার ভেতর ও বাইরের জীবন চলছে; অতএব আমি যতটা পেয়েছি আর এখনও পাচ্ছি ঠিক সেই পরিমাণে

১ L. Infeld, op. cit., p. 293.

দেওয়ার জন্যে* আমাকেও চেষ্টা করতে হবে। আমি মিতব্যয়ী জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করি এবং এই জন্যে আমার মন পীড়িত হয় যে, আমি প্রতিবেশী মানুষদের পরিশ্রমকে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করছি।"(১)

এইভাবে আইনস্টাইনের সকলের চেয়েও অনাডম্বর পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁর অন্তর্জীবনের মূল প্রকৃতির সঙ্গে যুক্তি ও আবেগের দিক থেকে জড়ানো ছিল। একদিক থেকে দেখতে হলে এটা ছিল আইনস্টাইনের জীবনের মস্ত বড়ো বৈশিষ্ট্য: তাঁর জীবনের প্রতিটি অভ্যাস ও ঝোঁক শেষ পর্যন্ত তাঁর মূল আদর্শের সঙ্গে গ্রথিত হয়েছিল। এ থেকে তাঁর ভাবমূর্তির সঙ্গে তাঁর জীবনের অপূর্ব সামগ্রিকতাকে আমরা বুঝতে পারি।

লেভি-সিভিতা চলে যাবার পরে আইনস্টাইন ইনফেল্ডকে তাঁর বাড়ি যেতে বললেন। তাঁরা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং আইনস্টাইন বুঝিয়ে দিলেন কেন তিনি এটাকে সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে মেলাতে পারেন না। "তিনি আমাকে তাঁর পড়বার ঘরে নিয়ে গেলেন," ইনফেল্ড লিখেছেন, "সেখানে বিরাট জানলা দিয়ে তাঁর সুন্দর বাগানের উজ্জ্বল শরতের আলো ঘরে এসে পড়ছে। আর তখন প্রথমেই তিনি যে কথাগুলি বললেন তার সঙ্গে পদার্থবিদ্যার কোনো সম্পর্ক ছিল না:

"এই জানলা থেকে একটা সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।"(২)

এই উক্তিটির সঙ্গে পদার্থবিদ্যার কোনো সম্পর্ক নেই তা ঠিকই কিন্তু এটা পদার্থবিদ্যার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীনও নয়। আইনস্টাইনের কাছে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সৌন্দর্য নিশ্চয়ই প্রকৃতির সৌন্দর্যেরই প্রতিফলন। আইনস্টাইন একটু আগেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সৌন্দর্যতত্ত্বগত ত্রুটির কথা বলছিলেন। আমরা জানি, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমালোচনা মূলত অনুভূতিসঞ্জাত ছিল ("আমি একমাত্র আমার ছোট্ট আঙুলটিকে সাক্ষী হিসাবে মানতে পারি"), আমরা এটাও জানি যে, একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যতাত্ত্বিক মানদণ্ডের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অনুভূতিকে তিনি কতটা নিবিড়ভাবে যুক্ত করতেন। এ থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর অনুভূতির মধ্যে কতটা সৌন্দর্যতত্ত্বগত সমস্যা আছে তা আমরা বুঝতে পারি।

১ **Ideas and Opinions, p. 8.**

২ **L. Infeld, op. cit., p. 262.**

আইনস্টাইন ইনফেল্ডের সঙ্গে গতির সমীকরণ নিয়ে কাজ করেন। ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যায় এমন সব ক্ষেত্রের সমীকরণ আছে যাদের সাহায্যে ক্ষেত্রেব উৎস জানা থাকলে, যে-কোনো বিন্দুতে ক্ষেত্রের তীব্রতা নির্ণয় করা যায় অর্থাৎ যে বল নিয়ে ক্ষেত্র ইউনিট চার্জের পরে কাজ করছে তাকে মাপা যায়। যেমন, কোনো একটি বস্তুর অবস্থান জানা থাকলে যে-কেউ তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সমীকরণের সাহায্যে হিসাব করে বলতে পারে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে একটা বিশিষ্ট চার্জ একটা বিশেষ পয়েন্টে তার দিকে আকৃষ্ট হবে, না বিরোধী হবে। তেমনি আবার, ধ্রুপদী মহাকর্ষের ক্ষেত্রীয় সমীকরণের সাহায্যে কেউ যে-কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষ-বলকে নির্ধারণ করতে পারে—যদি মহাকর্ষের ভরগুলি জানা থাকে। ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে গতির এমন সমীকরণ দেখতে পাওয়া যায় যাতে ক্ষেত্রের তীব্রতা একটা বিশেষ মুহূর্তে বেড়ে যায়। এটা জানতে পারলে যে কোনো মুহূর্তে বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের কাজে গতির সমীকরণগুলিকে ব্যবহার করা যায়। ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যায় ক্ষেত্রীয় সমীকরণ ও গতির সমীকরণ পরস্পর-নিরপেক্ষ। আইনস্টাইনের মহাকর্ষের তত্ত্বে ক্ষেত্র ও গতির সমীকরণকে কিন্তু আলাদা করা যায় না। গতির সমীকরণকে ক্ষেত্রের সমীকরণ থেকে বার করে নিয়ে আসা যায়। এই কঠিন কাজটি কিন্তু তিরিশের দশকের শেষ দিকে ইনফেল্ড-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে আইনস্টাইন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বতন্ত্রভাবে ভি এ ফক সমাধান করেছিলেন।

ক্ষেত্রের সমীকরণ থেকে গতিশীলদের সমীকরণ বার করে নিয়ে আসার মধ্যে একটা গাণিতিক সমস্যা ছিল। গাণিতিক সমস্যাকে অতিক্রম করার ক্ষেত্রে আসল অসুবিধা ছিল একটা পদার্থগত মনোভাব, সমস্যা সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণার আভাস—যা পদার্থগত জগৎ-চিত্রের প্রাথমিক ধারণার ক্ষেত্রে গুরুত্বসম্পন্ন।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ মহাকর্ষের ক্ষেত্রকে অথবা দেশ-কালের বক্রতাকে বস্তু-দেহের দেশ-কালগত অস্তিত্বের অধীন বলে গণ্য করে—এই বস্তু-দেহগুলি ক্ষেত্র বা বক্রতার জন্যে দায়ী। ক্ষেত্রের সমীকরণগুলি থেকে দেশ-কালের বক্রতা অথবা (যা একই ব্যাপার) ক্ষেত্রের তীব্রতা পাওয়া যায়—যখন এটার জন্যে দায়ী সূত্রগুলির সন্ধান দেওয়া সম্ভব হয়। ধরে নেওয়া যাক, একটা কণা মহাকর্ষের ক্ষেত্রে চলছে। যদি তার গতির নিয়ম (সমীকরণের) ক্ষেত্রের

সমীকরণ থেকে আলাদা হয় তাহলে আমরা দুটো অবস্থা পেতে পারি ; (১) ক্ষেত্র, (২) ক্ষেত্রে গতিশীল বস্তু ; এবং তাদের প্রতি ক্ষেত্রের আকর্ষণ থাকবে। যদি সমীকরণটা স্বাধীন বা স্বতন্ত্র না হয় এবং ক্ষেত্রের সমীকরণের মধ্যেই থাকে তাহলে ক্ষেত্রটাকেই একমাত্র বাস্তব অবস্থা বলে মানতে হয়। আবার যদি কণাদের গতি শেষ পর্যন্ত একমাত্র ক্ষেত্রের সমীকরণের দ্বারাই নির্ণয় করা যায়, তাহলে আমরা ক্ষেত্রগুলির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কণাদের গণ্য করতে পারি।

এই ধরনের চিন্তা এখুনি ক্ষেত্রের সমীকরণ থেকে গতির সমীকরণ নির্ণয় করার সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, যদিও আইনস্টাইনের কাছে এই ধরনের সমীকরণের কিছু অর্থ আছে, এটা আসছে আইনস্টাইনের 'নিষ্ফল' সময়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলি থেকে।

হারমান ভয়েল একদা লিখেছিলেন, ধ্রুপদী বিজ্ঞান দেশ-কে এমন একটা ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করেছিল, যেখানকার অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী একে প্রভাবিত করতে পারে না। অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি দেখিয়ে দিয়েছে যে দেশের অনেক রকম ধর্ম থাকতে পারে এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ দেখিয়ে দিয়েছে দেশে বস্তু-দেহের—মহাকর্ষের কেন্দ্রগুলির উপস্থিতির উপর তাদের নির্ভরতা। দেশের 'ক্ষেত্র' অনবরত তাদের অধিবাসীদের দ্বারা পুনর্গঠিত হয়। ভয়েল-এর উপমা দেশ ও বস্তু-দেহগুলির সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এখন আর কাজে লাগে না : স্থাপত্য-সৌন্দর্যের অংশ হিসাবে একটা বাড়ির অধিবাসীদের চিত্রিত করা কঠিন।

১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে ইনফেল্ড আইনস্টাইনের সঙ্গে প্রায় রোজ দেখা করতেন এবং তাঁরা প্রিন্সটনের ধারে-কাছে অনেক ঘোরাফেরা করতেন। ১৯২০-এর দশক থেকে আইনস্টাইন সম্পর্কে যে মূল্যবান স্মৃতিকথা আমাদের রয়েছে, ইনফেল্ডের স্মৃতিচারণ তার সঙ্গে আইনস্টাইনের আরও কিছু মূল্যবান বৈশিষ্ট্য যোগ করে দেয়। আইনস্টাইনের ক্রমাগত মানসিক প্রচেষ্টার প্রগাঢ় তীব্রতার চিত্র ইনফেল্ডের লেখা থেকে পাওয়া যায়।

"আমেরিকাতে এই সময়ে", ইনফেল্ড লিখেছেন, "আমি প্রথম নিগ্রোদের নাচ ও সঙ্গীত দেখতে পাই, যার পেছনে যথেষ্ট তেজ ও বল-বীর্য ছিল। হারলেম-এর সাভোয়-এর নাচবার ঘরটি এই সময়ে একটি জ্বলন্ত সূর্য ও ঘন জঙ্গলে পরিণত হতো। ঘরের বাতাস যেন কাঁপতে থাকত।" সঙ্গীতের

প্রচণ্ড শব্দ থেকে প্রচণ্ড শক্তি ও আবেগপূর্ণ নাচ সৃষ্টি হতো যাতে পুরো আবহাওয়াটাকে যেন অবাস্তব বলে মনে হতো। সেই তুলনায় শ্বেতাঙ্গদের মনে হতো তারা যেন অর্ধেক জীবিত, কিছুটা যেন উপহাসের বস্তু আর খানিকটা যেন অপমানিত। এই শ্বেতাঙ্গরাই ছিল যেন পটভূমি যার তুলনায় নিগ্রোরা যেন একটা আদিম, বাধাবন্ধহীন জীবনীশক্তি নিয়ে জ্বলজ্বল করত। এতে মনে হতো যে, কোনো বিরতি, একটু থেমে যাওয়া যেন অনাবশ্যক, এই প্রচণ্ড গতি চিরকাল ধরে চলতে পারে।

"আইনস্টাইনকে কাজ করতে দেখে আমার প্রায়ই এই ছবিটি মনে পড়ত। তাঁর মনকে ক্রমাগত চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় এই ধরনের একটা শক্তিশালী যন্ত্র তাঁর মধ্যে আছে। এটাই হচ্ছে সেই মহত্ত্বের অভিমুখী প্রাণ-শক্তি। অনেক সময় এটা লক্ষ্য করাও যন্ত্রণাদায়ক। আইনস্টাইন রাজনীতির কথা বলতে পারেন, অনেকের অনুরোধ মেনে নিতে পারেন এবং যথাযথ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, কিন্তু এই ধরনের বহির্মুখী ক্রিয়াকলাপের পেছনে রয়েছে সেই ধরনের ধীরস্থির বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলির চিন্তা, যেটা তাঁর মস্তিষ্ক কোনোরকম বিরতি না দিয়েই চালিয়ে যায়। এটা এমন একটা গতিশীলতা যাকে কেউই বন্ধ করতে পারে না।"(১)

মহাবিশ্ব নিয়ে আইনস্টাইনের চিন্তাটা এমন একটা ব্যাপার ছিল, যেটাকে কোনো তুচ্ছ বিষয় বা ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনো তীব্র বেদনাদায়ক ঘটনা দিয়েও থামানো বা ভিন্নমুখী করা যেত না। এটাকে মোটেই ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক ঔদাসীন্য বলে মনে করা উচিত নয়। নিজের পরিবারবর্গের নিকটজনদের সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট সচেতনতা ছিল। তাঁর কাছে সামাজিক আলোড়নগুলি ব্যক্তিগত বেদনাবোধের চেহারা নিত, তবুও তিনি অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তাঁর কাজ করে যেতেন। এলসা যখন মৃত্যু শয্যায়, আইনস্টাইনের সেই সময়ের জীবন ও কাজের কথা উল্লেখ করেছেন ইনফেল্ড। প্রিন্সটন-এ তাঁদের বাড়ির একতলাটা তখন হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। আইনস্টাইন দোতলায় তাঁর স্টাডিতে কাজ করছেন। তাঁর জীবনের প্রিয়তম মানুষটির আসন্ন বিচ্ছেদ তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করছে, কিন্তু আগের মতোই গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি কাজ করে চলেছেন। এলসার মৃত্যুর

১ L. Infeld, op. cit., pp. 271-72.

কিছুদিন পরে তিনি ফাইন হল-এ আবার কাজ শুরু করলেন। তাঁকে তখন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল এবং তাঁর চেহারাও আগের চেয়ে অনেক বেশি শীর্ণ। কাজ শুরু করেই তিনি গতির সমীকরণের অসুবিধাগুলি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। তাঁর কাছে চিন্তা করাটা ছিল শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলার মতোই অপরিহার্য ব্যাপার।

ইনফেল্ড তাঁর স্মৃতিকথাতে আইনস্টাইনের মানবিক করুণাবোধের 'বৌদ্ধিক ও 'মানসিক' উৎস নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা আগেই অনেকবার লক্ষ্য করেছি যে, আইনস্টাইনের মধ্যে গভীর নৈতিক গুণাবলীর অস্তিত্ব ছিল, যদিও সেটা সব সময়ে প্রকাশ পেত না। আর তাঁর মননশীলতার সঙ্গে এই গুণাবলীর একটা সমন্বয় ঘটেছিল। এমন একজন বৈজ্ঞানিককে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়, যাঁর এমন ধরনের মনোভাব রয়েছে, যেটা এত আবেগময় এবং 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট। অন্যদিকে এমন একটা মানুষ প্রায়ই পাওয়া যাবে না যাঁর দয়া, প্রেম ও অন্যদের সম্পর্কে দায়িত্ববোধ তাঁর চিন্তা-পদ্ধতির থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসে।

ইনফেল্ড আইনস্টাইনের এই গুণটির একটা যথাযথ চিত্র দিয়েছেন।

"পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপারে আমি আইনস্টাইনের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। কিন্তু যাকে আমি সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্যবান বলে মনে করি, সেটা হল—বিজ্ঞান নয়, মানুষের জগৎ সম্বন্ধে আমি তাঁর কাছে যা শিখেছি তাই। আইনস্টাইন দুনিয়ার সবচেয়ে দয়ালু, সবচেয়ে সহানুভূতিশীল ও সর্বাপেক্ষা সাহায্যকারী মানুষ। কিন্তু এই সাধারণ বক্তব্যকেও আক্ষরিক-ভাবে গ্রহণ করাটা ঠিক হবে না।

"সমবেদনাবোধ জাগ্রত হয় মানুষের করুণাপ্রবণ মন থেকে। প্রতি-বেশীদের ভাগ্যের জন্যে, আমাদের চারধারের দুঃখ-কষ্টের জন্যে, মানুষের দুর্দশাভোগের জন্যে সমবেদনাবোধ আমাদের আবেগকে মথিত করে তোলে। জীবন ও জনগণ সম্পর্কে আকর্ষণ, বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক-বন্ধন আমাদের জীবনের বাইরে যে সংগ্রাম ও দুঃখভোগ রয়েছে—সে সম্পর্কে আমাদের আবেগপ্রবণ করে তোলে। কিন্তু এ ছাড়াও সম্পূর্ণ আর এক ধরনের মানবিক করুণার উৎস আছে। এটা এমন একটা নিস্পৃহ কর্তব্যবোধ যেটা আসছে একান্তে থাকার, পরিষ্কার যুক্তির ক্ষেত্র থেকে। ভালো, সোজা

চিন্তা মানুষের মনে দয়া ও আনুগত্য জাগিয়ে তোলে, কারণ এটাই জীবনকে সহজ-সরল ও পূর্ণ করে তোলে, সমৃদ্ধ করে এবং আমাদের পরিবেশ আর জীবনের মধ্যে যে সংঘাত ও অসুখীভাব থাকে, তাকে কমিয়ে আনে। এই দুটো ভিন্ন উৎস থেকেই একটা সুস্থ সামাজিক মনোভাব, অপরকে সাহায্য করার চিন্তা, বন্ধুতা ও দয়ার উদ্রেক হতে পারে। শারীরবিদ্যার দিক থেকে বলতে গেলে হৃদয় ও মস্তিষ্ক থেকেও এগুলি আসতে পারে। যতই দিন গেছে আমি এই দ্বিতীয় ধরনের শোভন রুচিকে, যা পরিষ্কার চিন্তাশক্তির ফল, বেশি করে মূল্য দিতে শিখেছি। প্রায়ই আমি দেখেছি, পরিষ্কার চিন্তা ছাড়া আবেগপ্রবণতা ধ্বংসাত্মক না হলেও, একেবারে অসার।"(১)

অনেক লোক যারা আইনস্টাইনকে জানত, তারা জানতে চাইবে, কোনটা তাঁর মধ্যে বড়ো; তাঁর মস্তিষ্ক—যেটা মহাবিশ্বের কাঠামোকে ধরে রাখতে পারে, নাকি তাঁর হৃদয়—যেটা মানুষের শোক-যন্ত্রণার প্রতি ও প্রতিটি সামাজিক অবিচারের প্রতি তাৎক্ষণিক সাড়া দেয়। এই প্রশ্নটা আইনস্টাইনের প্রিন্সটন-এর জীবন সম্পর্কে অনেক স্মৃতিকথাতে এসেছে। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক গুস্তাভ বাকি লিখেছেন যে, আইনস্টাইনের ভাবনাচিন্তার গভীরতা ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতি আনুগত্যের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, "তাঁর মানবিক করুণাবোধ ছিল সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে গতিশীল বিস্ময়।"(২) বাকি লিখেছেন যে, যদিও আইনস্টাইন তাঁর প্রতিকৃতির জন্যে 'সিটিং' দেওয়াটা অপছন্দ করতেন তবুও একটা যুক্তির কাছে তিনি কাবু হয়ে পড়তেন। একজন শিল্পীকে শুধু বলতে হতো যে, তাঁর আর্থিক ব্যাপারে এই ছবিটা তাঁকে সাহায্য করবে আর তাহলেই ঐ হতভাগ্য শিল্পীকে আইনস্টাইন অনেকদিন ধরে 'সিটিং' দিতে রাজি হয়ে যেতেন। বাকি আরও লিখেছেন রাস্তাতে আইনস্টাইন যাচ্ছেন এটা দেখতে পারলেই অনেক পথচারীর মুখে প্রশান্ত হাসির রেখা দেখা দিত।

"এমন কি প্রিন্সটনেও সকলেই আইনস্টাইনকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে, বিস্ময়ের সঙ্গে দেখত," লিখছেন ইনফেল্ড, "আমাদের কথা বলবার সময়ে আমরা বেশি ভিড়ের রাস্তাগুলিকে এড়িয়ে মাঠ ও বহুদিনের পুরানো রাস্তা দিয়ে

১ L. Infeld, op. cit., pp. 286—87.

২ Helle Zeit, S. 61.

চলতাম। একবার একটা গাড়ি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল এবং একজন মধ্যবয়সী মহিলা গাড়ি থেকে নেমে অল্প একটু হেসে একটি ক্যামেরা বার করে খানিকটা লজ্জা ও উত্তেজনা মেশানো ভাষায় বলল :

"প্রফেসার আইনস্টাইন, আমাকে ছবি নিতে দেবেন কি ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবো।"

"তিনি মুহূর্তের জন্যে চুপ করে দাঁড়ালেন, তারপর আবার তাঁর যুক্তিগুলি তিনি বলতে শুরু করলেন। এই ছবিটা তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না এবং আমি নিশ্চিত যে, সেটা যে আদৌ ঘটেছে, কয়েক মিনিট পরে সেটা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

"একবার আমরা প্রিন্সটন-এ এমিল জোলার জীবন-কাহিনী দেখবার জন্যে ফিল্ম দেখতে গেলাম। টিকিট কিনে ভেতরে যাবার জন্যে আমাদের একটা লোকজন ভর্তি ঘরে যেতে হল এবং সেখানে দেখলাম যে, আমাদের আরও পনের মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। আইনস্টাইন বললেন যে, ততোক্ষণ একটু ঘুরে আসা যাক। বেরিয়ে যাবার সময় গেটম্যানকে বললাম :

"আমরা শীগগিরই ফিরবো।"

"কিন্তু আইনস্টাইন সত্যিসত্যিই একটু কুণ্ঠিত হলেন এবং অত্যন্ত সরলভাবে বললেন :

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো আর টিকিট নেই। তুমি কি আমাদের চিনতে পারবে ?"

"গেটম্যান ভাবল আমরা ঠাট্টা করছি। সে হাসতে হাসতে বলল :

"হ্যাঁ, প্রফেসার আইনস্টাইন, আমি চিনতে পারবো।"(১)

১৯৩৭ সালে ইনফেল্ড এর সামনে সমস্যা দেখা দিল আইনস্টাইনের সঙ্গে কী করে কাজ করা যাবে। প্রিন্সটনে তাঁর কাজ ছিল মাত্র এক বছরের এবং আইনস্টাইন তার সম্পর্কে যথেষ্ট চেষ্টা করলেও তাঁর কাজ আর এগোনো গেল না। ইনফেল্ড তখন এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের একটা উপায় ভাবলেন : যদি আইনস্টাইনের সঙ্গে একটা জনবোধ্য পদার্থবিজ্ঞানের বই লেখা যায়। যে-কোনো প্রকাশক বইয়ের লেখক হিসাবে আইনস্টাইনের নাম থাকলে নিশ্চয়ই সেটা প্রকাশ করতে চাইবেন। এই বইয়ের মোট দক্ষিণার যা অগ্রিম

১ L. Infeld, op. cit., p. 290.

মিলবে তাতে ইনফেল্ড-এর প্রিন্সটনে আর এক বছর থাকা হয়ে যাবে। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর ইনফেল্ড আইনস্টাইনের কাছে প্রস্তাবটি করলেন। সবটা শুনে তিনি ইনফেল্ডকে বললেন : 'এটা মোটেই কোনো কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যাপার নয়। মোটেই নয়।' তারপর উঠে গিয়ে ইনফেল্ড-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন : 'আমরা দুজনে এটা করবো'।"(১)

আইনস্টাইন মোটেই আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে জনবোধ্য বই লিখতে চান নি। তাঁর ধারণা ছিল যে, পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান ধারণাগুলিকে তিনি তাদের যুক্তিসিদ্ধ বিকাশের ধারায় প্রকাশ করবেন। এতে কেবলমাত্র পদার্থগত ধারণাগুলিই দেওয়া হবে, অংকের দিকটা নয়। এইভাবে ইতিহাসের ধারায় ব্যাখ্যা করে দেখানো যাবে কী করে পদার্থগত ছবিগুলি তাদের গাণিতিক চেহারা পাবার আগে গড়ে ওঠে এবং বিকাশ লাভ করে। ইতিহাসের ধারায় উপস্থাপিত হলে অনুসন্ধানের উত্তেজনা ও ভাবধারাগুলির সংঘাতের ব্যাপারটা প্রকাশ পায়।

"এটা একটা নাটক, একটা চিন্তাভাবনার নাটক", বললেন আইনস্টাইন তাঁর ভবিষ্যতের বই সম্পর্কে। যাঁরাই বিজ্ঞানকে ভালবাসে, তাদের সবার কাছেই এটা মনোযোগ ও আকর্ষণের বিষয় হওয়া উচিত।"(২)

আইনস্টাইনের অনুভূতিসঞ্জাত এবং আধা-অনুভূতিসঞ্জাত ছবিগুলি, যেটা তার কোনো কিছুর একেবারে নিছক ব্যাখ্যা, পদার্থগত ছবিগুলিকে 'ভাবনা-চিন্তার নাটক' হিসাবে দেখা—এসবই তাঁর দার্শনিক সূত্র থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসে। যদি একটা ছবিকে আগে থেকে তুলে ধরা যায়, তাহলে একটা তত্ত্বকে নীতিগতভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব, যাতে পূর্বতঃসিদ্ধ কোনো কিছুকে ধরে-নেওয়াটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। বিজ্ঞান যদি জ্ঞানের মধ্যেকার পূর্বতঃসিদ্ধ অনুমানের যুক্তিসিদ্ধ পরিণতি হয় (কাণ্ট), অথবা যদি (পোঁয়েকার-এর) মুক্ত রীতিপদ্ধতির পরিণতি হয়, তাহলে সেটা নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাপুঞ্জের বিবরণের সংকলন হয়, যেটা 'নিছক বর্ণনা' এবং বিষয়ীমুখী অভিজ্ঞতার ফল (মাখ), তাহলে সেটা 'স্বতঃপ্রতিভাত থেকে পলায়ন' হবে না, তাতে কোনো আপাত-বিরোধী

১. Ibid., p. 311.

২ Ibid., p. 313.

সংঘাত, কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না, তাতে এমন কিছু আসবে না যেটা বিজ্ঞানকে একটা নাটকে পর্যবসিত করে এবং ইতিহাসে একটা নজির রেখে যায়।

বইটার উপস্থাপনার শুরুতেই আইনস্টাইনের ধারণাগুলিকে পেশ করা হয়েছে। ধারণাটা হচ্ছে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যাবতীয় কৃত্রিম অলংকার ও প্রভাবগুলিকে সরিয়ে ফেলা। তাঁরা এমন কিছু দিয়ে মহাকাশের এবং আন্তঃনক্ষত্র জগতের দূরত্বকে, যাতে ক্ষুদ্রাণু পরিধির নক্ষত্রের বহু লক্ষ লক্ষ বছরের দূরত্বকে মেপে রাখা সম্ভব হয়—পাঠকদের কল্পনার উপর চাপিয়ে দিতে চান নি, যাতে তাদের মাথা ঘুরে যায়। তাছাড়া আইনস্টাইন ও ইনফেল্ড এমন একটা ধারণারও সৃষ্টি করতে চান নি, যাতে মনে হতে পারে বিজ্ঞান সাধারণ অর্থ থেকে সরে গেছে। বিজ্ঞান যদি পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণার ছকটির-ই প্রকাশ ঘটায়, তাহলে রোজকার অভিজ্ঞতা থেকে যে ধারণার উদ্ভব হয়, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো মিল থাকে না। আইনস্টাইনের দার্শনিক অবস্থানের ভিত্তি এটাই ছিল যে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাগুলি সাধারণ বোধগম্য ধারণার মতো একই পথ ধরে চলে: বৈজ্ঞানিক চিন্তা একমাত্র যা করে তা হল যেসব নতুন নিয়মকে (অন্তত প্রাথমিকভাবে) দৈনন্দিন সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ববিরোধী মনে হয়, তার ভিতরে প্রবেশ করে।

'পদার্থবিজ্ঞানের বিবর্তন' প্রথম ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। লেখকরা এর মুখবন্ধে লিখছেন:

"এই বইটা লিখতে গিয়ে আমরা আমাদের কল্পিত পাঠকের কথা অনেক ভেবেছি এবং তার সম্পর্কে অনেক দুশ্চিন্তাও করেছি। পদার্থবিজ্ঞান ও অঙ্ক সম্পর্কে তার জ্ঞান কিছুমাত্র নেই এটা ধরে নিয়েই কয়েকটি কথা তার 'পরে আরোপ করার চেষ্টা করেছি। আমরা অনুমান করেছি যে, তার পদার্থবিদ্যা ও দার্শনিক চিন্তাভাবনায় আগ্রহ আছে এবং যে-কঠিন ধৈর্যের সঙ্গে সে অপেক্ষাকৃত নীরস ও কঠিন অংশগুলি বোঝার চেষ্টা করে, সে সম্পর্কে আমরা সপ্রশংস হতে বাধ্য হয়েছি।"(১)

এই পাঠক অবশ্য যতটা অস্তিত্বহীন ততটা কল্পিত নয়। 'পদার্থবিজ্ঞানের বিবর্তন' পড়তে গেলে খুব বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, যদিও এঁকে বুঝতে হলে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন এবং বিমূর্ত যুক্তির ক্ষমতা ও অধ্যবসায় থাকা

১ A. Einstein, L. Infeld, The Fvolution of Physics, Simon and Schuster, New York, 1954, P. X.

দরকার। একে বুঝতে হলে প্রধানত মানুষের ভাবাদর্শগত বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহ থাকা চাই। আমাদের কালের এটা একটা তাৎপর্যময় ঘটনা যে, বর্তমান দুনিয়ায় এমন অনেক বাস্তব মানুষ রয়েছে, যারা এই কল্পিত পাঠকের অবিকল প্রতিমূর্তি। আমাদের যুগে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সাম্প্রতিক সমস্যাগুলির উত্তর খুঁজছেন। এই পরিচ্ছেদের গোড়ার উদ্ধৃতাংশে এই মৌল উত্তরটি দেওয়া আছে: জগতে একটা সুষমা বিরাজ করছে এবং জগৎকে জানা যায়। 'পদার্থবিজ্ঞানের বিবর্তন' শীর্ষক পরিচ্ছেদের মাথায় যে অংশটুকু রয়েছে, তাতে বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-চিত্রের বিকাশের বৈশিষ্ট্যটুকু দেওয়া আছে, তার থেকে এই সুষমা ও জ্ঞেয়তার ধারণা পাওয়া যায়।

এই বইয়েতে যে ভর, বল এবং গতির প্রাথমিক ধারণাগুলি রয়েছে, সেটা কোনো গতিশীল কাঠামোতে ঘটনাবলীর ধারা প্রভাবিত করে না। এই ধারণাগুলি থেকে জগতের যান্ত্রিক ছবি তৈরি করা যায়: অনেকগুলি কণার মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যা দূরত্বের 'পরে নির্ভর করে। "একটা সাহসী বৈজ্ঞানিক চিন্তার দরকার ছিল, যাতে বস্তুদের আচরণ নয়, কিন্তু তাদের মধ্যের কোনো কিছুর আচরণ, অর্থাৎ যাকে ক্ষেত্র বলা যায়, সেটাই ঘটনাপ্রবাহকে বুঝতে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে সাহায্য করবে।"(১)

এর পরে পরম কাল বর্জিত হয়েছে এবং তারপর জাড্যের কাঠামোর ক্ষেত্রে আপেক্ষিক গতির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। সমস্ত কাঠামোর ঘটনাবলীকেই পর্যবসিত করা হয়েছে বস্তুর আপেক্ষিক স্থানচ্যুতির মধ্যে। ঘটনাবলীর পটভূমি আর শুধু একমাত্রিক কাল এবং ত্রিমাত্রিক দেশগত অবিচ্ছিন্নতা নয়, পরন্তু চতুর্মাত্রিক দেশ-কাল-এর অবিচ্ছিন্নতা। আর শেষ অবধি, "কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবার আমাদের বাস্তবের নতুন ও মর্মগত বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরছে। বিচ্ছিন্নতার বদলে আসছে অবিচ্ছিন্নতা।" পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্যটা সব জায়গায় একই থেকে যাচ্ছে, যেটা হল পর্যবেক্ষণ-জাত তথ্যাবলীর রহস্যের মধ্যে থেকে বিষয়মুখী সুষমার আবিষ্কার। "আমরা চাই পর্যবেক্ষণজাত তথ্যাবলী আমাদের বাস্তবতার ধারণা থেকে যৌক্তিকভাবে বেরিয়ে আসুক।"(২)

১ A. Einstein, L. Infeld, The Evolution of Physics, Simon and Schuster, New York, 1954, p. 312.

২ Ibid., p. 312.

এটা এমন একটা লক্ষ্য, যেটার 'পরে বৈজ্ঞানিক (আর তাই আইন-স্টাইনেরও) চিন্তা নিবদ্ধ ছিল। অনেক সংঘাতের ফলে যুক্তিবাদ স্পিনোজার দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রয়োগ-জগতে তিনশ বছরের সমৃদ্ধির ফলে বিজ্ঞানের প্রগতি একটা সাধারণ রূপ পেয়েছে: আদর্শের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তার যুক্তি পর্যবেক্ষণযোগ্য পদার্থগত সম্পর্কগুলির সামগ্রিকতার মধ্যে নিয়ে যায়। বিজ্ঞান তার অগ্রগতিতে এই আদর্শের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এটা জগৎপ্রপঞ্চে নিশ্চয়তাবাদের (determinism) প্রমাণ: বৈজ্ঞানিক চিন্তার যুক্তি, মহাবিশ্বকে ঘিরে যে বাস্তব কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে, তাকেই প্রকাশ করে।

এই ভিত্তিমূলক ধারণাটির উপর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ ও মানসিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করাই ছিল আইনস্টাইনের জীবন ও কর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই বই সম্পর্কে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক। এর প্রস্তুতিপর্বে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ হবার পরে তিনি সকল ঔৎসুক্য হারিয়ে ফেলেন: এমনকি তিনি বইখানির প্রুফও দেখেন নি। প্রকাশকরা যাতে হতাশাবোধ না করেন, সেজন্যে ইনফেল্ড তাঁদের বললেন যে, আইনস্টাইন বইখানির পুরো চেহারাটা দেখে খুব পছন্দ করেছেন। আসলে আইনস্টাইন কিন্তু বইটা আর খুলেও দেখেন নি।

সপ্তবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

পরমাণু বোমার ট্র্যাজিডি

অ্যাটম-এর 'এম' একটা ধনী কৃপণ ব্যক্তি, যে তার জীবন চলাকালে, কাউকে কোনো টাকা (এনার্জি বা শক্তি) দেয় না। কিন্তু তার উইলে সে যেটা রেখে যাচ্ছে তার কিছুটা তার সন্তান-সন্ততি এম′ ও এম″-কে দেয় ; এর শর্ত হচ্ছে যে, তারা তাদের সম্প্রদায়কে একটা ছোটো অংশ দেবে, যেটা পুরো সম্পত্তির (শক্তি বা ভর) এক সহস্রাংশের কম হবে। পিতার যা ছিল তার তুলনায় ছেলেদের সম্পত্তির পরিমাণ কম আছে (এম′ ও এম″, দুজনে মিলে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর এম-এর চেয়ে কম)। কিন্তু সম্প্রদায়কে যে অংশটা দিল, যদিও সেটা কম, তবুও সেটা এত বিপুল পরিমাণের যে, (গতি-শক্তি হিসাবে) তারা বিরাট আকারের বিপদ ডেকে আনতে পারে। সেই বিপদকে এড়াতে পারাটা আমাদের সময়কার সবচেয়ে জরুরী সমস্যা।

আইনস্টাইন

সভ্যতার শুরু থেকে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি আমাদের শিল্পশক্তি উৎপাদনের প্রধান ভিত্তি হল পরমাণুর পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া

—রাসায়নিক দহনক্রিয়া—যার মধ্যে বহির্গত শক্তি বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তির তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকার নেয়। পারমাণবিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার এমন-ভাবে হয় যাতে যে শক্তি বহির্গত হয় তাকে একটা বস্তুর ভরের সঙ্গে আলোর গতিবেগ দিয়ে গুণ করে দেখা যায়। এগুলি হল শান্তিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টা। যখন একটা থার্মাল এনজিন উদ্ভাবিত হয়, যাতে পিসটনকে প্রথম সাইকেল শেষ হবার পরে, অর্থাৎ, গ্যাস বা স্টিম তৈরি হবার পরে, সিলিণ্ডার থেকে বের করে নেওয়া হয়, এটাও শক্তি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন যুগের পত্তন করে নি। নতুন যুগের সূত্রপাত হয় তখন, যখন থার্মাল এনজিনে গ্যাস বা বাষ্পের প্রসারণকে মেসিনের শাফট ঘোরাবার কাজে ব্যবহার করা হল। অনুরূপভাবে, পারমাণবিক যুগের সূত্রপাত হয় প্রথম পরমাণু বোমার দ্বারা নয়, পরমাণুশক্তি-চালিত বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের দ্বারা।

পরমাণুর শক্তিকে মুক্ত করার ভিত্তি হল পদার্থবিদ্যাতে আপেক্ষিকতাবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে পরমাণু-কেন্দ্রকের আবিষ্কৃত নিয়মগুলি। আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রয়োগের পরে দেখা গেল যে, প্রায়োগিক দিক থেকে একটা পরমাণু-কেন্দ্রকের ভর তার বিভিন্ন উপাদানমূলক গঠনের প্রোটন ও নিউট্রনের চেয়ে, অনেক কম। ভরের এই তথাকথিত হ্রাসের ব্যাপারটাকে বোঝানো যায় আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত ভর-শক্তির তুল্যতার ভিত্তিতে। বিভিন্ন কেন্দ্রকের কণাগুলি হয় নিবিড়ভাবে, নয়ত শিথিলভাবে গ্রথিত রয়েছে এবং তাদের আলাদা করতে বিভিন্ন শক্তির দরকার হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রকের কণাগুলিকে গ্রথিত রাখবার জন্যে যে-শক্তি রয়েছে সেটা বিভিন্ন অণুতে বিভিন্ন রকমের, যেটা মেনডেলিয়েভের পর্যাবৃত্ত সারণী থেকে পাওয়া যায়। আইনস্টাইনের শক্তি ও ভরের তুল্যতার সূত্র অনুযায়ী বিভিন্ন শক্তির মধ্যে তফাতটা ভরের মধ্যের তফাত অনুসারে ঘটে থাকে।

এক ধরনের কেন্দ্রকগুলির অন্য ধরনের কেন্দ্রকগুলিতে রূপান্তর—সেটা ভারী কেন্দ্রকগুলির বিদারণ বা হালকা কেন্দ্রকগুলির মিলন, যার ফলেই হোক না কেন, প্রচণ্ড ঘনত্বে পরিবর্তন ঘটায়। এই অবস্থাতে রূপান্তরিত কেন্দ্রক-গুলির ভর গোড়াকার ভরের চাইতে কম হয়। ভরের এই হ্রাস নির্গত শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

আপেক্ষিকতাবাদের এইসব অনুসিদ্ধান্তভিত্তিক হিসাব থেকে দেখা যায় যে, পারমাণবিক ক্রিয়ার ফলে সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে আসে—যার

সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সবচেয়ে ভারী ও সবচেয়ে হালকা পারমাণবিক কেন্দ্রকগুলি।

পর্যাবৃত্ত সারণির শেষের দিকে ভারী অণুদের (যাদের পারমাণবিক গুরুত্ব বেশি) পারমাণবিক কেন্দ্রকগুলি সারণীর মাঝখানের অণুদের কেন্দ্রকগুলির চাইতে ঢিলেঢালা। অতএব ভারী থেকে মাঝের কেন্দ্রকে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অথবা অন্য কথায় বলতে হলে, ভারী কেন্দ্রকগুলির অনেক বেশি প্রোটন ও নিউট্রন নিয়ে কাজ করার মধ্যে শক্তি নির্গত হয়। এই সূত্রটি প্রকাশ পেয়েছে আইনস্টাইনের ধনী কৃপণের গল্পে, যে তার ছেলেদের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নিচ্ছে।

আবার অন্যদিকে, পর্যাবৃত্ত সারণীর গোড়ার দিকে যে সকল হালকা কেন্দ্রক-আছে, তাদের বড়ো গোছের কেন্দ্রকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরিণতি ঘটে প্রচণ্ড ঘনত্ব বৃদ্ধির মধ্যে। হাইড্রোজেন কেন্দ্রকগুলি যেভাবে হিলিয়াম কেন্দ্রকগুলির সঙ্গে মিলিত হয় তাতে বিপুল পরিমাণ শক্তির নির্গমন ঘটে।

অতএব নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় : পরমাণুর বিভাজন ও মিলন। দুই ক্ষেত্রেই শক্তি নির্গত হয় এবং কেন্দ্রকগুলির নীট ভর প্রাথমিক অবস্থার কেন্দ্রকগুলির ভরের চাইতে কম। রূপান্তরিত এই প্রতিক্রিয়াতে যে শক্তি নির্গত হয়, যেটা নাকি ভর-এর যা ক্ষয় হয় তার সঙ্গে আলোর গতিবেগকে যোগ করলে যা দাঁড়ায় তার সমপরিমাণ বস্তুর দহন ক্রিয়াজাত শক্তির পরিমাণের চাইতে শত-সহস্রগুণ বেশি।

তিরিশের দশকের শেষ দিকে ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের বিভাজনটা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। যখন নিউট্রন দিয়ে তাদের তাড়িত করা হয় তখন এই ভারী কেন্দ্রকগুলি দুটি আলাদা কেন্দ্রক-এ পরিণত হয়, পর্যাবৃত্ত সারণীর মাঝখানে এদের স্থান। এর অল্পদিনের মধ্যেই এটা দেখা গেল যে, ইউরেনিয়াম-বিভাজন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিউট্রন কণা নির্গত হয়—এরা আবার এদের প্রতিবেশী কেন্দ্রকগুলির বিভাজন ঘটাতে সক্ষম। কাজেই সমগ্র প্রক্রিয়াটা দাঁড়ায় শৃঙ্খল-অভিক্রিয়া—যা একবার শুরু হয়ে গেলে যে-ইউরেনিয়ামের মধ্যে এটা ঘটে থাকে—তার সমগ্র ভরকেই এ জড়িয়ে নেয়। এটাই ছিল ফ্রান্সে ফ্রেডারিক জোলিও কুরী ও এনরিকো ফের্মির পরীক্ষার ফলাফল। ফের্মি ইতালিতে প্রথম ইউরেনিয়াম-এর বিভাজন নিয়ে কাজ করেন।

এর পরে তিনি মুসোলিনির রাজত্ব থেকে আমেরিকাতে চলে যান—যেখানে ফিলও সিলার্ড এবং অন্যরাও এ নিয়ে কাজ করছিলেন।

যুগটা যখন শুরু হয়, তখন রাজনৈতিক গগন ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। নাৎসীদের অধীনে জার্মানি তখন দ্রুত তার সামরিক শক্তি গড়ে তুলছে। পদার্থবিদ্যার গবেষণার প্রায়োগিক ফলাফল কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে তখন আইনস্টাইন বিশেষভাবে চিন্তিত। তিনি বুঝেছিলেন যে, একটা বিশ্বযুদ্ধ আর বেশি দূরে নেই। ইনফেল্ড লিখেছেন যে, আইনস্টাইন ভালোভাবেই বুঝেছিলেন স্পেনের ঘটনাবলী, স্পেনের প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ সর্বগ্রাসী ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের একটা মহড়া। তিনি স্পেনের প্রজাতন্ত্রের জয় কামনা করেছিলেন।

"আমার মনে আছে, যখন আমি তাঁকে বললাম যে, আজকের বিকেলের সংবাদপত্রে স্পেনে গণতন্ত্রকামীদের জয়ের সংবাদ রয়েছে—তখন তাঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল," লিখছেন ইনফেল্ড।

"ওটা একটা দেবদূতের গান বলে মনে হচ্ছে, "এমন একটা উত্তেজনার সঙ্গে তিনি এটা বললেন যা আমি এর আগে তাঁর মধ্যে কখনও লক্ষ্য করি নি।(১)

এর দু'বছর পরেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯৩৯-এর গ্রীষ্মকালে আইনস্টাইন এমন একটা সমস্যার সম্মুখীন হন, যা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী।

সেই বছরের জুলাই মাসে, পদার্থবিদ ভিগনার সিলার্ড ও আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে লঙ আইল্যাণ্ডের উত্তরদিকে একটা জায়গায় যান, যেখানে তিনি সাধারণত গরমের সময়টা কাটাতে যেতেন। রবার্ট ইয়ুঙ্ক এ সম্পর্কে তাঁর 'সহস্র সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বলতর' বইটিতে লিখেছেন।(২)

এই দুই পদার্থবিদ বহু সময় ধরে আইনস্টাইনকে খুঁজছিলেন। "হঠাৎ সিলার্ড বললেন: 'খোঁজার ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক। বোধ হয় নিয়তির ইচ্ছা নয় যে, আমরা এটা করি। আমরা হয়তো এই ধরনের ব্যাপারে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপের জন্যে আইনস্টাইনের সাহায্য চেয়ে গুরুতর ভুল করছি। সরকার একবার কোনো কাজে হাত দিলে, ছেড়ে দেবার চেষ্টা করে না।'(২)

১ L. Infeld, op. cit., p. 292.

২ R. Jungk, Brighter Than a Thousand Suns, New York, 1958, p, 78. For Szilard's Memoirs see also Helle Zeit, S. 98-104.

" 'কিন্তু আবার এটা করা আমাদের কর্তব্য,' ভিগনার বললেন, 'একটা ভয়াবহ বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্যে এটা আমাদের অবশ্য করণীয়' ।" যে 'ভয়াবহ বিপর্যয়' এই দুইজন পদার্থবিদ প্রতিরোধ করতে চাইছিলেন, সেটা হল নাৎসী জার্মানির দ্বারা একটা ইউরেনিয়াম বোমা তৈরি প্রতিরোধ করা । এমন খবর পাওয়া গিয়েছিল যাতে সিলার্ড ও অন্যান্য পদার্থবিদের কাছে মনে হয়েছিল যে, নাৎসী সেনাবাহিনীর হাতে হয়তো শীগগিরই পরমাণু অস্ত্র গিয়ে পৌঁছবে । এই বিপদের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারকে হুঁশিয়ার করার জন্যে সিলার্ড যতোদূর সম্ভব দ্বারে দ্বারে করাঘাত করে ফিরছিলেন । কিন্তু যারা এটা করতে পারে, তাদের কাছে তিনি ছিলেন একেবারে অপরিচিত ব্যক্তি । তাছাড়া 'পরমাণুর বন্ধনী শক্তি', 'পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজন' কথাগুলির সঙ্গে তখনকার দিনের বাস্তব কাজকর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না । সিলার্ড শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে, সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আইনস্টাইনের সমর্থন আদায় করা আর বেলজিয়ামের রাণী এলিজাবেথের কাছে আবেদন জানানো । বেলজিয়ামের হাতে তখন প্রচুর পরিমাণ ইউরেনিয়াম মজুত ছিল আর সিলার্ড চাইছিলেন সেটা যেন কিছুতেই জার্মানদের হাতে না পড়ে । তাছাড়া তাঁর আরও আশা ছিল যে, ইউরেনিয়াম বোমার ব্যাপারে আইনস্টাইন অনেক বেশি আমেরিকান সরকারের সাহায্য নিতে পারবেন । যে দায়িত্ব সিলার্ড নিতে যাচ্ছিলেন, সেটা ছিল অত্যন্ত গুরুভার । এর তুলনায় অন্য সব রকমের ছোটোখাটো বাধাকে তিনি নিজের কড়ে আঙ্গুল নাড়ানোর মতো সামান্য ব্যাপার বলে মনে করতেন । আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপার তাঁর মনে গেঁথে ছিল ।

শেষ পর্যন্ত সাত বছরের একটি ছেলে সিলার্ড ও ভিগনারকে দেখাল আইনস্টাইন কোথায় বাস করেন; ছেলেটি জানাল সে তাঁকে ভালো করেই চেনে ।

"ইউরেনিয়ামে শৃঙ্খল-অভিক্রিয়ার(১) সম্ভাবনার কথা আইনস্টাইনের মনে হয় নি", এই কথা বলে সিলার্ড লিখছেন, "কিন্তু যে মুহূর্তে আমি তাঁকে এটা

১ শৃঙ্খল-অভিক্রিয়া (chain reaction)—ইউরেনিয়াম কেন্দ্রককে মন্থরগতি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে কেন্দ্রকটি দুটি অসমান খণ্ডে ভাগ হয়ে যায় এবং একই সঙ্গে নিউট্রন ও প্রচুর শক্তির উদ্ভব হয় ।—অনুবাদক ।

বলতে শুরু করলাম, তিনি বুঝলেন ব্যাপারটা কী হতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর দিক থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন…কিন্তু মনে হল বেলজিয়াম সরকারকে ব্যাপারটা বলবার আগে যে পদক্ষেপটা নেওয়া হবে সেটা ওয়াশিংটনকে জানানো উচিত। যখন ভিগনার ও আমি আইনস্টাইনের লঙ আইল্যাণ্ডের জায়গা থেকে চলে আসি তখন অবস্থাটা এই রকমই ছিল।"(১)

কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনার পরে সিলার্ড শেষ পর্যন্ত আলেকজাণ্ডার সাচস্‌-এর সঙ্গে দেখা করলেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন একজন ধনবান ব্যক্তি, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বন্ধু ও তাঁর বেসরকারী উপদেষ্টা। সাচস্‌ তৎক্ষণাৎ খবরটার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। তখন ঠিক করা হল যে, আইনস্টাইন সোজাসুজি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে চিঠি লিখবেন এবং চিঠির একটা খসড়াও তৈরি করা হল।

২-রা আগস্ট সিলার্ড এডওয়ার্ড টেলারকে নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করলেন। পরে যখন এর অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের দায়িত্বের ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, তখন তাঁরা সব রকম খুঁটিনাটি বিষয় দাঁড় করাবার, বিশেষ করে, চিঠির চূড়ান্ত খসড়াটি কে করেছিলেন সেটা স্থির করার চেষ্টা করেন।

সিলার্ড বলছেন: "যতদূর আমার মনে পড়ে, আইনস্টাইন জার্মান ভাষায় চিঠির একটা বয়ান টেলারকে মুখে মুখে বলে যান এবং আমি সেই চিঠিটার ভিত্তিতে আরও দু'বার খসড়া করি, একটা কিছুটা ছোট আর অন্যটা বেশ বড়, দুটোই প্রেসিডেন্টকে লেখা। এর মধ্যে আইনস্টাইন কোন্‌টা পছন্দ করবেন, সেটা আইনস্টাইনের 'পরে ছেড়ে দি। তিনি বড় ধরনের খসড়াটা পছন্দ করেন। আইনস্টাইনের চিঠির সঙ্গে আমি একটা মেমোরাণ্ডামও যোগ করি।"(২)

অন্যদিকে টেলার বলতে চান, যে-চিঠি তাঁরা এনেছিলেন, সেটাতেই আইনস্টাইন সই করেন। এটাই অবশ্য আইনস্টাইনেরও বক্তব্য।

---

১ R. Jungk, op. cit., p. 84.

২ R. Jungk, op. cit., p. 80.

এই সেই চিঠি, যার ফলাফল এত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল :

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন
ওল্ড গ্রোভ রোড
ন্যাসাও পয়েন্ট
পেকোনিক, লঙ আইল্যাণ্ড,
২রা আগস্ট, ১৯৩৯

এফ. ডি. রুজভেল্ট
প্রেসিডেন্ট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস
হোয়াইট হাউস
ওয়াশিংটন, ডি. সি.

মহাশয়,

ই. ফের্মি ও এল্. সিলার্ড-এর কিছু সাম্প্রতিক কাজ, যা আমাকে পাণ্ডুলিপির আকারে দেখানো হয়েছে, দেখে আমার মনে হয়েছে যে, ইউরেনিয়াম নামে একটি মৌল পদার্থকে নিকট ভবিষ্যতে শক্তির একটা নতুন ও মূল্যবান উৎসে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এই পরিস্থিতির কয়েকটি দিকে নজর দেওয়া দরকার এবং প্রয়োজন হলে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরুরী কার্যক্রম গ্রহণ করা সঙ্গত। এজন্যে আমি মনে করি যে, নিম্নোক্ত তথ্য ও প্রস্তাবগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কর্তব্য।

গত চার মাসের মধ্যে ফ্রান্সে জোলিও এবং আমেরিকাতে ফের্মি ও সিলার্ড-এর কাজের দ্বারা এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, প্রচুর পরিমাণের ইউরেনিয়ামে নিউক্লিয়ার শৃঙ্খল-অভিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব, যার দ্বারা বিপুল পরিমাণ শক্তি এবং রেডিয়ামের মতো নতুন পদার্থ উৎপন্ন করা যাবে। এখন এটা প্রায় নিশ্চিত যে, নিকট ভবিষ্যতে এটা করা সম্ভব হবে।

এই নতুন প্রক্রিয়া থেকে শীঘ্রই বোমা তৈরি করা যাবে এবং এটা ধারণা করা যায় যে, যদিও ততটা নিশ্চিত নয়, এর থেকে নতুন ধরনের অত্যন্ত শক্তিশালী .বামা নির্মাণ করা সম্ভব। এই ধরনের একটি মাত্র বোমা, যদি নদী দিয়ে বা সমুদ্র দিয়ে নিয়ে কোনো বন্দরে বিস্ফোরণ ঘটানো যায়, তাহলে সেটা আশপাশের এলাকা সমেত সমগ্র বন্দরকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। তবে এই ধরনের বোমা খুব সম্ভব এরোপ্লেনে করে বায়ুমণ্ডল দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে অত্যন্ত গুরুভার হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতি সাধারণ আকরিক ইউরেনিয়াম অল্প পরিমাণে

রয়েছে। কিছুটা ভালো আকরিক ইউরেনিয়াম রয়েছে কানাডাতে ও আগেকার চেকোস্লোভ্যাকিয়াতে, যদিও সর্বাপেক্ষা বড় খনি রয়েছে বেলজিয়ামের কঙ্গোতে।

এই অবস্থাতে প্রশাসন এবং শৃঙ্খল-অভিক্রিয়া (chain reaction) নিয়ে কর্মরত আমেরিকান পদার্থবিদদের মধ্যে একটা স্থায়ী যোগাযোগ রক্ষা করা আপনি সঙ্গত মনে করতে পারেন। এটা করার একটা সম্ভাব্য উপায় হতে পারে যদি আপনি এমন একজন লোককে এই কাজের ভার দিতে পারেন যার প্রতি আপনার বিশ্বাস আছে এবং যে কিনা বেশ খানিকটা বেসরকারিভাবে কাজ করতে পারে। তার কাজ হবে খানিকটা এই ধরনের।

(ক) সরকারি বিভাগগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। এ সম্পর্কে কী হচ্ছে তাদের তা অবহিত রাখা, সরকারের করণীয় সম্পর্কে প্রস্তাব হাজির করা—যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে খনিজ ইউরেনিয়াম সংগ্রহের সমস্যাটির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া সম্ভব হয়।

(খ) বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারগুলিতে সীমাবদ্ধ অর্থ-সংস্থানের মধ্যে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে তাকে প্রয়োজনমতো আরও অর্থের যোগান দিয়ে গবেষণার কাজ দ্রুততর করা, এই উদ্দেশ্যে যেসব ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং সম্ভবত যেসব শিল্প-সংস্থার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি-সমন্বিত গবেষণাগার রয়েছে, তাদের সহযোগিতাকেও কাজে লাগানো।

আমি যা জানি, তাতে জার্মানি ইতিমধ্যেই তার দখল-করা চেকোস্লো-ভ্যাকিয়ার খনি থেকে ইউরেনিয়াম বিক্রি করা বন্ধ করে দিয়েছে। জার্মানি যে তাড়াতাড়ি এই কাজটা করেছে সেটার কারণ এই তথ্যটি থেকে বোঝা যায় যে, জার্মানির আণ্ডার সেক্রেটারি ফন ভেইৎসাকের-এর পুত্র বার্লিনের কাইজার ভিলহেলম ইন্সটিটিউট-এ রয়েছেন, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ধরনের কাজ ইউরেনিয়াম নিয়ে করা হয়েছে, এখন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত,

এ. আইনস্টাইন (১)

---

১ Einstein on Peace, edited by Otto Nathan and Heinz Norden, Simon and Schuster, New York, 1960, pp. 294-96.

বাইরের জগৎ সম্পর্কে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গির দীর্ঘ বিবর্তনের ফল হচ্ছে তাঁর এই হস্তক্ষেপ। আবার এই সঙ্গেই, তাঁর এই কাজটি পারমাণবিক যুগের সূত্রপাতের লক্ষণাক্রান্ত।

আইনস্টাইন কী ধরনের পণ্ডিত ছিলেন—গজদন্তমিনারের অধিবাসী, না ইতিহাসের গতিধারায় অংশগ্রহণকারী? আর্নস্ট কুনো ফিসার একবার দুজন বড় দার্শনিকের মধ্যে তুলনা করেছিলেন। স্পিনোজা কখনও শাসনকর্তাদের কাছে যান নি, তাদের থেকে নিজেকে পৃথক করে রেখেছিলেন। তিনি হীরক খোদাইয়ের কাজ করতেন, যাতে স্বাধীনতা বজায় রেখে নিশ্চিন্ত মনে চিন্তাভাবনা করা যায়। লিবনিজ ছিলেন রাজাদের উপদেষ্টা, অসংখ্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রকল্পের লেখক, যাঁর লেখা চিঠিপত্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫,০০০। তাঁদের মধ্যে যে তফাৎ, সেটা শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সেটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থাতে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির উপরে যে চাহিদা চাপানো হয় তার মধ্যেও রয়েছে। আরও রয়েছে, কতকগুলি সাধারণ ধারণার মধ্যে—যা একজনকে জীবনের দৈনন্দিন কলকোলাহল থেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায় আবার অন্যজনকে জনসাধারণের কাজকর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

আইনস্টাইনের মনোভাব ছিল স্পিনোজার কাছাকাছি। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, কোনো পণ্ডিত বা গবেষকের আদর্শ সামাজিক অবস্থান একজন শ্রমিক, হস্তশিল্পী অথবা লাইটহাউস রক্ষীর মতো হওয়া উচিত। বহুদিন ধরে তিনি অন্য লোকের ব্যাপারে জড়িত না হওয়ার চেষ্টা করেছেন, কোনো জনসভায় যেতেন না অথবা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে, নিজের শহরে ও দেশের অথবা পৃথিবীর ঘটনাবলীকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করার কোনো প্রয়াসে যান নি। তাঁর জীবন, স্বপ্ন ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বিজ্ঞান—যা কিনা সর্বাত্মক অর্থে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।

অথচ অন্য কোনো প্রকৃতি-বিজ্ঞানী কখনও জাগতিক ব্যাপারে এত সক্রিয়ভাবে ও ফলপ্রসূতার সঙ্গে আইনস্টাইনের মতো অংশ নেন নি। এটা ১৯৩৯ সালে আরম্ভ হয় নি, আরম্ভ হয়েছে তার থেকে অন্তত পঁচিশ বছর আগে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি হচ্ছে, যখন তিনি দেশান্তরে ভ্রমণ করছেন, যখন তিনি নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন—এই সারা সময়টাই তিনি নিজেকে দুনিয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত রেখেছেন। আর

এইবার সময় এসেছে যখন তিনি মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের হস্তক্ষেপের পথ সুগম করার জন্যে এমন একটা ভূমিকা নেবেন—বিশ্বের ইতিহাসে যার কোনো নজির নেই।

অবশ্য, কাউকেই, আর বিশেষ করে আইনস্টাইনকে, যা ঘটেছে তার জন্য নিশ্চয়ই দায়ী করা যাবে না। রুজভেল্টের কাছে চিঠিতে তাঁর সইটা আসল কারণ রূপে প্যানডোরার বাকস-কে খুলতে সাহায্য করে নি। কিন্তু একদিকে, ইউরেনিয়াম-বিভাজন সম্পর্কে গবেষণা শুরুর ব্যাপারে তাঁর অংশ গ্রহণ, তার মাত্রা যাই হোক না কেন, এবং অন্যদিকে সামরিক কার্যে পরমাণু-শক্তি ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম—এই সবটার মধ্যেই সময়ের ছাপ রয়েছে। তাঁর কারণ শুধু এই নয় যে, শক্তির সঙ্গে ভর-এর সমন্বয়ের কৃতিত্বটা আইনস্টাইনকেই দিতে হয়। এমন একটা সময় ছিল যখন জনগণের পূর্ণ দৃষ্টির সামনে আপেক্ষিকতা এমন কিছুর প্রতীক বলে মনে হতো যা মানবিক ঘটনাবলী ও স্বার্থ থেকে বহু দূরের বিষয়।

এখন এই রকম একটা অনুভব সঞ্চারিত হল যে আইনস্টাইনের কাজের মধ্যে নিছক তত্ত্ব ছাড়াও আরও কিছু আছে। মানবজাতি এমন একটা ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের সম্মুখীন হয়েছে, যেখান থেকে বিজ্ঞান মানুষের মহত্তম আশা ও ভয়ংকর আতঙ্কের উৎস হিসাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই রকম সন্ধিক্ষণে সংগ্রামে যোগ না-দেওয়াটা বিজ্ঞানের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হতো। মানুষের অস্তিত্বের জন্যেই বিষয়মুখিতা, বিজ্ঞানের যৌক্তিক প্রকৃতি ও সত্যস্বরূপ এই দাবি উপস্থিত করল যে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন করতে হবে এবং তাদের আতংকের অবসান ঘটাতে হবে।

আইনস্টাইনের সামনে পরমাণু বোমা হাতে হিটলারের একটা অপচ্ছায়াময় আতংক-মূর্তি ছিল। কিন্তু আমেরিকার শাসক মহল সম্পর্কেও তিনি পুরোপুরি আস্থাবান ছিলেন না।

এই মহল সম্পর্কে তাঁর আস্থা এত কম ছিল যে, ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরেই আইনস্টাইন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা চিঠি সম্পর্কে বলেছিলেন যে এটা তাঁর জীবনে খুব বড় রকমের দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। তাঁর একমাত্র যুক্তি ছিল এই ভয় যে, তা নাহলে জার্মানি পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলবে।

আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ না হলে হিটলারের হাতে কখনও পরমাণু অস্ত্র আসত না। প্রথমত, ইতিহাস তাকে সময় দিয়েছিল খুবই কম। ১৯৪২

সালের শরৎকাল থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অগ্রগতি এবং ব্যাপক বিমান আক্রমণ জার্মানিতে পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা নির্মাণ করা বাস্তবে অসম্ভব করে তুলেছিল। তাছাড়া জার্মানি থেকে বিজ্ঞানীদের বিদেশে পলায়ন সে দেশের গবেষণার মানকে দারুণভাবে নামিয়ে দিয়েছিল। যে সকল পদার্থবিদ জার্মানিতে ছিলেন, তাঁরা যতটা না নতুন আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিলেন, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন যাতে সেগুলি নাৎসীদের হাতে না পড়ে। ফ্রিৎস হাউটারমানস, যাঁর কাজ ছিল জার্মানিতে থেকেই ইউরেনিয়াম বিভাজনের শৃঙ্খল-অভিক্রিয়া নিয়ে কাজ করা, তাঁর গবেষণার ফলাফল গোপন রেখেছিলেন। হাইসেনবার্গ ও ভেইৎসস়াকার-ও একই ব্যাপার নিয়ে কাজ করছেন—এই সংবাদে যখন তাঁর আশংকা জাগল, তখন ম্যাকস ফন লাউয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন: "প্রিয় বন্ধু, যে যেটা আবিষ্কার করতে চায় না, সেটা সে আবিষ্কার করেও না।" এর সঙ্গে এটাও যোগ করা উচিত যে হিটলার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আবিষ্কারের উৎস হিসাবে তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যাকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখত: এর যৌক্তিক, বিষয়মুখী প্রকৃতিটা ফুরার-এর রহস্যবাদী প্রেরণাবোধের বিপরীত ছিল।

এই সকল যুক্তি অবশ্য জার্মানিতে পরমাণু বোমা না হবার বিরুদ্ধে যায় না। বড় জোর তারা এ ব্যাপারে গবেষণার কাজকে বিলম্বিত করেছিল। আসল বাধা ছিল এখানেই যে, ১৯৪২ সালের পর থেকে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। এই প্রশ্নটা ভোলগার তীরে শেষবারের মতো মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। সেখানে নাৎসী জার্মানির পরাজয় হিটলারের হাতে পরমাণু বোমা যাওয়ার ভয়াবহ বিপদ থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করেছিল।

১৯৩৯ সালে আইনস্টাইন এসব ব্যাপার নিজেও জানতেন না অথবা আগে থেকে বিচারও করতে পারেন নি এবং নাৎসীদের হাতে পরমাণু বোমার চেহারাটা তাঁকে এর পরেও বেশ কিছুদিন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছিল।

প্রেসিডেন্টকে লেখা আইনস্টাইনের চিঠিটা আলেকজাণ্ডার সাচস্-এর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, তিনি রুজভেল্টকে মাত্র ১১ই অক্টোবর সেটা দেন। এটা প্রেসিডেন্টকে বিশেষ প্রভাবিত করে নি। কিন্তু পরের দিন, প্রাতর্ভোজের সময় সাচস্ রুজভেল্টকে একটা গল্প বলেন, যাতে নেপোলিয়ন রবার্ট ফুলটনকে বরখাস্ত করেছিলেন। তার কারণ ফুলটন সম্রাটকে প্রস্তাব

দিয়েছিলেন বাষ্পচালিত নৌবহর তৈরি করে ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। "যদি নেপোলিয়ন সেই সময়ে আর একটু কল্পনাশক্তি ও বিনয়ের পরিচয় দিতেন," বললেন সাচস্, "তাহলে হয়তো ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসটা অন্য রকমের হতো।"

গল্পটা ভালো করে শুনে রুজভেল্ট একটা নোট লিখে যে চাপরাসীটি প্রাতরাশ দিচ্ছিল তাকে দিলেন; সে কিছুক্ষণ বাদে নেপোলিয়নের সময়কার ফরাসি ব্রাণ্ডির বোতল নিয়ে এল এবং গেলাসগুলি ভরে দিল। রুজভেল্ট তাঁর সামরিক সাহায্যকারী জেনারেল ওয়াটসনকে ডাকলেন এবং পরমাণু বোমা বানাবার কাজ শুরু হয়ে গেল। অনেক আস্তে আস্তে কাজ শুরু হল এবং ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে আইনস্টাইন আর একটা চিঠি প্রেসিডেন্টকে পাঠালেন, যাতে নাৎসী জার্মানি যে ইউরেনিয়াম সম্পর্কে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাচ্ছে সেই কথা আবার তিনি বললেন। রুজভেল্টের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কাজটা কিন্তু সরকারি কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়িক মহলের মধ্যে আটকে রইল। সিলার্ড ও অন্যদের স্মৃতিকথা বিচার করে বলা যেতে পারে যে, এইসব মহল তাত্ত্বিক চিন্তাতে বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখায় নি। প্রধানত পদার্থবিদ ও ইন্‌জিনিয়ারদের উৎসাহ থাকাতে এই প্রকল্পটি সফল হয়েছিল, কারণ তাঁরা তত্ত্বগত বিচারের ক্ষেত্রে এর মূল উদ্যোক্তাদের প্রতি আস্থাবান ছিলেন এবং নাৎসীদের হাতে বোমা পড়ার যে-ভয় মূল উদ্যোক্তাদের ছিল, এঁরা ছিলেন তারও শরিক।

জার্মানি হেরে যাবার পর অবশ্য এই ভয়টা দূর হল কিন্তু তার থেকেও অনেক বড় এবং নতুন ধরনের বিপদ দেখা দিল।

"জার্মানি আমাদের কী করতে পারে, ১৯৪৫ সালে যখন এই দুশ্চিন্তা দূর হল, তখন আমরা দুশ্চিন্তা করতে শুরু করলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট অন্য দেশ সম্পর্কে কী করবে"—এটা সিলার্ড পরে লিখেছেন।(১)

আবার তিনি আইনস্টাইনের কাছে গেলেন—এবারে উদ্দেশ্য ছিল জাপানের শহরগুলিতে পরমাণু বোমা ফেলা হবে না—এই মর্মে রুজভেল্টের কাছে যে স্মারকলিপি পাঠানো হবে, তাতে আইনস্টাইনের সমর্থন পাওয়া। আইনস্টাইন চিঠিটা পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু সেটা কখনও প্রাপকের কাছে পৌঁছায় নি।

১ R. Jungk, op. cit., p. 178.

১৯৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল, যেদিন রুজভেল্ট হঠাৎ মারা যান, চিঠিটা তাঁর ডেস্কেই ছিল, তখনও খোলা হয় নি।

হিরোশিমা ও নাগাসাকির মর্মান্তিক ঘটনা আইনস্টাইনের পক্ষে একটা গুরুতর পরীক্ষা ছিল। অ্যান্তোনিয়া ভ্যালেন্তাঁ ও আইনস্টাইনের মধ্যে কথাবার্তার সময়, আইনস্টাইন ব্যাপারটা তোলেন :

"'আমার ভূমিকা ছিল একটা ডাকবাকসের মতো', বললেন আইনস্টাইন। 'চিঠিটা লিখে আমার কাছে আনা হয়েছিল : আমার কাজ ছিল তাতে একটা সই দেওয়া।' আমরা প্রিন্সটনে তাঁর পড়বার ঘরে বসেছিলাম। জানলা দিয়ে একটা ধূসর আলো আসছিল এবং তাঁর কিছুটা তোবড়ানো গালে ও চোখে পড়ছিল, সেটা যেন তাঁর মাথাতে জ্বলছিল। অনেক প্রশ্ন নিয়েও একটা নীরবতা ঘরে বিরাজ করছিল। তাঁর চোখগুলি, সবসময়েই যেটা জ্বলছে, আমার দিকে পড়ল। আমি বললাম : 'তবুও আপনিই বোতামটা টিপেছিলেন।' তিনি দ্রুত আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং জানলা দিয়ে নির্জন উপত্যকা ও সবুজ উজ্জ্বল পুরানো বাগানের দিকে চেয়ে রইলেন, যে বাগানের গাছপালাগুলির আড়ালে দিগন্তটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তারপর যেন দূরের গাছপালাগুলির মাথায় দৃষ্টি রেখে শান্তভাবে চিন্তা করে এবং প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, আমি বোতামটা টিপেছি'।"(১)

'হ্যাঁ আমিই বোতামটা টিপেছি'—কথাটা থেকে মনে হতে পারে যে, আইনস্টাইন মনে করছেন রুজভেল্টকে লেখা তাঁর চিঠিটাই এই বিপর্যয়ের কারণ, যেটা ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা ও নাগাসাকির সর্বনাশ ঘটিয়েছিল এবং যেটা তখন থেকেই দুনিয়ার উপরে ঝুলছে। অন্তত অ্যানতোনিয়া ভ্যালেন্তাঁর সেই রকমই ধারণা হয়েছিল। কিন্তু হেলেন ডুকাস, যিনি বহু বছর ধরে আইনস্টাইনের একান্ত নিজস্ব চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তিনি বলেছেন যে, 'হ্যাঁ, আমিই বোতামটা টিপেছি' কথার অর্থ থেকে এটা বোঝায় না যে, তিনি মানবজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যক্তিমানুষদের অথবা তাদের কার্যকলাপকে নিয়ামক শক্তি বলে মনে করতেন। আইনস্টাইন বরাবরই এই ধারণাকে বরবাদ করে দিতেন যে, ইতিহাসে বড় বড় আলোড়নগুলি কোনো-

১ A. Vallentin, op. cit., p. 215.

ভাবেই খ্যাতনামা ব্যক্তি অথবা 'ইতিহাস-স্রষ্টাদের' ইচ্ছা ও খেয়ালখুশির অধীন। নিজেকে তিনি কখনোই এই ধরনের মানুষ বলে মনে করতেন না; নিজেকে এইরকম মনে করার ধারণা এবং বিজ্ঞানে ও ইতিহাসে তাঁর ভূমিকার কথা কখনও তাঁর মনে উদয় হয় নি। তলস্তয়ের 'সবুজ যাদুদণ্ডটা' তিনি যেন চাইলেই পেতেন এবং তাৎক্ষণিক ও 'নিছক ব্যক্তিগত' ব্যাপার থেকে বিযুক্ত থাকাটাই ছিল তাঁর অন্তর্জগতের সহজাত প্রকৃতি।

এর সঙ্গে এটাও যোগ করা উচিত যে, পারমাণবিক গবেষণার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত যে-কোনো ব্যক্তির চোখেই এটা ধরা পড়বে যে, রুজভেল্টের কাছে লেখা চিঠিটাকে 'আমিই বোতামটা টিপেছি', এই ধারণার সঙ্গে মেলানো যায় না। ১৯৪৫ সাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যে গভীর বেদনা তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে, এই ঘটনাটি তার জন্যে দায়ী নয়।

পরমাণু বোমার ট্র্যাজিডির পেছনে এমন একটা ব্যাপার ছিল যেটা বহু বছর ধরে তাঁকে পীড়িত করেছিল। দুনিয়ার যাবতীয় অশুভ ব্যাপারের জন্যে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যুগ-যুগান্তের যুক্তি-বিধ্বংসী শক্তির ট্রাজিডি এবং মানব-মনের কীর্তিগুলিকে ধ্বংসাত্মকভাবে কাজে লাগানোটা তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করত। মন প্রকৃতির মধ্যে সুষমার সন্ধান করে এবং অন্তরের তাগিদে সমাজকে সুষমার পথে, মানবগোষ্ঠীর যুক্তিসঙ্গত সংগঠনের দিকে পরিচালনা করে। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক সমাজে যুক্তির ফলাফল অনেক সময় বিষময় হয়ে উঠতে পারে এবং প্রতিটি বৈজ্ঞানিক ধারণা, দুনিয়ার অন্তর্লীন যুক্তির প্রতিটি আবিষ্কার শেষ অবধি যুক্তি-বিধ্বংসী শক্তিদের হাতের অস্ত্র হয়ে ওঠে। এই ধরনের মনোভাব আইনস্টাইন আগেই অনেকবার প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমান ঘটনাটিতে অবশ্য আপেক্ষিকতার অন্যতম মৌলিক অনুসিদ্ধান্তটির প্রয়োগের ব্যাপারটা জড়িত হয়ে পড়েছে। আইনস্টাইন অবশ্য এই ধরনের প্রয়োগের জন্যে নিজেকে দায়ী বলে মনে করতেন—কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের স্রষ্টা হিসাবে নয়। তিনি কখনও নিজেকে এভাবে মনে করতেন না এবং তাঁর নিজের চিন্তা-পদ্ধতিতে এরকম কোনো আত্ম-মূল্যায়ন ছিল না। আইনস্টাইন নিজেকে মানবজাতির সমষ্টিগত যুক্তিবোধের অঙ্গীভূত বলে মনে করতেন, সমগ্র বিজ্ঞানের জন্যে তাঁর একটা তীব্র দায়িত্ববোধ ছিল আর সেই কারণেই দ্বন্দ্বাত্মক সমাজে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির সুদীর্ঘ ট্রাজিডির ইতিহাসে এই শেষ কাজটি তাঁকে এত

গভীরভাবে বিষণ্ণ করে তুলেছিল। এই বোঝা পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ দূর করার কাজে এবং বিজ্ঞানের ফলাফলকে সৃষ্টিশীল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার ব্যাপারে মানবজাতির সামর্থ্য সম্বন্ধে তাঁর আস্থাকে টলিয়ে দেয় নি। পারমাণবিক শক্তি সাধারণভাবে মানুষের জীবনে কোনো বিপদ সৃষ্টি করে না, বিপদটা রয়েছে প্রকৃতির এই নতুন শক্তিকে অপব্যবহারের মধ্যে। "পারমাণবিক শৃঙ্খল-অভিক্রিয়াটা", আইনস্টাইন লিখছেন, "মানুষের পক্ষে ততটাই বিপদের কারণ হবে, যতটা দেশলাই আবিষ্কারের দ্বারা হয়; আসল করণীয় হচ্ছে, এর শক্তির অপব্যবহারের সম্ভাবনাটা দূর করা।"

আইনস্টাইন দেখিয়েছেন যে, পরমাণু শক্তি একটা পুরানো সমস্যার গুরুত্ব পরিমাণগতভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। "পারমাণবিক শক্তির মুক্তি কোনো নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে নি। বরঞ্চ এ একটা বর্তমান সমস্যাকে সমাধান করার প্রয়োজনীয়তাকে জরুরীভাবে তুলে ধরেছে," ১৯৪৫-এর নভেম্বরে তিনি এটা লিখেছিলেন। সমস্যাটা নিহিত রয়েছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আগ্রাসী ও ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবার সম্ভাবনার মধ্যে। আইনস্টাইন মনে করতেন যে, সময় আসবে যখন পুরানো সমস্যাকে সমাধান করা যাবে, সমাজকে একটা যৌক্তিক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা যাবে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি শুধু জনগণের কল্যাণেই প্রযুক্ত হবে।

কিন্তু যে অশুভ ট্রাজিডি দেখা দিয়েছিল, এই বিশ্বাস তাকে দূর করল না; এটা তাঁকে হিরোশিমার দুর্ভাগ্যকে ভুলতে দিল না, অথবা সেটা যে আবার অন্য শহরে ঘটতে পারে না, এমন আশ্বাসও দিল না। বিজ্ঞানকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে আইনস্টাইন যে নৈতিক অপরাধবোধে আক্রান্ত ছিলেন, ঐ বিশ্বাস তা থেকেও তাঁকে মুক্তি দিল না। সারা জীবন ধরে তিনি সামাজিক বিরোধের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে নারাজ ছিলেন, তিনি সেগুলিকে কখনও ভুলতে পারেন নি এবং সামাজিক ও নৈতিক ঔদাসীন্য বা আপসের পথ গ্রহণ করতে পারেন নি।

বেশিরভাগ যথার্থ বৈজ্ঞানিকেরই বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্নে অনমনীয় দৃঢ়তা। বিজ্ঞানের সেবা করতে হলে এই ধরনের স্বাতন্ত্র্য, দৃঢ়তা, ন্যায়-পরায়ণতা ও সাহস প্রয়োজন—এগুলি নৈতিক আপস-রফার বিরোধী। ব্যক্তিগত স্বার্থে বা জনস্বার্থে সুবিধাবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের জগতে ভাবাদর্শগত সুবিধাবাদের মুখবন্ধ রচনা করে এবং সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক

অনুসন্ধানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিত্যাগ করে। সব বিজ্ঞানীর মধ্যেই বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক মানদণ্ড ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থান করে। কিন্তু আইনস্টাইনের মধ্যে এগুলি একাকার হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর যুগের অন্য যে-কোনো বিজ্ঞানীর চেয়ে তিনি বিজ্ঞানের আগ্রাসী সামরিক প্রয়োগের ট্র্যাজিডি সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। পরমাণু বোমা তৈরির কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন 'গভীরভাবে' কথাটি তাঁদের সম্পর্কে প্রযোজ্য—তাঁরা হয়তো হিরোশিমার ট্র্যাজিডি আরও তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন। আইনস্টাইনের কাছে কিন্তু সমস্যাটা কতকগুলি পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার ছিল না, এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি কোনো অংশই নেন নি, তাঁর সমস্যাটা ছিল সমগ্র বিজ্ঞানকে নিয়েই। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক কর্তৃপক্ষের কাজকর্ম থেকে সুস্পষ্ট-ভাবে বোঝা যায় যে, বিজ্ঞান সেখানে যুক্তি-বিধ্বংসী শক্তিদের হাতে পড়েছে। সমস্ত রকমের সভা ও সম্মেলনের বিবরণগুলি থেকে সেই একই চেহারার যুক্তি-বিধ্বংসী দানব বেরিয়ে আসত। তা সেই সভা সমর-বিভাগেরই হোক, শিল্প-কর্পোরেশনেরই হোক অথবা তাদের উপর নির্ভরশীল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানেরই হোক। এই দানব বিজ্ঞানকে শাপশাপান্ত করত না, তাকে তার দাস করে তুলত। অনুমানমূলক চিন্তার উন্নত অবস্থান থেকে আইনস্টাইন দেখলেন যে, বিজ্ঞান পুরোপুরিভাবে সেই সকল গোষ্ঠীর হাত পড়েছে, যারা সত্যের প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্যের শত্রু। আইনস্টাইনের কাছে বিজ্ঞান ছিল চিন্তার স্বাধীনতার সঙ্গে সমার্থবাচক, যার কর্তব্য হল 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' যুক্তিসঙ্গত আদর্শের সেবা করা। বিজ্ঞান বাস্তব স্বার্থের সেবা করে কিন্তু সেই জন্যে তার যুক্তিসম্মত মর্মকে নষ্ট করে না; এই মর্মের স্বরূপ তখনই দেখতে পাওয়া যায়, যখন বাস্তব স্বার্থের লক্ষ্য হয় যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে যুক্তিসম্মত ধারায় সমাজ ও প্রকৃতিকে পুনর্গঠিত করা। যুক্তিসম্মত, সুষমান্বিত সমাজব্যবস্থা স্বাধীন সুষম্যান্বিত বিকাশের ও যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার পথ সুগম করে। দ্বন্দ্বাত্মক সমাজব্যবস্থার স্বার্থগুলি সত্যের বিপরীত এবং সেগুলি বিজ্ঞানের প্রকৃতি-বিরোধী ও বাধ্যতামূলক শর্ত হাজির করে।

বিজ্ঞানের সামরিকীকরণ এবং আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি আইনস্টাইনকে

বাধ্য করল ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টেলিভিসনে উপস্থিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মূল্যায়ন পেশ করতে :

"(আমেরিকাতে) বিদেশ-নীতির প্রতিটি কাজই একটা দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয় : যুদ্ধ লাগলে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রাধান্য অর্জনের জন্যে আমাদের কিভাবে চলতে হবে ? তার জন্যে দুনিয়ার সকল রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে হবে। সম্ভাব্য মিত্রদের যথাযোগ্য সামরিক ও আর্থনীতিক সাহায্য দিয়ে জোরদার করে তুলতে হবে। দেশের মধ্যে : সামরিক শক্তির হাতে প্রভূত আর্থনীতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে হবে ; যুবকদের জন্যে সামরিকীকরণ করতে হবে ; নাগরিকদের, বিশেষ করে অসামরিক কর্মচারীদের, আনুগত্যকে বিশেষ নজরে রাখতে হবে, আর সেটা করতে হবে এমন একটা পুলিশ বাহিনীর দ্বারা, যাদের শক্তিবৃদ্ধি প্রতিদিনই নজরে পড়ে ; স্বাধীন চিন্তার মানুষদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে বশে আনতে হবে। রেডিও, পত্র-পত্রিকা ও স্কুলের মাধ্যমে জনসাধারণকে সূক্ষ্ম কায়দায় নিজেদের মতে দীক্ষিত করে তুলতে হবে।"(১)

আইনস্টাইন 'আনুগত্যের পরীক্ষা' নেওয়ার বিরুদ্ধে বারবার তাঁর বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৩ সালের মে মাসে নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন-এর শিক্ষক উইলিয়ম ফ্রাউয়েনগ্লাস আইনস্টাইনকে লিখলেন যে, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংযোগের সমর্থনে কথা বলার জন্যে তাঁকে মার্কিন কংগ্রেসের কমিটির সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে। নিজের রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে ফ্রাউয়েনগ্লাস কিছু বলতে চান নি,—এর ফলে তাঁর অনেক রকমের অসম্মান, অসুবিধা হতে পারে। ১৬ই মে তারিখে লেখা আইনস্টাইনের জবাবটি নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর ১২ই জুন, ১৯৫৩ সালের সংখ্যাতে প্রকাশিত হল। খানিকটা অন্য বিষয় ছাড়াও এতে আছে :

"আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা যে সমস্যার সম্মুখীন, সেটা বেশ গুরুতর ধরনের। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিজ্ঞরা বাইরে থেকে বিপদের ধুয়ো তুলে জনগণের মনে সমস্ত রকম মননশীল কাজের বিরুদ্ধে একটা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করতে পেরেছেন। এ পর্যন্ত সফল হয়ে তাঁরা এখন শিক্ষা-দানের স্বাধীনতাকে দাবিয়ে দেওয়ার এবং যাঁরা তাঁদের কাছে নতি স্বীকার

১ Ideas and Opinions, p. 159.

করছেন না, তাঁদের সমস্ত পদ থেকে বঞ্চিত করে অনাহারে মারবার কাজে হাত দিয়েছেন ।

"সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কী করবে? খোলাখুলি-ভাবে বলতে গেলে আমি এর একমাত্র বিপ্লবী উপায় দেখি গান্ধির অসহযোগিতার মধ্যে। কমিটির সামনে যে বুদ্ধিজীবীকেই ডাকা হোক না কেন, তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবেন, অর্থাৎ জেল খাটা ও আর্থিক সর্বনাশের জন্যে তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে, এক কথায় তাঁর স্বদেশের সাংস্কৃতিক কল্যাণের স্বার্থে তাঁর ব্যক্তিগত কল্যাণকে বলি দিতে হবে।

"তবে সাক্ষ্য দিতে এই অস্বীকৃতি যেন সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনের শরণ নিয়ে নিজের অপরাধ এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল না হয়, এর ভিত্তি হবে এটাই যে, কোনো নিরাপরাধ নাগরিকের পক্ষে এই ধরনের জেরার সম্মুখীন হওয়াটাই অপমানজনক এবং এই ধরনের জেরার ব্যাপারটি সংবিধানের মর্মবিরোধী।

"যদি বহু মানুষ এটা করতে রাজি থাকেন তাহলে এটা সফল হবে। আর তা নাহলে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের জন্যে যে দাসত্বের পথ রচিত হয়েছে, তার চেয়ে ভালো কিছু আর তারা পেতে পারে না।"(১)

১ Ideas and Opinions, p. 33-34.

অষ্টবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু

> সত্যের জন্যে অনুসন্ধান, সেটাকে পাওয়ার চেয়ে মূল্যবান।
>
> লেসিং

১৯৫০ এর দশকে আইনস্টাইনের লেখা চিঠিগুলিতে বারংবার একটা সুর অনুরণিত হয়েছে—সেটা ক্লান্তির, জীবন সম্পর্কে একটা সার্বিক ক্লান্তিকর অবস্থার। এই সংক্রান্ত মন্তব্যগুলি হাস্যপরিহাসের সঙ্গেই করা হোক অথবা গুরুগম্ভীরভাবেই করা হোক, এগুলি ছিল একটা শান্ত, সমাহিত বিষণ্ণতার প্রকাশ, একটা নীরব সন্ধ্যায় কোনো মানুষকে যে মানসিকতা পেয়ে বসে, এটা যেন সেই রকমই। কিন্তু কোনোভাবেই এই মেজাজটা আইনস্টাইনের হাস্য-পরিহাস, আশাবাদ বা কাজের আগ্রহকে প্রভাবিত করতে পারে নি। এর সঙ্গে সারা জীবনের কাজের ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার রচনা করারও কোনো সম্পর্ক নেই। আইনস্টাইনের চিন্তাধারা একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের কম-বেশি সাফল্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। আইনস্টাইনের লেখার মধ্যে তাঁর জীবনের সারসংক্ষেপ রচনার মতো কিছু পাওয়া যায় না।

একটা ছোট্ট লেখা 'আত্মজীবনীমূলক নকশা', ১৯৫৫ সালের মার্চে তাঁর জীবনের শেষ বসন্তে লেখা হয়েছিল। জুরিখ পলিটেকনিক-এর শতবার্ষিকী সংখ্যাতে প্রকাশের জন্যে এটা লেখা হয়।(১) তাতে আইনস্টাইন তাঁর জীবনে প্রথম পলিটেকনিক-এ ঢোকবার কথা বলেছেন, বলেছেন তাঁর আরাই-তে ক্যানটনাল স্কুলের কথা এবং স্কুলে কী ধরনের স্বাধীনতার পরিবেশ ছিল,

১ Helle Zeit, p. 9-17.

সেই কথা। তাছাড়া সেখানে 'চিন্তার পরীক্ষা' কী ভাবে তাঁর মনকে দখল করে ছিল সে সম্পর্কেও বলেছেন : যদি কোনো মানুষ আলোর রশ্মিকে ধরবার চেষ্টা করে, তাহলে কী ঘটবে? সেরকম লোকের পক্ষে আলোর তরঙ্গগুলি স্থির থাকবে বলে মনে হয়। এই ছবির সঙ্গে আপেক্ষিকতার সূত্রের অসঙ্গতিটা এত বেশি যে এখান থেকে তার একটা গভীর চিন্তার সূত্রপাত হয়, যেটা শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ সালে লেখা 'গতিশীল বস্তু-দেহের বিদ্যুৎগতিশীলতা প্রসঙ্গে' বিখ্যাত নিবন্ধের ভাবধারার মধ্যে প্রকাশ পায়।

এর পরে আইনস্টাইন তাঁর ছাত্রজীবন ও গাণিতিক জ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। মার্সেল গ্রসমানের স্মৃতির প্রতি তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। আইনস্টাইন বার্ন পেটেন্ট অফিসে তাঁর কাজের কথা স্মরণ করে বলেছেন, তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্যে সেখানকার পরিবেশ কতই না চমৎকার ছিল।

তারপর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের কথা সামান্য উল্লেখ করে তিনি প্রায় তিন পাতা ধরে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে বলেছেন। এখানে তিনি তাঁর অনুসন্ধানের একটা সুস্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক বিবরণ হাজির করেছেন— যে অনুসন্ধান ১৯১৬ সালে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে পরিণতি লাভ করে। এই তত্ত্ব সম্পর্কে সম্ভবত এটাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দলিল।

এই আত্মজীবনী শেষ হয়েছে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলি দিয়ে :

"চল্লিশ বছর হয়ে গেল যখন মহাকর্ষের তত্ত্ব সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। এই বছরগুলি সমগ্র পদার্থবিদ্যার ভিত্তি গড়ে তোলার জন্যে মহাকর্ষের তত্ত্বের সাধারণীকরণ এবং ক্ষেত্রতত্ত্বের বিকাশ ঘটাবার একমাত্র উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হয়েছে। বহু মানুষই ঠিক ঐ একই লক্ষ্য নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। অনেক ধারণা যা গোড়াতে আশাপ্রদ বলে মনে হয়েছিল পরে তাকে বরবাদ করতে হয়েছে। তবুও গত শেষ দশ বছরে যে-তত্ত্ব গড়ে উঠেছে সেটা আমার কাছে স্বাভাবিক ও আশাপ্রদ বলে মনে হয়েছে, যদিও আমি এখনও বলতে পারি না, পদার্থবিদ্যার কাছে এর মূল্য আছে কি, না। এটার কারণ হচ্ছে গাণিতিক ক্ষেত্রে অলংঘনীয় বাধাবিঘ্ন যে কোনো অ-রৈখিক ক্ষেত্রতত্ত্বের পক্ষে অনিবার্য ব্যাপার। তাছাড়া এটাও সংশয়জনক যে, ক্ষেত্রতত্ত্ব থেকে বস্তু ও শক্তি বিকীরণের পারমাণবিক কাঠামো এবং অনুরূপভাবে কোয়ান্টাম ঘটনাবলী

বার করা যাবে কি, না। বেশির ভাগ পদার্থবিদই এ সম্পর্কে জোরের সঙ্গে 'না' বলবেন, কারণ তাঁরা মনে করেন যে কোয়ান্টাম সমস্যাকে আরও অন্য কোনোভাবে সমাধান করতে হবে।"(১) এর পরেই এই পরিচ্ছেদের মাথায় লেসিংয়ের যে কথাগুলি উদ্ধৃত হয়েছে সেটি আছে "সত্যের জন্যে অনুসন্ধান, সেটাকে পাওয়ার চেয়ে মূল্যবান।"

এখন আমরা আইনস্টাইনের জীবন ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ভালো করেই জানি, তাই কোন অর্থে তিনি 'সত্যের জন্যে অনুসন্ধান' ও 'সত্যকে পাওয়া' কথাটা বলেছেন এবং কেন এগুলির মধ্যে তাঁর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব ও আত্ম-জীবনী সংক্রান্ত পুরো ধারণাটা পাওয়া যায়, তা বুঝতে পারি।

আইনস্টাইনের কাছে 'সত্য' হচ্ছে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সত্যতা, জগৎ-চিত্রের সত্যতা। এই চিত্রটা সীমাহীনভাবে এমন একটা মৌল চিত্রকে পাবার চেষ্টা করে, যেখানে কার্য-কারণ সম্পর্কচ্যুত কোনো অভিজ্ঞতাভিত্তিক ধ্রুব পদার্থের অস্তিত্ব নেই; এই চিত্র পাবার জন্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ ইচ্ছামতো অনুমানের উপর নির্ভর করে—অধিকতর মাত্রায় বিজ্ঞানের আদর্শের সঙ্গে মিলিত হয়। বিজ্ঞান তার আদর্শের জন্যে শাশ্বত সন্ধানের পথে তার অগ্রগতির প্রতিটি স্তরে কিছু পরিমাণ আপেক্ষিক সত্য অর্জন করে—যা পদার্থগত বাস্তবতার ধারণা সম্পর্কে আপেক্ষিক, প্রায় যথাযথ সত্য। অগ্রগতির পরবর্তী ধাপে এই ধারণার আবার রদবদল হয়। 'সত্যকে পাওয়ার অর্থ' একটা নিশ্চিত জগৎ-চিত্রকে পাওয়া।

কিন্তু বিজ্ঞান তো কেবলমাত্র সত্যকে এই অর্থে পায় না যে, সে মহাবিশ্বের একটা নির্দিষ্ট ছক হাজির করছে (অবশ্যই একটা স্তরের জ্ঞানের সীমার মধ্যে)। এই ধরনের প্রতিটি ছকই যদিও নতুন ছকের দ্বারা বদলে যায় ও অপসারিত হয়, তবুও বাস্তবতার নতুনভাবে বিকাশমান ধারণাটি ইতিহাসের দিক থেকে একটা অপরিবর্তনীয় উপাদান বজায় রাখে, যাকে বদল করা যায় না। বিশেষ করে, বিকাশের প্রতিটি স্তরে বিজ্ঞান অগ্রগতির সমস্যার কতকগুলি অন্তর্নিহিত শক্তি বহন করে—যাকে বিজ্ঞান পরবর্তী যুগের হাতে সমর্পণ করে যায়। বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত শক্তি সাধারণত দৃঢ়, ইতিবাচক চেহারার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। যে দ্বন্দ্বগুলি একটা যুগে চোখে

১ Helle Zeit, p. 16-17.

পড়ে না, আবার অন্য যুগে প্রতিভাত হয়, যে অনুমানগুলি প্রমাণের অপেক্ষায় থাকে—এগুলি সবই একটা যুগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে—যার ফলে বিজ্ঞানের আরও বিকাশ সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দ্রুততা তাদের 'পরে বহুলাংশে নির্ভর করে। বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত শক্তি তখনই প্রতিভাত হয়, যখন একটা তত্ত্বকে আর একটা তত্ত্ব অপসারিত করে—আগের তত্ত্বটির অমীমাংসিত সমস্যাগুলি পরবর্তীটির উপর বর্তায়। বিজ্ঞানকে ক্রমবর্ধমান সঠিকতা ও সামগ্রিক ধারণার একটা অনিঃশেষ ধারাবাহিক রূপ হিসাবে দেখলে আমরা এটাও স্বীকার করব যে, বিজ্ঞানের সত্যতা হল তার নিরবচ্ছিন্ন, চিরবিকাশশীল ও চিরপ্রসারণশীল সমস্যাগুলি। বিজ্ঞানে এইসব সমস্যার নতুন নতুন, অধিকতর যথাযথ ও সাধারণ সমাধান পাওয়া যায়। এই সমাধানগুলিই বিজ্ঞানের ধ্রুবত্বের ভিত্তি হিসাবে, তার অবিনশ্বর শক্তির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। 'সত্যের জন্যে অনুসন্ধান'-এর অর্থ হল পুরানো তত্ত্বকে নতুন তত্ত্ব অপসারিত করে, আর এই অপসারণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় পুরানো তত্ত্বের দ্বারাই। তত্ত্ব ও তার স্রষ্টাদের এটাই ভাগ্য।

আইনস্টাইন মনে করতেন না যে, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব জগৎপ্রপঞ্চের দ্ব্যর্থহীন ব্যাখ্যা হাজির করেছে। তিনি ভালো করেই এই তত্ত্বের পরীক্ষাধীন চরিত্রটা জানতেন এবং সেটা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে বলেও ছিলেন। সত্যটা তাঁর আয়ত্তে ছিল না। কিন্তু একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব বিজ্ঞানে একটা জোরালো প্রবণতা নিয়ে এসেছিল। এটা তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যাকে আপেক্ষিকতাবাদী ও কোয়ান্টাম ধারণার সংশ্লেষণের দিকে, বিভিন্ন ধরনের শক্তিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারণার সংশ্লেষণের দিকে ঠেলে দেয়। এই অর্থে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব বিজ্ঞানের মূল প্রবাহের মধ্যেই ছিল। এর বিশেষ রূপটি ১৯৪০-১৯৫০-এর দশকে যেভাবে আইনস্টাইন বিবৃত করেছিলেন, সেইভাবেই তার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে যেতে পারত। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ঝোঁকটি আমাদের কাছে সব সময়েই একটা উত্তরাধিকার হয়েই থাকবে। নানা ধরনের ক্ষেত্র-এর মধ্যে ক্রিয়ার প্রকাশ হিসাবে কণার রূপান্তর ঘটার যে কোয়ান্টাম-আপেক্ষিকতাবাদী ধারণার বিকাশ ঘটেছে—তার থেকে এখন আমরা একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রবণতাটি ভালো করেই বুঝতে পারি। বিজ্ঞানকে এইভাবে দেখাটা 'সত্যের জন্যে অনুসন্ধানের'ই প্রকাশ, যদি 'তাকে পাওয়াটা' নাও হয়!

দ্ব্যর্থহীন, ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া না গেলেও, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের জন্যে

দুরন্ত অনুসন্ধান এমন একটি প্রতিভার অশ্বারোহণ পর্ব (আর এটা ১৯৬০-এর দশকে বিশেষ করে স্পষ্ট)—যিনি নতুন সত্যের পথ উন্মুক্ত করেছেন, বিষয়-মুখী বাস্তবতার অনিঃশেষ অন্বেষণে নতুন যোগসূত্রের সন্ধান দিয়েছেন।

আইনস্টাইন বিজ্ঞানের চিরন্তন, নিরবচ্ছিন্ন উপাদান ও তার পরিবর্তনশীল মূল্যের মধ্যে যে জীবন্ত সংযোগ রয়েছে—তা খুব গভীরভাবেই বুঝতেন। বিজ্ঞানের গোড়ার এই ধারণাটি ফ্রাংকলিন ও নিউটন সংক্রান্ত বিষয়ের লেখক বারনার্ড কোহেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের আসল বিষয়বস্তু ছিল। কোহেন আইনস্টাইন মারা যাবার দু'সপ্তাহ আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।(১)

কোহেন ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে এক রবিবারের সকালে সবুজ জানালা লাগানো ঐ ছোট্ট বাড়িটাতে গিয়ে হাজির হন। তাঁকে হেলেন ডুকাস অভ্যর্থনা করে দোতলার ঘরে আইনস্টাইনের স্টাডিতে নিয়ে যান। ঐ ঘরের ছবিটা আমরা আগেই দেখেছি। কোহেন কাগজ, পেনসিল ও টুকিটাকি জিনিসপত্র ও পুরানো একগাদা ধূমপানের পাইপ ইত্যাদিতে বোঝাই একটা বড় টেবিলের বর্ণনা দিয়েছেন।

আইনস্টাইন ঘরে ঢুকলেন এবং মিস ডুকাস কোহেনকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এক মুহূর্তের জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি পাইপ নিয়ে ফিরে এলেন। একটা ইজিচেয়ারে বসে পায়ের উপরে একটা কম্বল চাপা দিয়ে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন ; তাঁর পরনে ছিল নীল রংয়ের সোয়েট শার্ট, ফ্লানেলের ট্রাউজার্স আর পায়ে চামড়ার চটি।

"তাঁর মুখের চেহারাটা", কোহেন লিখেছেন, "বেশ করুণ দেখাচ্ছিল, চামড়াতে ছিল অসংখ্য কুঞ্চন কিন্তু তাঁর চোখের দীপ্তিতে তাঁকে তরুণ বলেই মনে হয়। তাঁর চোখে প্রায় সব সময়েই জল পড়ত, এমন কি হাসবার সময়েও তিনি হাত দিয়ে চোখের জল মুছতেন।"

আইনস্টাইনের ইংরাজির দখলটা কোহেনের কাছে লক্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল ; আমেরিকাতে তিনি প্রায় বিশ বছর বাস করেছেন অথচ তিনি একটু থেমে থেমে নিম্ন স্বরে কথা বলেন কিন্তু হাসেন খুব জোরে।

সাক্ষাৎকারের বেশির ভাগটাই বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শন নিয়ে কাটল।

১ B. Cohen, op. cit., p. 73.

আইনস্টাইন তাঁর সঙ্গে মাখ-এর মূল পার্থক্যের কথা বললেন এবং আরও বিস্তারিতভাবে বললেন মাখ-এর সঙ্গে ভিয়েনাতে তাঁর সাক্ষাৎকার ও অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের আলোচনার কথা। আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন, "আজকের দিনে পদার্থবিদরা প্রায় সবাই দার্শনিক, যদিও তারা প্রত্যেকেই খারাপ দার্শনিক।" এর উদাহরণস্বরূপ তিনি মাখ-এর ছাত্রদের, বিশেষ করে 'ভিয়েনা গোষ্ঠী'র দ্বারা সমর্থিত 'যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদে'র উল্লেখ করলেন (ফিলিপ ফ্র্যাংক, মরিৎস সিল্ক, আর ক্যারনাপ, ও নিওরাথ এবং অন্যান্য)। মাখ-এর পালটা, তারা বিজ্ঞানে যৌক্তিক নির্মাণের কথা বলেছে, যেগুলির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ানুভূতির কোনো সম্পর্ক নেই অথচ মৌল দার্শনিক বিষয়ে তারা মাখকেই অনুসরণ করে এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পর্যবেক্ষণের পেছনে যে বিষয়মুখী বাস্তবতা রয়েছে তাকে অস্বীকার করে। সম্ভবত আইনস্টাইন এটা বেশ ভালভাবেই বুঝতেন যে, 'যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ' ও গোঁড়া 'মাখবাদ'-এর অথবা প্রত্যক্ষবাদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত নেই।

সাক্ষাৎকারের একটা বড় অংশ ছিল নিউটন ও তাঁর কাজ সম্পর্কে আলোচনা। কোহেন বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গির একটা বিশেষ দিক উল্লেখ করেছেন, যাকে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিকোণের মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। "আইনস্টাইন যেভাবে দেখেছেন," তিনি লিখছেন, "তাতে বিজ্ঞানের একটা অভ্যন্তরীণ অথবা স্বজ্ঞামূলক ইতিহাস আছে এবং একটা বাইরের অথবা দলিলভিত্তিক ইতিহাস আছে। শেষেরটা নিশ্চয়ই অনেক বেশি বিষয়মুখী কিন্তু আগেরটা অনেক বেশি আগ্রহোদ্দীপক।"

যুক্তিসিদ্ধ, অবচেতন ও একেবারে মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াশক্তির বিশ্লেষণের সাহায্যে আইনস্টাইন ইতিহাসের স্বজ্ঞাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, যেটা নিউটনকে শূন্য দেশ-এর মধ্যে দিয়ে দূরবর্তী ক্রিয়ার চিন্তা থেকে ইথারের ধারণার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। নিউটনের চিন্তা করার পদ্ধতিকে বোঝা যায়। কিন্তু, আইনস্টাইন বলেছেন, "প্রশ্ন হল কিভাবে অথবা সম্ভবত, কতটা পর্যন্ত কেউ এই ধরনের স্বজ্ঞাকে নথিবদ্ধ করতে পারেন।" আইনস্টাইন মনে করতেন, একজন ঐতিহাসিক একজন বিজ্ঞানীর ভেতরের চিন্তাকে ঐ বিজ্ঞানীর নিজের চাইতে অনেক বেশি ধরতে পারেন।

পদার্থগত স্বজ্ঞা বা অনুভূতি, যেটা আমরা আগে 'পদার্থবিজ্ঞানের বিবর্তন' বইটি প্রসঙ্গে বলেছি, এমন একটা ধারণার দিকে নিয়ে যায় যা কঠোর গাণিতিক

সম্পর্কগুলিকে আগে থেকে অনুমান এবং কখনও কখনও ব্যাখ্যাও করতে পারে। এইরকম ধারণা থেকেই দেখা দেয় 'ভাবধারার চমকপ্রদ সংঘাত।'

আইনস্টাইনের মতে আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই রকম ধারণাকে ও বিজ্ঞানের জগতে তাদের সংঘর্ষকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এমন কি যখন 'ভাবধারার চমকপ্রদ সংঘাতের' ঘটনাবলী কোনো মহাকাব্যিক ফলাফল সৃষ্টি করে না অথবা কোনো সংশয়াতীত, ঐতিহাসিকভাবে অপরিবর্তনীয় রূপ গড়ে তোলে না এবং একটা পরিণতিবিহীন অবস্থাতেই থেকে যায়, তখনও সেগুলি বিজ্ঞান-নির্ভর হয়েই বেঁচে থাকে।

আইনস্টাইন কোহেনকে এটা বলেছিলেন যে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়, যেসব বড় বড় সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে বলে মনে হয়, অথচ তারা আবার নতুন চেহারা নিয়ে ফিরে আসে। তাঁর মতে এটা সম্ভবত, পদার্থবিদ্যার বৈশিষ্ট্য এবং তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, কিছু মৌলিক সমস্যা হয়ত সব সময়েই আমাদের থাকবে।

আইনস্টাইন সমাধানের কথা বলেন নি, বলেছেন সমস্যা, বিরোধ, সংঘাত ও দ্বন্দ্বের কথা—এই সবই ইতিহাসকে নানা ভাবধারার চমকপ্রদ নাটকে পরিণত করে। কোনো এক যুগে একটা সমস্যার সমাধান হওয়া সত্ত্বেও যখন সেটার অস্তিত্ব থেকেই যায়, তখন বুঝতে হবে সমাধানটি মোটামুটিভাবে হয়েছে, এটা অস্থায়ী, আপেক্ষিক চরিত্রের। সমাধানটি একটা ইতিবাচক, ঐতিহাসিক-ভাবে অপরিবর্তনীয় (অর্থাৎ ইতিহাসের একটা সময়ে অপরিবর্তনীয়, কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে তা-পালটে যেতে পারে—অনুবাদক) উপাদান বিশ্ব-চিত্রের মধ্যে সঞ্চার করে, কিন্তু সমস্যাটাকে একেবারে দূর করে দেয় না; এ সমস্যাটাকে আরও প্রসারিত করে ও আধুনিক রূপে উপস্থিত করে এবং বিজ্ঞানে আবার ফিরে আসার মতো করে তাকে প্রস্তুত করে তোলে।

অ্যারিস্টটল সম্পর্কে লেনিনের মন্তব্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন দ্বন্দ্ব, অনুসন্ধান, নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া এবং যে জীবন্ত সত্তাকে ধ্বংস করা যায় না—এগুলিকে মধ্য যুগের অ্যারিস্টটলবাদী শুকনো পণ্ডিতরা নষ্ট করতে পারে নি।

একটা অণুর গতির অবস্থা বিচার করার জন্যে একটা সময়ে শুধুমাত্র তার অবস্থানকে বিচার করলেই চলবে না, পরন্তু সময় ও গতিবেগের পরিপ্রেক্ষিতে তার স্থানাঙ্কের স্বভাবটিও দেখতে হবে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগতি বিচার

করতে হলে এই চিন্তাটি কোন্ স্তরে পৌঁছেছে এবং কোন্ কোন্ সমস্যার সমাধান করেছে, শুধু সেটা দেখলেই চলবে না, তার গতি ও চ্যুতির মাত্রাটাকেও দেখাতে হবে। আর এরই অন্তর্ভুক্ত থাকে উত্তরের সঙ্গে জড়ানো নতুন প্রশ্ন, পুরোনো প্রশ্নের রূপান্তর ও প্রসারণ, এগুলি সব ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হয়। আর বিজ্ঞান কিছুটা উত্তর পেলেও এবং একটা স্তরে উত্তীর্ণ হলেও ঐ বিষয়গুলি জীবন্ত থাকে। সত্য বটে, গতিশীল অণুদের সঙ্গে বিজ্ঞান-চিন্তার তুলনা করাটা অনুচিত, কারণ শুধু বাইরের শক্তির প্রভাবেই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে এমন তো নয়, এর অনেকখানি অগ্রগতি হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে। কিন্তু তাহলে আমরা যতটুকু জানি, তাতে অণুদেরও একইভাবে চলতে হবে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসকে, এমনকি তার সর্বাপেক্ষা সুস্থির, আপাতদৃষ্টিতে স্বয়ংসিদ্ধ এবং মূলত অলঙ্ঘনীয় ধারণাগুলিকেও যদি সঞ্চয়, প্রসার এবং ভাবীকালের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হয় তাহলে ইতিহাসের অতীত স্মৃতিমন্থনের ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় বিগত যুগের পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা—যাঁরা প্রত্যেকেই যেন বহু যুগের ওপার থেকে আমাদের সম্বোধন করেন।

অ্যারিস্টটল, ডেমোক্রিটাস অথবা এপিকিউরাস-এর দৃষ্টিভঙ্গি যতোই প্রাচীন জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক না কেন, গতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিনাশ ও সৃষ্টির সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের সমস্যা আজও জীবন্ত আকারেই রয়েছে; ডেমো-ক্রিটাস-এর '—সত্যিকারের অ-সত্তা' শূন্যতা এখনও বাতিলযোগ্য নয়; নিরবচ্ছিন্ন গতি-সূত্রে এপিকিউরাস-এর 'কাইনিম্যা'কে রূপান্তরের সমস্যাটি এখনও বলবৎ রয়েছে। (১)

অতীতের এই জীবন্ত সংঘর্ষগুলি আমাদের জন্যে রয়ে গেছে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ধারা, গতি ও উত্থান-পতনের সঙ্গে এগুলি জড়িত। এই সংঘর্ষগুলি অবিনশ্বর।

এইভাবেই আইনস্টাইন পুরোনো জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে নিউটনকে বিচার করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর প্রতি

১ কাইনিম্যা—গ্রীক ভাষায় এর অর্থ গতি—এমন বিমূর্ত গতি যার সঙ্গে শক্তি বা ভর-এর কোনো সম্পর্ক নেই।—অনুবাদক।

যে একান্ত উৎসাহ বিজ্ঞানের ইতিবাচক উত্তরকে ইতিহাসের একটা পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলতে চায়, এই দৃষ্টিভঙ্গি তাকে বাধা দেয় না। আইনস্টাইন নিউটনের উদ্দেশে নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেন: "আপনার সময়ে যতটুকু সম্ভব ছিল সেইটুকুই আপনি করে গেছেন··· ।" কিন্তু নিউটনের সঙ্গে সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনার পরে এই কথাগুলি এসেছে এবং এটা শুরু হয়েছে ব্যক্তিগত নামে সম্বোধন জানিয়ে: "নিউটন, আমাকে ক্ষমা করবেন।"

আইনস্টাইন নিউটনকে সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁর ইতিবাচক সমাধান ছিল তাঁর নিজের এবং পরের দুই শতাব্দীর জন্যে। সপ্তদশ শতাব্দীতে যেসব সমস্যা, দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নের সমাধান করা যায় নি, সেগুলি মুলতুবি রয়েছে ভবিষ্যতের জন্যে। এই সমস্যাগুলি নিউটনকে অমরত্ব দিয়েছে এবং এর ফলেই মহাবিশ্বের সমস্যাবলী নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা যাচ্ছে, যেন তিনি জীবন্ত রয়েছেন এই রকম মনে করে।

যে মানুষ অমর কীর্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে, সে নিজেও অমরত্ব পায়। বিশ্বের অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আবিষ্কারকদের সঙ্গে আইনস্টাইনের জীবন্ত সহযোগিতার বোধ তাঁকে বাস্তবতার সেই মৌল নিয়মগুলির ছক সম্পর্কে একটা বিশেষ ধরনের নির্লিপ্তি এনে দিয়েছিল—যে নিয়মগুলির ছক তাঁর কলম থেকে বেরোতে পারত। তিনি জানতেন যে, একটা নির্দিষ্ট সমাধান হিসাবে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব দ্ব্যর্থহীন পদার্থগত তত্ত্বের মর্যাদা লাভ না করেই শেষ হয়ে যেতে পারে। তাঁর অনুসন্ধানের নজিরবিহীন তীব্রতা সত্ত্বেও আইনস্টাইন তাঁর পর্যবেক্ষণের বিতর্কমূলক চরিত্রকে একটা নিরুদ্বেগ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন। তিনি জানতেন যে, সমস্যাটির একদিন সমাধান হবে, তবে সেটা আবার বিজ্ঞানে জটিল রূপ নিয়ে ফিরে আসবে। একটা নির্দিষ্ট সমাধান হয়ত মিলিয়ে যাবে, কিন্তু সত্যটা টিকে থাকবে এবং চিরদিন তার প্রসারণ ঘটবে।

বিজ্ঞানটা তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল, তাই নিজের ভাগ্য, জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল বিজ্ঞান সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। ১৯৪৫ সালে তাঁর লেখা 'আত্মজীবনীমূলক নকসাতে' এবং ১৯৪৯ সালে লেখা 'শোকবার্তা'তে যতটা তাঁর জীবনের কথা

আছে তার চেয়েও বেশি আছে ভবিষ্যতের কথা। আগেই যেটা বলা হয়েছে, আইনস্টাইন কখনও নিজের জীবনকথা লিখতে আগ্রহী ছিলেন না। একবার একজন রবাহুত ব্যক্তি (এ রকম অনেকেই তাঁর কাছে আসত) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল: "আপনার মৃত্যুশয্যায় আপনি কি করে জবাব দেবেন যে, আপনার জীবনটা সফল না ব্যর্থ হয়েছে?" তাঁর স্বভাবসিদ্ধভাবে প্রশ্নটার মূঢ়তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি একটা সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন: "মৃত্যুশয্যাতেই হোক বা অন্য কোনো সময়েই হোক, এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আসলে আমি তো প্রকৃতিরই একটা ক্ষুদ্র কণা মাত্র।"(১)

মৃত্যুকে আইনস্টাইন কী চোখে দেখতেন তা অনেকের স্মৃতিচারণায় পাওয়া যায়। ১৯১৬ সালে আইনস্টাইন দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁর জীবন যথার্থই সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। রোগশয্যায় এলসার নিরন্তর সেবাযত্ন ছাড়া তিনি হয়তো আর সেরে উঠতেন না। এই অসুস্থতার সময়ে ম্যাকস বোর্ন-এর স্ত্রী হেডভিগ বোর্ন তাঁর কাছে আসতেন। আইনস্টাইন নিজেই তাঁর মৃত্যুর বিষয় নিয়ে হেডভিগের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। এত নির্লিপ্ত ও প্রশান্তির সঙ্গে আইনস্টাইন তাঁর মৃত্যুর কথা বলতেন যাতে শ্রীমতী বোর্ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন কি না। "না," তিনি জবাব দিলেন, "আমি নিজেকে সবকিছু জীবন্ত জিনিসের এমন একটা অংশ বলে মনে করি যাতে এই অনিঃশেষ প্রবাহের মধ্যে কোনো ব্যক্তির সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের শুরু বা শেষ আমাকে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন করে না।"(২)

এই কথাগুলি অবশ্যই কেবলমাত্র কথার কথা ছিল না। শ্রীমতী বোর্ন, যিনি আইনস্টাইনের হাস্যপরিহাস এবং ব্যক্তিগত ঠাট্টার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তিনি এই কথাগুলির চরম গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছিলেন। শ্রীমতী বোর্ন এর সঙ্গে তাঁর নিজের কিছু গভীর মন্তব্য যোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন, আইনস্টাইনের কথাগুলি মানবজাতির সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধেরই প্রকাশ, প্রকৃতির নিয়মগুলি অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি সারা জীবন ধরে এই একাত্মতার উপলব্ধি পোষণ করেছেন।

১ Helle Zeit, p. 27.
২ Ibid., p. 36.

আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক কীর্তির এবং জনসাধারণের সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গির সার কথাটি হেডভিগ বোর্ন বিস্ময়কর তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ব্যক্তিক সীমার বাইরে বেরিয়ে আসা', মহাবিশ্বের বিষয়মুখী নিয়মগুলির প্রতি ঔৎসুক্যটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে, জীবনের সমস্ত রকম অভিব্যক্তির সঙ্গে এবং যে-মানুষরা প্রজন্ম-পরম্পরায় প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তার ঘটায়, প্রকৃতির উপর তাদের ক্ষমতা প্রসারিত করে এবং মানব-গোষ্ঠীর যুক্তিসঙ্গত সংগঠনের দিকে নজর দেয়—তাদের সবার সঙ্গে একটা একাত্মতাবোধের সৃষ্টি করে। মানুষ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেন তাঁর মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত হতো, হৃদয় থেকে নয়। এটা ছিল তাঁর মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পরিপূর্ণ ঐক্যতানিক প্রকাশ। একবার ইনফেল্ডের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন :

"জীবনটা বড় রোমাঞ্চকর খেলা। আমি তাকে উপভোগ করি। এ একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কিন্তু আমি যদি জানতে পারতাম যে তিন ঘণ্টার মধ্যে আমার মৃত্যু হবে, সেটাও আমাকে এমন কিছু বিচলিত করতে পারত না। তখন আমি ভাবতাম এই শেষ তিনটি ঘণ্টা কী করে ভালভাবে কাজে লাগানো যায় আর তারপর আমি আমার কাগজপত্র গোছগাছ করে নিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়তাম।"(১) আইনস্টাইনের দু'হাজার বছর আগে আর একজন দার্শনিক, যাঁর ভাগ্যে জুটেছে মানুষের ব্যক্তিগত সুখের প্রবক্তা হওয়ার বদনাম, মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে গিয়েছেন। মেনেকিউস-কে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে এপিকিউরাস মৃত্যু-ভয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি হাজির করেছেন : "মৃত্যু-ভয় বারবার দেখা দেয় কিন্তু যখন আমরা বেঁচে আছি তখন মৃত্যু নেই, আবার যখন মৃত্যু আছে, তখন আমরা নেই। ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সীমা পেরিয়ে যাদের উপলব্ধি প্রসারিত হয় তারা কম-বেশি পরিমাণে এই যুক্তির সারবত্তা বুঝতে পারে। এপিকিউরাস তাঁর মৃত্যু-মুহূর্তে গরম জলে স্নানের কথা বলেন আর সেই সঙ্গে আনতে বলেন নির্ভেজাল মদ, তিনি তাঁর শেষ চিঠিতে মৃত্যু দিনটিকে জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন বলে অভিহিত করেছেন কারণ এই জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছে দার্শনিক আলাপ-আলোচনায়। এপিকিউরাসবাদের অথবা এপিকিউরাস-এর স্নান ও মদের চিন্তার থেকে আইনস্টাইনের মতো

১ L. Infeld, op. cit., p. 294.

দূরে-থাকা মানুষ কমই পাওয়া যাবে। কিন্তু গ্রীক-জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গির সুষমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর এই রকম মানুষও বিশেষ পাওয়া যাবে না।

কোহেন যখন ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে তাঁর কাছে যান তখন তিনি বেশ ভালো বোধ করছিলেন। কয়েকদিন পরে প্রিন্সটন-এর এক বন্ধু (কোহেন তাঁর নাম করেন নি) আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর কন্যা মারগোকে দেখতে হাসপাতালে যান, মারগো তখন সায়াটিকাতে ভুগছেন। তাঁরা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করেন, সেই সময়ে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। আইনস্টাইনের সঙ্গী মন্তব্য করেন যে, মৃত্যুটা তাঁর কাছে একদিকে একটা বাস্তব ঘটনা, অন্যদিকে আবার রহস্যও। এর সঙ্গে আইনস্টাইন যোগ করলেন, "আর নিষ্কৃতিও বটে।"

এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আইনস্টাইন জীবনকে ভালোবাসতেন, তবুও এর বহু বছর আগে তিনি সোলোভিনকে লেখা একটা চিঠি শেষ করছেন এই বলে: "মৃত্যুও কিন্তু ততটা খারাপ নয়।"(১) এটা জীবনের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, এটা জীবনকে অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' জীবনের প্রতি ভালোবাসা; এটা ছিল গ্রীক সুষমার চোখে জীবনকে দেখা, কিন্তু এ এমন একটা মহান যুগের অন্তর্গত, যখন মানব-জাতি ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'ব্যক্তিক সীমা-বহির্ভূত' সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

এক সপ্তাহ পরে, ১৩ই এপ্রিল, আইনস্টাইন তলপেটের ডানদিকে একটা তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন। ডাক্তাররা দেখে বললেন, পিত্তথলির স্ফীতি ঘটেছে। হাসপাতালে তাঁরা অপারেশন করতে চাইলেন, কিন্তু আইনস্টাইন রাজি হলেন না। ঐ একই হাসপাতালে মারগোও ছিল। ১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা মারগোকে আইনস্টাইনের শয্যার পাশে আনা হল হুইল চেয়ারে করে। তিনি ভালো বোধ করছিলেন, মারগোর সঙ্গে কথা বললেন এবং তাকে বিদায় জানালেন। হেলেন ডুকাস এর আগেই হাসপাতাল থেকে চলে গিয়েছিলেন। মধ্যরাত্রের কিছু পরে নার্স অ্যালবেরতা রোসাংজেল দেখলেন যে, আইনস্টাইন ঘুমের মধ্যে দারুণ জোরে নিঃশ্বাস ফেলছেন। তিনি তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার ডাকতে দরজার কাছে গেলেন। হঠাৎ

১ Solovine, p. 71.

আইনস্টাইন কয়েকটি শব্দ জার্মান ভাষায় বিড়বিড় করে বললেন। নার্স রোসাংজেল কথাগুলি বুঝতে পারলেন না এবং তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে গেলেন। তখন রাত্রি ১টা বেজে ২৫ মিনিট হয়েছে এবং আইনস্টাইন আর নেই। পরে পোস্ট মর্টেমে দেখা গেল তাঁর তলপেটের কাছে ধমনীতে রক্তক্ষরণ হয়েছে।

সকাল বেলা আইনস্টাইনের উইলটি পড়া হল। তাঁর অনুরোধ ছিল যে, তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যেন কোনো রকম ধর্মীয় আচার বা সরকারি অনুষ্ঠান না করা হয়। কয়েকটি মাত্র নিকটবন্ধু ছাড়া আর সকলের কাছ থেকেই যেন তাঁকে কোথায় কখন সমাহিত করা হবে তা গোপন রাখা হয়; একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই তাঁর দেহকে দাহনচুল্লীতে ঢুকিয়ে দেবে।

দুনিয়ার সাধারণ লোক সর্ব দেশেই তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছিল। লিওনিদ আন্দ্রেয়িএভ্ যেমন তাঁর রূপক রচনা 'গ্যালিভারের মৃত্যু'তে লিখেছিলেন, (লেখাটা ছিল লিও তলস্তয়ের মৃত্যু উপলক্ষে) গ্যালিভার যখন বেঁচে ছিলেন তখন লিলিপুটরা রাত্রে তাঁর হৃদস্পন্দন শুনতে পেত। আইনস্টাইন সম্পর্কেও ঠিক এই কথা বলা যায়। তাদের মধ্যে এই রকম একজন মানুষ বাস করছেন—এই ধারণাটাই জনগণকে যুক্তির শক্তি ও অমরত্ব সম্বন্ধে আস্থাবান করে তুলত। এখন সেই বিরাট মনীষার হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত মানুষের কাছে অপূরণীয় ক্ষতির এই উপলব্ধি এর আগে শুধুমাত্র বড় রাষ্ট্রনায়ক বা খ্যাতিমান লেখকদের ক্ষেত্রেই অনুভূত হয়েছে। এই প্রথম জনগণ একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর মৃত্যুতে এই রকম বোধ করল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অমরত্ব

> মৃত্যুকে কি তুমি ভয় করো? তুমি কি অমর হতে চাও? পুরো অস্তিত্ব নিয়ে থাকবে! তুমি হয়তো মারা যেতে পারো কিন্তু জীবন বরাবরের মতো চলবে।
>
> শিলার

> বাঁচা মানে বদলে যাওয়া এবং কাগজে লিপিবদ্ধ আমাদের ভাবনাচিন্তাগুলির মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থাও ঐ একই নিয়ম মেনে চলে: তারা বেঁচে থাকে, অনবরত পরিবর্তন হয়; যখন তারা আমাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে বাইরে প্রকাশ পেয়েছিল, ক্রমশই তারা তখনকার সেই অবস্থা হারাতে থাকে।
>
> আনাতোল ফ্রান্স

পদার্থবিজ্ঞানের যে অমীমাংসিত সমস্যা আইনস্টাইন বিংশ শতাব্দীকে দিয়ে গেলেন সেটা হচ্ছে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং সংশ্লিষ্ট কোয়ান্টাম-উত্তর নিয়মাবলী—যারা বিভিন্ন ক্ষেত্র-এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতে অতি-আপেক্ষিকতাবাদী ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞান এই উত্তরাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না; আইনস্টাইনের ধারণার অনুসন্ধান, দৃষ্টিভঙ্গি ও অসুবিধাগুলি বিজ্ঞানে বারবার দেখা দেবে, ঠিক যেমন অতীতের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান ও অসুবিধার ব্যাপারটা বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে। কিন্তু অমীমাংসিত সমস্যার সঙ্গে আইনস্টাইনের উত্তরাধিকারের মধ্যে রয়েছে

দ্ব্যর্থহীন পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব, বিশেষ করে আপেক্ষিকতাবাদের অর্জিত মূল্যবান সম্পদ।

যে সব পণ্ডিত জগতের একটা ঐক্যবদ্ধ চেহারা উপস্থিত করতে চান, আমাদের কাজ হচ্ছে এটা দেখা যে এই চেহারাটা কী করে সীমানা রেখে চলবে, এবং তার দ্বারা তাঁদের সৃজনশীল কীর্তির সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব। নিউটনের ক্ষেত্রে এই সীমানাগুলি নির্ধারিত হয়েছিল আলোক-বিকীরণের সঙ্গে গতির অসামঞ্জস্য থেকে এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিতে উত্তরণের দ্বারা। এই গতিগুলির ক্ষেত্রে নিউটনের নিয়মগুলি, বিশেষ করে গতিবেগকে যুক্ত করার ধ্রুপদী নিয়ম, যথেষ্ট পরিমাণে সঠিক ছিল না। এখানে আমরা নিউটোনীয় বলবিদ্যার সীমানা পার হয়ে যাই। আইনস্টাইনের বলবিদ্যারও সীমানা আছে। কিন্তু আইনস্টাইন ও নিউটনের ঐতিহাসিক কীর্তিকে ইতিবাচক পদার্থগত পদ্ধতিতে পর্যবসিত করা ভুল হবে। এগুলিও দুনিয়ার সব কিছুর মতোই জন্মায়, পুষ্ট হয়ে ওঠে ও মারা যায়। বিজ্ঞানের প্রতিভাধর ব্যক্তিরা অবিনশ্বর সম্পদ সৃষ্টি করেন। অর্জিত এই সম্পদ হল ঘটনাবলীর সামান্যীকরণ। ঘটনাবলীর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সব সময়েই তাদের যাথার্থ্য বজায় থাকে, তাদের আরও সামান্যীকরণ করা যায়, আরও নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায় এবং অন্যান্য ঘটনাকে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিশদ করে তোলা যায়। তাদের কখনও বর্জন করা যায় না। যেসব বস্তু আলোর গতিবেগের তুলনায় আস্তে চলে, নিউটনের তত্ত্ব তাদের সম্পর্কে সব সময়েই খাটবে। যে সকল বস্তুর মহাকর্ষজনিত ক্ষেত্র নগণ্য, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সেই গতিশীল বস্তু-জগতের যথার্থ প্রতিবিম্ব হিসাবে বরাবরই থেকে যাবে। মহাকর্ষের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে গতিশীল অপরিবর্তনীয় বস্তু-জগতের যথার্থ চিত্রকে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সব সময়েই উপস্থিত করবে।

বিশ্বের একটা ছবি থেকে অন্য ছবিতে যেতে বিজ্ঞানের সর্বাধিক মর্মের মধ্যে কিছু বিশেষ ধরনের নিত্যতা পাওয়া যায়—সেটা অপরিবর্তনীয় ও মৃত্যুহীন। পরিবর্তন-প্রক্রিয়া অবিনশ্বর। প্রকৃতিতে এটা ঘটে বস্তুর রূপ-বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। আর বিজ্ঞানে এটা ঘটে একটা মৌল ধারণাকে কেন্দ্র করে ইতিবাচক মতামতের চিরন্তন বিবর্তন-ধারার মধ্যে। এই ধরনের ধারণার সবচেয়ে সাধারণ বিষয় হল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারণ সম্পর্ক আর এটা হল বস্তুর শাশ্বত বিবর্তন-প্রক্রিয়ার প্রতিফলন। এটা

কখনও মিলিয়ে যায় না আবার কখনও সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত চেহারা নেয় না, প্রতিটি নতুন বিশ্ব-চিত্রে নতুন উপাদানের সংযোজন ঘটায়। কার্যকারণ সম্পর্কের ঐক্যবদ্ধ, অপরিবর্তনীয় ধারণাটির সমৃদ্ধিসাধন ও বিশদ রূপদান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের একটা শাশ্বত অবদান।

এই ধরনের অবদান কোন্ ক্ষেত্রে কাজে লাগবে সে সম্পর্কে অনবহিত থেকেও এটা করা হতে পারে। অনেক বৈজ্ঞানিকই তাঁদের আবিষ্কারের ফলাফল উপলব্ধি না করেই কার্যকারণ-সম্পর্কের সূত্রটির বিকাশ ঘটান, নির্দিষ্ট রূপ দেন ও সমৃদ্ধি সাধন করেন। আইনস্টাইন এই গোত্রের মানুষ ছিলেন না। তিনি জানতেন যে, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির কার্যকারণ-সম্পর্কের ব্যাখ্যাকে মহিমান্বিত করে তোলার অর্থ হল বিজ্ঞানের মৌল, ঐতিহাসিক-ভাবে অপরিবর্তনীয় ভিত্তিকে শক্তিশালী করার কাজে নিয়োজিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেই সমৃদ্ধ করে তোলা।

এটা নয় যে, পরীক্ষার দিক থেকে গ্রাহ্য ও প্রযুক্ত তত্ত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের মধ্যে স্থান পায়। কিংবা বিজ্ঞানের 'সুস্পষ্ট সম্পদ'কে অমীমাংসিত সমস্যাগুলি থেকে আলাদা করা যায়। প্রতিটি নতুন ইতিবাচক তত্ত্ব, প্রতিটি ইতিবাচক সমাধান অসংখ্য নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়, বস্তুত যতগুলি প্রশ্নের এ সমাধান করে, তার অনেক বেশি নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি করে। নতুন তত্ত্ব একটা রক্ষণশীল ব্যাখ্যা হাজির ক'রে, নতুন প্রশ্ন, অসুবিধা ও দ্বন্দ্বগুলিকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। নবোদ্ভূত সমস্যাবলী তত্ত্বের অনিবার্য বিবর্তনে ও জীবন্ত অমরত্বের ক্ষেত্রে অবদান রাখে—যা কিনা প্রতিটি জৈব দেহের সহজাত বৈশিষ্ট্য; যদিও এই অমরত্ব শ্বেত-পাথরের মূর্তির অমরত্বের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

আপেক্ষিকতা বিজ্ঞানের 'সুস্পষ্ট সম্পদগুলি'র অন্তর্ভুক্ত: যেমন, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ধ্রুপদী তাপগতিশীলতার মতোই সম্পূর্ণ ও দ্ব্যর্থহীন। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ যদিও এখনও অনুরূপ সম্পূর্ণতা অর্জন করে নি, তবুও এটা মহাকর্ষ-তত্ত্বের একটা যৌক্তিক পরিণতি সূচিত করে। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদ কণাদের রূপান্তরের সমস্যা, ক্ষেত্র-এর পারস্পরিক ক্রিয়ার সমস্যা, বস্তু ও বিকীরণের পরমাণুভিত্তিক কাঠামো থেকে (এবং সম্ভবত দেশ-কাল-এর পরমাণুভিত্তিক কাঠামো থেকেও) আপেক্ষিকতার প্রতিপাদ্য আহরণের সমস্যাকে (মাপবার যন্ত্র ও ঘড়িগুলির আচরণের তারতম্য-সংক্রান্ত

বিবৃতি) বিজ্ঞানের সামনে তুলে ধরেছে। মাইকেলসন-এর পরীক্ষা থেকে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিল সেই তুলনায় এই সমস্যাগুলি আরও অনেক বেশি, জটিল ও তীব্র (স্মরণ করা যেতে পারে, আপেক্ষিকতাবাদী নিয়মগুলির তুলনায় কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া থেকে অফুরন্ত শক্তি পাওয়া যায়)।

কোয়ান্টাম-আপেক্ষিকতার সমস্যাগুলির বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্ত ধরনের।

বর্তমান তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যার অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যে ১৯৬০-এর দশকে বিশ্ব-চিত্রের আমূল সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কেউই আর প্রশ্ন তুলতে পারে না। বস্তুত, আমাদের সময়ে 'বিশ্ব-চিত্রের আমূল সংশোধনের' অর্থটাই পালটে যাচ্ছে।

তিন শতাব্দী কিংবা আরও একটু বেশি সময় ধরে সূর্যকেন্দ্রিক বিপ্লবকে বিশ্ব-চিত্রের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বলে গণ্য করা হতো। আসলে বিশ্ব-চিত্রের আরও সর্বজনীন পরিবর্তনের—এর প্রাথমিক ভাবমূর্তির রদবদল ঘটাবার এটা ছিল সূচনা মাত্র। সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিতরা অ্যারিস্টটল-এর দার্শনিক পরিভাষা 'সত্তা', 'অসত্তা' ও 'গুণাত্মক গতি'কে এমনভাবে গণ্য করতে শুরু করেছিলেন যেন তারা বিশুদ্ধ যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং এগুলি যেন অপরিবর্তনীয় বস্তুর সরল স্থানচ্যুতির গৌণ ফল। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যাকে শেষ পর্যন্ত সমরূপ বস্তুর আপেক্ষিক অবস্থান ও পারস্পরিক স্থানচ্যুতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

বিদ্যুৎগতিবিদ্যা এই ধরনের 'ধ্রুপদী আদর্শে' একটা সংকট এনে দিল এবং তাকে কাটানো গেল পরস্পরের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে গতিশীল কাঠামোগুলিতে আলোর গতিবেগের নিত্যতা-সংক্রান্ত স্ববিরোধী ধারণার দ্বারা।

উনবিংশ শতাব্দীতে এমন একটা ধারণা পেশ করা হল—যা পুরানো ধারণার সঙ্গে আরও বেশি করে বিচ্ছেদ ঘটাল। এতদিন যে সম্পর্কগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হতো (পৃথিবীর যে নিশ্চলতাকে মানুষ প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'স্বতঃসিদ্ধ' মনে করত, শুধু সেই অর্থেই নয়) অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সেখানে হস্তক্ষেপ করল। ইউক্লিডের জ্যামিতিকে মনে হয়েছিল যুক্তির ও স্বতঃসিদ্ধতার দিক থেকে ঠিক আছে। রুশ গণিতজ্ঞ ভি. এফ. কাগান লোভাচেভস্কি-র অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির শতবর্ষ পালন উপলক্ষে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় বলেছিলেন: "মনে হয়েছিল যে,

পৃথিবীকে নড়ানো সোজা কিন্তু একটা ত্রিভুজের তিনটি কোণকে সরানো, সমান্তরাল রেখাগুলিকে এক জায়গায় মিলিয়ে দেওয়া অথবা একই লাইনের বিভিন্ন লম্বকে নানামুখী করা সোজা নয়।"

লোভাচেভস্কি ও রিম্যান অ-ইউক্লিডীয় সম্পর্কের মধ্যে আসল চরিত্রকে ধরা কত কঠিন তা বলেছিলেন; কিন্তু আইনস্টাইনের আগে যুক্তির দিক থেকে সম্পূর্ণ এরকম কোনো মতবাদ ছিল না, যেটা এই সম্পর্কগুলিকে বিশেষ ও সুনিশ্চিত পদার্থগত তত্ত্ব বলে গণ্য করবে। আইনস্টাইন যখন অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিক সম্পর্কগুলির অনুরূপ একটা দ্ব্যর্থহীন পদার্থগত সম্পর্ক বার করলেন, তখন তিনি 'একটা নতুন বিশ্ব-চিত্র' কথার অর্থটাই পালটে দিলেন।

আজকের দিনে এই ধরনের বদলের কথা বলতে শুধু দেশ-এ গতিশীল বস্তুর একটা নতুন গতিবিদ্যার ছকই বোঝায় না, পরন্তু তা থেকে দেশ-এরই একটা নতুন ও জ্যামিতিক ব্যাখ্যায় উত্তরণও বোঝায়।

'একটা নতুন বিশ্ব-চিত্র' কথাগুলির আরও বেশি মৌলিক ব্যাখ্যার বীজ আপেক্ষিকতার মধ্যেই ছিল। অসম্বদ্ধ দেশ-কালের কোষগুলির মধ্যে প্রাথমিক কণাগুলির রূপান্তরণ-সংক্রান্ত মৌল ধারণার সাহায্যে কোনো বিশ্ব-চিত্র গড়তে হলে নতুন যুক্তিবিদ্যার পত্তন করতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে যুক্তি-ভিত্তিক অনুমান-চিন্তার নতুন রীতি-পদ্ধতি। আজকের দিনে বিশ্ব-চিত্রের পরিবর্তনের অর্থ নিছক গতিশীল বস্তুর একটা নতুন গতিবিদ্যা নয়, নিছক একটা নতুন জ্যামিতিশাস্ত্র নয়; এটার অর্থ নতুন যুক্তিবিদ্যা সৃষ্টি করা। এটা আর একটা বড় ধরনের 'পাগলামি', পুরোনো রীতি-পদ্ধতির খোল-নলচে পালটে নতুন নীতি প্রণয়ন করা।

বিজ্ঞানের প্রগতি কেবলমাত্র বিশ্বের সম্বন্ধে গুটিকয়েক নির্দিষ্ট ধারণার 'পরে ভিত্তি করেই চলে না, এটা ঐ ধরনের ভিত্তির 'পরে নির্ভর করেই শেষ হয়ে যায় না অথবা ঐ ধরনের বিকাশের সম্পূর্ণতা ও সামগ্রিকতার মধ্যেও এটা সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের প্রগতি কেবলমাত্র জ্ঞানের স্তর দিয়ে পুরোপুরি মাপা যায় না অথবা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ স্তর থেকে কোন জ্ঞানটা আগে বা পরে পাওয়া যায়, তা দিয়েও নয়। যেটা বদল হয়, সেটা হল এমন একটা 'গুণগত' পরিবর্তন যাতে নতুন ধারণায় উত্তরণটা হয় আরও প্রচণ্ড রকমের, আরও সর্বজনীন, আপাত-বিরোধী, আরও 'উন্মত্ত' প্রকৃতির—এই রকম রদবদলের ক্ষেত্রে এই কথাগুলির মানেই পালটে যায়। একটা ঘূর্ণ্যমান

পৃথিবীর গতিশীল 'পাগলামি' থেকে অ-ইউক্লিডীয় মহাবিশ্বের পদার্থগত-জ্যামিতিক 'পাগলামি' এবং তা থেকে আজকের দিনের কোয়াণ্টাম-আপেক্ষিকতাবাদী ক্ষেত্র-তত্ত্বের যৌক্তিক আপাত-বিরোধী সংঘাত। বৈজ্ঞানিক প্রগতির ধারাবাহিকতার কোনো নতুন যোগসূত্র যতই স্বাভাবিক ও 'স্বতঃসিদ্ধ' হোক না কেন, এই যোগসূত্রটি তার সাহসিকতা ও স্বাধীন গতিবিধির অনপনেয় স্বাক্ষর রেখে যায়। বিজ্ঞান যখন টলেমিক ব্যবস্থার নরকেন্দ্রিক স্বতঃসিদ্ধতা থেকে সরে এসেছিল, তখন বিজ্ঞান অন্যান্য পরমধর্মী 'স্বতঃসিদ্ধতা'কেও বর্জন করার শিক্ষা পেয়েছিল। সেটা আর কখনও ফিরে আসতে পারে না। বিজ্ঞান যখন একবার বিভিন্ন জ্যামিতি নিয়ে মহাবিশ্বকে বোঝাতে আরম্ভ করল, সে তখন আর ইচ্ছা করলেও আগের পরমধর্মী, পূর্বতঃসিদ্ধ জ্যামিতির ধারণায় ফিরে যেতে পারে না। এখন যেহেতু কোয়াণ্টাম ক্ষেত্র-তত্ত্বের বিভিন্ন পদার্থগত অবস্থায় তর্ক-শাস্ত্রসম্মত যুক্তিদানের নানা ধরনের পদ্ধতি প্রযুক্ত হচ্ছে, তখন আর বিজ্ঞান কোনো পরমধর্মী যুক্তি-পদ্ধতিতে ফিরে যেতে পারবে না। সত্যের অন্বেষণে বেরিয়ে বিজ্ঞান একই সঙ্গে যেমন নতুন নতুন জয়-পতাকা অর্জন করে, তেমনি নতুন ধরনের অস্ত্রও তার অধিগত হয়।

এই দিক থেকে দেখতে গেলে আইনস্টাইনের কাজ বিজ্ঞানকে দ্রুত অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে ওঠার প্রেরণা যুগিয়েছে। আইনস্টাইনের পরে শুধু যে জনসাধারণই মহাবিশ্ব সম্পর্কে বেশি জেনেছে তাই নয়, পরন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পদ্ধতিও পালটে গেছে। আইনস্টাইনের চিন্তাধারা পরীক্ষাগত ও গাণিতিক আপাত-বিরোধী পদ্ধতির সমন্বয় ও প্রত্যাখ্যান; আর এটা ঘটেছে একটি মাত্র তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে, পরীক্ষামূলক স্বতঃসিদ্ধতা (কোপারনিকাস-এর উত্তরাধিকার অনুযায়ী) এবং অভ্যাসগত (যেন গাণিতিকভাবে পূর্বতঃসিদ্ধ) ও যৌক্তিক রীতিপদ্ধতির কাঠামোর মধ্যে। বিজ্ঞানের চিন্তা-পদ্ধতির 'পরে এই প্রভাবটাকে আর বিপরীতমুখী করা যাবে না, এই ছাপটা চিরদিনের জন্যে বজায় থাকবে। সত্যের কাছাকাছি হওয়ার জন্যে বিজ্ঞানের অপরিবর্তনীয় যোগসূত্রগুলির মতোই আইনস্টাইনের ধারণাগুলি অমর। কারণ সেগুলি বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতিকে এমনভাবে পালটে দিয়েছে যাকে আর বিপরীতমুখী করা সম্ভব নয়।

একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অমরত্ব শুধু তার প্রদত্ত উত্তরগুলি থেকেই, যে

সমস্যা সে সামনে এনেছে তা থেকেই এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে সে যে প্রভাব ফেলেছে, শুধু তা থেকেও উদ্ভূত হয় না। বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয় অন্তর্নিহিত প্রেরণাদায়ক শক্তি ও জনগণের চিন্তার সঙ্গে জীবন্ত সাযুজ্যের মাধ্যমে, যার 'পরে বিজ্ঞান তার প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। একটা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা তখনই ঐতিহাসিক গুরুত্ব পায় যখন ইতিহাসগতভাবে যে পরিস্থিতি থাকে তার উপরে এবং জনগণের জীবন, কাজ ও আত্মচেতনার উপরে তার প্রভাব পড়ে।

যে সঠিকতা ও সামগ্রিকতার সঙ্গে এঙ্গেলস সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সামাজিক প্রভাব বিচার করেছেন, এখানে সেটা স্মরণ করা যেতে পারে। বিজ্ঞান ও দর্শনের মিলনের ফল হল মহান ফরাসি বিপ্লব। আইনস্টাইনের দার্শনিক সামান্যীকরণের ফলাফল কী? নতুন পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে ১৯০৮ সালে লেনিন এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন: আধুনিক পদার্থবিদ্যা ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের জন্ম দিচ্ছে।(১) পদার্থগত ঘটনাবলীর বস্তুগত কার্যকারণ-সম্পর্কের গভীরে অনুপ্রবেশ করে, কার্যকারণ-সম্পর্কের সঠিক উপলব্ধির বিস্তার ঘটিয়ে এবং সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ মতান্ধতাবিরোধী অবস্থান নিয়ে আপেক্ষিকতাবাদ লেনিনের ঐ সূত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়।

পুরানো ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পদার্থগত তত্ত্বগুলিকে এখন নির্দিষ্ট পদার্থগত ধারণাগুলির বিরুদ্ধে চালাতে হবে: চালাতে হবে আগেকার দিনের 'উঁচু' ও 'নীচু'র পরম ধারণার বিরুদ্ধে, পৃথিবীর চেহারার চরম অনড়তার বিরুদ্ধে, অনন্ত গতির চলমান সম্ভাবনার বিরুদ্ধে। পরম দেশ ও কালের ধ্রুপদী ধারণা দূর করার জন্যে আপেক্ষিকতা শুধুমাত্র যে বিশিষ্ট পদার্থগত ধারণার (স্থিতিশীল ইথার ইত্যাদি) বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে তাই নয় পরন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গোঁড়ামির মনোভাব এবং খোদ মতান্ধতার বিরুদ্ধেই তাকে অভিযান চালাতে হয়েছে। আলোর গতিবেগের নিত্যতার সূত্র, ভর ও শক্তির নতুন তত্ত্ব, ত্বরণ ও মহাকর্ষের তুল্যাঙ্কতার সূত্র, দেশ ও কালের বক্রতার ধারণা— এই সবগুলি গোঁড়ামি-বিরোধী, মূলত বৈজ্ঞানিক সামান্যীকরণের ধারাবাহিক পথপরিক্রমা হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জিত হতে পারত না। এ এমনই একটা বিপ্লবী পথ (যা স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলিকে আপাতবিরোধীভাবে ধ্বংস করেছে) যা সচেতন ও সুসঙ্গতভাবে মতান্ধতাকে খণ্ডন না করে অগ্রসর

১ V. I. Lenin, Collected Works, Moscow, Vol. 14, 1962, p. 313.

হতে পারত না। এজন্যেই আইনস্টাইনের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অবস্থানগুলি আপেক্ষিকতার ইতিবাচক প্রভাবের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়, তত্ত্বের যে কোনো সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যার মধ্যেই এটা দেখতে পাওয়া যায়; একে ঐতিহাসিক দিক থেকে আলোচনা করলে আরও পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আইনস্টাইনের জীবন-ইতিহাসেও যে-কেউ এটা দেখতে পাবেন। গোঁড়ামির ব্যাপারে আইনস্টাইনের অবস্থানটি একাধারে ছিল ঘটনাবলীর চাক্ষুষ 'স্বতঃসিদ্ধতার' বিরুদ্ধে (এই চাক্ষুষ স্বতঃসিদ্ধতা প্রত্যক্ষবাদী 'বিশুদ্ধ বর্ণনার' ভিত্তি যোগায়) এবং অন্যদিকে যৌক্তিক 'স্বতঃসিদ্ধতা'র পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণার বিরুদ্ধে। এই ধরনের অবস্থান নিশ্চয়ই 'অকার্যকর' হতে পারে না, কারণ এটা বিজ্ঞানের নিরন্তর নবায়মানতার প্রকাশ। আপেক্ষিকতা সাধারণভাবেই সেই সকল সামাজিক শক্তির ভাবাদর্শগত হাতিয়ার—যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জ্ঞানের ক্লান্তিহীন, চিরবিকাশমান পথ থেকে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অপসারণ করা এবং প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তার করা।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে প্রায়োগিক মূল্য দিয়ে আমরা কী বোঝাতে চাই?

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের পরিণতি ঘটেছিল যন্ত্রশিল্পের উৎপাদনের মধ্যে এবং তার থেকে নতুন সামাজিক অবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। আপেক্ষিকতার ব্যবহারিক প্রয়োগ পারমাণবিক যুগের পত্তন করেছে। পরমাণু শক্তি ও আনুষঙ্গিক যা কিছু—পারমাণবিক অ্যালকেমি থেকে সাইবারনেটিকস পর্যন্ত—শুধুমাত্র বিজ্ঞানের প্রয়োগ নয়—আসলে এটাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত সব রকমের পরীক্ষা আজ মহাকাশ গবেষণায়, পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর নির্মাণ ও ব্যবহারে, সাইবারনেটিকস-এর উদ্ভাবনা ও প্রয়োগের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। যন্ত্রশিল্পের কাজ এখন আর শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ ধরনের চালু যন্ত্রপাতি তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, দ্রুত নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। উৎপাদনকে কেবলমাত্র তার মাত্রার সাহায্যে বিচার করা হয় না, পরন্তু তাকে বিচার করা হয় শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির মাত্রার দ্বারা। কারখানার বিভিন্ন বিভাগ, এমন কি বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও (যেমন, মহাকাশ গবেষণার যন্ত্রপাতি) গবেষণাগারে পরিণত হচ্ছে আর অনুরূপভাবেই গবেষণাগারগুলি হয়ে দাঁড়াচ্ছে কারখানার বিভাগ।

সামনের দিকে তাকিয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ধারণাগুলির ব্যাপক ব্যবহারকে লক্ষ্য করে এটা দেখা যাচ্ছে যে, পারমাণবিক যুগের ভিত্তি-হল মাইক্রোস্কোপিক ও আধা-মাইক্রোস্কোপিক জগতের সমস্যায় আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োগ, এই জগৎ পরমাণু-কেন্দ্রকের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ও মৌল কণাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটাই হচ্ছে আপেক্ষিকতার সেই দিক, যেটা ভবিষ্যতের অভিমুখী, প্রাথমিক কণা ও ক্ষেত্রদের একীভূত তত্ত্বের দিকে ঘোরানো এবং এই দিকটি কোয়ান্টাম ও আপেক্ষিকতাবাদী নিয়মাবলীর আরও সুসঙ্গত একীকরণ ও সামান্যীকরণের ভবিষ্যতের উপাদান।

বর্তমান পদার্থবিদ্যা অত্যন্ত বিমূর্ত প্রবণতা নিয়ে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হচ্ছে, এ এমন প্রবণতা যেটা প্রয়োগক্ষেত্র থেকে বহু দূরে, এমনকি দ্ব্যর্থহীন পদার্থগত তত্ত্বের অবস্থা থেকেও বহু দূরে। আইনস্টাইন ১৯৩০-এর দশক থেকে তাঁর জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করেছিলেন, বিজ্ঞানের এই বর্তমান প্রবণতা সেই মেজাজের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

এই সকল নানা ঝোঁকের দ্ব্যর্থহীন, পরীক্ষিত ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রূপ সম্ভবত ব্যাপকতম শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ-কর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং এই শিল্পগত প্রয়োগ এমন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকবে যা কণাগুলির অভ্যন্তরীণ শক্তির সঙ্গে অন্যান্য শক্তির মুক্ত হওয়ার পদ্ধতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে। শক্তির উৎসগুলির ও নির্গতশক্তির এই সুসংহত প্রয়োগ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনের (অটোমেশন) প্রয়োজনীয়তাকে এমন মাত্রায় নিয়ে যাবে যা বর্তমানে সাইবারনেটিকস-এ অর্জিত হয়েছে। এই ধরনের অটোমেশন, যার মধ্যে উন্নত পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় উত্তরণের ব্যবস্থা রয়েছে, তথ্য-বিশ্লেষণ ও তথ্য-সরবরাহের জন্যে কম্পিউটার ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত হয়েছে। পরমাণু যুগ যখন তার প্রাথমিক স্তর কাটিয়ে উঠবে, তখন ঐ ধরনের অটোমেশন সমস্ত মূল শিল্প ও পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে।

তথ্যের বিশ্লেষণ ও প্রেরণের মধ্যেই সাইবারনেটিকস এখনও সীমাবদ্ধ রয়েছে—এই সীমাবদ্ধতা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বর্তমান পরিবর্তনশীল পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য, পদার্থবিদ্যার বিকাশের সঙ্গেও এটা সঙ্গতিপূর্ণ। একটা সময় পর্যন্ত কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিকীরণ শক্তি নিয়ে কাজ করত আর

তাই সেটা ছিল আপেক্ষিকতাবাদের বাইরে। তারপর উচ্চতর শক্তিগুলি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়, তখন প্রয়োজন দেখা দেয় ক্ষুদ্রাণু জগতের আপেক্ষিকতাবাদী ধারণার, তার পরিণতিতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গভীরতর সামান্যীকরণ অর্জিত হয়। উৎপাদন, তথ্য প্রেরণ, বণ্টন এবং প্রচণ্ড তীব্রতা-সম্পন্ন শক্তিগুলিকে কাজে লাগাবার জন্যে সাইবারনেটিক পদ্ধতি কোয়ান্টাম-আপেক্ষিকতাবাদী ধারণার মূর্তরূপ হিসাবে আগামী দিনে প্রতিপন্ন হবে।

এই ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা কিভাবে মানুষের শ্রমকে প্রভাবিত করবে? এই প্রশ্নটির জবাব মানবজাতির ভবিতব্যের উপর আইনস্টাইনের চিন্তাধারার প্রভাব উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করে। শ্রমের নানা উপাদানকে পর পর সাজিয়ে নিলে প্রযুক্তিবিদ্যার পরে সেই গঠন-বিন্যাসের যে প্রভাব পড়ে, তার থেকে আমরা এই ধরনের একটা ধারাবাহিকতা পাই: প্রাপ্তিযোগ্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার, একই পদার্থগত সূত্রগুলির কাঠামোর মধ্যে আরও ফলপ্রসূ কাঠামো-গত ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত ছক। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশল ঐ ধারাবাহিকতার প্রথম যোগসূত্র শ্রমিককে সরিয়ে দিয়ে শ্রমের পুনর্গঠনযোগ্য উপাদানটিকে কতটা শক্তিশালী করে তোলে। পরবর্তী স্তরে সাইবারনেটিক পদ্ধতি তার নিজের নকশাকেই পালটে দিয়ে মানুষকে আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী সমস্যার দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম করে তুলবে। সাইবারনেটিক্স মানুষকে অপসারিত করে না, তার সৃজনশীল কাজের প্রকৃতিকে পালটে দেয়। আধুনিক ইন্‌জিনিয়ারিং-এর সবচেয়ে উন্নত শাখাগুলির দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, শ্রম কিভাবে গবেষণার সঙ্গে মিশে গিয়েছে—শুধু বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রেই এটা ঘটে নি, পদার্থগত বাস্তবতার সমস্যায়, মহাকাশের কাঠামো নির্ধারণ এবং প্রাথমিক কণা ও ক্ষেত্রগুলির কাঠামোর ব্যাপারেও এটা দেখা যাচ্ছে। **সামাজিক শোষণের সঙ্গে এই ধরনের শ্রম সম্পূর্ণ বেমানান।**

আইনস্টাইনের কাজ এইভাবেই মানবজাতির আত্মিক ও বৈষয়িক মুক্তির সঙ্গে জড়িত। তাঁর বৈজ্ঞানিক কীর্তির অমরত্ব এখানেই। আইনস্টাইনের ভাবমূর্তিটিও মৃত্যুঞ্জয়, কার্যকারণ-সম্পর্কে বাঁধা একটা সুশৃঙ্খল সমগ্রতারূপে এই জগতের জ্ঞান অর্জনের জন্যে তিনি যা 'নিছক ব্যক্তিগত' ও দৈনন্দিন গতানু-গতিকতার আচ্ছন্ন, তাকে বর্জন করেছিলেন।

এমন দিন আসবে যখন সাধারণ মানুষ আইনস্টাইনের চাইতেও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক বেশি জানবে। কিন্তু আইনস্টাইনের কাজ থেকে সেই মানুষ যা 'নিছক ব্যক্তিগত', তার থেকে দূরে থাকার প্রেরণা পাবে, সে এই বিরাট মানুষটির হৃদস্পন্দন শুনতে পাবে। আইনস্টাইনের রচনাবলী পাঠ করে তাঁর মনের মহিমান্বিত অবস্থান ও খেলোয়াড়ের মতো বলিষ্ঠতা দেখে বিস্মিত হবে (কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটালে'র মধ্যে যে প্রচণ্ড মননশীল ক্ষমতার পরিচয় রয়েছে, তারই মতো)।

এই হলেন আইনস্টাইন: মানুষের মধ্যে একজন বিরাট মানুষ, চিন্তা নিয়ে বেঁচে আছেন এই রকম একজন মানুষ। এই তাঁর জীবন: লুইটপোল্ড জিমনাসিয়াম; নীল ভূমধ্যসাগরীয় তটরেখা, ছবির মতো সুন্দর শহর ও মিউজিয়াম নিয়ে ইতালি; সুইজারল্যাণ্ডের ছাত্রজীবন; বার্ন-এর পেটেন্ট অফিস; অধ্যাপনাবৃত্তি; বার্লিন; প্রথম মহাযুদ্ধ; বিশ্বজুড়ে খ্যাতি; বিভিন্ন দেশ সফর; নাৎসীদের তাড়নায় উদ্বাস্তু; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিজের কাজ; পরমাণু বোমার ট্রাজিডি। এই তাঁর কাজ: ব্রাউনীয় গতি, ফোটন, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব বার করার চেষ্টা।

সেই কবিতাটার কথা মনে করা যাক, যাতে ঈশ্বর নিউটনকে পাঠালেন বিশ্বকে আলোকিত করতে এবং শয়তান আইনস্টাইনকে পাঠাল বিশ্বকে আবার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে। বস্তুজগতের ধ্রুব নিয়মগুলিকে একবারেই আলোকিত করে তোলা (অর্থাৎ আবিষ্কার করে ফেলা—অনুবাদক) প্রকৃতপক্ষেই মানুষের সম্ভাবনা ও ইচ্ছার নাগালের বাইরে। নিউটনের আলোকচ্ছটাকে ও সেই সঙ্গে সমস্ত আলোকে বাতিল করে দেওয়া শয়তানের কাজ হতে পারে। কিন্তু নিউটন যে আলো জ্বালিয়েছিলেন তার জায়গায় আরও উজ্জ্বলতর আলো জ্বালানো, কোনো একটি আলো জগৎ-চিত্রকে যেভাবে আলোকিত করে, তাকে চূড়ান্ত বলে না মানা এবং পুরানো আলোটা সরে গেলে অন্ধকার নেমে আসবে, এই ভয় না করা—মানবিক আকাঙ্ক্ষা ও মানব-প্রতিভার কর্তব্য। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদের এটাই ছিল অবদান। সব কিছু মিলিয়েই তিনি ছিলেন একজন মানুষের মতো মানুষ।